সমকালীন ভাস্কর্য

মৃণাল ঘোষ

সমকালীন ভাস্কর্য
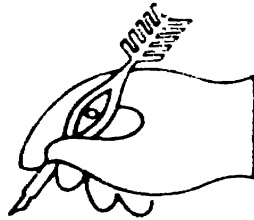
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ
১ বৈশাখ, ১৪০২
১৫ এপ্রিল, ১৯৯৫

প্রকাশক
প্রিয়ব্রত দেব
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
৭ জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক
প্রতিক্ষণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১২বি বেলেঘাটা রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৫

প্রচ্ছদের ছবি
রামকিঙ্করের ভাস্কর্য। 'রবীন্দ্রনাথ'। ব্রোঞ্জ। ১৯৪৮।

চতুর্থ প্রচ্ছদের ছবি
প্রদোষ দাশগুপ্তের ভাস্কর্য। 'ফলেন উওম্যান'। ব্রোঞ্জ। ১৯৭০।
(সৌজন্য: বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার। কলকাতা।)

বাবার স্মৃতিতে
এবং
মাকে

'প্রতিক্ষণ' প্রকাশিত এই লেখকের অন্য তিনটি বই

এই সময়ের ছবি (দ্বিতীয় সংস্করণ)
গণেশ পাইনের ছবি
শিল্পের স্বদেশ ও বিশ্ব

সূচনা

সমকালীন চিত্রকলা নিয়ে লেখা 'এই সময়ের ছবি' বইটি বেরিয়েছিল জানুয়ারি, ১৯৮৯-তে। তখন থেকেই ইচ্ছে ছিল ভাস্কর্যকেও একটু নিবিষ্ট অনুধাবনের। পরের দুটি বই 'গণেশ পাইনের ছবি' ও 'শিল্পের স্বদেশ ও বিশ্ব' করতে গিয়ে ওই পরিকল্পনা খানিকটা বিলম্বিত হয়েছে। তবু লেখাগুলো একে একে তৈরি করা গিয়েছিল। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত 'প্রতিক্ষণ'-এ বেরিয়েছিল ভাস্কর্য-বিষয়ক ১১টি প্রবন্ধ। আর একটি লিখতে হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়র জন্য। এই ১২টি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের সংকলন বর্তমান বইটি, যার নাম 'সমকালীন ভাস্কর্য'।

যদিও স্বতন্ত্র তবু একটি পরিকল্পনার অন্তর্গত বলে স্বভাবতই প্রতিটি অধ্যায় পরস্পর সম্পর্কিত এবং সমকালীন ভারতীয় ভাস্কর্যের উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে ধরার চেষ্টা কাজ করেছে এর পেছনে। কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে প্রবন্ধগুলো লেখা হয়েছিল বলে কোনো কোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বইতে অন্তর্ভুক্ত করার সময়ও সেটা এড়ানো গেল না।

বিবর্তনের ধারাবাহিকতার আভাস রয়েছে যদিও, তবু এ বই সমকালীন ভাস্কর্যের সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস নয়। একটি কেন্দ্রীয় সন্ধান হয়তো থেকে গিয়েছিল চিত্রকলা বিষয়ক পূর্বোক্ত তিনটি বইতে। কেমন করে দেশীয় ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিক আধুনিকতার আঙ্গিককে আত্মস্থ করে প্রকাশের স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াস চলছে, সেটাকেই বুঝে নেওয়া, প্রকারান্তরে তা আমাদের এই সাম্প্রতিক দেশকালের স্পন্দনকেও অনুধাবনের চেষ্টা, শিল্পের দর্পণে যেটুকু তার ধরা পড়ে। সেই প্রত্যয়কেই ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে দেখার বিনীত প্রয়াস এখানে।

সমকালীন ভাস্কর্যের কোনো কোনো বিশিষ্ট শিল্পীর মুখেও শুনেছি ভারতীয় আধুনিকতা বলতে যা বোঝায় আমাদের ভাস্কর্যে সেরকম কিছুর উন্মেষ এখনো ঘটে নি। সত্যিই কি তাই? এই শতকের ভাস্কর্য-চর্চার ধারাবাহিকতায় ঐতিহ্য-অন্বিত আধুনিকতার মূল্যমানে ভাস্কর্য সৃষ্টির প্রয়াসও চলছে বিগত প্রায় ষাট বছর ধরে। অনেক শিল্পীই তাঁদের জীবনের সমগ্র ধ্যান এর পিছনে দিয়েছেন। এ সমস্ত থেকে অর্জন কি কিছুই নেই? এ প্রশ্নটি ভাবিয়েছে এবং হয়তো প্রাণিত করেছে এই সন্ধানে। একথা ঠিকই বিগত একশো বছরে ছবি যতটা এগিয়েছে ভাস্কর্যের অগ্রগতি, জীবনে ও সমাজে তার ব্যাপ্তি, সে তুলনায় অনেক ক্ষীণ। এটাই বা কেন? অথচ ক্ষীণ হওয়া সত্ত্বেও এও লক্ষ করা যায় ভাস্কর্যে শিল্পীর নিষ্ঠা ও দায়বোধের গভীরতা কম নয় কোনো অংশেই। এই নিষ্ঠা বা দায়বোধের অর্জনই বা কতটা? এ সব সন্ধানই ঘুরেফিরে এসেছে এই লেখায়। এসবের কোনো শেষ উত্তর তো হয় না, সন্ধানটাই যদি পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহলেই এর খানিকটা তাৎপর্য বা প্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে।

ভারতীয় ভাস্কর্যের মহান ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতাকে বোঝার চেষ্টা প্রথম অধ্যায়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য ইওরোপীয় আধুনিকতার স্বরূপ। 'সমকালীন ভাস্কর্য : সমস্যা ও সফলতা'—এই তৃতীয় প্রবন্ধটিকে বলা যায় পরবর্তী আলোচনাগুলির সারসংক্ষেপ। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'সমকালীন ভাস্কর্যের দিকে তাকানো বাকি ৯টি প্রবন্ধে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিনটি প্রজন্মে ভাগ করা হয়েছে ১৯৩০-এর পরবর্তী ভারতীয় ভাস্কর্যকে। প্রথম প্রজন্মের ৬ জন ভাস্করের কাজের বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে বুঝতে চাওয়া হয়েছে সেই সমন্বয়ের স্বরূপই।

আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক শিল্পীর নাম এসেছে, উল্লেখ করা হয় নি এরকমও আছেন হয়তো অনেকে। ভাস্কর্যের স্বরূপ বা প্রবণতাকে বোঝাই উদ্দেশ্য ছিল। ব্যক্তি শিল্পীর প্রসঙ্গ নয়। উল্লেখ, অনুল্লেখ বা আলোচনার দৈর্ঘ্য, তাই স্বভাবতই কোনো শিল্পীর গুরুত্বের মাপকাঠি নয়। এ সংক্রান্ত কোনো ত্রুটির জন্য তবু লেখক মার্জনাপ্রার্থী।

লেখালেখির পেছনে যাঁদের আগ্রহ, সহযোগিতা ও উৎসাহ সব সময়ই কাজ করে, এখানেও করেছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় দেবেশ রায়, অরুণ সেন, দিব্যেন্দু পালিত, স্বপ্না দেব, মনসিজ মজুমদার, নভেন্দু সেন, মায়া ঘোষ প্রমুখের নাম। বইপত্র সক্রান্ত সহায়তা পেয়েছি অরুণ সেন, রঘুনাথ সিংহ, শুভ বসু ও চঞ্চল মুখার্জির কাছে থেকে। ছবি ছাপা হল শিল্পীদের সহৃদযতায় যেমন, তেমনি বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার, সেন্টার অব ইন্টারন্যাশনাল মডার্ন আর্ট, সিগাল সংস্থা, গ্যালারি ৮৮, গ্যালারি বি· এফ· ১৪, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ললিতকলা অ্যাকাডেমি, ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট, এ সমস্ত গ্যালারি ও প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যে। আগের তিনটি বইয়ের ক্ষেত্রে যেমন, এ বইটির বেলাতেও প্রিয়ব্রত দেবের উৎসাহ ও সহৃদয়তা ছাড়া প্রকাশ সম্ভব ছিল না। 'প্রতিক্ষণ'-এর কর্মীবন্ধুদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রস্তুতি ও মুদ্রণের প্রতিটি পর্যায়কে সহজতর করেছে। আন্তরিক ও বিনত কৃতজ্ঞতা রইল সকলের প্রতি।

কলকাতা
জানুয়ারি ১৯৯৫

মৃণাল ঘোষ

সূচি

রঙিন ছবি ১· অর্ধনারীশ্বর। দক্ষিণ ভারতীয়, চোল। ব্রোঞ্জ। একাদশ শতক।
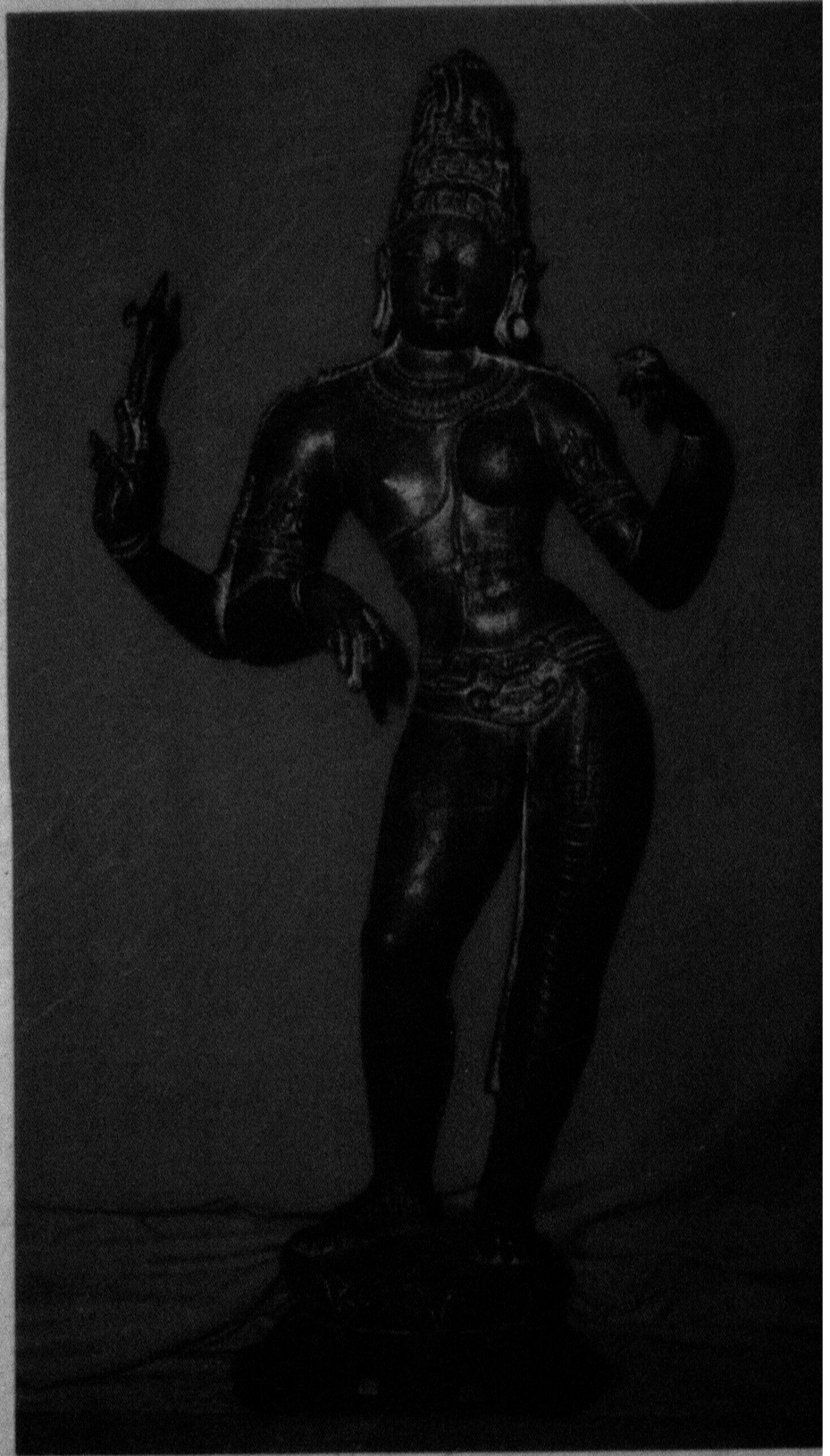
ভাস্কর্যের ভারতীয়তা

এক

উৎস

কুমারস্বামী তাঁর 'হিসট্রি অব ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইন্দোনেশিয়ান আর্ট' গ্রন্থের শুরুতেই মন্তব্য করেছিলেন, "ইতিহাস ধরে যতই আমরা পিছিয়ে যাই, ততই আমরা সংস্কৃতির একটি সাধারণ ধরণের (কমন কালচারাল টাইপ) কাছাকাছি আসি। পার্থক্যটা বাড়তে থাকে যতই আমরা সামনের দিকে এগোই।" প্রাগৈতিহাসিক যুগে সারা পৃথিবীতেই মানুষের প্রকাশের মধ্যে একরকম ঐক্য লক্ষ করা যায়। এমনকী আদিম যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইতিহাসের আগের অতীত এখনো স্তব্ধ হয়ে আছে, পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক তাদের অবস্থান, তাদের শিল্পের মধ্যেও অভিব্যক্তির একটা মিল আছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাস্কর্য কোনটি? এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে ইওরোপে মাটির তৈরি ভাস্কর্যের আদিমতম দৃষ্টান্তগুলি ২৭৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনতম যে ভাস্কর্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তা প্রায় খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ সহস্রাব্দে নব্যপ্রস্তর যুগের। (সূত্র: বি এন মুখার্জি—আ নোট অন দ্য ইনসেপশন অব মডার্ন ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার। কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস আয়োজিত ১২ নভেম্বর ১৯৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত শিরোনামের আলোচনাচক্রের স্মারকপত্রে অন্তর্ভুক্ত)

অস্ট্রিয়ার উইলেনডর্ফ-এ পাওয়া চুনাপাথরের একটি নারী মূর্তিকেও পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাস্কর্যের অন্যতম নিদর্শন বলে মনে করেন অনেকে। (সূত্র: দ্য রানডম হাউজ লাইব্রেরি অব পেইন্টিং অ্যান্ড স্কাল্পচার। দ্বিতীয় খণ্ড। নিউইয়র্ক। ১৯৮১)। ভাস্কর্যটির নামকরণ হয়েছে 'দ্য ভেনাস অব উইলেনডর্ফ'। আনুমানিক তিরিশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের রচনা। হাতের মুঠোয় ধরা যায় এরকমই ছোট নুড়ি-পাথর থেকে খোদাই করা এই মূর্তিটিতে সংহত হয়ে আছে মাতৃত্ব ও উর্বরতাশক্তির ঘনীভূত সারাৎসার। হাত-পা ক্ষুদ্রাকৃতি। মাথা ও মুখ বিশদবর্জিত। উদর, বক্ষ, যোনি ও পশ্চাদ্দেশ, স্ফীত, যেন ভেতর থেকে পুঞ্জীভূত কোনো শক্তি স্ফুরিত হচ্ছে। প্রকাশের সারল্য ও সাবলীলতার মধ্যে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের এই ভাস্কর্য অভিব্যক্তির যে তীব্রতাকে ধরে রাখে প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর শিল্পের সেটাই সাধারণ চরিত্রলক্ষণ। এর সঙ্গে এসে যায় এক ধরণের আধ্যাত্মিক আকুতি, অস্তিত্বের তীব্র সংকটজনিত ভয় ও করুণার অনুরণন, যেন অস্তিত্বের ভিতরের এক অসংজ্ঞায়িত গহন অন্ধকারের বিমূর্ততা মূর্তিবদ্ধ হয়ে ওঠে। চেতনার অভ্যন্তরের এই আলো-আঁধারিকে বস্তুপুঞ্জের ত্রিমাত্রিকতার মধ্যে রূপবদ্ধ করতে পারা পৃথিবীর সভ্রান্ততম ও আধুনিকতম সভ্যতার শিল্পীর সামনেও একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। এজন্যই আধুনিকতা বারবার আদিমতার কাছে ফিরে গিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে।

আজও পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের আদিম জনগোষ্ঠীর শিল্পের মধ্যে কি আশ্চর্য মিল! মুগ্ধ হওয়ার মতো এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখার সুযোগ হল সম্প্রতি (মে, ১৯৯৩) কলকাতায় বিড়লা অ্যাকাডেমি আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে। নীলাদ্রি চাকী পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি সূত্রে বিদেশে ছিলেন দীর্ঘদিন। আর ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রায় সারা পৃথিবী। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন আদিম ও লৌকিক নানা জনগোষ্ঠীর বিচিত্র সব শিল্পকর্ম। অসামান্য সেই সংগ্রহ নিয়ে আয়োজিত হয়েছিল প্রদর্শনীটি। এখানে আমরা মুগ্ধ হয়েছি দেখে যে সুদূর আফ্রিকা,

মেক্সিকো বা ভারতবর্ষের আদিম উপজাতির কাজের মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত রকমের এক ঐক্য। আদিমতার চেতনার মধ্যে যেমন এক যোগসূত্র রয়েছে, তেমনি আবার স্বতন্ত্র ধরণের এক যোগসূত্র রয়েছে লোকায়তিক জনগোষ্ঠীর প্রকাশের মধ্যে।

আদিমতার প্রকাশভঙ্গির মূল বৈশিষ্ট্য তীক্ষ্ণ ও তীব্র অভিব্যক্তিময়তা। আর লৌকিক শিল্পের মধ্যে রয়েছে নির্ভার, সারল্য ও ছন্দিত সুষমা। কিন্তু মানুষের চেতনাপ্রবাহ কালগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তার মধ্যে একটা প্রবহমানতা রয়েছে। এই প্রবহমানতার ভিতর দিয়ে চলে এক রূপান্তর প্রক্রিয়া। আদিমতাই ক্রমান্বয়ে লৌকিকে রূপান্তরিত হয়। এভাবে মিথ বা পুরাণকল্পের ধারা বয়ে চলে আদিম থেকে সাম্প্রতিকে। অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' পুস্তিকাটির মধ্যে এই রূপান্তরের অনেক দৃষ্টান্ত ধরা আছে। আমাদের লৌকিক চিত্রে ও নানা ব্রতের আলপনায় এমন অনেক নকশা বা প্রতিমাকল্প আছে যেগুলি প্রাগৈতিহাসিক আদিম জীবনধারার নানা টোটেম বা জাদু-আচার থেকে রূপান্তরিত হতে হতে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। সুধাংশুকুমার রায় তাঁর 'দ্য রিচুয়াল আর্ট অব দ্য ব্রতজ অব বেঙ্গল' গ্রন্থে এর অনেক সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এর মধ্য দিয়েই মিল খুঁজে পাওয়া যায় আমাদের দেশের সঙ্গে সুদূর মিশর বা পাশ্চাত্যের কোনো সভ্যতার কিছু কিছু চিত্রকল্পের। এ-প্রসঙ্গে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন যেটি তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত করা যায়,

> "গোড়াতে ব্রত ছিল অমার্জিত ও অপরিশোধিত একরকম ডাকিনী-বিদ্যা। ক্রমান্বয়ে এটাই পরিশুদ্ধ হয়ে শিল্পে উন্নীত হল। সম্মোহন রূপান্তরিত হল কবিতায়, আর ম্যাজিক-আশ্রিত যে আলপনা তা পেল চিত্রকলার আদল। সম্মোহন হল আত্মার সুরেলা ক্রন্দন এবং আলপনা নারীজাতির সুললিত আকাঙ্ক্ষার ছন্দিত প্রতিফলন।" (পৃষ্ঠা-৪৮)

এই হল আদিমতা থেকে লৌকিকে রূপান্তরের প্রক্রিয়া।

ভারতবর্ষে ভাস্কর্যের প্রাচীন নিদর্শনগুলির অন্যতম উৎস সিন্ধুসভ্যতা। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও চানহুদারোতে সিন্ধুসভ্যতার বিস্তৃত কিছু অবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল যথাক্রমে ১৯২১, ১৯২২

১· কোনারক। বাদনরতা সুন্দরী। খ্রিঃ ১৩শ শতক।

ও ১৯৩১-এ। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে খননকার্য সম্পন্ন হয়েছিল যথাক্রমে ১৯২৩-২৪ ও ১৯২৫-২৬ সালে। এই ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কার, আমরা জানি, ভারতের সামাজিক ইতিহাসে যেমন, তেমনি শিল্পের ইতিহাসেও নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। এর আগে ভারতের ইতিহাস শুরু হত আর্যসভ্যতা থেকে এবং শিল্পের ইতিহাস শুরু হত মৌর্য যুগ থেকে (৩২০ থেকে ১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), কখনো-বা শিশুনাগ-নন্দ বংশের সময় থেকেও (৬৪২ থেকে ৩২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), শুরু করতেন কেউ কেউ। সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারের পরে ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস প্রায় তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেল। কুমারস্বামী শিল্প-ইতিহাসের দিক থেকে সিন্ধুসভ্যতাকে বলেছেন ইন্দো-সুমেরীয় যুগ। মেসোপটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বেঞ্জামিন রোলান্ড তাঁর "দ্য আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া" গ্রন্থে বলেছেন, সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সিন্ধুসভ্যতার মানুষের সঙ্গে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার কিছু সংযোগ অবশ্যই ছিল। সমুদ্রপথে এবং বেলুচিস্তান হয়ে স্থলপথে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এটা তো একটা বহিঃসংযোগের ব্যাপার। শিল্প-আঙ্গিক ও প্রতিমা-লক্ষণের দিক থেকে যেটা প্রাসঙ্গিক, তা হল, সিন্ধুসভ্যতা ছিল মাতৃতান্ত্রিক এবং প্রাচীনকালের সমস্ত মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার শিল্প-প্রকাশের মধ্যেই নন্দনগত একটা ঐক্যের সূত্র পাওয়া যায়। আমরা মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া সীলমোহরগুলির মধ্যে দুটি সীলমোহর একটু নিবিষ্টভাবে দেখে নিতে পারি। দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়মে রক্ষিত এই সীল দুটির একটিতে দেখা যায় ত্রিশৃঙ্গবিশিষ্ট এক দেবমূর্তি উপবিষ্ট। তাকে ঘিরে অনেক বন্য জন্তু। এই ত্রিশৃঙ্গের উপস্থাপনাকে পণ্ডিতেরা বলেছেন মেসোপটেমিয়ার সভ্যতারই এক নিদর্শন। আবার উপবিষ্ট এই দেবতা পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের মধ্যেও অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে যে শিব, তারই পূর্বসূরি। এই ত্রিশৃঙ্গ ত্রিশূলরূপে হয়ে উঠেছে শিবেরই প্রতীক। আবার বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও ত্রিশূল এসেছে ধর্মীয় ও শিল্পগত প্রতীক হিশেবে। আর এই দেবতাটির বসার অসামান্য ভঙ্গির মধ্যে দক্ষিণ ভারতের কথাকলি নৃত্যের বিশিষ্ট এক মুদ্রা আমরা চিনে নিতে পারি। দ্বিতীয় সীলটিতে রয়েছে খুবই সুপরিচিত বৃষের প্রতিকৃতি। এর সঙ্গেও সুমেরীয় উর্বরতার প্রতীকের সাযুজ্যের কথা বলেছেন পণ্ডিতেরা।

উইলেনডর্ফ-এর ভেনাস। নুড়িপাথর। খ্রিঃ পূঃ ৩০০০০-২৫০০০।

৩. হরপ্পা চুনা পাথরের দেহকাণ্ড। খ্রিঃ পূঃ ৩০০০-১৫০০।

৪· নৃত্যরতা মূর্তি। হরপ্পা। চুনাপাথর। খ্রিঃ পূঃ ৩০০০-১৫০০।

৫ নৃত্যরতা মূর্তি। মহেঞ্জোদারো। তাম্র। খ্রিঃ পূঃ ৩০০০-১৫০০।

এই ষাঁড আবার পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছে শিবের বাহন এবং অন্যদিক থেকে শিবের প্রতীক। ভাস্কর্য হিশেবে এটি অসামান্য নান্দনিক উৎকর্ষের নিদর্শন। এর মধ্যে যে আর্কায়িক বা প্রত্ন-প্রতিমাসঞ্জাত অসাধারণ শক্তি ও সংহতির প্রকাশ তাকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো ভাস্কর অতিক্রম করতে পারেন নি। আর ভাস্কর্য বিষয়ে আগ্রহী যে-কোনো মানুষই জানেন যুগের পর যুগ ধরে আধুনিক কালে পর্যন্ত মহেঞ্জোদারোর এই ষাঁড়কে কতভাবে গড়েছেন ভারতীয় ভাস্কররা। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে আদিম ও আধুনিক এই ষাঁড ভারতীয় ভাস্কর্যের উৎকর্ষকে একটি মাত্রায় বেঁধে দিয়েছেন আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। তারপরে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতক থেকে দশম-একাদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় ভাস্কর্যের যে অনির্বাণ জয়যাত্রা, তাতে নানা শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হয়ে পৃথিবীর শিল্প-ইতিহাসে অচঞ্চল এক আলোকশিখার মতো দীপ্যমান হয়ে আছে আমাদের যে ভাস্কয, সেই সফলতা বীজরূপে প্রোথিত ছিল সিন্ধুসভ্যতাতেই।

কিন্তু এই সীলগুলিও শিল্পকর্ম হিশেবে সিন্ধুসভ্যতার অনেকটাই গৌণ প্রকাশ। যে কয়েকটি পূর্ণমাত্রার ভাস্কর্য পাওয়া গেছে এখানে সেগুলো ভারতীয় ভাস্কর্যের মূলগত বৈশিষ্ট্যের সন্ধানে গভীর ইঙ্গিতময় হয়ে থাকে আমাদের কাছে। শিল্পের এক আবিশ্ব ঐক্যের কথা দিয়ে শুরু হয়েছিল এই আলোচনা। কিন্তু ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রত্যূষের সেই সামগ্রিক ঐক্যের মধ্যেও ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্যের জায়গাটা ক্রমে ক্রমে কিভাবে বিকশিত হয়েছে সেই সন্ধানের দিকে যেতে গিয়ে সিন্ধুসভ্যতার ভাস্কর্যের এই কটি নিদর্শনের মধ্যে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাই। বুঝতে পারি, আদিম কৌম বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের বিঘ্নসংকুল সংঘাত ও অনিবার্যতা থেকে জেগে উঠছিল যে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, প্রয়োজনের পাশাপাশি সে এক সৌন্দর্যচেতনারও জন্ম দিচ্ছিল, সেই সৌন্দর্যচেতনাই ইতিহাসের স্রোতে প্রবাহিত হয়ে নানা উৎস থেকে রস আহরণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সমস্ত অর্জনকে আত্মস্থ করে নিজের আত্মপরিচয়কে একান্ত ও অনন্য করেছে। সিন্ধুসভ্যতার এই কটি ভাস্কর্য সেই সন্ধানেরই আমাদের জানা প্রথম পদক্ষেপ। আমরা এখানে মহেঞ্জোদারোর দুটি এবং হরপ্পার দুটি মাত্র ভাস্কর্য একটু নিবিষ্টভাবে দেখব। প্রথমটি মহেঞ্জোদারোর সেই সুপরিচিত

'লাইমস্টোন' বা চুনাপাথরের আবক্ষ পুরুষ মূর্তি। অর্ধনীমিলিত দীর্ঘায়ত দুই চোখ, শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত মুখ, উন্নত নাসা, পুরু ঠোঁট, এক কাঁধ অনাবৃত, অন্য কাঁধের উপর দিয়ে সঞ্চালিত অঙ্গবস্ত্র নিয়ে পুরোহিত বা সাধকশ্রেণীর এই মানুষকে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর বলে চিনে নেওয়া যায়। ভারতীয় ভাস্কর্যের পরবর্তী ধারায় এর প্রত্যক্ষ অনুরূপতা তেমন না পাওয়া গেলেও অস্তিত্বের দীর্ণ সংকটের বিপরীতে আধ্যাত্মিকতার সন্ধানের যে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য তার কিছু ইঙ্গিত এর মধ্যে ধরা থাকে। মহেঞ্জোদারোর দ্বিতীয় ভাস্কর্যটি ব্রোঞ্জ বা মতান্তরে তাম্র-নির্মিত নৃত্যরতা এক নারীমূর্তি। শীর্ণকায়া নগ্নিকা এই নারীর দাঁড়ানোর মধ্যে ত্রিভঙ্গ ছন্দের সামান্য আভাস আছে, যদিও পরবর্তীকালের ধ্রুপদী ভাস্কর্যের সুষমার ছন্দ থেকে তা অনেক দূরবর্তী। কিন্তু এটা কোনো অভাব নয়। এখানে অভিব্যক্তির যে আদিমতাময় প্রত্নপ্রতিমাসঞ্জাত তীক্ষ্ণতা, সেটাই এর শক্তি। আর এই অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েই এই মূর্তি পৃথিবীর সমস্ত আদিম শিল্পের সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন করে আজও আমাদের ভাস্কর্যের বিশেষ একটি ধারাকে পরিপুষ্ট করে যাচ্ছে। এটিকে দেখে দক্ষিণ ভারতীয় অনেক পরবর্তীকালের কোনো চোল ভাস্কর্য বলেও ভুল হতে পারে। এখানেই আসে সেই আবিশ্ব ঐক্যের প্রশ্ন, আবার এটাই ভারতীয়তার বিশিষ্ট একটি প্রশাখার অনন্য উৎস।

তৃতীয় ও চতুর্থটি যথাক্রমে হরপ্পার লাইমস্টোন বা চুনাপাথরে তৈরি পুরুষের দেহকাণ্ড ও নৃত্যরতা নারীমূর্তি। এই নৃত্য-মূর্তির সঙ্গে মহেঞ্জোদারোর নৃত্যরতার তুলনা করলে আমরা শিল্পে অভিব্যক্তি বা প্রকাশভঙ্গির দুই বিপ্রতীপ ধারার ইঙ্গিত পাই। মহেঞ্জোদারোতে সংঘাতের দিক, তীব্রতার দিক, আর হরপ্পায় সমন্বয়ের দিক, সুষমার দিক। হরপ্পার নৃত্যমূর্তিটিতে হাত, পা, মাথা পাওয়া যায় নি, শুধু টরসো বা দেহকাণ্ডটি পাওয়া গেছে। পুরুষমূর্তিটিতেও তাই। কিন্তু

৬· মহেঞ্জোদারোর কয়েকটি সিল। খ্রিঃ পূঃ ৩০০০-১৫০০।

এটুকু অংশের মধ্যেই এখানে যেটা লক্ষণীয়, তা হল আয়তনের সুডৌল পূর্ণতা অভ্যন্তরে একটি কেন্দ্রে সংহত হয়ে কেমন করে বাইরের দিকে স্ফুরিত হচ্ছে। রূপায়ণের স্বাভাবিকতাতে লগ্ন থেকেও এক আদর্শায়িত ছন্দিত সুষমার দিকে এই যে উত্তরণ, পরবর্তীকালে ভারতীয়তার এটাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এ-কথা মনে রেখেই হেইনরিক জিমার তাঁর বিখ্যাত 'দ্য আর্ট অব ইন্ডিয়ান এশিয়া' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন,

> "শিল্পের অন্তঃস্থ কেন্দ্র থেকে উৎসারিত জীবন্ময় পুঞ্জিত শক্তির বাইরের তলের দিকে এই যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা, পরবর্তী ভারতীয় শিল্পের যা এক নিবিড় বৈশিষ্ট্য, ওই অবিশ্বাস্যরকম প্রাচীন কালেই তার প্রকাশ দেখতে পাই আমরা (মহেঞ্জোদারোর ভাস্কর্যে)"।(পৃষ্ঠা-৩৬)।

আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সিন্ধুসভ্যতা স্থায়ী ছিল বলে মনে করা হয়। ২০০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ জুড়ে আর্যরা ভারতে আসতে থাকে এবং উত্তর ভারত জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। এই হাজার বছর ধরে ভারতীয় মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয় এক সমন্বয় প্রক্রিয়া। এই সমন্বয়ের ভিতর দিয়েই ভারতীয় সভ্যতা তার স্বাতন্ত্র্যের দিকে অগ্রসর হয়। রবীন্দ্রনাথ আর্য-অনার্যের এই সমন্বয় প্রক্রিয়াকে সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন 'পরিচয়' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে। রামায়ণ, মহাভারত, অন্যান্য পুরাণ ও নানা লোককাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তত্ত্বজ্ঞানী আর্য ও সৃজনশীল অনার্যরা বিরোধের মধ্য দিয়ে কেমন করে

এক সমন্বয়ের পথে এগিয়েছে। আর এই সমন্বয়ের ফলে গড়ে উঠেছে ভারতীয়তার স্বতন্ত্র ধরণ। আলোচনা থেকে তিনি পৌঁছেছেন এই সিদ্ধান্তে:

> "বস্তুত প্রাচীন দ্রাবিড়গণ সভ্যতায় হীন ছিল না। তাদের সহযোগে হিন্দুসভ্যতা, রূপে বিচিত্র ও রসে গভীর হইয়াছে। দ্রাবিড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিল না, কিন্তু কল্পনা করিতে, গান করিতে এবং গড়িতে পারিত। কলাবিদ্যায় তাহারা নিপুণ ছিল এবং তাহাদের বধূ ছিল কলাবধূ। আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্ভাবনী শক্তির সংমিশ্রণ চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আর্যও নহে, অনার্যও নহে, তাহাই হিন্দু। এই দুই বিরুদ্ধের নিরন্তর সমন্বয় প্রয়াসে ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য সামগ্রী পাইয়াছে। তাহা অনন্তকে অন্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে এবং ভূমাকে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে।" (পৃষ্ঠা-১৪৪, ১৮শ খণ্ড, বিশ্বভারতী)

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ১৩১৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১১ সালে। তখনো মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা আবিষ্কৃত হয় নি। এই আবিষ্কারের পরে প্রাক-আর্য সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আমূল পালটেছে। এবং মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার ভাস্কর্যের সাক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্তকে আমরা এখন আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। সিন্ধুসভ্যতার পরে ও মৌর্যযুগেব সূচনার মধ্যবর্তী সময়ে আমরা সামান্য যে কয়েকটি ভাস্কর্যের নিদর্শন পাই তার মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি লুরিয়া নন্দগড় থেকে পাওয়া সোনার পাতের উপর ছোট একটি মাতৃকা মূর্তি, দ্বিতীয়টি বর্তমানে বোস্টন মিউজিয়ামে সংগৃহীত মথুরা থেকে পাওয়া টেরাকোটা মাতৃমূর্তি। এই দুটির অঙ্গ-সংস্থান ও অবয়ব-বিন্যাসে আশ্চর্য মিল রয়েছে। বুকের পর থেকে কোমর পেরিয়ে নিম্নাঙ্গ অত্যন্ত পৃথুল, পৃথিবীর মতো গোলকের আকৃতি নিয়ে নেমে এসেছে। সাবলীল ছন্দিত বক্ররেখায় তরঙ্গায়িত হিল্লোল প্রবাহিত হয়েছে শরীর জুড়ে। এই সেই সনাতন প্রজনন ও উর্বরতা শক্তির প্রতীক আদিম মানুষ সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে যার ধ্যান করেছে।

প্রকৃত দৃষ্টান্তের এরকম অপ্রতুলতা সত্ত্বেও স্টেলা ক্রামরিশ প্রমুখ সিদ্ধান্ত করেছেন, মাঝখানে একটা শূন্যতা থাকলেও ভারতীয় ভাস্কর্যের মধ্যে একটা ক্রমিক প্রবহমানতা রয়ে গেছে। এই প্রবহমানতায় প্রাক-আর্য জনগোষ্ঠীর সভ্যতার অবদান অপরিসীম। আবার এই সফলতা ভারতবর্ষ অর্জন করেছে সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে কোনো একক সাধনায়ও নয়। পৃথিবীর বৃহত্তর সভ্যতার কেন্দ্রগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের একটা সংযোগ সব সময়ই ছিল। পাশ্চাত্য গবেষকরা এই সংযোগে ভাবতকে অনেক সময় অধমর্ণ হিশেবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। যেন সুমেরীয় সভ্যতাই ভাবতকে গড়ে তুলেছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা না থাকলে ভারত এভাবে বিকশিত হতে পারত না। এর বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া জেগেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিতের মধ্যে। জাপানের মনীষী ওকাকুরা বলেছেন এক "কমন আর্লি এশিয়াটিক আর্ট"-এর কথা। এই শিল্পধারাই তরঙ্গ বিস্তার করেছে একদিকে হেলেনীয় শিল্পে, অন্যদিকে আয়ারল্যান্ড, এট্রুরিয়া, ফোয়েনিসিয়া, মিশর, ভারত ও চীনে। কুমারস্বামী বলেছেন, এটাই ইওরোপ ও এশিয়ার সাধারণ উত্তরাধিকার। এই দুটি ধারা ক্রমান্বয়ে দুভাবে বিকশিত হয়ে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্রভাবে উন্মীলিত হতে থেকেছে। এই বিকাশের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ অর্জন করেছে তার নিজস্ব রূপচেতনা। দ্রাবিড় সভ্যতার মধ্যে ছিল একটি সাধারণ বৈশ্বিক উত্তরাধিকার। তা ছিল গভীরভাবে জীবন, প্রকৃতি ও বাস্তবতায় প্রোথিত। আর্যদের মধ্যে ছিল গহন ও মরমী দর্শন চেতনা, যদিও বাস্তবচেতনা বিবর্জিত নয় তা। তাদের প্রকাশ ছিল অলংকরণময় ও বিমূর্ত। এই দুই উত্তরাধিকাব মিলে গিয়ে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকেই ভারতীয় ভাস্কর্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও রূপচেতনায় ভাস্বর হতে থাকে। ভারহুত ও সাঁচী এই সফলতার অসামান্য দৃষ্টান্ত। এখান থেকেই আমরা এমন কিছু পেতে থাকি সারা পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে যা অনন্য। প্রাক-আর্য দ্রাবিড়সভ্যতার ভিত্তির উপর এই উন্মীলনই আমাদের পৌঁছে দেয় সেই অসামান্য বৈশিষ্ট্যে যাকে বলছি ভাস্কর্যের ভারতীয়তা।

দুই

প্রবাহ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পৃথিবীতে চারটি বড় ধর্মমত জেগে উঠেছিল। চীনে কনফুসীয় ধর্ম, ইরানে জরথুস্টবাদ, ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। গৌতম বুদ্ধের জীবনকাল ৫৬৩ থেকে ৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। আর্যদের বৈদিক ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধধর্ম ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারায় বিরাট বিপ্লব এনেছিল। যার অভিঘাতের তুলনা ভারতের ইতিহাসে বিরল। বৌদ্ধধর্ম আপামর জনসাধারণকে তার ছত্রছায়ায় নিয়ে আসে। ধর্মের সঙ্গে সাধারণ মানুষের এত গভীর সংযোগ এর আগে বিশেষ ঘটে নি। এই সংযোগ সেই সময়ের শিল্পকলাকেও গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

মৌর্যবংশকে বলা হয় ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক রাজবংশ। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আলেকজান্ডারের মৃত্যুর (৩২৩ খ্রিঃ পূঃ) পর গ্রিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা দেখিয়ে খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উত্তর ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে পারেন। তাঁর পৌত্র অশোকের (২৭২-২৩২ খ্রিঃ পূঃ) আমলে ধর্মনীতি ও রাজনীতি একসঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এক নতুন যুগের সূচনা করে।

অশোক ৪২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বর্তমান নেপালের কাছে লুরিয়া নন্দগড়ে এক বিরাট স্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন। চুনারের বেলেপাথরে তৈরি এই স্তম্ভের শীর্ষে একটি সিংহ আসীন। এই স্তম্ভ বা আমাদের সুপরিচিত সারনাথের ত্রিসিংহ বিশিষ্ট যে অশোক স্তম্ভ, এগুলো মৌর্যযুগের শৌর্য ও পরাক্রমের প্রতিভূ। এদের নির্মাণকৌশল ও প্রতিমালক্ষণে (আইকনোলজি) অনেকেই ইরানীয় ও হেলেনীয় প্রভাব দেখতে পান। মৌর্যযুগে এই রাজকীয় অভিব্যক্তির পাশাপাশি আর এক ধরণের ভাস্কর্যের নিদর্শন আমরা দেখতে পাই যেগুলি আয়তনিক পূর্ণতায়, প্রাখর্যে যে আদিমতাসঞ্জাত আর্কায়িক বা প্রত্নপ্রতিমার অনুরণন জাগায় তা সিন্ধুসভ্যতায় আবিষ্কৃত ভাস্কর্যগুলির অন্তর্লীন শক্তির সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন করে। পারখামের পাথরে তৈরি দণ্ডায়মান পুরুষ যক্ষমূর্তি বা কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়মে রয়েছে যে পাথরের মুণ্ডহীন যক্ষ, তাদের পেশল শরীরে কোনো পেলবতা নেই। আপাতকমনীয়তার থেকে এখানে জোর পড়েছে বলিষ্ঠতায়। এখানে আমরা পাই এক কৌম জনগোষ্ঠীর সংহত জীবনবোধ যা তখনো মরমী রূপবোধের অনির্বচনীয়তাকে আয়ত্ত করার মতো পরিশীলিত নন্দনচেতনায় পৌঁছায় নি কিন্তু একটা শক্তির সাধনা করছে, প্রকৃতি ও জীবনের অখণ্ড সংযোগকে উপলব্ধি করছে। এই মূর্তিগুলির পরিধেয় বস্ত্রের রূপায়ণে যে দক্ষতা বা পাথর খোদাই-এর যে ধরণ তাতেও ইরানীয় ও গ্রিসীয় প্রভাবের কথা বলেন অনেকে। বেঞ্জামিন রোল্যান্ড বলেছেন পাথর কাটার প্রকরণ ভারতীয় শিল্পী শিখেছে মৌর্যযুগে ইরানীয় ও হেলেনীয় সংযোগের ফলে। সে যাই হোক এই মূর্তিগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা ভারহুতের পদসঞ্চার অনুভব করি, যে ভারহুতে সামগ্রিকভাবে প্রায় মহাকাব্যিক বিস্তারে ভারতীয় জনমানসের প্রাণস্পন্দন রূপবদ্ধ হয়ে আছে। শুঙ্গ বংশের রাজত্বকাল ১৮৫ থেকে ৭২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। ভারহুত এই রাজবংশের সময়কালেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল। বহু শতাব্দীর বিস্মৃতির গহ্বর থেকে ভারহুতের বৌদ্ধস্তূপকে এ যুগের লোকচক্ষুর সামনে নিয়ে এসেছিলেন কানিংহাম ১৮৭৩ সালে। এর প্রাচীর ভাস্কর্যের অনেকটা অংশ এখন রাখা আছে কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়মে। হীনযান বৌদ্ধধর্মে তখন বুদ্ধের প্রতিকৃতি গড়া হত না। কিন্তু বুদ্ধের জীবন ও জাতকের কাহিনী ভাস্কর্যে রূপায়িত হত। প্রকারান্তরে এটা ছিল তৎকালীন লৌকিক জীবনপ্রবাহকেই রূপ দেওয়া। যক্ষ, যক্ষী ও সুরসুন্দরীদের ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষই রূপায়িত হত। আর আসত প্রকৃতি তার রূপ-রস-গন্ধময় সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে। আসলে ভারহুতের ভাস্কর্যে আমরা এক লৌকিক আঙ্গিকেরই জয় ঘোষণা শুনতে পাই। লৌকিক এখানে ধ্রুপদী ঐশ্বর্যে উত্তরণের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু লৌকিকের তীব্র ও অমেয় জীবন-সংবেদন এখানে এক আলোকোজ্জ্বল সংগীতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। দৃষ্টান্ত হিশেবে এখানে আমরা একটি মাত্র ভাস্কর্য দেখব। এটি একটি যক্ষী, যাকে বলা হয় চুলকোকা দেবতা। এক তন্বী নারীমূর্তি হাতির পিঠ ও মাথায় দুপা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। হাতিটি শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে আছে একটি কদমগাছ, যে গাছটি উপর দিকে উঠে গিয়ে প্রস্ফুটিত ফুল ও পাতায় উন্মীলিত হয়েছে। এই নারী তার বাঁ-হাত ও বাঁ-পা দিয়ে জড়িয়ে আছে কদম্বের কাণ্ড। ডান হাত উঁচুতে তুলে ধরে আছে ফুলন্ত একটি শাখা। শরীরের উর্ধ্বাংশে সে

৭ মথুরা থেকে পাওয়া মাতৃমূর্তি। টেরাকোটা। খ্রিঃ পূঃ ৩য়-খ্রিঃ পূঃ ১ম শতক। (বোস্টন মিউজিয়ম সংগ্রহ)
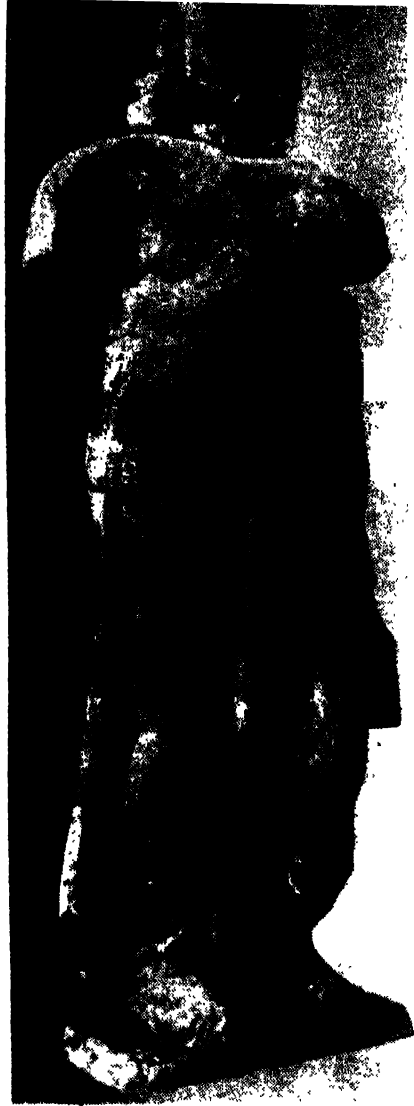
৮· পারখামের দণ্ডায়মান যক্ষমূর্তি। খ্রিঃ ১ম শতক।

নগ্নিকা। নিম্নাংশে নাভির নীচে বস্ত্রের আচ্ছাদন। যৌবনবতী তন্বী এই নারী সালংকারা। তার মুখমণ্ডলে প্রশান্তির স্নিগ্ধ আলোব আভা। মানুষ, প্রকৃতি ও পুরাণকল্পকে জড়িয়ে জীবনের এক দীপ্ত জয়ঘোষণা এখানে। যদিও পাথরে করা তবু এর রূপায়ণে অনুভব করা যায় কাঠ বা আইভরি (হাতির দাঁত) খোদাইয়ের সনম্র কোমলতা। অবয়ববিন্যাস সুডৌল পূর্ণ ত্রিমাত্রিক নয়, একটু চ্যাপটা, যেন চিত্রেরই অভিজ্ঞতা ভাস্কর্যায়িত হয়েছে।

ইতিহাসের যুগের প্রথম সফল এই ভাস্কর্যে আমরা লক্ষ করি কেমন করে ভারতীয় শিল্পী মেসোপটেমিয়া, মিশর বা গ্রিসের রূপরীতির বাইরে নিজস্ব রীতির এক আত্মপরিচয়ের সন্ধান করছেন। ভারতীয়তা বলতে আমরা যা বুঝব তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হলেও তার প্রতিধ্বনি আমরা ভারহুতে শুনতে পাচ্ছি। আর্কায়িক বা আদিমতার অভিজ্ঞতা লৌকিকে পরিশীলিত হয়ে এক ছন্দের স্পন্দন আনছে এখানে। এই ছন্দের মধ্যেই, পরবর্তী বিবর্তনে আমরা দেখব, ধরা আছে ভারতীয়তার প্রাণ ও মূলগত ঐশ্বর্য। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য রূপবোধের পার্থক্যের একটি সূত্র আমরা পেতে পারি

ভারহুতের যক্ষী। খ্রিঃ পূঃ ২য় শতক।

হাইনরিক জিমার-এর একটি মন্তব্য থেকে। ভারতীয়তার ই সূচনাপর্বে যা খুবই প্রাসঙ্গিক। ভারহুত সম্পর্কিত ালোচনা সূত্রেই তিনি বলেছিলেন,

> "পাশ্চাত্যে, আমরা ইতিমধ্যেই যেমন দেখেছি, একেবারে শুরুতে, এমনকী কিছুটা উন্নত পর্যায়েও, শিল্প ছিল চিত্রলিপি (পিকটোগ্রাফিক হিয়ারোগ্লিফ) থেকে উদ্ভূত এক ধরণের প্রত্ন (আর্কায়িক) লিখন-ভঙ্গির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। তাই অবয়ব সব সময় একটু বাঁকা হয়ে সারিবদ্ধভাবে পার্শ্বচিত্রে (প্রোফাইল) রূপায়িত হত। যদিও ভারতবর্ষ সবসময়ই পাশ্চাত্য প্রভাবকে উন্মুক্ত আগ্রহে গ্রহণ করেছে, কিন্তু কি জীবনে, কি শিল্পে, এর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি কখনও আবৃত হয় নি। বাইরে থেকে যা কিছু প্রভাব এসেছে, তাকে সে নিজের দৈনন্দিনতার ক্রিয়া ও আচার অনুষ্ঠানের আদলের সঙ্গে মিলিয়ে একেবারে সমীকৃত করে নিয়েছে।" ('দ্য আর্ট অব ইন্ডিয়ান এশিয়া', পৃষ্ঠা-৩৩০)

ভারহুতের এই ধারা ক্রমান্বয়ে আরো পরিশীলিত হয়ে বৌদ্ধধর্মের ভাবাদর্শের মধ্যে বিবর্তিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে শুঙ্গ আমলে ভূপালের কাছে সাঁচীতে, খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে, সাতবাহন (অন্ধ্র) আমলে অন্ধ্র প্রদেশের অমরাবতীতে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে, ইক্ষ্বাকু আধিপত্যে নাগার্জুনকোণ্ডায় ১৭৫ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দে। এই প্রায় চারশতকব্যাপী বিস্তারের মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্যের যে উত্তরণ তাকে বলা হয় আর্কায়িক থেকে আর্লি-ক্লাসিকের দিকে বা আদিমতার প্রত্ন-সংহতি থেকে প্রাক-ধ্রুপদী স্তরে উত্তরণ। ভারতীয়তা তখন অনেকটা স্পষ্ট আদল পেয়েছে।

এর দৃষ্টান্ত হিশেবে আমরা একটি মাত্র ভাস্কর্যের উল্লেখ করব— সাঁচীর পূর্ব তোরণের যক্ষীমূর্তি। একটি আমগাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে এই নগ্নিকা। ডান হাত তার কাণ্ডের উপর দুটি ডালের সংযোগস্থল ধরে আছে, বাঁহাতে সে ধরে আছে উপরের একটি শাখা। যেন কোনো ডালের উপর পা রেখে একটু কৌণিকভাবে শরীর ত্রিভঙ্গ ছন্দে হিল্লোলিত করে দাঁড়িয়ে আছে চিরন্তন এই ভারতীয় যুবতী। যদিও নগ্নিকা তবু সে সালংকারা। কি দুরন্ত প্যাশান তার সমগ্র শরীরে ছড়ানো! কি অসামান্য জীবন্ময়তা! সৌন্দর্য, কামনা, আর ঐশ্বর্যের কি প্রগলভ বিচ্ছুরণ! এই নারী তোরণে দাঁড়িয়ে যেন সমগ্র জীবলোককে আহ্বান করছে তার মধ্যে সমর্পিত হওয়ার জন্য। অথচ কি বিচিত্র

১১

১০· দিদারগঞ্জের যক্ষী। খ্রিঃ পূঃ ১ম শতক।

১১· সাঁচীর পূর্বতোরণের যক্ষী। খ্রিঃ পূঃ ১ম শতক।

কৌতুক মনে হয় যখন আমরা বৌদ্ধ সন্ত বুদ্ধঘোষ-এর একটি বাণীর কথা ভাবি। বৌদ্ধধর্মের একটি জীবনদর্শন তিনি প্রকাশ করেছিলেন এভাবে: "যেমন মৃত্যুতে শরীর হয়ে ওঠে কুৎসিত, বিকর্ষণযোগ্য, তেমনি জীবন্ত অবস্থাতেও তাই।" এই যে নিরাশার দর্শন, এই যে জীবনের আলোর থেকে চৈতন্যের মরমী অন্ধকারকেই বড় করে দেখার প্রবণতা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে ছিল, তা কিন্তু শিল্পীদের বা সাধারণ জীবনপ্রবাহকে কখনো স্পর্শ করতে পারে নি। জীবনের উচ্ছ্বসিত সংগীতেই তাঁরা শিল্পের মুক্তি খুঁজেছেন। সাঁচীর পূর্ব তোরণের এই নগ্নিকা আমাদের সেই সত্যের দিকেই নিয়ে যায়। এই সংবেদনময়তা, যা প্রকাশিত হয়েছে আয়তনগত পূর্ণতায়, এই প্রাণশক্তি যা একটি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে উপরিতলের দিকে আলোকরশ্মির মতো, এই ছন্দিত দেহবিন্যাস যা দেহের বাস্তবতাকে লৌকিক থেকে অলৌকিকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যেই আমরা পাই ভারতীয় রূপবোধের কয়েকটি ইঙ্গিত।

বৌদ্ধধর্মে ভারতীয় দর্শন সত্ত্বেও শিল্পের মধ্যে এই যে লৌকিক জীবনের আলো, তার প্রধানতম এক কারণ হতে পারে এরকম যে প্রথম খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে তৃতীয় খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধ শিল্পের বিকাশে জনজীবনের প্রত্যক্ষ সংযোগ। এই সংযোগ কেবল কর্মী বা কারিগর হিশেবেই নয় পৃষ্ঠপোষক হিশেবেও। এই সময়ের মন্দির বা তার ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে জনসাধারণেরই প্রত্যক্ষ আর্থিক অনুদানে, কোনো রাজা বা সম্ভ্রান্তবংশীয় সমাজপতির আনুকূল্যে নয়। ১৯৮৫-তে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ভারত উৎসবে এক আলোচনাচক্রে বিদ্যা দেহেজিয়া একটি গবেষণাপত্র পড়েছিলেন। এর নাম বা বিষয় 'দ্য কালেকটিভ অ্যান্ড পপুলার বেসিস অব আর্লি বুদ্ধিস্ট পেট্রনেজ: সেক্রেড মনুমেন্টস, ১০০ বি-সি— এ-ডি ২৫০'। পরে এটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত বারবারা স্টোলার মিলার সম্পাদিত 'দ্য পাওয়ার্স অব আর্ট: পেট্রনেজ ইন ইন্ডিয়ান কালচার' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রবন্ধে বিদ্যা দেহেজিয়া দেখিয়েছেন কেমন করে সাঁচী স্তূপ, কার্লি ও মথুরাতে সাধারণ মানুষই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। অর্থের জোগান দিয়েছেন। সাঁচীতে এরকম ৬৩১টির বেশি নাম খোদিত দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাঁদের। এর মধ্যে গৃহস্থ আছে, বণিক আছে, শ্রেষ্ঠী আছে, আছে তন্তুবায়, পোশাক-বিক্রেতা, লেখক কারিগর ইত্যাদি নানা

[illegible]া। দণ্ডায়মান বুদ্ধ (গুপ্ত)। [illegible] ৫ম শতক।

১৩· গান্ধার। দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব। খ্রি: ২য় বা ৩য় শতক।

১৪· মথুরা। উপবিষ্ট বুদ্ধ। খ্রিঃ ২য় শতক।

১৫· সূর্য মূর্তি। কোনারক। খ্রিঃ ১৩শ শতক।

সম্প্রদায়ের মানুষ। এরকম কথা ভাবা যায় যে স্রষ্টা বা নির্মাতার সঙ্গে এখানে সৃষ্টির একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটেছিল, বিচ্ছিন্নতা ছিল না, আর সেই সংযোগ থেকেই উদ্ভাসিত হয়েছিল জীবনের এই অমেয় ঐশ্বর্য।

১৬· দুর্গা মহীষাসুরমর্দিনী। মহাবলীপুরম। খ্রিঃ ৭ম শতক।

শুঙ্গ ও অন্ধ্র যুগের ভাস্কর্য আরো পরিপূর্ণ, পরিশীলিত হয়েছে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে কুষাণ যুগে এসে। কুষাণরা মধ্য এশিয়ার ইউএ-চি নামক পাঁচটি উপজাতি শাখার একটি। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে মধ্য এশিয়ার এক ভয়ঙ্কর খরা জনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই ইউএ-চি উপজাতি তাদের আদি বাসভূমি ছেড়ে খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে এবং ব্যাকট্রিয়া থেকে শকদের সরিয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কুষাণ রাজা প্রথম ক্যাডফিসেজ কাবুল উপত্যকা ও সিন্ধুর পশ্চিম দিক জয় করেন। দ্বিতীয় ক্যাডফিসেজ মথুরা পর্যন্ত অগ্রসর হন। কণিষ্ক ৭৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং কাশ্মীর থেকে পাটনা পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। কুষাণ রাজত্বকালে মথুরা ভাস্কর্যের একটি বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে (সূত্র: এম এস রানধাওয়া ও ডি এস রানধাওয়া: ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার)।

এই আমলের ভাস্কর্যে নারীশরীরের সংবেদনময়তা ও অবয়বগত পূর্ণতা আরো প্রগাঢ় হতে থাকে। এম এস রানধাওয়া ও ডি এস রানধাওয়া তাঁদের পূর্বোক্ত 'ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার' গ্রন্থে বলেছেন,

> "কুষাণ যুগে ভারতের লোকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে ছিল খুব কম এবং বিশাল অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, যেখানে বন কেটে জমি উদ্ধারের দরকার ছিল। এজন্য প্রয়োজন ছিল আরো মানুষের। যক্ষী ভাস্কর্যের জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তার কারণ নিহিত আছে এর মধ্যে।" (পৃষ্ঠা-৫৭)

কুষাণ আমলে ভারতের এক প্রান্তে মথুরায় যখন সংবেদনময় পরিপূর্ণ এক ভারতীয় রীতি জাগছে, তখন অন্য প্রান্তে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একই শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় দেখা দিচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন শৈলীর এক ভাস্কর্য, যা গান্ধার ভাস্কর্য নামে পরিচিত। গান্ধার শিল্প প্রবলভাবে গ্রিক প্রভাবিত। গ্রিসীয় অনুপুঙ্খ স্বাভাবিকতার রীতি এভাবে আর কখনো ভারতে প্রবেশ করে নি।

আসলে ভারতে গ্রিকদের অধিকার ও প্রত্যক্ষ শাসন শেষ হয়ে যায় ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরেই। চন্দ্রগুপ্তও সেলুকসকে অপসারিত করেছিলেন। ২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্য যখন ভেঙে যেতে থাকে তখন পেশোয়ার উপত্যকা আবার বৈদেশিক আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়। গ্রিকদের প্রত্যক্ষ অধিকারের মধ্যে না থাকলেও গান্ধার অঞ্চলে কিছু শিল্পীগোষ্ঠী ছিলেন যাঁরা গ্রিকো-রোমান শিল্পরীতিতে পারদর্শী ছিলেন। অশোকের রাজত্বকালে গান্ধার অঞ্চল বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ হয়। বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও গ্রিসীয় প্রকরণের যে সম্মিলন ঘটে সেটাই কুষাণ আমলে, তাঁদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ণ রূপ পেয়ে একটি স্বতন্ত্র ভাস্কর্য ধারা হিশেবে বিকশিত হয়। আগে বৌদ্ধধর্মে বা বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত শিল্পে গৌতম বুদ্ধের কোনো প্রতিকৃতি রচিত হত না। তাঁকে প্রতীকে বোঝানো হত। কুষাণ যুগেই প্রথম বুদ্ধের প্রতিকৃতি রচিত হয় বলে মনে করা হয়। প্রথম বুদ্ধ প্রতিকৃতি কোথায় রচিত হয়েছিল গান্ধারে না মথুরায়, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। কুমারস্বামী তাঁর 'দ্য অরিজিন অব বুদ্ধ ইমেজ' গ্রন্থে বলেছেন ভারতে প্রথম বুদ্ধমূর্তি রচিত হয়েছিল কণিষ্কর রাজত্ব শুরুর অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে। তিনি নিজে অবশ্য মথুরাকেই পূর্বসূরী বলে মনে করেন। তারপর দুই অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রচিত হয়েছে বুদ্ধমূর্তি, এবং হয়তো পরস্পর পরস্পরকে সামান্য প্রভাবিতও করেছে। এবং এভাবেই কালক্রমে কুষাণ বুদ্ধ গুপ্ত বুদ্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে।

গান্ধার আমাদের ভাস্কর্যকে কতটা দিয়েছে, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। গান্ধারে আমরা অনুপুঙ্খ স্বাভাবিকতায় চূড়ান্ত সফলতার নজির দেখি। বুদ্ধ এখানে রক্তমাংসের মানুষ হয়ে ওঠেন, যেন তাঁর ধমনীতে রক্ত সঞ্চালনও অনুভব করা যায়। কিন্তু অনেকটাই আদর্শায়িত, যেন অ্যাপোলো বুদ্ধের শরীর ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছে। বস্ত্র বা পরিচ্ছদ বিন্যাসে, ইংরেজিতে যাকে ড্রাপারি বলে, এত নিপুণ দক্ষতা, ভারতীয় সীমার মধ্যে এর আগে কখনো আসে নি। এই ড্রাপারির কিছুটা প্রভাব পরবর্তীকালে ভারতীয় ভাস্করদের ভিতর হয়তো সঞ্চারিত হয়েছে। পঞ্চম শতকের মথুরার দুটি দণ্ডায়মান বুদ্ধ এর প্রমাণ। অনুপুঙ্খ স্বাভাবিকতার এক ভিন্নধর্মী প্রকাশ হিশেবে আমাদের আকর্ষণ করে গান্ধারে তৃতীয় শতকের 'দ্য ফাস্টিং বুদ্ধ' বা উপবাসরত বুদ্ধের মূর্তিটি। উপবাসে জীর্ণশীর্ণ শরীর। বুকের প্রতিটি হাড় দৃশ্যমান। উদর ও চক্ষুদ্বয় কোটরগত। যেন এক মূর্তিমান কঙ্কাল। শুধু মাথার উপর চুলের চূড়া ও মাথার পেছনের বৃত্তাকার প্রভামণ্ডল দেখে একে কোনো অলৌকিক পুরুষ বলে চেনা যায়। এ অলৌকিকতা আরোপিত। এত দক্ষতার মধ্যেও কিন্তু এই অভাব ঘোচে না। আসলে গান্ধার কখনো দেহের সীমা পেরতে পারে নি। দেহাতীত কোনো সত্যে উত্তীর্ণ করতে পারে নি বুদ্ধকে। অভাবাত্মক ক্ষয় ও রুদ্রতার অভিব্যক্তির দিক থেকে আমরা এই বুদ্ধের সঙ্গে ভারতীয় দুটি মূর্তির তুলনা

১৩

করতে পারি। প্রথমটি ধরা যাক, মহেঞ্জোদারোর ব্রোঞ্জের সেই শীর্ণকায়া নৃত্যরতা নগ্নিকা, অন্যটি অনেক পরবর্তী কালের তাঞ্জোরের ব্রোঞ্জ 'কালী'। রুদ্রতার যে চরম অভিব্যক্তি ভারতীয় আর্কায়িক ভাস্কর্য দেখিয়েছে, এই দুটি তার অসামান্য দৃষ্টান্ত, তা গান্ধারের স্বাভাবিকতার রীতির একেবারে সাধ্যের বাইরে ছিল। ভারতীয়তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের মূল পার্থক্য এখানেই। কুষাণ যুগের গান্ধার বুদ্ধ ও মথুরা বুদ্ধ এই দুই ভিন্ন প্রকাশভঙ্গির চরম দৃষ্টান্ত। তাদের মধ্যে প্রায় দুই মেরুর ব্যবধান। মথুরা বুদ্ধ ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাস্কর্যের উৎকর্ষের অন্যতম এক শীর্ষবিন্দু। অনেকের মতে এমনকী গুপ্তযুগের ভাস্কর্যও এই আলোকিত সফলতায় অচঞ্চল থাকতে পারে নি। বরং যেন খানিকটা অবনমিত হয়েছে। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতশিল্প' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে খুবই স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। খানিকটা উদ্ধৃত করা যায় যেখানে গান্ধার, মথুরা ও গুপ্ত ভাস্কর্যের মূল বৈশিষ্ট্য অল্প কয়েকটি কথার আঁচড়ে সুন্দর ধরা পড়েছে।

> "আদিমকাল থেকে ভারতীয় শিল্পে বহুরকম বিজাতীয় প্রভাব প্রবেশ করেছে। এই প্রভাবের মধ্যে গ্রীক প্রভাব, তথা গান্ধার শিল্প সম্বন্ধে পণ্ডিতরা অনেক বই লিখেছেন। এইসব পণ্ডিতরা কেবলই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে বুদ্ধমূর্তির প্রথম পরিকল্পনা গ্রীকদের সাহায্যেই ঘটেছে। এই আলোচনার কতটুকু মূল্য আজ আছে জানি না। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ঐকান্তিক সম্বন্ধটি ভারতশিল্পে বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে, ইতিপূর্বে আমি তা উল্লেখ করেছি। সেই উপলব্ধিরই আর এক প্রকাশ মথুরার বুদ্ধমূর্তি। গান্ধার শিল্পে এই দৃষ্টিভঙ্গির স্থান সংকীর্ণ, এ-বিষয়ে মতভেদ হবে না। কঠিন পাথরকে প্রাণময় করে নির্মিত করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল শিল্পীদের। সেইজন্যই সমগ্রভাবে মথুরার শিল্প যেমন অনাড়ম্বর তেমনই প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল। এ আদর্শের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল গুপ্তযুগের শিল্পে।" (চিত্রকথা— পৃষ্ঠা-২৫)

এর পরের অংশে বিনোদবিহারী ব্যাখ্যা করেছেন গুপ্তযুগের শিল্পের অবনমনের মূল কারণ। গুপ্ত ভাস্কর্যের পর্বে আসার আগে আমরা তাঁর মতটি শুনে নিতে পারি। একজন তাত্ত্বিকের থেকে একজন শিল্পীর মতের অন্য গুরুত্ব থাকে।

> "গুপ্তপূর্ব ভারতশিল্পের সঙ্গে গুপ্তযুগের শিল্পের পার্থক্য কতটা ছিল তা যাঁরা জানতে চান তাঁরা একবার সারনাথ মিউজিয়ামে রক্ষিত 'দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি'র সঙ্গে একই ঘরে রাখা 'উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি'টির তুলনা করবেন। গুপ্তযুগে ধ্যান-ধারণা অপেক্ষা ধর্ম-সংস্কার প্রধান হল এবং বুদ্ধদেব হলেন সে ধর্ম-সংস্কারের অন্যতম প্রতিনিধি। সাহিত্য, অভিনয় এবং শিল্পাচার্যদের নির্দেশ একত্রে মিলে যে বিশেষ রকমের আদর্শ, সেটি সমগ্র ভারতশিল্পের সঙ্গে ঠিক মিশ খেল না। কেন মিশ খেল না, সেটি জানতে হলে গুপ্তযুগের শিল্প সম্বন্ধে সাধারণভাবে দু-চার কথা বলতে হয়। কঠিনতা থেকে কোমলতা, সংযম থেকে প্রাচুর্য, আকার ও ভঙ্গির ঘনিষ্ঠতা অপেক্ষা নাটকীয় ভাবের আতিশয্য গুপ্তযুগের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য। ...গুপ্তপূর্ব যুগে পশুপক্ষীর যে স্বাধীন সত্তা ছিল সেটি লোপ পেল এবং জীবজন্তুর স্থান হল বৈদিক দেবদেবীর বাহন রূপে। এইসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই আমি বলেছি যে গুপ্ত যুগের শিল্প ভারতীয় ধারার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় নি। সংক্ষেপে, গুপ্তশিল্প হল বিদগ্ধ সমাজের সৃষ্টি।" (পৃষ্ঠা-২৫-২৬)

গুপ্তযুগ সম্পর্কে বিনোদবিহারীর এই মত গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে এটা খুবই ব্যতিক্রমী। প্রায় সব পণ্ডিত বা গবেষকই গুপ্তযুগকে ভারতশিল্পের সুবর্ণযুগ বলে স্বীকার করেন। কুমারস্বামী বলেছেন, 'দা স্টাইল ইজ ইউনিফায়েড অ্যান্ড ন্যাশনাল'। ('হিসট্রি অব ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইন্দোনেশিয়ান আর্ট' পৃষ্ঠা-৭১) বেঞ্জামিন রোল্যান্ড বলেছেন, "অ্যাজ সো অফেন ইন গুপ্ত আর্ট, উই ফাইন্ড আ কম্বিনেশন অব অ্যান এনটায়ারলি নিউ অ্যান্ড ফ্রেশ কনসেপ্ট উইথ এলিমেন্টস অব ট্রাডিশন' ('দা আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া', পৃষ্ঠা-২২০) হেইনরিক জিমার দেখিয়েছেন এই ধ্রুপদী রীতিতে পৌঁছেই ভারতীয়তা কেমন করে এক সম্পূর্ণ আদল পেল। 'দা নিউ ফোর্সেস অব মথুরা, গান্ধার অ্যান্ড কুষাণস কমবাইনড উইথ দ্য কমপ্লেক্স, পার্টলি প্রি-এরিয়ান ট্রাডিশন রিপ্রেজেনটেড ইন দ্য স্তূপজ অব সাঁচী অ্যান্ড ভারহুত, অ্যান্ড ইন দ্য কোর্স অব টাইম দেয়ার এমারজড ফ্রম দিজ ইন্টারঅ্যাকশন আ হারমোনিয়াস ক্লাসিকাল স্টাইল, ডিস্টিংকটলি ইন্ডিয়ান।' ('দ্য আর্ট অব ইন্ডিয়ান এশিয়া', পৃষ্ঠা-৭)

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ভারহুত থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে মথুরা পর্যন্ত যে প্রায় পাঁচশ বছরের জয়যাত্রা তাতেই ভারতীয় ভাস্কর্য অনেক দুঃখ ও ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে নিজস্ব স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। এরই শীর্ষবিন্দু গুপ্তযুগ। এখানে শিল্পশুদ্ধির যে চূড়ান্ত শিখর—তা মানবতার চিরন্তন প্রবাহ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। গজদন্ত মিনারের মতো সেই উচ্চ পর্যায়ে শিল্প আমাদের দৈনন্দিনতার সঙ্গে সংযোগ হারায়। গুপ্তযুগের সমৃদ্ধির পেছনে ঐশ্বর্যের

১৭· নৃত্য-গীত অনুষ্ঠান। গোয়ালিয়র মিউজিয়ম সংগ্রহ খ্রিঃ ৬ষ্ঠ শতক।

বিরাট ভূমিকা আছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে রোমের সঙ্গে ভারতের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে তা যথেষ্ট ঐশ্বর্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল। চতুর্থ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান সেই ঐশ্বর্যের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত (দ্রষ্টব্য কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়: 'বাংলার ভাস্কর্য' পৃষ্ঠা-৯৪) ভারহুত, সাঁচী, কার্লি, মথুরায় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে শিল্পের যে সংযোগ ছিল, গুপ্তযুগে সেটা ছিল না। পৃষ্ঠপোষকতা চলে গিয়েছিল রাজবংশ বা ধনিকশ্রেণীর হাতে।

তবু গুপ্তযুগের ভাস্কর্য সম্পর্কে যে অতৃপ্তি তা হয়তো শিল্পশুদ্ধির চূড়ান্ত প্রকাশের জন্যই। সমস্তটাই বড় বেশি নিটোল। মান, পরিমাপ, আকার ও আয়তনের মধ্যে কোনো ফাঁক রইল না, যেখানে একটু কল্পনার স্বাধীন খেলা চলতে পারে। গুপ্ত ভাস্কর্যই হয়ে রইল ভারতীয় শিল্প-চৈতন্যের চূড়ান্ত পর্যায়। এর পরে আর কিছু হয় না।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকাল ৩০০ থেকে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দ। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করেন ৩২০ থেকে ৩৫৫ খ্রিস্টাব্দ। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ৩৩৫ থেকে ৩৮০ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর সময়ই সাহিত্য, নাট্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা সবদিকেই অসামান্য প্রতিভার আবির্ভাব হয়। এ সমস্ত কারণে এ সমৃদ্ধিকে নবজাগরণ বলা হয়। কিন্তু এটা ঠিক নবজাগরণ নয়। বিগত প্রায় হাজার বছরের ক্রমিক বিকাশের এটাই শীর্ষবিন্দু।

এখানে ভারতীয়তার একটা স্পষ্ট আদল তৈরি হয়ে গেল। ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিল যে তার শিল্পীরাই পারে মূর্তের ভিতর দিয়ে বিমূর্তকে ধরতে। ধ্যানী পুরুষের শরীরের অবলম্বনে তারা ধ্যানকে রূপায়িত করতে পারে। নৃত্যরতা নারীর মধ্য দিয়ে নৃত্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। তারা চৈতন্যের বিমূর্ততাকে শরীরের কাঠামোর ভিতর দিয়েই প্রকাশ করতে পারে। যেটা পাশ্চাত্যের স্বভাববাদী শিল্প কোনোদিন পারে নি। শরীরী প্রকাশের চরম উৎকর্ষ তারা দেখিয়েছে। কিন্তু শরীর দিয়ে শরীরকে অবলুপ্ত করতে পারে নি কখনো। ভারতীয়তার মূল ঐশ্বর্য নিহিত আছে এই বৈশিষ্ট্যে। এটা ভারতীয় শিল্পী করেছেন ছন্দের অনুপম এক বিন্যাসে। সমভঙ্গই হোক, ত্রিভঙ্গই হোক—শরীরের যে-কোনো ছন্দিত প্রকাশ ব্যক্তির অহংকে মূর্ত করে তোলে না, বরং তা বিশ্বপ্রকৃতির গতিছন্দের নির্লিপ্ততার আদলটিকে অনুসরণ করে। যে ছন্দে গাছ বেড়ে ওঠে, কাণ্ড থেকে পত্রমঞ্জরী নির্গত হয়, লতা মাটির উপর আপন লাবণ্যে এগিয়ে যায়, যে ছন্দে পাখি ওড়ে, সমুদ্রের ঢেউ কলতান করে আছড়ে পড়ে, সেই ছন্দকেই ভারতীয় শিল্পী আয়ত্ত করেন তাঁর অবয়বের বিন্যাসে। নৃত্য ও সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের সম্পর্ক তাই অচ্ছেদ্য। এই ছন্দ, অভ্যন্তরের স্থির কোনো কেন্দ্র থেকে সমস্ত শক্তির বাইরের পরিপূর্ণতার দিকে বিচ্ছুরণ, ভারতীয়তার এই যে বৈশিষ্ট্য, গুপ্ত-পরবর্তী ভাস্কর্য এই ঐশ্বর্যকেই নানাভাবে বিকশিত করেছে। গুপ্তযুগের পরে ভারতীয় শিল্পের বিকাশকে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন বলেন অনেকে। গুপ্ত পর্যন্ত প্রাচীন যুগের পর একে মধ্যযুগও বলা হয়। কিন্তু রূপভঙ্গির দিক থেকে এর স্বরূপ বোঝাতে গেলে ইওরোপীয় শিল্পবিচারের একটি শব্দ সুপ্রযুক্ত মনে হয়, সেটি হল 'বারোক'। বারোক বলতে সাধারণত বোঝায় সেই স্টাইল যেটা ১৫৮০ সাল নাগাদ মুখ্যত ইটালিতে বিকশিত হয়েছিল এবং পরবর্তী এক শতকের বেশি সময় ধরে পশ্চিম ইওরোপের শিল্পসৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছিল। এর মধ্যে একই সঙ্গে রয়েছে স্বাভাবিকতা (ন্যাচারালিজম) ও ধ্রুপদী অনুষঙ্গের দিকে ঝোঁক ইটালির ম্যানারিজম-এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় যেদিকে ঝুঁকছিলেন অ্যানিবেল কারেচি, ডোমেনিচিনোর মতো চিত্রী, বা ফ্রাঁসেসকো মোচির মতো ভাস্কর। হার্বার্ট রিড বলেছেন বারোক বোঝায় 'দ্য অড, দ্য হুইমজিক্যাল, অর দ্য এক্সট্রাঅর্ডিনারি'। শিল্পের প্রকাশকে যদি দুভাগে ভাগ করা যায়, এক ভাগে আসে ক্লাসিক্যাল, আদর্শায়িত সৌন্দর্য যার লক্ষ্য, যা মান পরিমাপে নির্দিষ্ট, নির্ধারিত; আর এক ভাগ যেখানে কল্পনার স্বচ্ছন্দ বিচরণ সম্ভব, যা কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে, নির্দিষ্ট যুক্তিপরম্পরায় বাঁধা নয়। এই যে কল্পনার সালংকৃত, ঝংকৃত সঞ্চরণ, এই যে পার্থিবতার আনন্দ সংগীতময় ছন্দোলাবণ্যে ভূলোক ছাড়িয়ে দ্যুলোকের দিকে উঠে যাওয়া, এটা বোঝাতে এখানে আমরা 'বারোক' শব্দটি ধার করছি, এর পরিচিত অর্থকে খানিকটা প্রসারিত করেই। গুপ্তযুগের যে সুউচ্চ সফলতা তার বাইরে শিল্পের দ্বিতীয় কোনো স্বরূপ খুঁজতে হলে শিল্পীকে ফিরে আসতেই হবে জীবনের কাছে, পার্থিব আনন্দের কাছে। এরই প্রকাশ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভাস্কর্যের বিকাশে। ত্রয়োদশ শতকের কোনারকে এসেই ভারতীয় ভাস্কর্যের চূড়ান্ত বিকাশ। তারপর আর নতুন কোনো মাত্রা যুক্ত হয় নি। এই ভিত্তির উপরই আরো বিকাশ ঘটেছে অথবা পুনরাবৃত্তি চলেছে। এই যে প্রায় সাত-আটশো বছরের বিবর্তন এটা হিন্দুধর্মের ছত্রছায়ায় ঘটেছে, মূলত শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের। হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট কিছু আইকনোলজি বিকশিত হয়েছে। কিন্তু শিল্পের

ক্ষেত্রে ধর্ম একটা প্রেক্ষাপট বা ক্যানভাস মাত্র, যদিও সে-যুগে খুবই নিবিড় ছিল তার বাঁধন। তবু শিল্পীর কাছে সময় ও জীবনই তো প্রধান উপজীব্য। ধর্মের প্রেক্ষাপটে সে তো এই জীবনের কথাই বলে। এই শিল্পেও সেই জীবনেরই জয় ঘোষণা। এখানে হিন্দু শিল্পী সমস্ত ট্যাবু, সমস্ত নীতিবোধকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিল। খাজুরাহো বা কোনারকের মিথুন ভাস্কর্য দেখে আজকের অনেক মানুষের নীতিবোধ আহত হয়। ধর্ম বা তন্ত্রসাধনার অজুহাত দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা খুঁজতে হয়। কিন্তু সে-যুগের শিল্পী জীবনের শিল্প ও শরীরের শিল্পে কোনো পার্থক্য দেখেন নি। শরীরের আনন্দ ও অধ্যাত্মচেতনার আনন্দকে এক করে নিতে পেরেছিলেন। এটাও ভারতীয়তার এক বৈশিষ্ট্য যেটা পৃথিবীর আর কোনো শিল্পে আছে কিনা সন্দেহ।

আমরা প্রথমে গুপ্ত-পরবর্তী ভাস্কর্যের বিস্তারকে কালানুক্রমে ও বংশানুক্রমে দেখব। তারপর কয়েকটি মাত্র ভাস্কর্যের উল্লেখ করব তার মধ্যে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে বোঝাতে।

(১) খ্রিস্টাব্দ ৬০০ থেকে ৮৫০—দক্ষিণ ভারতে পল্লব রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাবলীপুরমে সমুদ্রতীরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য।

(২) ৫৫০ থেকে ৭৫০—দক্ষিণ ভারত—চালুক্য রাজবংশ—বাদামি, আইহোল, পত্তদকল; অজন্তা, এলোরা।

(৩) ৭৫০ থেকে ৯৭৫—রাষ্ট্রকূট—দাক্ষিণাত্য—এলোরা, এলিফান্টা।

(৪) ৭৩০ থেকে ১২৫০—পাল ও সেনবংশ—নালন্দা ও বাংলা।

(৫) ৯১৬ থেকে ১০২৯—চান্ডেলা রাজপুত-মধ্যভারত—খাজুরাহো।

(৬) ১০৭৬ থেকে ১৫৮৬—গঙ্গাবংশ—ওড়িশা—কোনারক।

(৭) ৮৫০ থেকে ১১৫০—চোলবংশ—দক্ষিণ ভারত—তাঞ্জোর।

(৮) ১১০০ থেকে ১৩১০—পাণ্ড্যবংশ—দক্ষিণ-ভারত—তিরুভান্নামালাই।

(৯) ১৩৫০ থেকে ১৫৬৫—রায়বংশ—বিজয়নগর। (হেইনরিক জিমার-এর বই থেকে সংকলিত)

আমরা এই প্রায় এক হাজার বছরের বিরাট বিস্তৃতির মধ্যে কয়েকটি ভাস্কর্য বেছে নিয়ে সেগুলি দেখার স্মৃতি যদি মনে করতে পারি, তাহলে এই বারোক সৌন্দর্যের খানিকটা আভাস জেগে থাকে। ভারতীয়তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও স্বরূপ কী তা বোঝার জন্য কোনো বাক-বিস্তারের প্রয়োজন হয় না।

ষষ্ঠ শতকের ঔরঙ্গাবাদ গুহার নৃত্যের ভাস্কর্যটি সাতটি নারীমূর্তি নিয়ে রচনা। দুপাশে তিনজন তিনজন করে বাদ্য যন্ত্র বাজাচ্ছে, মাঝখানে ত্রিভঙ্গ ছন্দে নৃত্যরতা নারী। এই নারীর মাথার চূড়ার শীর্ষবিন্দু থেকে ত্রিভুজের মতো নেমে এসেছে রচনা। সংগীতের ঝংকারে নৈঃশব্দ্য আলোড়িত হচ্ছে। রামকিঙ্কর নাকি এই ভাস্কর্যটির একটি প্রতিরূপ গড়েছিলেন শান্তিনিকেতনে প্রথম জীবনে ঔরঙ্গাবাদ ঘুরে এসে। মহাবলীপুরমে জীবনের বিচিত্র রূপ জীবনের নানা স্তর থেকে নিয়ে সাজানো আছে। 'গঙ্গাবতরণ'-এ যে দুটি বানরের মূর্তি একে অন্যের মাথার চুলে হাত দিয়ে বসে আছে বা হয়তো উকুন বাছছে, বিষয় বৈচিত্র্যে সেটাও কত আসামান্য। তবু একটি মূর্তি বেছে নিতে হলে বেছে নেওয়া যায় এখন বোস্টন মিউজিয়মে রক্ষিত অষ্টভুজা দুর্গার মূর্তিটি। মহিষের ছিন্ন মস্তকের উপর দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দু পুরাণকল্প ও দ্রাবিড় শিল্পভঙ্গির অসামান্য সমন্বয়।

খাজুরাহোর শিব-পার্বতী মূর্তিটি বেছে নেওয়া যায়, আলিঙ্গনাবদ্ধ দুই নর-নারী, পুরাণকল্পের ছদ্মবেশে এ তো লৌকিক প্রেমেরই রূপায়ণ। কিন্তু এই লৌকিকের আরো জীবন্ত প্রতিরূপ পাব কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দিরের সেই মূর্তিটিতে যেখানে এক নারী ঘুরে দাঁড়িয়ে দুহাতে হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ চুলগুচ্ছ চেপে জল নিষ্কাশিত করছে স্নানের পরে। দৈনন্দিনতার এত আশ্চর্য সৌন্দর্য সারা পৃথিবীর ভাস্কর্যেই বিরল। অথবা পত্রলিখনরতা সেই নারী, আমাদের কলকাতার মিউজিয়মে যেটি রয়েছে। বারোক সৌন্দর্যের আদর্শ দৃষ্টান্ত। কোনারকের বিখ্যাত সূর্যমূর্তি— সমভঙ্গ ছন্দে দণ্ডায়মান পুরুষ— তার স্তব্ধতা, ধ্যানমগ্নতা, প্রশান্তি নিয়ে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অন্বেষণের কয়েকহাজার বছরের অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখে। এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমাদের নিয়ে যেতে পারে ভাস্কর্যে ভারতীয় মানসের শ্রেষ্ঠ অবদানের সামনে। লৌকিকের মধ্যেই অলৌকিকের প্রস্ফুটনের স্বরূপ উদ্ভাসিত হতে পারে আমাদের কাছে।

১৮· খাজুরাহো। চুল থেকে জল নিষ্কাশিত করছে নারী। খ্রিঃ ১০ম শতক।

তিন

প্রাণছন্দ ও মানবতা

জীবনবোধ ও শিল্পনন্দনে ভারতীয়তা ও পাশ্চাত্য চেতনার মধ্যে পার্থক্যটা ঠিক কোথায়? আমাদের শিল্পবেত্তা মনীষীরা নানাভাবে সেটা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। কুমারস্বামী তাঁর 'দ্য ড্যান্স অব শিব' গ্রন্থের অন্তর্গত 'হোয়াট হ্যাজ ইন্ডিয়া কনট্রিবিউটেড টু হিউম্যান ওয়েলফেয়ার?' প্রবন্ধে এই পার্থক্যকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন এভাবে যে ভারতে বাস্তবচেতনা ও দর্শনচেতনার মধ্যে একটা ঐক্য রয়েছে। একটি আর-একটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু ইওরোপের মানসে বাস্তবতা ও দর্শনের মধ্যে রয়ে গেছে দ্বৈত। এই দুটোকে ইওরোপ মেলাতে পারে নি। যদিও সভ্যতার উষালগ্নে দুই শিল্পচেতনার, শিল্প প্রক্রিয়ার উৎস ছিল এক, কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে জীবনধারণের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রকৃতির অমোঘ প্রভাব তাঁদের চেতনার স্বরূপকেও বিবর্তিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মুক্তির স্বাদ এটা গুপ্তপূর্ব ভারতীয় ভাস্কর্যে বা পরবর্তী বারোক ভাস্কর্যে এত উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে যে তার সঙ্গে গ্রিক ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ ফসলগুলির তুলনা করলে দেখি যে বন্ধন আছে, বন্ধনের অমেয় আনন্দ আছে, কিন্তু সেই বন্ধন কোনো অলৌকিকে কোনো ট্রানসেনডেন্টাল অনুভূতিতে বিলীন হয়ে যায় না। এই দ্বৈতের বিলোপ হয় না সেখানে।

স্টেলা ক্রামবিশ খুব সুন্দর করে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন এই পার্থক্য ('দ্য আর্ট অব ইন্ডিয়া') :

"গ্রিকরা তাঁদের মার্বলের দেবতা গড়েছিলেন নিখুঁত মানুষের শরীরের আদলে। ভারতে ধ্যানের শৃঙ্খলা কেবল মানবিক অবয়বকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, সমস্ত জীবন্ত সত্তাকেই পুনর্নির্মিত ও পুনর্গঠিত করে। (পৃষ্ঠা-১৫)

তারপর প্রতীক ও প্রতিমার দ্বৈত কিভাবে একাকার হয়ে যায় ভারতীয় ভাস্কর্যে সে সম্পর্কে বলেছেন,

"প্রতীকের বদলে উদ্ভূত যে প্রতিমা প্রতীকী বৈশিষ্ট্যেই তা সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে। মানবাকৃতির প্রতিমাই হয়ে ওঠে প্রতীকের শক্তির ক্ষেত্র। প্রতীকী সংকেতে ঋদ্ধ যে অবয়ব, তা সেই প্রতীকের অর্থময়তাতেই রূপান্তরিত ও অর্থান্বিত হয়ে ওঠে।...মানুষের স্বারূপ্য ঐশ্বরিকতায় মিলে যায়।" (পৃষ্ঠা-৩৩)

একদিকে জীবনে বাস্তবতা ও দর্শনচেতনার ঐক্য অন্যদিকে শিল্পে প্রতীক ও প্রতিমার মধ্যবর্তী দ্বান্দ্বিকতার নিরাকরণ এর ভিতর দিয়ে ভারতীয় শিল্পী সত্যের কোন স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করতে চান? মানুষ ও দেবতার মধ্যে যে ভেদ থাকে না, এই অভেদত্বই কি তাঁর লক্ষ্য, না কি অভেদত্বের আড়ালে জীবনই নন্দিত হয় বার বার?

ভারতীয় শিল্প ও নন্দনচর্চার দৃষ্টিকোণের বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে বিগত কয়েকদশকে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে ওয়ারেন হেস্টিংসের অনেক বদনাম আছে। কিন্তু অন্তত একটি ব্যাপারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এদেশের সাহিত্যিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর মধ্যেই প্রথম সচেতনতা জেগেছিল। তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্যার উইলিয়াম জোনস প্রাচ্য ঐতিহ্য বিষয়ে গবেষণার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৭৮৪ সালে। প্রাচ্য বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত এখান থেকে। এই উইলিয়াম জোনসই 'শকুন্তলা'র অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদ জার্মান কবি গ্যেটেকে প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইওরোপীয়দের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে তখন থেকেই অনুসন্ধিৎসা জাগে। কিন্তু অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে ভারতীয় ঐতিহ্যকে তাঁরা যে ভাবে বুঝেছিলেন বা বুঝিয়েছিলেন তা যে খুব সার্বিক ও সত্যনিষ্ঠ ছিল, তা বলা যায় না। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'অ্যান অ্যাপ্রোচ টু ইন্ডিয়ান আর্ট' গ্রন্থে লিখেছেন,

"বস্তুত উনবিংশ শতকে পশ্চিম ইওরোপে ভারতীয় সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনের ঐতিহ্য সম্পর্কে অকৃত্রিম একটা আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। ভারতের সার্বিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এ কথা অবশ্য বলা যায় না যে— যতটা তাঁদের আগ্রহ ছিল, ততটাই তাঁরা বুঝে উঠতে পেরেছিলেন এই ঐতিহ্যের স্বরূপ।"

প্রথম পর্বের এই ইওরোপীয় চর্চার মধ্যে মূল যে অভাব ছিল, তা হল সংস্কৃতি ও জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে এবং খানিকটা জাত্যাভিমানের দম্ভের জন্যই হয়তো রাসকিন বা বার্ডউডের মতো ইংরেজ শিল্প সমালোচকরা ভারতীয় ভাস্কর্যের ঐতিহ্যে বর্বরতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পান নি। এই বিচ্ছিন্নতা অনেক দিন পর্যন্ত ভারতীয় ঐতিহ্যকে একটা ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়েছে।

১৯. খাজুরাহো। শিবপার্বতী। খ্রিঃ ১০ম শতক।

২০· তাঞ্জোর। কালী। ব্রোঞ্জ। খ্রিঃ ১৪শ শতক।

১৮৬১-তে লর্ড ক্যানিং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর প্রথম ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন আলেকজান্ডার কানিংহাম। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল জেমস ফার্গুসনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিসট্রি অব ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার'। ভারতীয় পুরাকীর্তি সম্পর্কে এটিই প্রথম পর্বের একটি প্রামাণ্য আলোচনা। এ বই সম্পর্কে হ্যাভেল মন্তব্য করেছিলেন, "ফার্গুসন ভারতীয় পুরাতত্ত্বকে দেখেন তাঁর পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের নিরিখ থেকে, এর একমাত্র ফল হয়েছে, তাঁর এই বিশাল অগ্রণী কাজটি পাশ্চাত্য পুরাতাত্ত্বিকের গ্রন্থাগারে শুধু একটি সম্মানজনক আসন পাবে, কিন্তু অপঠিতই থেকে যাবে।" এটা হল সমস্যার দিক। আর এক দিকে রয়েছে অতিরিক্ত ভাববাদ। এই হ্যাভেলই একবার মন্তব্য করেছিলেন : 'ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড বাই দা ডিভাইন আইডিয়াল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল কনটেমপ্লেশন ইজ দা কি-নোট অব হিন্দু আর্ট'। শিল্পকে চলমান জীবন ও সময়প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার একটা প্রবণতা ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ছিল। এই ভাববাদ থেকে কুমারস্বামী বা স্টেলা ক্রামরিশও মুক্ত হতে পারেন নি। তখন ছিল যে স্বাদেশিকতার চেতনা, ইওরোপীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে বাস্তবক্ষেত্রে না হোক ভাবাদর্শের দিক থেকে এশিয়ার গৌরবকে তুলে ধরার প্রবণতা তার ফলেও এই ভাববাদে আশ্রয় নিচ্ছিলেন অনেক মনীষী। কুমারস্বামীর মূল্যায়নে নীহাররঞ্জন রায় প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়েও একবার মন্তব্য করেছিলেন .

"ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে এ ধরণের যুক্তি একটু বেশি সরলীকৃত। মানুষের সভ্যতার অগ্রযাত্রা এ রকম সোজা ও সরল পথে চলে না। এখানেই তাঁর মধ্যে ছিল এক ধরণের বৌদ্ধিক দ্বান্দ্বিকতা যা তিনি কখনও সমাধান করতে পারেন নি, সম্ভবত কখনও চেষ্টাও করেন নি।" ('দা লাইফ অব কুমারস্বামী . অ্যান ইন্টারপ্রিটেশন'। 'পরোক্ষ কুমারস্বামী সেন্টিনারি সেমিনার পেপারস', পৃষ্ঠা-৭)

ভারত ও এশিয়ার শিল্পের ভাবাদর্শকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে কুমারস্বামী বা ওকাকুরার মতো মনীষীর অবদানের কোনো পরিসীমা নেই। তবু পরবর্তী কালের গবেষণা থেকে উঠে এসেছে যে সত্য, তাতে আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের এই আদর্শায়িত প্রকাশেরও একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভারতীয় দর্শন, শিল্প ও জীবনচর্যার মধ্যে ভাববাদ ছাড়িয়ে মানবতাবাদেরই প্রাধান্য উপলব্ধি করা যায়। পূর্বোক্ত ওই কুমারস্বামী সেন্টিনারি

সেমিনারেই একটি পেপার পড়েছিলেন কপিলা বাৎস্যায়ন। বিষয় ছিল · 'দ্য ইন্ডিয়ান আর্টস, দেয়ার ট্র্যাডিশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড প্রিন্সিপলস অব ফর্ম'। তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতীয় বেদ বা উপনিষদ কখনোই বাস্তবতাকে বা বাস্তবতার জ্ঞান আসে যে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে সেই ইন্দ্রিয়ের গুরুত্বকে উপেক্ষা করে না। উপনিষদ ববং মনে করে মানুষের ইন্দ্রিয়ময় শরীর অংশের সঙ্গে সমগ্রের যোগ স্থাপনে জীবন্ত প্রতীকের ভূমিকা পালন করে। চিন্তার ক্ষেত্রে জ্ঞানের ভিত্তিতে এই বাস্তব চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করে লেখিকা শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষত ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে আসেন। বলেন :

"ভাস্কর মানবিক রূপাবয়বকে কতগুলি আলম্ব ও অনুভূমিক তলের গতিময়তার সমন্বয় হিশেবে দেখেন এবং তার মধ্যে খুঁজে নেন একটা কেন্দ্র বা একটা বিন্দু যা থেকে সমগ্র গতিপ্রবাহ বাইরের দিকে প্রবাহিত হয় এবং ভিতরে সমাহৃত হয়। এভাবে, অনেক শিল্প-ঐতিহাসিক যার ব্যাখ্যা করেছেন অনুপাত ও ভারসাম্যের একটা অবাধ ও জটিল পদ্ধতিরূপে, তা আসলে সনাতন ধ্যানলব্ধ প্রতিমাকল্পের রূপ-অন্বিত শিল্পভাষায় রূপান্তরণ।" (পৃষ্ঠা-৫৮)।

ভাস্কর্যে ভারতীয়তার যে মূলগত বৈশিষ্ট্য · একক অচঞ্চল অন্তর্লীন একটি কেন্দ্র থেকে সমস্ত শক্তির স্ফুরিত হয়ে আয়তনের উপরিতলের দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে আসা, এটাও যে একটা বাস্তব ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তবতারই প্রকাশ, কপিলা বাৎস্যায়ন এই লেখায় সেটা প্রমাণ করতে পারেন।

রোমিলা থাপার ১৯৮৭-তে দিল্লির সেইন্ট স্টিফেনস কলেজে আই এইচ কুরেশি স্মৃতি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিষয় ছিল— 'কালচার অ্যান্ড আর্লি ইন্ডিয়া : ট্রাডিশন অ্যান্ড পেট্রনেজ'। পরে ওই বছরই ৭ থেকে ১৩ এপ্রিল — লেখাটি ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল কলকাতার 'টেলিগ্রাফ' পত্রিকায়। তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে যে কেবল শান্তি ও অহিংসাই বিরাজ করত— তা নয়। ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই জেগেছে প্রতিহিংসাপরায়ণতা, ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও হত্যার দৃষ্টান্তও ছড়িয়ে আছে ইতিহাস জুড়ে। শিল্পেও ঘটেছে তার প্রতিফলন। বৌদ্ধ মন্দির যে হিন্দুরা বার বার ভেঙে দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত অজস্র। প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ প্রদর্শনের অন্য নমুনাও আছে। যেমন খাজুরাহোর শৈব মন্দিরে দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের সাধুদের অত্যন্ত কদাকার যৌন ভঙ্গিতে দেখানো হয়েছে। এরকম সংকীর্ণতা যখন চলেছে উপরতলায়, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা সৌহার্দ্য ও সমন্বয় প্রক্রিয়া চলেছে। পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টি তিনিও খুব গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। বলেছেন শিল্পকে আমরা কেবলই রাজবংশের নামে অভিহিত করি— যেমন শুঙ্গ বা অন্ধ্র ইত্যাদি। এটা ভুল। বিশেষত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত ওই শুঙ্গ বা অন্ধ্র যুগে সাধারণ মানুষই ছিলেন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। এ বিষয়ে অবশ্য আমরা আগেই বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এই লৌকিক পৃষ্ঠপোষকতারই অবনমন ঘটতে থাকে পঞ্চম শতক থেকে। গুপ্তযুগ থেকে সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ধনিকশ্রেণীর ঐশ্বর্যের অহঙ্কার এবং সেই অহঙ্কারের প্রদর্শন শিল্পের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংযোগকে ব্যাহত করেছে। পৃষ্ঠপোষকতার এই বিবর্তন শিল্পের দর্শনেও রূপান্তর এনেছে। শ্রীলঙ্কার একটা কাহিনী আছে যেটা লেখা হয়েছিল 'মহাবংশ' নামে গ্রন্থে পঞ্চম শতকে। দ্বিতীয় শতকের এক সম্রাট দত্থ গামিনি, তিনি একটা স্তূপ তৈরি করাচ্ছিলেন, নিজের শৌর্য ও সম্পদ প্রকাশের জন্য। এক সন্ত সেই নির্মাণে নিজেকে যুক্ত করার জন্য একটি ইট নিজে তৈরি করে গোপনে সেটা কারিগরদের দিয়েছিলেন ওই স্তূপে ব্যবহার করার জন্য। সম্রাট জানতে পেরে সেই সন্তকে প্রচুর সম্পদ দিতে আদেশ করেছিলেন ওই ইটটির মূল্য হিশেবে, যাতে এই নির্মাণের সম্পূর্ণ গৌরব সম্রাটেরই থাকে একক ভাবে। এই পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টি ভারতীয় ভাস্কর্যের বা শিল্পকলার ক্ষেত্রে মানবতাবাদের বিকাশে বা সংকোচনে অনেক সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। রোমিলা থাপার তাই এরকম সিদ্ধান্তে এসেছেন : "শিল্পের ভাষা গড়ে ওঠে নির্মাতা বা স্রষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকের পারস্পরিক সংযোগ ও বিনিময়ের মধ্য দিয়ে।" মানুষের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের মধ্য দিয়ে, প্রকৃতির অপার রহস্যময়তায় তার বিস্ময় এবং সেই বিস্ময়কে শিল্পায়িত করার মধ্য দিয়ে ভারতীয় ভাস্কর্যের রূপাবয়ব নির্ধারিত হয়েছে সেই সিন্ধুসভ্যতার যুগ থেকে । এই একাত্মতা ও মানবতাতেই তা অর্জন করেছে শ্রেষ্ঠত্ব।

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'অ্যান অ্যাপ্রোচ টু ইন্ডিয়ান আর্ট' গ্রন্থে একথাই অত্যন্ত প্রজ্ঞাদীপ্তভাবে বলেছেন যে ভারতশিল্পের মূলগত দর্শন এই গভীর মানবতাবাদেই নিহিত, বাস্তবতা-নিরপেক্ষ কোনো ভাববাদে নয়। ভারতবর্ষে শিল্পের প্রথম লিখিত সংজ্ঞা পাওয়া যায় যে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'—সেখানে বলা হয়েছে শিল্প হচ্ছে দক্ষতার প্রকাশ, এবং

এই প্রকাশ হবে ছন্দোময়। এর মধ্যে কোনো ভাবালুতা নেই। এবং এই সংজ্ঞা আজও প্রযোজ্য। এ অর্থেই পরম্পরাগত ভারতীয় শিল্প যতই ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত ও আধ্যাত্মিক হোক, শেষ পর্যন্ত তা মানবিক এবং মানুষের ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির কাছেই তার প্রথম আবেদন।

তবু ভারতশিল্পের রূপগত ও ভাবগত প্রকাশে রয়েছে যে আপাত অলৌকিকতা তার কারণ ভারতবর্ষের মানুষ সব সময়ই জীবনকে দেখেছে সামগ্রিক পূর্ণতায়, প্রকৃতিকে দেখেছে অবিভাজিত ঐক্যে। জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে সে দেখেছে বহমান নদীর মতো এক নিরন্তর গতিপ্রবাহ। এই গতিময়তা ও পূর্ণতার বোধ ভারতীয় ভাস্কর্যের রূপাবয়বে এনেছে আয়তনময় মসৃণ সুডৌল প্রবহমানতা। তলগুলি পরস্পর পরস্পরে সমর্পিত হয়ে যায়। একের মধ্যে অন্যে বিলীন হয়ে সহাবস্থানে প্রকৃতিরই অন্তর্লীন সুরের অনুরণন জাগায়। গতিময় থাকে প্রাণছন্দের পূর্ণতায়, যেন শ্বাসবায়ুর অভিঘাত অনুভূত হয় প্রতিটি মুহূর্তে।

এই হল ভারতীয় ভাস্কর্যের সারাৎসার। এখানেই এর ভারতীয়তা। এখানে সে অনন্য পৃথিবীর অন্য সংস্কৃতির ভাস্কর্যের থেকে।

চার

সমকাল

বহু যুগ এই ভাস্কর্যের চেতনা সুপ্ত ছিল আমাদের দেশে। বস্তুত ত্রয়োদশ শতকে কোনারকের পর আঞ্চলিকভাবে এর যে সামান্য বিস্তার তা শুধু গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি। মুসলিম ও ব্রিটিশ আমলে ধীরে ধীরে যে শীর্ণ হয়ে গেল এর ধারা, তা হয়তো অনেকটাই পৃষ্ঠপোষকতা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিরতার অভাবে। শুধু লৌকিক স্তরে পরম্পরাগত ভাস্কর্যের কিছু চর্চা চলেছে কোনো কোনো অঞ্চলে। ইংরেজ শাসনে জনসাধারণের রুচি অবনমিত হয়েছে। অর্থবান যাঁরা তাঁরা সাগরপার থেকে আনিয়েছেন বিকৃত রুচির ভিনাস মূর্তি তাঁদের বিলাসগৃহ সাজাতে। চিত্রকলায় নতুন চেতনা এল বিংশ শতকের শুরু থেকে বা কয়েকবছর আগে থেকে। ভারতীয়তার এক নতুন সংজ্ঞা খোঁজার প্রেরণা এল। অবনীন্দ্রনাথ নিলেন পুরোধার ভূমিকা। স্বদেশচেতনা রূপ পেতে লাগল ছবির মধ্য দিয়ে। ভাস্কর্যে তার কোনো ঢেউ এল না। শুধু ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক রীতির একটা পরিমণ্ডল তৈরি হল তাঁদের প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুলগুলিতে। প্রথমদিকে বম্বে বা মহারাষ্ট্রেরই ছিল এখানে অগ্রণী ভূমিকা। ম্হাত্রে বা কারমাকারের মতো শিল্পীর দক্ষতার কোনো তুলনা নেই। অনেক শিল্পী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় লন্ডনে গিয়ে রয়াল অ্যাকাডেমিতে কাজ শিখেছেন। এমনও আছে ছবিতে তাঁরা নব্য-ভারতীয় রীতির চর্চা করেছেন, কিন্তু ভাস্কর্যে তথাকথিত অ্যাকাডেমিক রীতিতেই আটকে থেকেছেন। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী যেমন। ভাস্কর্যে ভারতীয়তার কোনো চর্চা হয় নি ১৯৩০-এর আগে পর্যন্ত।

যে ব্যক্তিপ্রতিভার একক অবদানে আধুনিক কালে আমাদের ভাস্কর্য মুক্তির স্বাদ পেল, তিনি রামকিঙ্কর। পরোক্ষে তাঁর রামকিঙ্কর হওয়ার পেছনে গভীর ভূমিকা ছিল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতনের। সেদিক থেকে বলা যায় শান্তিনিকেতনই আধুনিক ভারতে সৃজনশীল ভাস্কর্যের সূচনা করেছে। যে প্রশ্নটি এ আলোচনায় প্রাসঙ্গিক, তা হল, রামকিঙ্করের আধুনিকতায় ভারতীয়তার কি কোনো ভূমিকা আছে? তিনি ছবি আঁকার ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের প্রচলিত ঘরানাকে মানেন নি। নন্দলালের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল, তবু একমাত্র তিনিই তৎকালীন কলাভবনে নন্দলালের নির্দেশকে এড়িয়ে গিয়ে তেলরঙে ছবি এঁকেছেন, পাশ্চাত্য রীতিনীতি নিয়ে চর্চা করেছেন, এক্সপ্রেশনিস্ট ও কিউবিস্ট আঙ্গিকের প্রয়োগে ছবিতে গতিময়তা, সংঘাত ও তীব্র আর্তিকে রূপ দিয়েছেন যার সঙ্গে তথাকথিত ভারতীয়তার পেলবতা, আপাতসুষমার কোনো সম্পর্ক নেই। সেই রামকিঙ্কর ভাস্কর্যে ধ্রুপদী ভারতীয়তার রীতিকেই অনুসরণ করে যাবেন এটা কখনোই সম্ভব নয়।

শান্তিনিকেতনে লিজা ভন পট ও মাদাম মিলওয়ার্ড নামে বুর্দেল-শিষ্যা এক ভাস্কর, এই দুজন এসে কিছুদিন ভাস্কর্য শিখিয়েছিলেন। ভাস্কর্যের প্রকরণগত কিছু তালিম রামকিঙ্কর তাঁদের কাছে পেয়েছিলেন। এর বাইরে ছেলেবেলায় প্রতিমা গড়ার অভিজ্ঞতা ছাড়া ভাস্কর্যে তাঁর আর প্রথাগত শিক্ষা কিছু ছিল না। সবটাই তিনি আয়ত্ত করেছেন তাঁর

সহজাত প্রতিভা ও শিল্পবোধ দিয়ে। শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে অজস্র বিদেশী বই তিনি দেখতেন। সেই সূত্রেই ইওরোপীয় আধুনিকতার সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয়। এই ভিত্তির উপর নিজেকে তিনি ভাস্কর হিশেবে গড়েছেন।

তবে তাঁর ছিল চলমান জীবনপ্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। গ্রামীণ মানুষ বিশেষত শান্তিনিকেতন ঘিরে যে সাঁওতালরা থাকত তাঁদের কর্মময় মুক্ত জীবন অনেক সময়ই তাঁর ভাস্কর্যের বিষয় হয়েছে। এই সূত্রে ভারতীয়তার একটা প্রাণছন্দ তাঁর কাজে অনিবার্যভাবে এসেছে। আমরা যদি তাঁর 'কলের বাঁশি' বা 'সাঁওতাল পরিবার' এই কাজ দুটি দেখি, তাহলে এর মধ্যে যে অমসৃণতা, কর্কশতা, রূপাবয়বের যে প্রগাঢ় ভাঙন তাতে ইওরোপীয় আধুনিকতার পরিপূর্ণ শক্তি অনুভব করা যায়। এই শক্তির সঙ্গে যে বিশেষ গুণাবলির জোরে এই কাজ অনন্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বে অধিষ্ঠিত তার মধ্যে ঐতিহ্যের প্রতিফলন অন্যতম।

এই ঐতিহ্য কি ধ্রুপদী ভারতীয়তার? তা হয়তো নয়। ভারতীয় ভাস্কর্যে একটা বড় শক্তি এসেছে লৌকিক তথা আদিম জীবনপ্রবাহ থেকে। সিন্ধুসভ্যতায় যে দ্রাবিড় ঐতিহ্য শক্তি জুগিয়েছে, সেটা শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রবাহিত হতে হতে লৌকিক ও বৈদেশিক ঐতিহ্য থেকেও রস আহরণ করে ক্রমশই পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়েছে। রামকিঙ্করে এসে সেই ঐতিহ্যেরই আর এক স্বতন্ত্র স্ফুরণ দেখলাম আমরা। অনেকে বলেন, যেমন বলেছিলেন রামকিঙ্করেরই ছাত্র প্রখ্যাত একজন ভাস্কর, যে রামকিঙ্কর তাঁর ভাস্কর্যের এই শক্তি আহরণ করেছিলেন 'বুর্দেল'-এর কাছ থেকে। কিন্তু এটা বড়ই আংশিক সত্য। বুর্দেলের কাছ থেকে প্রকরণগত প্রভাব হয়তো আসতে পারে, কিন্তু সেই প্রভাব নিয়ে এত বড় সফলতায় পৌঁছানো যায় না।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখা দরকার, যেটা আগে হয়তো স্পষ্ট করে বলা হয় নি— যে আমাদের দেশে ধ্রুপদী বা উচ্চকোটির ভাস্কর্যের পাশাপাশি লৌকিক ও আদিবাসীদের নিজস্ব একটা ধারা সব সময়ই চলেছে। উচ্চকোটির ভাস্কর্যও তা থেকেই শক্তি সংগ্রহ করেছে। আধুনিক ইওরোপীয় ভাস্কর্য যেমন আদিমতা থেকেই প্রেরণা নিয়েছে, আমাদের ভারতীয় আধুনিক ভাস্কর্যও তাই। রামকিঙ্করের 'কলের বাঁশি' ও 'সাঁওতাল পরিবার' এরই দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রামকিঙ্কর স্বভাবতই ভারতীয় ভাস্কর্যের ধারা গভীর অভিনিবেশে দেখেছেন। ঔরঙ্গাবাদের গুহার নৃত্যমূর্তি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে শান্তিনিকেতনে তার একটি প্রতিরূপ গড়েছিলেন। অনেকে বলেন সেটা এত ভালো হয়েছিল যেন আসলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। কোনারক তাঁর খুব প্রিয় ছিল। কোনারকের বাদ্যবাদনরত মূর্তিগুলি তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

তবে ভারতীয়তার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ ঘটেছে দিল্লি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জন্য করা তাঁর 'যক্ষ-যক্ষী' মূর্তিতে। এজন্য তিনি বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে নানা ঘরানার যক্ষ ও যক্ষী মূর্তি দেখেছেন। যক্ষ-যক্ষীর পরিচিত রূপকল্পকে তিনি নিজের মতো করে রূপান্তরিত করেছেন। আদিমতার সংক্ষুব্ধতা সেখানেও তাঁর শক্তির উৎস হয়েছে। 'যক্ষ-যক্ষী'-তেই রামকিঙ্কর আরো সফলভাবে দেখালেন ভারতীয়তাকে কিভাবে আধুনিকতায় অভিষিক্ত করা যায়। তাঁর 'যক্ষ-যক্ষী' শুধু আমাদের ভাস্কর্যেই নয়, পৃথিবীর আধুনিক ভাস্কর্যেই এক অনন্য সৃষ্টি। প্রদোষ দাশগুপ্ত প্রথম জীবনে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে ও পরে লন্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে কাজ শিখেছেন। কিন্তু নিজের ভাস্কর্য করতে গিয়ে তাঁর সামনে প্রধান সমস্যা হল, কিভাবে ভারতীয়তাকে আধুনিকতার মধ্য দিয়ে রূপ দেওয়া যায়। তিনি উপলব্ধি করলেন ভারতীয়তার অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে অন্তর্লীন একটি অচঞ্চল কেন্দ্র থেকে সমস্ত শক্তির পরিধি অভিমুখী স্ফুরণের মধ্যে। ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা ও প্রত্যয়কে তিনি তাঁর ভাস্কর্যের রূপাবয়ব সৃষ্টিতে কাজে লাগালেন। এর ফলে ডিম্বাকৃতি (egg-form) এক ধরণের রচনা উদ্ভাবন করলেন তিনি। কখনো বিমূর্ততায়, কখনো সামান্য মূর্তির আদল এনে ভারতীয়তার দর্শনগত প্রত্যয়কে তিনি রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। এখানে ব্রাঁকুসির প্রভাব যদি কিছু থাকে, তাহলে তাঁর মতে, ব্রাঁকুসিই প্রাচ্য থেকে এই দর্শনকে গ্রহণ করেছিলেন। আঙ্গিকগত দিক থেকে আমাদের আধুনিক ভাস্কর্যের প্রধান সমস্যা আধুনিকতার ইওরোপীয় মডেলটি থেকে বেরিয়ে আসতে না পারা। অনেকেই মনে করেন এটা তো কোনো বিশেষ দেশ বা জাতির নিজস্ব সম্পদ নয়, এই বৈশ্বিক উত্তরাধিকারে আমাদেরও সমান অধিকার। কাজেই আজকে ঐতিহ্যের অনুকরণ বা অনুসরণের মধ্যে কোনো মুক্তি নেই। কিন্তু এর পাশাপাশি এও তো সত্যি যে একটা নতুন দিগদর্শন যদি না জাগে, যার মধ্যে একটা জাতির আত্মপরিচয় নিহিত থাকে এবং একই সঙ্গে প্রস্ফুটিত থাকে সমকালের ঘনিষ্ঠ উত্তাপ, তাহলে শিল্প হিশেবে তা মহত্ব দাবি করতে পারে না। আমাদের ভাস্কররা অনেকেই এ নিয়ে ভাবছেন।

তাঁরা চাইছেন এমন একটা রূপভঙ্গি যা ঐতিহ্যেরও অনুকরণ নয়, পাশ্চাত্যেরও প্রত্যক্ষ অনুসরণ নয়, এর বাইরে তৃতীয় কোনো পথ। ভারতীয়তার যে বিমূর্ত বোধ, তাকে ব্যবহার করছেন অনেকে, আদিমতা একটা প্রধান শক্তি হয়ে দেখা দিচ্ছে অনেক শিল্পীর কাজে, লৌকিক থেকেও গ্রহণ করছেন কেউ। এভাবে পাশ্চাত্য আঙ্গিক আশ্রিত প্রধান যে ধারা, তার পাশাপাশি একটা সমন্বয়ের প্রক্রিয়াও চলছে। দক্ষিণ ভারতে পরম্পরাগত আঙ্গিককে ব্যবহার করে তাকেও আধুনিকতায় উত্তীর্ণ করার চেষ্টা করছেন অনেক শিল্পী। এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে একজন রামকিঙ্কর যেমন আবির্ভূত হন, তেমনি জেগে ওঠেন মীরা মুখার্জির মতো ভাস্কর। ভারতীয়তার এক স্বতন্ত্র আদল উঠে আসে।

লৌকিক ভারতীয়তার একটি বিশেষ রূপভঙ্গিকে মীরা মুখার্জি যেমন এই সময়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে সঞ্জীবিত করেছেন, তার কোনো তুলনা হয় না। শুধু লৌকিক চেতনা নয়, তাঁর মধ্যে ভারতীয় ধ্রুপদী চেতনাও মিশেছে। আর মিশেছে সংগীত। ভারতীয় সংগীতের এত আশ্চর্য দৃশ্যরূপ ভাস্কর্যে এর আগে কমই দেখা গেছে। সমকালীন ভাস্কর্যে কেমন হওয়া উচিত ভারতীয়তার স্বরূপ তার দুই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত রামকিঙ্কর ও মীরা মুখার্জি। অন্তত তাঁদের দৃষ্টান্তে বলা যায় 'ভারতীয়তা' কথাটা আধুনিক ভাস্কর্যে অমূলক নয়।

ভাস্কর্যের আধুনিকতা

এক

'ব্রোঞ্জ-যুগ'—আধুনিকতার উত্তরাধিকার

অগুস্ত রদাঁ 'দ্য ব্রোঞ্জ এজ' নামে ভাস্কর্যটি শেষ করেছিলেন ১৮৭৭ সালে। তখন তাঁর বয়স ৩৭ বছর। (জন্ম—১৪ নভেম্বর ১৮৪০)। ভাস্কর্যের আধুনিকতায় তাঁর যে মহান ও গভীর অবদান, ইওরোপীয় ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতায় স্তিমিত হয়ে আসা আলোটিকে আবার উসকে দিতে পারার যে কৃতিত্ব তার সূচনায় পৌঁছতে ৩৭ বছর সময় লেগেছিল রদাঁর মতো এক প্রতিভার। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে আধুনিকের মানবতা ও নন্দনচেতনায় 'ব্রোঞ্জ এজ'-এর গুরুত্ব অনেকটা। পাশ্চাত্য ভাস্কর্যের এতদিনকার প্রচলিত যে দর্শন, এর সামনে জটিল এক প্রশ্ন চিহ্নের মতো আবির্ভূত হল এই কাজটি। ফলে তাৎক্ষণিক একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। সন্দেহ জেগেছিল এত প্রকট যে এর স্বাভাবিকতা, কি করে আনা সম্ভব হল তা? তাহলে কি মডেলরূপী ব্যক্তির শরীর থেকে সরাসরি তোলা হয়েছে ছাঁচ (কাস্ট)? জীবন্ত এক ব্যক্তির প্রত্যক্ষ এক প্রতিরূপ বা নকলই কি চালানো হচ্ছে সৃজনশীল ভাস্কর্য বলে? এরকম কথাও উঠল জীবিত না হলেও কোনো শবদেহ থেকে কি তোলা হতে পারে ছাঁচ? 'ব্রোঞ্জ এজ'-এর সফলতা ও স্বীকৃতির অন্তরালে এই একটি সংশয় এর শিল্পীকে ক্রমাগত বিব্রত ও আহত করেছে। কেন এরকম হল?

২১

'ব্রোঞ্জ এজ' একজন নগ্ন দণ্ডায়মান পুরুষের পূর্ণাবয়ব রূপায়ণ। ১৯৭৫-এ রদাঁ রোমে যান। সেখানে শিল্পকেন্দ্রগুলিতে বিস্তীর্ণ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে মাইকেল-এঞ্জেলোকে তিনি নতুন মাত্রায় আবিষ্কার করেন। ভাস্কর্যে আদর্শায়িত বাস্তবতা ও মানবতাবাদের সমন্বয়ের ক্ষেত্রটি মাইকেল-এঞ্জেলোর আলোতে তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রোমে ও ইটালিতে যাওয়ার আগেই তিনি শুরু করে গিয়েছিলেন একটি কাজ। একজন বেলজিয়ান সৈনিককে মডেল হিশেবে নিয়ে একটি মূর্তির খশড়ায় হাত দিয়ে দিয়েছিলেন। পেশাদারী মডেলের বদলে প্রত্যক্ষ জীবনের উত্তাপে সম্পৃক্ত এরকম মডেলেই তখন তাঁর উৎসাহ ছিল। ফিরে এসে দেড় বছর কাজ করে শেষ করেছিলেন এই মূর্তিটি।

প্রথমে যে প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন এটি সেখানে এর নাম দিয়েছিলেন 'দ্য ভ্যানকুইশড'। উৎসর্গিত হয়েছিল ১৮৭০-এ ফ্র্যাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধে ফরাসি সৈনিকদের বীরত্বের স্মৃতিতে। পরে এর নামকরণ পালটেছিলেন অনেক বার। 'দ্য অ্যাওয়েকেনিং অব স্প্রিং', 'দ্য অ্যাওয়েকেনিং অব হিউম্যানিটি', 'প্রাইমেভাল ম্যান' এরকম কয়েকটি শিরোনাম ভেবেছিলেন। শেষে প্যারিসের সালোঁ-তে যখন পাঠালেন প্রদর্শনীর জন্য, তখন নামকরণ করলেন 'দ্য ব্রোঞ্জ এজ'। নামকরণের বিবর্তনের মধ্যে ধরা থাকে এই ইঙ্গিত যে রদাঁ তাঁর শিল্পের মধ্য দিয়ে মানবতা সম্পৃক্ত নন্দনচেতনার এক নতুন জাগরণ চাইছেন। এক নতুন সংজ্ঞা খুঁজছেন। 'ব্রোঞ্জ এজ' সেই জাগরণের দিকেই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। এর আগে পর্যন্ত ইওরোপীয় ভাস্কর্যে বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতার যে ধারণা, বা সেই ধারণার যে বিবর্তন, ঐতিহ্যের সেই নির্দিষ্টতার মধ্যে এই মূর্তিটিকে কিছুতেই খাপ খাওয়ানো গেল না। জীবনের এমন এক প্রত্যক্ষতা, বাস্তবতার এমন এক করুণাদীর্ণ উত্তাপ বিচ্ছুরিত হতে থাকল এর মধ্য দিয়ে যে শিল্পের সঙ্গে বাস্তবের যে নান্দনিক ব্যবধানে অভ্যস্ত ছিলেন পাশ্চাত্যের দর্শক, তাঁদের দেখার সেই অভ্যাস হঠাৎই একটা ধাক্কা খেল যেন। তাঁদের মনে হল শিল্প কেন এত সরাসরি এসে আঘাত করছে চেতনায়, কেন নেই নান্দনিকতার চিরাচরিত সেই পরিচিত আড়াল? তাই 'ব্রোঞ্জ এজ'কে শিল্পের

রদাঁ: দা ব্রোঞ্জ এজ। ব্রোঞ্জ। ১৮৭৬-৭৭।

সম্মান না দিয়ে তাঁরা বাস্তবতার অনুকরণের দায়ে অভিযুক্ত করলেন। যে অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে রদাঁ এমনকী এও ভেবেছিলেন যে বেলজিয়ান সেই সৈনিককে এনে দাঁড় করাবেন বিচারকদের সামনে। শিল্প ও বাস্তবকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করে দেখতে বলবেন। সেই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়, সীমান্তের ওপার থেকে এই সৈনিকটিকে নিয়ে আসার আইনগত সমস্যার জন্য।

একেবারে শুরু থেকেই ফরাসি প্রাতিষ্ঠানিক ভাস্কর্যের ধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন নি রদাঁ। সে জন্য শ্রেষ্ঠ যে ফরাসি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান—'একোল দা বোজার্ত'—সেখানে শিক্ষার্থী হিশেবে প্রবেশের অধিকারই পেলেন না কখনো। খুবই সাধারণ ফরাসি এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। ছেলেবেলায় পড়াশোনাতেও তেমন মেধা ছিল না। কিন্তু সহজাত এক প্রতিভা ছিল ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়ায়। আর ছিল অসম্ভব জেদ। ভালো লাগত যেটা সর্বস্ব পণ করে লেগে থাকতেন তাতেই। সেই একাত্মতায় কৈশোরেই আয়ত্ত করেছিলেন যে দক্ষতা, তা সম্বল করেই প্যারিসের ছোট স্কুলের (Petite Ecole) শিক্ষা শেষ করে বোজার্তে ঢুকতে গেলেন যখন, তখনই বুঝতে হল তাঁকে, প্রাতিষ্ঠানিক রীতির সঙ্গে তাঁর রয়েছে প্রায় আজন্ম এক বিরোধ। যে জন্য প্রতিষ্ঠান নিজের লোক বলে কখনোই দলভুক্ত করে নি তাঁকে। 'বোজার্ত'-এ আর শেখা হল না তাঁর। কেউ কেউ বলেন এই প্রত্যাখ্যানের জন্যই হয়তো আমরা পেতে পেরেছিলাম একজন রদাঁ। প্রচলিতের বাইরে থেকে ভাস্কর্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারলেন যিনি।

শিল্পের বাস্তবোত্তীর্ণ কোনো আরোপিত তথাকথিত মহত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না রদাঁ। বলতেন স্পষ্টতই, "কেবল মডেলকেই প্রশ্নহীন অনুসরণ করি আমি।... প্রকৃতির স্বাভাবিকতাকে কখনো শুধরে নিতে চাই না, বরং সেই স্বাভাবিকতার টানেই নিজেকে পরিচালিত হতে দিই। তখন সে-ই (মডেল বা প্রকৃতি) আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে।" এও নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেন তিনি যখন সামনে দেখে আঁকার মতো কোনো মডেল থাকে না তখন কোনো আইডিয়াও দানা বাঁধে না তাঁর মনে। কিন্তু প্রকৃতি যখন রূপের সামগ্রিকতা নিয়ে দাড়ায় সামনে, তখনই নতুন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হন তিনি। খুলে যেতে থাকে সত্যের নতুনতর দরজা।

২২· মিশর। চুনা পাথরে তৈরি মুখাবয়ব। ২৭০০ খ্রিঃ পূঃ (আনুমানিক)।

২৩· মিশর। রাজা চতুর্থ আমেনোফিস। চুনাপাথরে তৈরি নতোন্নত পদ্ধতির কাজ। ১৩৭০ খ্রিঃ পূঃ (আনুমানিক)।

পল জিসেল (Paul Gsell) রদাঁ সম্পর্কিত তাঁর বইতে (Entretieus avec Rodin) এই ভাস্করের কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর স্টুডিওতে নগ্ন ও নগ্নিকা অনেক মডেল ঘুরে বেড়াত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে রদাঁ লক্ষ করতেন তাঁদের দেহের বিভিন্ন পেশির সঞ্চলন। কখনো কোনো বিশেষ ভঙ্গি তাঁকে আকৃষ্ট করত, তিনি মাটিতে সঙ্গে সঙ্গে ধরে রাখতেন শরীরের সেই নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি। এইভাবে শরীরের প্রতিটি পেশি ও তার উপর আলো-ছায়ার বিচিত্র ভাষা আয়ত্তগত হয়ে ওঠে তাঁর। সেটাকেই তিনি করে নিতে পারেন তাঁর নির্মাণের বা সৃজনের নিজস্ব ভাষা। মুখই কেবল চেতনার দর্পণ নয় তাঁর কাছে। দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরা পেশিই প্রতিটি মুহূর্তে উন্মোচিত করে চৈতন্যের আলো ও অন্ধকার। দেহের বাস্তবতা ও আত্মার স্বরূপকে এভাবেই মিলিয়ে নিতে চাইতেন রদাঁ। দেহের বাস্তবতা দিয়েই চৈতন্যের সমগ্রতার সারাৎসারকে ধরতে চাইতেন তিনি।

শরীর তখন আর কেবল শরীর থাকত না। অথবা বলা ভালো, শরীর তখন খুব বেশি রকম সংবেদনময় শরীর থেকেও সেই শরীরে রূপায়িত সামগ্রিক সত্যের প্রতিফলনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত, তাঁর 'থিংকার', 'বালজাক', বা 'দ্য কিস'-এর মতো ভাস্কর্য এভাবেই দেহ ও চৈতন্যের দ্বৈতের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতকের ইওরোপের ভাস্কর্যের নির্জন ক্ষেত্রটিতে সূর্যোদয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এল। ৩২ ৩৩

'ব্রোঞ্জ এজ' তখনকার নন্দন চেতনায় এজন্যই খুব অপরিচিত ও অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। এখানে সংক্ষুব্ধ ও সংবদ্ধ যে জঙ্গমতা সেটা তৎকালীন অ্যাকাডেমিক রীতি থেকে অনেক দূরবর্তী তো বটেই, এমনকী গ্রিক বা রেনেসাঁস ভাস্কর্যের যে প্রতিষ্ঠিত রীতি, তা থেকেও আলাদা।

গ্রিক ভাস্কর্যে আমরা দেখি জীবন ও যৌবনের জয়গান। যুদ্ধে বা খেলার মাঠে যৌবনের যে গৌরবময় জঙ্গমতা সেই গতির রূপায়ণের মধ্য দিয়ে গ্রিক ভাস্কর শুধু শরীরই গড়তেন না, সেই শরীরে ফুটিয়ে তুলতেন আত্মার প্রতিফলন। প্রখ্যাত গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস নিজেও ছিলেন একজন প্রশিক্ষিত ভাস্কর। তাঁর নির্দেশ ছিল—একজন শিল্পী অনুভব করবেন, কেমন করে চৈতন্যের আলোড়ন কর্মনিষ্ঠ শরীরের গতিভঙ্গিতে প্রতিফলিত হয় আর সেই প্রতিফলনের রূপায়ণে তিনি ধরতে চেষ্টা করবেন আত্মারই আলোকিত স্বরূপ। গ্রিক ভাস্কর্যের চূড়ান্ত সফলতার পর্যায়ের একটি কাজ

২৬ ৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ভাস্কর মিরনের করা 'ডিসকাস থ্রোয়ার' বা লোহার চাকতি নিক্ষেপকারী নগ্ন যুবকের রূপায়ণ। কর্মময় শরীরের গতিছন্দে উদ্ভাসিত এখানে যৌবন। শরীরের প্রতিটি পেশিতে যে আলোকিত বৈভব যে জঙ্গমতা তাতে হয়তো ধরা পড়েছে সক্রেটিস কথিত আত্মারই বিভা। আরো একশ বছর পরে আমরা যখন দেখি ৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ২৯ ভাস্কর প্রক্সিটিলিসের (Praxiteles) যুবক ডাইওনিসাস (Hermes with young Dionysus) বা একই শতাব্দীর অ্যাপোলো, বা আরো দেড়শো বছর এগিয়ে এসে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে অজানা শিল্পীর করা 'মিলোর ভেনাস', তখন আমরা বুঝতে পারি যৌবনের এই শারীরিক সৌন্দর্যের মধ্যে বিশেষ ও নির্বিশেষ একাকার হয়ে গেছে। এ কোনো বিশেষ ব্যক্তির সৌন্দর্য নয়, সমস্ত সৌন্দর্যের সারাৎসারকে সংহত করে নির্মিত হয়েছে এই রূপ। একেই আমরা বলি আদর্শায়িত সৌন্দর্য। যেমন সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখতে পারে কোনো মানুষ বা কোনো শিল্পী, যে সৌন্দর্য পৃথিবীর কোনো একক আধারে থাকে না, থাকতে পারে কোনো স্বর্গীয় কল্পনায়, শিল্পীর ধ্যানের সেই স্বর্গীয় সুষমা প্রতিফলিত হয় তাঁর সৃষ্ট মানব বা মানবীতে। এই আদর্শায়িত সৌন্দর্যই হয়তো সেই সক্রেটিস কথিত আত্মার ক্রিয়াশীলতার রূপায়ণ।

গ্রিক ভাস্কর্যের সঙ্গে মিশরীয় ভাস্কর্যের একটা ধারাবাহিকতার সম্পর্ক আছে। গ্রিক ভাস্কর্য যেমন পার্থিবতা ও জীবন যৌবনকেই স্বর্গীয় বৈভবে আলোকিত করে দেখেছে, মিশরীয় ভাস্কর্যের নিহিত দর্শন এর বিপরীত। জীবনকে উত্তীর্ণ হয়ে মৃত্যুর ধ্যানগম্ভীর শীতলতাকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা সেখানে। কোনো উল্লাস নয়, প্রগলভতা নয়, মৃত্যুর ও অন্ধকারের গাম্ভীর্যে রয়েছে যে সুগভীর ধ্যান, সেই ধ্যানকে দৃশ্যতার ভাষায় রূপ দিতে চেয়েছেন মিশরীয় চিত্রী বা

২৪· ডেলফি-তে প্রাপ্ত। দুই যুবকের মূর্তি। ৫৮০ খ্রিঃ পূঃ (আনুমানিক)।

২৫· ডেলফি-তে প্রাপ্ত। এক রথচালকের মুখাবয়ব। ব্রোঞ্জ। ৪৭০ খ্রিঃ পূঃ (আনুমানিক)।

২৬· *গ্রিক। ডিসকাস থ্রোয়ার। মিরন-এর ব্রোঞ্জ মূর্তি থেকে রোমে করা মার্বল অনুকৃতি। ৪৫০ খ্রিঃ পূঃ (আনুমানিক)।*

২৭· *গ্রিক হেগসো-র সমাধি প্রস্তর। ৪২০ খ্রিঃ পূঃ (আনুমানিক)।*

ভাস্কর। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় সহস্রাব্দে মিশরীয় সভ্যতা যখন তার বৈভবের চূড়ায় তখন জীবনকে তারা পার্থিবতার আলোতেই শুধু বুঝত না, তাদের দর্শনের মধ্যে ছিল মগ্নচৈতন্যের গভীর প্রভাব, ছিল ম্যাজিক বা জাদুর নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এর ফলে অন্তর্লোকের আঁধারলীন স্তিমিত সংক্ষুব্ধতার প্রকাশ ঘটত খুব সহজেই তাঁদের রূপায়িত অভিব্যক্তিতে। অন্তর্লোকের এই ঐশ্বর্যের রূপায়ণের স্বাচ্ছন্দ্য আজকের আধুনিক ভাস্কর্যের কাছেও ঈর্ষণীয়। এই ঐশ্বর্যকে আয়ত্ত করার চেষ্টার তাই আজও বিরাম নেই।

মৃত্যুময় এই তমসার অভিব্যক্তির স্বরূপ কেমন তা বোঝার জন্য আমরা দুটি মাত্র মিশরীয় ভাস্কর্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারি। গিজের এক সমাধিতে পাওয়া গেছে ২৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের বেলেপাথরের একটি মুখাবয়ব। এখন আছে ভিয়েনার এক মিউজিয়ামে (kunsthistorisches museum)। এই মুখে আমরা যে গভীর ও শীতল প্রশান্তি দেখি এক কথায় তা অতুলনীয়। বার্লিন মিউজিয়মে আছে ১৩৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের রাজা চতুর্থ আমেনোফিসের একটি বেলেপাথরের নতোন্নত (রিলিফ) পদ্ধতির মুখাবয়ব। প্রোফাইল বা পার্শ্ব-রূপায়ণের মধ্যেও এই মুখাবয়বে ধরা পড়েছে সুগভীর এক আধ্যাত্মিক আকুতি। তল বিন্যাসের তীক্ষ্ণতা ও কৌণিকতা সামগ্রিক অভিব্যক্তিতে যে বলিষ্ঠতা আনে তাতে এক সুপরিণত সভ্যতার ইঙ্গিত ধরা পড়ে, যে সভ্যতা জীবনের আলোকে যেমন জেনেছিল, তেমনি উপলব্ধি করেছিল অন্তর্লোকের আধ্যাত্মিকতার আলো-আঁধারিকেও।

চেতনার এই পরিপূর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, আধ্যাত্মিকতা ও নন্দন চেতনার দিক থেকে গ্রিক সভ্যতাকে অনেক অর্বাচীন মনে হয়। তবু গ্রিক ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশ যদি আমরা লক্ষ করি, তাহলে দেখব মিশরীয় নন্দন চেতনার অভিজ্ঞতাকে গ্রিক শিল্পীরা কেমন করে ক্রমে ক্রমে আত্মস্থ করেছেন। এবং সেই ভিত্তির উপর নিজেদের গভীর বাস্তবচেতনা সম্পৃক্ত জীবনবোধকে এক নতুন মাত্রায় উন্মীলিত করেছেন। মিশরীয় উত্তরাধিকারের দৃষ্টান্ত হিশেবে উল্লেখ করা যায় ডেলফি মিউজিয়ামে ৫৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দুই যুবকের দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব মূর্তি। ডেলফিতেই পাওয়া গিয়েছিল, এবং সম্ভবত ক্লিওবিস ও বাইটন নামে দুই ভাইয়ের রূপায়ণ। গ্রিসীয় রীতির পরিপূর্ণ স্বাভাবিকতা (ন্যাচারালিজম) বা আদর্শায়িত বাস্তবতা নেই এই ভাস্কর্যে। বরং এক অপ্রগলভ শীতলতা আছে। পরবর্তী কালের নিপুণ

২৪

২৫

২৮ *গ্রিক। অ্যাপোলো বেলভেডার। গ্রিক মূর্তি থেকে রোমে করা অনুকৃতি। ৩৫০ খ্রিঃ পূঃ (আনুমানিক)।*

২৮

২৯

২৯ *গ্রিক। প্রক্সিটিলিস। শিশু ডাইওনিসাস সহ হার্মেস। ৩৫০ খ্রিঃ পূঃ।*

দক্ষতা তখন পর্যন্ত অর্জিত না হলেও শিল্পের সত্য এখানে অনেকটা গভীর দ্যোতনায় আভাসিত। কেবল দীর্ঘ সাধনায় অর্জিত নয় বলে রূপ ও ভাবের পূর্ণ সমন্বয়ের কিছুটা অভাব এখানে থেকে গেছে। ডেলফিতেই পাওয়া ৪৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের একজন রথ চালকের মুখাবয়বের ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যে বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিকতার এক সুষম সমন্বয় আমরা লক্ষ করি। এখনো অজানা কিছু রহস্য যেন রয়ে গেছে মানুষের সত্তায়, সেই ছায়াচ্ছন্নতায় আরো মাত্রাময় হয়ে ওঠে এই যুবকের মুখ।

আরো আলোকিত মধ্যাহ্নের দিকে যত এগিয়েছে গ্রিক সভ্যতা এই ছায়াটিকে ততই যেন সে হারিয়েছে। যতই সে বিশ্ব জয় করেছে, ততই বাস্তবতায় দিতে চেয়েছে স্বর্গীয় বিভা, বিনিময়ে অন্তর্লোকের মরমী অন্ধকার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বেলভেডারের অ্যাপোলো (৩৫০ খ্রিঃ পূঃ) বা মিলোর ভেনাস-এ (খ্রিঃ পূঃ প্রথম শতক) আমরা এই আদর্শায়িত নিখাদ সৌন্দর্যকে দেখি। সক্রেটিস কথিত আত্মার প্রতিফলনকেও ছাপিয়ে গিয়ে এক নৈর্ব্যক্তিকতায় অভিষিক্ত হল সে, বিচ্ছিন্নতাই যার একমাত্র পরিণাম।

পৃথিবীর শিল্পের ইতিহাসটাই এরকম— অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিকতার আকুতি থেকে তা ফিরে আসে পার্থিবতার জয়গানে, আবার সেই সফলতার চূড়া স্পর্শ করে পুনরাবর্তিত হয় অন্তর্লোকের দিকে। গ্রিক ভাস্কর্যের চূড়ান্ত সফলতার পর সহস্রাধিক বছরের যে বিবর্তন রেনেসাঁসের আগে পর্যন্ত তাকে মধ্যযুগ বলা হয়, কেউ-বা অন্ধকার যুগও বলেন। বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেও আত্মিক সন্ধানের বিরতি ছিল না তখন। চতুর্দশ শতক থেকে যে মানবতার জাগরণ, তাতে সেই অভিজ্ঞতার কিছু রেশ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু অস্তিত্বের কেন্দ্র থেকে এতদিন হারিয়ে গিয়েছিল যে মানুষ, রেনেসাঁসের শিল্পীরা সেই মানুষকে আবার ফিরিয়ে আনলেন স্বর্গ ও মর্তের কেন্দ্রে। শরীরী মুখোশের অন্তরালে আলোকিত আত্মার সন্ধান তাঁদেরও ছিল কিন্তু তা মানসিক ও শারীরিক ভিত্তির উপরেই। দোনাতেল্লোর (১৩৮৬-১৪৬৬) দুই 'ডেভিড' (১৪১২ ও ১৪৩৫) থেকে মাইকেল এঞ্জেলোর (১৪৭৫-১৫৬৪) 'ডেভিড'-এ (১৫০১-১৫০৪) পৌঁছাতে যে প্রায় এক শতকের ব্যবধান তাতে এই মানবতার জয় ঘোষণারই এক পরিপূর্ণতার দিকে যাত্রা আমরা লক্ষ করি।

ধ্রুপদী গ্রিক ভাস্কর্যের মহত্ত্বে আপ্লুত ও বিস্ময়াবিষ্ট মাইকেল এঞ্জেলো নাকি বেলভেডার টরসোর সামনে নতজানু হয়ে ধ্যানমগ্নতায় উচ্চারণ করতেন, 'এ সেই

মানুষের কাজ যিনি প্রকৃতির থেকে বেশি কিছু জানতেন।' সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মাইকেল এঞ্জেলোরও স্বপ্ন ছিল প্রাকৃতিকতা দিয়েই প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে যাওয়া। তাঁর 'ডেভিড'-এ যে অনৈসর্গিক সৌন্দর্য তাতে মনে হয় স্থিতধী আত্মবিশ্বাসদৃপ্ত যৌবন পৃথিবীর কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে শৌর্য ও প্রেম দিয়ে যেন স্বর্গ ও মর্তকে জয় করতে চাইছে। 'ডেভিড' যেমন প্রেম, শৌর্য ও বীরত্বের প্রতীক, তেমনি করুণা ও মৃত্যুকেও রূপ দিয়েছেন মাইকেল এঞ্জেলো যথাক্রমে 'পিয়েতা' (১৪৯৮-৯৯) ও 'দ্য ডাইং স্লেভ' (১৫১৬) ভাস্কর্যে। 'ডাইং স্লেভ'-এ মৃত্যুর বিপন্নতাও যেভাবে সৌন্দর্যে মহনীয় হয়ে ওঠে তাতে অনুচ্চার এক পূর্বাভাস হয়তো ভেসে ওঠে যে পাশ্চাত্য ভাস্কর্যকে এবার আন্দোলিত হতে হবে আর এক প্রান্তের দিকে যেখানে বাস্তবতা স্বর্গীয় বৈভব কাটিয়ে আবার ফিরে আসবে তার নিজস্ব স্বরূপে। ৩১

এজন্য তিন শতাব্দীরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। রদাঁর 'ব্রোঞ্জ এজ'-এ আমরা ফিরে পেলাম বাস্তবতার দ্বন্দ্বক্লিষ্ট পার্থিব সেই মানুষকে, জীবনের দায়কে যে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারে না। শরীরের প্রতিটি পেশির স্পন্দনের উপর আলোক সম্পাতের ভাষাকে বুঝে নিয়ে রদাঁ স্থৈর্যের মধ্যে জঙ্গমতাকে উদ্ভাসিত করে তুলতেন। সে জঙ্গমতা একান্তই পার্থিব। ২১

৩০· গ্রিক। মিলোর ভেনাস। খ্রিঃ পূঃ ১ম শতক।

৩১· মাইকেল এঞ্জেলো। দ্য ডাইং স্লেভ। মার্বল। ১৫১৬।

মাইকেল এঞ্জেলোর গতিও এক স্থিতিতে বাঁধা ছিল, মাধ্যাকর্ষণে স্থিত মার্বল ব্লকের সেই সুঠাম স্থবিরতা মূর্তিতে সঞ্চালিত গতিকেও পার্থিব ভার দিত, মূর্তি যাকে অস্বীকার করতে চাইত বলে, গতি ও স্থিতির এক দ্বান্দ্বিকতায় বাঙ্ময় হয়ে উঠত তা। রদাঁ তাঁর ব্রোঞ্জে নির্ভারতাব শূন্য থেকে উন্মীলিত করতেন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ,বেধ। নির্ভার থেকে ভারের দিকে সেই যাত্রায় ক্রমশই মহীরুহের মতো প্রোথিত হতে হতে বেড়ে ওঠা শরীর এক প্রত্ন-প্রতিমার সংহতিতে ম্লানতা ও উজ্জ্বলতার দ্বৈতে অভিষিক্ত হত, তাঁর 'বালজাক' (১৮৯৩-৯৭) যে সফলতার পরম দৃষ্টান্ত। পার্থিবতাই রদাঁর ভাস্কর্যে আনল শক্তি ও সুষমা।

আবার ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের সমসময়ের মানুষ তিনি। আলোকবিজ্ঞানের গবেষণা চিত্রকলায় আলোকবিন্যাসের ভূমিকাকে যে গুরুত্ব দিয়েছিল, ভাস্কর্যে তাকে গ্রহণ করার দায়িত্বও পালন করতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর 'দানে' (১৮৮৫), 'প্রডিগাল সান' (১৮৮৯), 'ইটারনাল আইডল' (১৮৮৯), 'কিস' (১৮৮৬) ইত্যাদি ভাস্কর্যে একদিকে যে করুণা, ৩৩ অন্যদিকে যে সংসক্ত সংবেদনময়তা, বিষাদাবিষ্ট মানবিক প্রেমের যে জয় ঘোষণা, তাতে অনন্য ভূমিকা থাকে আলোর বিচ্ছুরিত চঞ্চল গতিভঙ্গির। রদাঁ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রগাঢ় বাস্তব-সচেতনতা দিয়ে একদিকে প্রত্ন-প্রতিমার সংহতিতে জীবনের গভীর জিজ্ঞাসার ভাস্কর্যরূপ আবিষ্কার করেছেন যেমন 'বালজাক' (১৮৯৩-৯৭), 'থিংকার' (১৮৮০), 'বার্ঘার্স অব ক্যালে' (১৮৮৬-৮৮); অন্যদিকে রোমান্টিক চেতনায় আপ্লুত হয়ে সংবেদনময় প্রেমের প্রতিমূর্তি রচনা করেছেন 'কিস' (১৮৮৬) বা 'ইটারনাল আইডল' (১৮৮৯) ইত্যাদি ভাস্কর্যে।

দুই

সংঘাত ও গাঠনিকতা

গ্রিক এবং তারপর রেনেসাঁস থেকে রদাঁ পর্যন্ত ইওরোপীয় ভাস্কর্যের বিবর্তনে আমরা মানবতাবোধের যে বিবর্তন দেখি তাতে মানুষের বাস্তব-চেতনা ও পার্থিবতারই সমধিক গুরুত্ব। এই বাস্তবতার অস্তিত্বের মধ্যেই শিল্পীরা আদর্শায়িত সত্যকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু পার্থিবতা কখনোই দ্রবীভূত হয়ে যায় নি। মিশরীয় ভাস্কর্যে আমরা একভাবে দেখেছি কেমন করে বাস্তবতার আবরণ মৃত্যুচেতনাদীর্ণ চৈতন্যের আবছায়ায় অনাবৃত হয়ে যায়। ভারতীয় ভাস্কর্যের মূলগত দর্শন এই দুটি ধারা থেকেই আলাদা। জীবন ও পার্থিব অস্তিত্বের প্রতি প্রগাঢ় ও সংবেদনময় আসক্তি নিয়েও ভারতীয় শিল্পী তাঁর প্রকাশে শরীরী সত্তাকে দ্রবীভূত করে ফেলে এক অলৌকিকের আলোয় তাকে উদ্ভাসিত করে নিতে পারেন। শরীরের গঠনের বিস্তৃত অনুপুঙ্খের থেকে তাঁর দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ থাকে এক সামগ্রিক ছন্দের প্রতি, যে ছন্দের সংগীতময় অনুরণন লৌকিককে অলৌকিকে উদ্ভাসিত করে। আবিশ্ব ভাস্কর্যের এই তিনটি মূল নান্দনিক ও দার্শনিক প্রবণতার মধ্যে আধুনিকতা একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু আধুনিকতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ বিষয়কে ছাড়িয়ে বিষয়ীর প্রাধান্য। বিষয়কে একটা উপলক্ষ মাত্র করে রূপাবয়বের (form) স্বকীয়তা ও অভিনবত্বের উদ্বোধনে শিল্পীর নিজস্ব দর্শনকে উদ্বোধিত করে তোলা। এই প্রক্রিয়ায় দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবও অনেক সময় ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হয়ে যায়। রূপাবয়ব বা ফর্মের স্বকীয়তাই আধুনিকতার প্রধান অন্বিষ্ট।

রদাঁ-র আধুনিকতারও মূল বৈশিষ্ট্য এটাই। তাঁর কাজেও একটা বর্ণনাত্মক ও বিবরণমূলক দিক আছে। পববর্তী ভাস্কর্যে আমরা দেখব এই বর্ণনা ও বিবরণকে ভাবালুতা বলে পরিহার করে শিল্পীরা রূপাবয়বের সংহত সারাৎসারে পৌঁছতে চাইছেন। কিন্তু আবেগরঞ্জিত বর্ণনাকে গুরুত্ব দিয়েও রদাঁ যেভাবে রূপাবয়বের গাঠনিকতা থেকেই নান্দনিক সত্যে এসেছেন, তাতেই তাঁকে আধুনিক ভাস্কর্যের প্রথম প্রতিভূ বলে বিবেচনা করা যায়।

তবু রদাঁ প্রকৃতিতে বড় সংসক্ত ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক বা অনুজ আধুনিকতার প্রতিভূ যাঁরা, এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রদাঁকে তাঁরা অতিক্রম করতে চাইতেন। অরিস্তিদ মাইয়ল (১৮৬১—১৯৪৪), আন্তন বুর্দেল (১৮৬১—১৯২৯) ও চার্লস ডেসপ্যু (১৮৭৪—১৯৪৬) এই তিনজন ছিলেন রদাঁর অনুজ সমসাময়িকদের মধ্যে অন্যতম। মাইয়ল বলেছিলেন একবার, "প্রকৃতি প্রবঞ্চনাময়। তার দিকে যত কম তাকাব, ততই বাস্তবকে ছাড়িয়ে সত্যে পৌঁছতে পারবে আমার কাজ।" রদাঁর প্রতি প্রতিক্রিয়ায় এভাবেই এক ধ্রুপদী বোধে পৌঁছতে চাইছিলেন মাইয়ল। প্রগলভতাকে পরিহার করে গঠনের ঋজুতায় সত্তার নিরাবেগ সত্যকে ধরতে চাইছিলেন। বুর্দেল-এ আবার আবেগের প্রাধান্য। অনুভূতির তীব্রতায় তা ধ্রুপদী বোধের বিপরীত। আদিমতার উদ্বোধনে তা চেতনার সংক্ষুব্ধ অন্ধকারকে মানবিক অবয়বে ও অভিব্যক্তিতে রূপবদ্ধ করে। রদাঁর অনুসৃত ফর্মের স্বরাটত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে, কিন্তু তাঁর বর্ণনাত্মক রূপকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় ইওরোপে আধুনিক ভাস্কর্যের নতুন দিগদর্শন রচনা করে যাচ্ছিলেন বিংশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশকে যে সব শিল্পী তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— মেডার্ডো রোসো (১৮৫৮—১৯২৮), উইলহেম লেমব্রুক (১৮৮১—১৯১৯), আর্নেস্টো ডি ফিওরি (১৮৮৪—১৯৪৫), গিওর্গ কোলবে (১৮৭৭—১৯৪৭), গেরহার্ড মার্কস (জ· ১৮৮৯), রেনি সিনটেনিস (১৮৮৮—১৯৬৫), অ্যাডলফ হিলডেব্রান্ড (১৮৪৭—১৯২১), আর্নস্ট বালরাক (১৮৭০—১৯৩৮), ক্যাথে কোলভিৎস (১৮৬৭—১৯৪৫) প্রমুখ।

ইম্প্রেশনিস্ট ও পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট ধারার কয়েকজন চিত্রশিল্পী ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও তাঁদের নন্দনভাবনাকে প্রসারিত করেছিলেন। এদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এডগার দেগা (১৮৩৪—১৯১৭), অগুস্ত রেনোয়া (১৮৪১—১৯১৯), পিয়ের বোনার্ড (১৮৬৭—১৯৪৭), অঁরি মাতিস (১৮৬৯—১৯৫৪) প্রমুখ। চিত্রকলায় ইম্প্রেশনিস্টরা যেমন বস্তুর বা প্রকৃতির আপাত-স্বাভাবিকতাতে তৃপ্ত না থেকে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তার স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করেন, তার মধ্যে প্রধান একটি ছিল আলোক-প্রক্ষেপের বিভিন্ন মাত্রা ও অভিমুখ বিষয়ের রূপকে যেভাবে প্রতিভাত করে তার (বিষয়ের) সেই তাৎক্ষণিক সত্তাকে উন্মোচনের চেষ্টা। ভাস্কর্যেও আপাত স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করে রূপের মরমী মায়ার সন্ধানে তার নব নব স্বরূপের সন্ধান চলছিল তাঁদের হাতে।

৩২· রদাঁ। বালজাক। মুখাবয়ব। স্টাডি। ১৮৯৩-৯৭।

একটি নির্দিষ্ট অভিমুখ থেকে দেখে বিষয়ের ত্রিমাত্রিক অস্তিত্বকে স্বীকার করে ফর্ম বা রূপাবয়বের স্বাভাবিকতাকে ভেঙে তার অন্তঃস্থ মাধুর্যকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের যে চেষ্টা, ইম্প্রেশনিস্ট ও রদাঁ পরবর্তী ভাস্করদের এ সম্পর্কে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের দেশে এখনো সমকালীন ভাস্কর্যের এটি একটি অতি প্রচলিত রীতি। ছবির ক্ষেত্রে আধুনিকতায় এখনো যেমন ইম্প্রেশনিজমের ভূমিকা রয়ে গেছে, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও তাই।

এডগার দেগার 'দ্য লিটল ডান্সার অব ফোরটিন ইয়ারস' নামে ১৮৮০-৮১ সালের ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যটি রদাঁর সমসাময়িক কালে রদাঁ থেকে একেবারে ভিন্ন রীতির কাজের একটি অনবদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। নৃত্যরতা চতুর্দশী এই কিশোরী মূর্তিটি ফর্মকে খুব একটা না ভেঙে স্বাভাবিকতায় স্থিত থেকেও ধ্রুপদী অভিব্যক্তির বাইরে করুণায় সংহত এক নিষ্পাপ সরলতাকে মেলে ধরছে। রদাঁ যেমন প্রতিটি অংশের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমগ্রতায় পৌঁছতে চাইতেন, এখানে তা নয়। এখানে সমগ্রতাই যেন এক একক। ধ্রুপদী ও রোমান্টিকতার তথাকথিত সংজ্ঞার বাইরে নন্দনচেতনার এক স্বতন্ত্র মাত্রা খুলে যাচ্ছে এইসব কাজে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ভাস্কর হিশেবে মাতিসের অবদান বিবেচ্য। প্রকাশের সামগ্রিকতার ঐক্যে ও অভিব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত সারল্যে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি, ছবিতে যেমন, তেমনি ভাস্কর্যেও। সারল্যও যে দীর্ঘসাধনাসাপেক্ষ, তা বোঝা যায় ভাস্কর্যে একটি বিষয়ের ক্রমিক বিবর্তন দেখে। 'দ্য ব্যাক' নামে নারীর পৃষ্ঠদেশের রূপায়ণের একটি ভাস্কর্য ২০ বছর ধরে বিবর্তিত হয়েছে তাঁর হাতে। প্রথমটি ১৯০৯-এর। এখানে স্বাভাবিকতার অনেকটা যে আদল ধরা থাকে, তা ক্রমশই সরলীকৃত হতে থাকে। ১৯১৩-১৪-তে যে দুটি কাজ, সেখানে বিশদ কমে এসেছে অনেক। আর ১৯২৯-এর কাজটিতে কয়েকটি আয়তনময় আলম্ব সরলরেখার বিন্যাসই পৌঁছে দেয় নির্দিষ্ট বিষয়ের সারাৎসারে। রূপের এই নির্যাসটুকুকে বের করে আনতে পারা ছবিতে যেমন, তেমনি ভাস্কর্যেও মাতিসের অনন্য অবদান।

৩৬ ৩৭

৩৩. রদাঁ। দা কিস্‌। ১৮৮৬।

৩৪· আন্তোন বুর্দেল। বিঠোফেন। ১৯০১।

এই পর্যন্ত পৌছতে ইওরোপীয় ভাস্কর আধুনিকতার সামগ্রিক জীবনবোধের রূপায়ণে ইওরোপীয় ঐতিহ্যকে আর যথেষ্ট বিবেচনা করলেন না। বাস্তবতাকে না ভেঙে আর বাস্তবের গভীর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, একথা তাঁরা উপলব্ধি করলেন। যেমন গ্রিসীয় ভাস্কর্যকে এক সময় মিশরীয় ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করতে হয়েছিল, তার চেয়েও অনেক ব্যাপকভাবে বিংশ শতকের শুরুতে শিল্পীদের শরণাপন্ন হতে হল আদিম ও প্রত্ন শিল্পের কাছে। ১৯০৭ সালে পিকাসো এঁকেছিলেন 'আঁভিনিওঁর নারীরা' শীর্ষক যে ছবি, তাতে আফ্রিকায় মুখোশ ও ইবেরীয় ভাস্কর্যের যে আদল ধরা পড়ল, সেই গ্রহণ এমন এক বৈপ্লবিক বিবর্তনের ইঙ্গিত আনল, যার পর থেকে ইওরোপীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের রূপায়ণগত দর্শন এতদিনকার ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এখন অবশ্য জানা গেছে আদিমতার সঙ্গে ১৯০৭-এ পিকাসোর যে সাযুজ্য, তা অনেকটা মগ্ন চৈতন্যের স্তরের, কেননা 'আঁভিনিওঁর মেয়েরা' ছবি আঁকার আগে আফ্রিকার বা ইবেরীয় ভাস্কর্য দেখার সুযোগ পিকাসোর হয় নি।

ইম্প্রেশনিস্টদের আলোর প্রক্ষেপ দিয়ে গড়া প্রকৃতি আলোর মায়ায় এত নির্ভার ও তরল হয়ে গেল যে তার গাঠনিক কোনো চরিত্র থাকল না। এই তরলতার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া এল সেজানের (১৮৩৯—১৯০৬) কাছ থেকে। সেজান চিত্রকলায় সেই গাঠনিকতার মেরুদণ্ডটি ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এক নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত আনল। সেই সম্ভাবনাই পরিণতি পেয়ে ঘনকবাদ বা কিউবিজম নামে এক নতুন শিল্প-দর্শনের জন্ম দিল। ইম্প্রেশনিজম পর্যন্ত শিল্পী বিষয় বা প্রকৃতিকে একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন। কিউবিজম দৃষ্টিকোণের সেই স্থিরতা বা নির্দিষ্টতা ভেঙে দিল। দৃষ্টিকোণের নির্দিষ্টতা বিষয়ের সামগ্রিকতাকে কখনোই উদ্ভাসিত করে না। ফলে বিষয়ের সম্পূর্ণ সত্তা কখনোই ধরা পড়ে না। কিউবিজম একই সঙ্গে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের দেখাকে চিত্রপটের সমতলে মিলিয়ে দিয়ে বিষয়ের গাঠনিক ঋজুতাকে উদ্ভাসিত করল।

ভাস্কর্য ত্রিমাত্রিক শিল্প। সেখানে দ্বিমাত্রিকতার পূর্বোক্ত সমস্যা ছিল না। কিন্তু শিরদাঁড়াহীন তরলতার সমস্যা ক্রমশ প্রকট হচ্ছিল। কিউবিজমের দর্শন, প্রকারান্তরে যা আবার প্রত্ন-শিল্পের আদিমতার অভিব্যক্তি থেকে উদ্ভাবিত, ভাস্কর্যে

এই গাঠনিক ঋজুতাকে ফিরিয়ে আনল। এই কাজে প্রথম এবং ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করলেন যিনি, তিনি পাবলো পিকাসো (১৮৮১— ১৯৭৩)।

জর্জ ব্রাক (১৮৮২—১৯৬৩) যেভাবে কিউবিজমের দার্শনিক রূপকার এবং কিউবিজমকে ধ্রুপদী সংহতির দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন, পিকাসোর ক্ষেত্রে ঠিক তা না হলেও, পিকাসো তাঁর প্রতিভার ব্যাপকতায় শিল্পের প্রতিটি দিগন্তেই যেমন তাঁর অবিসংবাদিত নিয়ন্ত্রণ ও অবদান রেখেছিলেন, কিউবিজমের ক্ষেত্রেও তাই। ১৯০৭-এ, তখনো কিউবিজম প্রকৃষ্ট ভিত্তি পায় নি, পিকাসো কাঠ কেটে গড়েছিলেন একটি টোটেম পোল ফিগার। সেখানে যে আদিমতা-সম্পৃক্ত গাঠনিক ঋজুতার প্রকাশ তার মধ্যেই কিউবিজমের পদধ্বনি শুনতে পাই আমরা। ১৯০৯-১০-এর 'হেড অব আ উওম্যান'-এ এক নারী মুখাবয়বের রূপায়ণে উপরিতলের মসৃণতাকে ভেঙে ছোট ছোট কৌণিকতায় সংবদ্ধ অজস্র তলের পারস্পরিক সংঘাত সৃষ্টি করেন এবং অভিব্যক্তিতে যে সুদূরচারী নির্জন ছায়াচ্ছন্নতা আনেন, তা একই সঙ্গে অভিব্যক্তিতে আদিমতা ও গাঠনিকতায় কিউবিজমের অনুষঙ্গ আনে। সম্ভবত এই কাজটিই ভাস্কর্যে কিউবিজমের একেবারে সূচনার দৃষ্টান্তগুলির অন্যতম।

শুধু কিউবিজম নয় পিকাসো ভাস্কর্যেও নানা রীতি ও নানা ধারার প্রবক্তা। ১৯১৪-র 'গ্লাস অব অ্যাবসিন্থ', ১৯৩১ এর 'ফোর হেডস' নামে চারটি নারী মুখের রূপায়ণ যেমন আদিমতা-সম্পৃক্ত কিউবিস্ট রীতির অনুরণনে সমৃদ্ধ, তেমনি সুররিয়্যালিজমের কল্পরূপাত্মক অনুষঙ্গের পরিচয় মেলে ১৯৩১-এর 'স্টিক স্ট্যাচু' নামে আপাত-প্রস্থহীন দামাবং বেড়ে ওঠা নারী প্রতিমাকল্পগুলি বা 'উওম্যানস হেড' নামে একটি ধাতব নির্মাণে। এই নির্মাণ, কনস্ট্রাকশন বা অ্যাসেমব্লেজ-এর ক্ষেত্রেও পিকাসোই অন্যতম পুরোধা। ১৯২৯-৩০-এর 'ফিগার অব আ উওম্যান'— বিভিন্ন পরিত্যক্ত ধাতুখণ্ড বা ধাতবপাত জুড়ে জুড়ে গড়া ভাস্কর্যের দৃষ্টান্ত।

প্রিমিটিভিজম ও কিউবিজম বা আদিমতা ও ঘনকবাদের সমন্বয়ে গড়া ভাস্কর্যের এই যে নতুন রূপভঙ্গি এতে পিকাসোর সমসাময়িক এবং হয়তো খানিকটা অগ্রবর্তী এক ভাস্করের যথেষ্ট অবদান রয়ে গেছে। তিনি জুলিও গনজালেজ (১৮৭৬—১৯৪২)। এই রীতির ভাস্কর্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আরো যে সব শিল্পী তাদের মধ্যে বিশিষ্ট জুয়ান গ্রিস (১৮৮৭—১৯২৭), আলেকজান্ডার আর্চিপেঙ্কো (১৮৮৭—১৯৬৪), হেনরি লরেন্স (১৮৮৫—১৯৫৪), জ্যাকস লিপচিটজ (১৮৯১—১৯৭৩), ওসিপ জ্যাড্‌কিন (১৮৯০—১৯৬৭), হেনরি গডিয়ের ব্রজেস্কা (১৮৯১—১৯১৫), পাবলো গারগালো, প্রমুখ।

এই পর্যন্ত এসে আমরা এমন একটা জায়গায় দাঁড়াই, যেখান থেকে অনেকগুলো পথ বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। আসলে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই তো স্বতন্ত্র একটা ধারা। বড় শিল্পীদের কোনো সাধারণ ঐক্যসূত্রে বাঁধা অনেক সময়ই মুশকিল। তবু ভাস্কর্যের মূল প্রবণতাগুলির সন্ধান করতে চাই যদি, তাহলে দেখব, কিউবিজম একদিকে চলে গেল কনস্ট্রাকটিভিজমের দিকে, অন্যদিকে তা থেকেই এল ক্রমান্বয়ে বিমূর্ততা। আবার আদিমতার অভিব্যক্তিকে অনুসরণ করে বা সেই উত্তরাধিকারকে আত্মস্থ করে আর একটি ধারা চলে গেল প্রতীকী অনুষঙ্গের প্রাণময়তা বা জীবন্ময়তার উদ্বোধনের দিকে। আমরা প্রথমে কনস্ট্রাকটিভিজমের প্রবণতাটিকে সংক্ষেপে বুঝতে চেষ্টা করব। এবং দেখব কেমন করে বিমূর্ততায় এসে ভাস্কর্যের সনাতন সংজ্ঞাটাই পালটে গেল। এর পরে আসব প্রতীকী বা জীবন্ময়তার ভাস্কর্যে যেখানে ব্রাঁকুসি ও হেনরি ম্যুর-এর মতো দুই মহান ভাস্কর্যের দার্শনিক এই শতাব্দীর ভাস্কর্যের নন্দন-জিজ্ঞাসায় বৈপ্লবিক মাত্রা যোগ করেছেন।

সেজান, ব্রাক ও পিকাসো চিত্রে ও ভাস্কর্যে এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলেছিলেন। কিউবিজমের সেই সম্ভাবনা শুধু আর বিশুদ্ধ নন্দনেই সীমাবদ্ধ রইল না, তাতে প্রযুক্তি বা টেকনোলজিরও অনুপ্রবেশ ঘটল। পিকাসো নাকি একবার (১৯০৯—১০ সালে) হেনরি কানওইলারকে বলেছিলেন (হার্বার্ট রিডের 'মডার্ন স্কাল্পচার' বই থেকে জানি) যে তিনি এমন ছবি আঁকতে চান যা থেকে একজন এঞ্জিনিয়ার বিষয়টিকে গড়ে নিতে পারবেন। তাঁর এই ইচ্ছাটাই কালক্রমে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল ফিউচারিস্ট ও কনস্ট্রাকটিভিস্টদের কাজের মধ্য দিয়ে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন বা শিল্পবিপ্লবের পর প্রযুক্তি যেভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দর্শনকে প্রভাবিত করছিল, তারই অনিবার্য পরিণতি ফিউচারিজম ও কনস্ট্রাকটিভিজমের বিকাশ।

ফিউচারিস্টরা মনে করতেন কিউবিজমও শেষ পর্যন্ত ইম্প্রেশনিজম পর্যন্ত এতদিনকার শিল্পকলার ধারার মতো

রঙিন ছবি ২· রদাঁ। হাফ-লেংথ ফিগার অব আ উওম্যান। ১৯১০
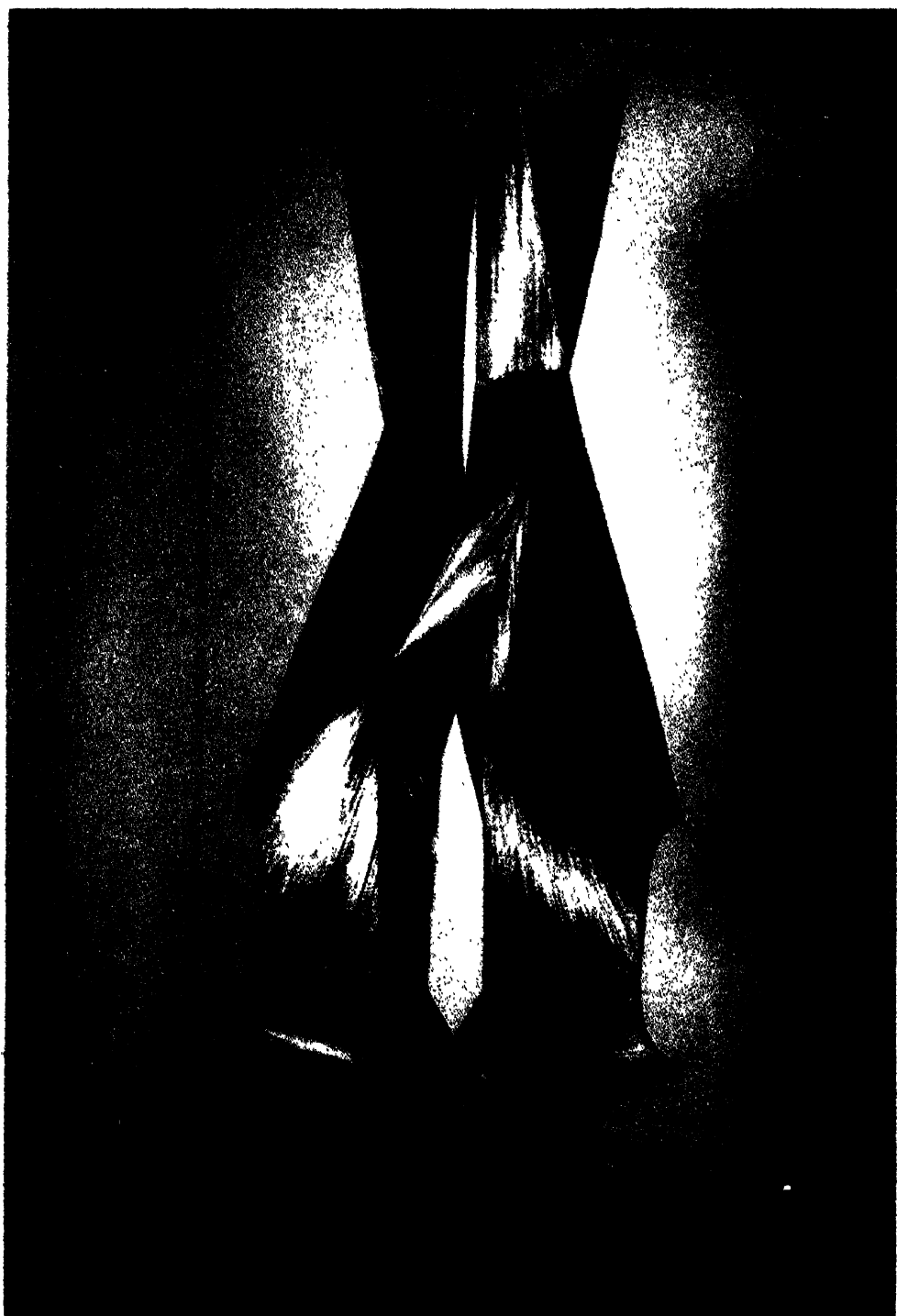
রঙিন ছবি ৩· আন্তন পেভসনার। কোলাম। ব্রোঞ্জ ও ব্রাস। ১৯৫২।

প্রকৃতি ও প্রতিকৃতির রূপায়ণমূলক শিল্পই থেকে গেল। কিন্তু যন্ত্র ও প্রযুক্তির যে মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ শক্তি ও গতি, একে কি করে চিত্র ও ভাস্কর্যে রূপ দেওয়া যায়, এই চিন্তা তাঁদের ভাবিত করল। ইতালির উমবার্তো বোচ্চিওনি (১৮৮২—১৯১৬) ১৯১৩-তে গড়লেন 'ইউনিক ফর্মস অব কন্টিনিউইটি ইন স্পেস', যার মধ্যে চলমান মানুষ ও অমানবিক যন্ত্রের আদল ধরা রইল। ১৯১২-তে তিনি এক বৃদ্ধার মুখ গড়েছিলেন—যার নাম 'অ্যান্টি-গ্রেসফুল'। কিউবিজম থেকে পাওয়া তলবিন্যাসের এক সংঘাতময় সংক্ষুব্ধ অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে এই মুখাবয়বে। রেমন্ড ডুচাম্প ভিলোঁ-এর (১৮৭৬—১৯১৮) ১৯১৪-র 'হর্স'-এর মধ্যে ঘোড়ার আদলের বিশেষ কিছু মিল নেই, বরং মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর কোনো মেসিনটুল-এর সঙ্গেই এর সাযুজ্য বেশি। এইভাবে আলেকজান্ডার আর্চিপেঙ্কো, জিয়াকোমো বালা, কুর্ট সুইটার্স, জঁা আর্প, ম্যাক্স আর্নস্ট প্রমুখ ভাস্কররা ১৯১২ থেকে ১৯২০-র মধ্যে এমন সব কাজ করছিলেন যাব মধ্য দিয়ে গতি ও যান্ত্রিকতা দৃষ্টিগ্রাহ্য ত্রিমাত্রিকতার রূপ নিচ্ছিল। এই গতি ও যন্ত্রের সমর্থনে ফিউচারিস্টরা এক সময় যুদ্ধের সমর্থনের দিকেও এগিয়ে যান এবং ক্রমে ফ্যাসিজমের ছত্রছায়ায় গিয়ে দাঁড়ান।

প্রতিবাদের আর একটা ধরণ কিউবিজম, ফিউচারিজম হয়ে দাদাইজম-এ গিয়ে পৌঁছল। অর্থাৎ আর্ট ক্রমান্বয়ে অ্যান্টি-আর্টের দিকে চলে গেল। দাদাবাদী শিল্পী শিল্পের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় এমন বস্তুকেই তুলে এনে সাজিয়ে শিল্পে উন্নীত করতে চাইলেন। মারসেল ডুচাম্প (১৮৮৭—১৯৬৮) ১৯১৫-তে একটা কাজ দেখালেন 'ইন অ্যাডভান্স অব আ ব্রোকেন আর্ম'। এটি অতি সাধারণ বালি বা বরফ তোলার বেলচা মাত্র। চওড়া ধাতব পাত, সঙ্গে একটি লম্বা কাঠের হাতল, সাধারণ বেলচা যেমন হয়। এই অশিল্পকে শিল্প করে তোলার মধ্যে তীব্র এক ধরণের প্রতিবাদী চেতনাই কাজ করে।

৩৫. এডগার দেগা · গার্ল ড্যান্সার অ্যাট ফোর্টিন। ১৮৭৯-৮১।

৩৬· *হেনরি মাতিস। দা ব্যাক-১। ১৯০৯।*

৩৭· *হেনরি মাতিস। দা ব্যাক-৪। ১৯২৯।*

দাদাবাদের প্রভাব কিন্তু কখনোই একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। বরং ষাটের দশকের পর থেকে ইওরোপ, আমেরিকায় অর্থনৈতিক চূড়ান্ত বৈভবের ফলে তথাকথিত পেলব নান্দনিকতার শিল্পের গতানুগতিকতার প্রতি অনীহা যত বাড়তে থাকে ততই দাদাবাদ-অনুপ্রাণিত অ্যান্টি-আর্ট বা আনান্দনিকতার শিল্পের চর্চা প্রসারিত হয়। আজকেও একটি সাধারণ কাঠ বা ধাতুর টুকরোকে আর একটির উপর দাঁড় করিয়ে তাকে ভাস্কর্য বলছেন, এমন শিল্পীর অভাব নেই। এপথেই ক্রমে উত্তর-আধুনিকতার আবির্ভাব।

সৃজনশীল যন্ত্র-প্রযুক্তি বা ক্রিয়েটিভ এঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন থেকে উদ্ভূত একটি প্রত্যয়। ইটালিতে ফিউচারিস্ট শিল্পীদের চর্চায় এরই একটা বিবর্তন যেমন আমরা দেখলাম, তেমনি এর আর একটি প্রকাশ দেখা গেল কনস্ট্রাকটিভিস্টদের চর্চায়। ১৯১৪-র পর থেকে মস্কোতে কিছু শিল্পী কনস্ট্রাকশন বা গঠনধর্মী ভাস্কর্যের চর্চা শুরু করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ভ্লাদিমির টাটলিন (১৮৮৫—১৯৫৩), কাসিমির মালেভিচ, ফিলোনাভ, ল্যারিওনোভ, রডচেঙ্কো, পেভসনার ও নউম জাবো প্রমুখ। এইসব শিল্পী নানা ধরণের গাঠনিকতা-সম্পৃক্ত কাজ করছিলেন যা রিপ্রেজেন্টেশনাল বা প্রতিমা রূপায়ণধর্মী কাজের থেকে একেবারেই আলাদা। ১৯১৯-২০-তে টাটলিনের 'মনুমেন্ট টু দা থার্ড ইন্টারন্যাশনাল' নামে সুউচ্চ কাজটি প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও এক বিস্ময়। নিউ ইয়র্কের স্টেট এম্পায়ার বিল্ডিং-এর দ্বিগুণ উচ্চতার এই স্তম্ভটি কাচ ও লোহা দিয়ে তৈরি। কনস্ট্রাকটিভিজমের আন্দোলন মস্কো থেকে ক্রমান্বয়ে ইওরোপে, এবং পরে প্রায় সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়ে।

কনস্ট্রাকটিভিজমের কোনো কোনো শিল্পী মানবিক প্রতিমার রূপায়ণও করেছেন। যেমন আন্তন পেভসনার-এর ১৯২৪-২৫-২৬-এর কিছু কিছু কাজ আছে যেখানে মানুষের মূর্তির আদল তিনি রেখেছেন। কিন্তু মাধ্যম ও নির্মাণের কৌশলের অভিনবত্ব এগুলিকে স্বতন্ত্র প্রত্যয়ে সঞ্জীবিত করেছে। কনস্ট্রাকটিভিজম ভাস্কর্যের মাধ্যমেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনল। সরু তার, কাচ জাতীয় স্বচ্ছ পদার্থ খুব সহজভাবে ব্যবহৃত হতে লাগল। ত্রিমাত্রিক আয়তনময়তা যে ভাস্কর্যের প্রচলিত সংজ্ঞা ছিল এতদিন, সেই সংজ্ঞায় এখন আর ভাস্কর্য সীমাবদ্ধ থাকল না। স্পেস বা স্থানিক শূন্যতাও হয়ে উঠল ভাস্কর্যের অনিবার্য মাত্রা। আন্তন পেভসনার, নউম জাবো, লাজলো মোহোলি-নাগি প্রমুখ শিল্পীর রচনাগুলি বিমূর্ততা ও স্থানিক শূন্যতার নন্দনময় সৃজনে অসামান্য অবদান রাখল। আমাদের দেশেও আজকের ভাস্কর্যে এই বিমূর্ততার রীতির প্রগাঢ় ভূমিকা আছে। এবং এটা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

তিন

রূপের নির্যাস ও প্রাণ

ধনতন্ত্র, যন্ত্র, প্রযুক্তি ভাস্কর্যের চরিত্রে যতই পরিবর্তন আনুক, যতই বিমূর্ততা, নিরাবেগ গাঠনিকতা ও বিমানবিকতার দিকে নিয়ে যাক, পাশাপাশি গভীর মানবতা-সম্পৃক্ত জীবন্ময়তার একটা ধারা সঞ্জীবিত রয়েছে, এবং তার প্রভাবও সমান ক্রিয়াশীল থাকছে। এই সৃষ্টিতে প্রাণ যে সর্বব্যাপী এই বোধ আদিম কাল থেকেই মানুষকে শিল্প সৃজনে উদ্বুদ্ধ করেছে। আদিম মানুষ সর্বচরাচরকেই প্রাণময় দেখত। এমনকী জড়বস্তুও তাঁদের কাছে অর্থহীন নিষ্প্রাণ মনে হত না। জড়ে জীবনের ও লৌকিকে অলৌকিকের আরোপ আদিম মানুষের শিল্পকে এমন এক প্রগাঢ় অভিব্যক্তি ও ভাবাবেগে সমৃদ্ধ করে, যা আধুনিকের যান্ত্রিক ও জড়-পরিবৃত জীবনে অন্তহীন প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। আধুনিকতা তাই আদিম শিল্পের কাছ থেকে সব সময়ই অনাবিলভাবে গ্রহণ করেছে। কিউবিজম বা ঘনকবাদের সূচনায় আদিম শিল্পের যেমন প্রগাঢ় ভূমিকা ছিল, তেমনি এই আদিমতার প্রেরণাই এক্সপ্রেশনিজম বা অভিব্যক্তিবাদের শিল্পরীতির প্রবর্তনে সাহায্য করেছে।

মানুষের দৈনন্দিনের যে পার্থিব জীবন, সেই জীবনের ভিত্তিতেই ও সেই জীবনকে কেন্দ্র করেই উন্মীলিত হয় তার আর এক সত্তা, মাটিতে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে আকাশের দিকে মেলে ধরে। এটা একই সত্তার দুই ভিন্ন প্রকাশ নয়, এই দ্বৈততা সত্তারই অন্তর্নিহিত এক সম্পৃক্ত স্বরূপ। ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্যেও আমরা লৌকিকের মধ্যে এই অলৌকিকের প্রকাশ দেখেছি। প্রাচ্য শিল্পের এটা একটা বৈশিষ্ট্য, পাশ্চাত্য শিল্প বিশেষত গ্রিক ও রেনেসাঁসের ধ্রুপদী শিল্প যা কখনো আয়ত্ত করতে পারে নি। সক্রেটিস কথিত আত্মার প্রতিফলনে উদ্ভাসিত শরীরের যে শিল্প, গ্রিসীয় উন্মীলনের সেই চূড়ান্ত পর্যায়েও দেহই আদর্শায়িত হয়েছে, স্বর্গীয় বিভায় উদ্ভাসিত হয়েছে, কিন্তু লৌকিক ও অলৌকিক পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে তৃতীয় এক সমন্বিত সত্যে উত্তীর্ণ হয় নি, যে বৈশিষ্ট্য আমরা মথুরার বুদ্ধে বা কোনারকের সূর্য মূর্তিতে অনুভব করতে পারি।

প্রক্সিটিলিসের (গ্রিসীয়) 'ডিওনিসাস', মাইকেল এঞ্জেলোর 'ডেভিড', ভাস্কর্যের সফলতার যে আকাশ-সীমা স্পর্শ করে, সেখানে বাস্তবতাও এত স্বর্গীয় ও আকাশচারী হয়ে যায় যে ইওরোপীয় ভাস্কর্যে মাইকেল এঞ্জেলোর পরে প্রায় তিনশ বছর ধরে একটা শূন্যতা বিরাজ করছিল যেখানে বাস্তবতাকে তার প্রকৃত স্বরূপে চিনে নেওয়া যাচ্ছিল না। রদাঁর 'ব্রোঞ্জ-এজ' সেই সমস্যারই প্রথম একটা সমাধান দিয়েছিল। পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতায় নতুন বলে, তাঁদের কেবলই মনে হচ্ছিল 'ব্রোঞ্জ-এজ' বুঝি শিল্প নয়, বাস্তবের অনুকৃতি। বাস্তবতার এই সমস্যার সমাধান হলেও রেনেসাঁস-উত্তর পাশ্চাত্য ভাস্কর্যে বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়হীনতার একটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছিল। আদিম শিল্প ও প্রাচ্যের ধ্রুপদী শিল্পে যে সমন্বয় খুবই সহজ ও স্বাভাবিক, পাশ্চাত্যের শিল্পী যখন বাস্তবতা-সম্পৃক্ত সেই আধ্যাত্মিকতায় পৌঁছতে চাইলেন তাঁকে নিজের ভিত্তির উপর আদিম ও প্রাচ্যের এই দুই উৎসকে মেলাতে হল। এর ফলে আমরা পেলাম জীবন্ময়তার (ভাইটালিস্টিক) ভাস্কর্যের একটি ধারা, কনস্টানটিন ব্রাঁকুসি ও হেনরি ম্যুর যার দুই প্রধান প্রবক্তা। এছাড়া এ ধারায় আনা যায় মদিগলিয়ানি, বা জিয়াকোমেত্তি ও জন মিরোর মতো সুর্রিয়ালিস্ট রীতির ভাস্করকেও। আমাদের সমকালীন ভারতীয় ভাস্কর্যে এই জীবন্ময়তার ধারা গভীর ভাবে প্রবাহিত।

কনস্টানটিন ব্রাঁকুসি (১৮৭৬—১৯৫৭) জন্মসূত্রে রুমানীয়। ১৯০৪-এ প্যারিসে আসেন। রদাঁর সঙ্গে দেখা হলে রদাঁ তাঁকে তাঁর অধীনে কাজ করতে বলেন। ব্রাঁকুসি এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মনে হয়েছিল অত বড় শিল্পীর সান্নিধ্য তাঁর নিজস্ব প্রকাশরীতিতে ব্যাঘাত ঘটাবে। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন, নইলে আধুনিক ভাস্কর্যের একটি বিশেষ ধারার প্রকাশ হয়তো সম্পূর্ণ হত না।

ব্রাঁকুসি ভাস্কর্যের রূপাবয়বে নির্ভার সরলতা এনেছিলেন, প্রায় শিশুর সারল্য। তিনি বলতেন, "যখন আমরা শিশু থাকি না, তখন আমাদের জীবনও স্তব্ধ হয়ে যায়।" কিন্তু শিশুর মতো কেবল সারল্যই তাঁর সরলতার লক্ষ্য ছিল না। তাঁর মত ছিল, "সারল্যই শিল্পের শেষ কথা নয়, বাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপে পৌঁছাতেই একজন শিল্পীকে সরল হতে হয়।" প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে রূপের সারাৎসারে পৌঁছায়। সমুদ্রের জল ও বায়ুর ঘর্ষণে একটি নুড়ি পাথর তার নির্দিষ্ট রূপ

৩৮· *পিকাসো। হেড অব আ উওম্যান। ১৯০৯-১০।* *পিকাসো। স্টিক স্ট্যাচু। ১৯৩১।*

পায়। একটি ডিম—ডিম হয়ে ওঠে মাতৃজঠরের ও নিষ্ক্রমণ পথের নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত চাপ ও তাপে। এই স্বতঃস্ফূর্ততার আদলটির কাছে পৌঁছতে হলে একজন শিল্পীকে তাঁর জ্ঞান ও অহমিকার সমস্ত ভার ঝেড়ে ফেলে প্রকৃতির সামনে নতজানু হয়ে ধ্যানমগ্ন হতে হয়। ব্রাঁকুসি প্রকৃতির সেই নিহিত সরল ছন্দটি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

৪০,৪২ তাঁর ১৯০৮-এর 'দ কিস' একটিই আয়তঘনকাকার পাথর মাত্র। কয়েকটি সরলরেখার আঁচড় তাতে আলিঙ্গনবদ্ধ নর নারীর সংবেদনময় চুম্বনের প্রতিমা রচনা করেছে। ১৯১৯-এর 'বার্ড-ইন-স্পেস' নামে ব্রোঞ্জটি ব্রোঞ্জই শুধু। শুরুর বিন্দু থেকে দৈর্ঘ্য বরাবর আয়তনে স্ফীত হতে হতে আবার শূন্যেই বিলীন হয়ে গেছে। আমেরিকার কাস্টম এটিকে ভাস্কর্য হিশেবে মানতেই চায় নি। ধাতু হিশেবে শুল্ক ধার্য করেছে। ব্রাঁকুসি সারা জীবনে খুব বেশি কাজ করেন নি। কিন্তু যে কটি করেছেন তাতে শিল্পশুদ্ধি এতই অবিসংবাদিত যে আধুনিক ভাস্কর্য তাঁর কাছ থেকে প্রকাশের এক নতুন দর্শন অর্জন করেছে।

ব্রাঁকুসির 'স্লিপিং মিউজ' নামে দুটি কাজ আছে, দুটিই পাথরের। প্রথম রূপটি ১৯০৬-এ করা। চারপাশে না কাটা পাথরের অমসৃণতা থেকে ঘুমন্ত একটি নারীর মুখ উদ্ঘাটিত হচ্ছে। ১৯০৯-১০-এ করা দ্বিতীয়টিতে এই ঘুমন্ত নারীর মুখ সম্পূর্ণ ডিম্বাকৃতি পেয়েছে। যেন সৃষ্টির আদি রূপ। ব্রাঁকুসি এই ডিম্বাকৃতির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের সুপ্ত আদল দেখতেন। এটা হয়তো খানিকটা প্রাচ্যদর্শন প্রভাবিত। ভারতীয় ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কিত এই প্রত্যয়কে তাঁর ভাস্কর্যে ব্যবহার করেছিলেন

আমাদের প্রদোষ দাশগুপ্ত।

মদিগলিয়ানির (১৮৮৪—১৯২০) ভাস্কর্যেও এই ডিম্বাকৃতি রূপের সারল্য খুব বেশি ব্যবহার হয়। মূলত চিত্রকর ইটালীয় মদিগলিয়ানি ১৯০৬-এ প্যারিসে এসে ব্রাকুসির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ হন। এই বন্ধুত্বের প্রেরণা তাঁর শিল্পেও হয়তো ব্রাকুসীয় পরিমণ্ডল আনতে সাহায্য করে। কিন্তু তাঁর যে ছিল প্রগাঢ় নিজস্বতার বোধ, নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত হত সেখান থেকেই। ফলে আদিম নিগ্রো শিল্পের প্রভাবকে যখন তিনি নিজের কাজে গ্রহণ করেন, তখনো তিনি বেছে নেন সংস্কৃদ্ধতার থেকে নিষ্পাপ সারল্যের প্রতিমূর্তিই। তাঁর যে কোনো একটি নারী মুখাবয়বের সঙ্গে আইভরি কোস্ট-এর কোনো প্রত্নমুখোশের তুলনা করলে এই সাযুজ্য ধরা পড়ে।

ব্রাঁকুসির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে হেনরি ম্যুর (১৮৯৮—১৯৮৬) একবার বলেছিলেন, গথিক থেকে ইওরোপীয় ভাস্কর্য কেবল আগাছা জড় করে করে কলেবরে স্ফীত হয়েছে, যে স্ফীতির তলায় শুদ্ধ রূপ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গিয়েছিল। ব্রাকুসির ব্রত ছিল ভাস্কর্যকে এই অনাবশ্যক স্ফীতি থেকে মুক্ত করে রূপের সারাৎসারকে উন্মোচিত করা। এটা করতে গিয়ে তিনি প্রায় রূপের এককে পৌঁছে গিয়েছিলেন। হেনরি ম্যুর রূপের শুদ্ধ এককের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাকে প্রসারিত করেছেন জীবনের ক্ষয়, শূন্যতা, বঞ্চনা, বিমানবিকতা, ও আকাশের আলোর সত্যকে আত্মস্থ করার দিকে।

হেনরি ম্যুর জন্মগ্রহণ করেন ইংলন্ডে ইয়র্কশয়ারের ক্যাসলফোর্ডে ১৮৯৮ সালের ৩০ জুলাই। ইয়র্কশায়ার ছিল ইংলন্ডের কয়লা খনি অঞ্চল। হেনরির পিতা রেমন্ড স্পেনসার ম্যুর কয়লাখনিতেই কাজ করতেন। হেনরি ছিলেন তাঁর আট ভাইবোনের মধ্যে সপ্তম। তাঁর শৈশব খুব সমৃদ্ধির মধ্যে কাটে নি। কিন্তু পারিবারিক একটা হার্দ্য পরিমণ্ডলের মধ্যে

৪০· কনস্তান্তিন ব্রাকুসি। বার্ড। ১৯১২।

৪১· হেনরি ম্যুর। রিক্লাইনিং ফিগার। ১৯২৯।

তিনি বড় হয়েছেন। একদিকে এই সৌহার্দ্যময় পারিবারিক পরিমণ্ডল, অন্যদিকে কয়লাখনির শ্রমনিষ্ঠ, দারিদ্র্যময় সংস্কৃতার পরিবেশ, শৈশবে তাঁর অনুভূতিকে যেভাবে গড়েছিল, তাঁর ভাস্কর্যের রূপকল্পনাকে তা বরাবরই নিয়ন্ত্রণ করেছে।

যে আদিমতা বা প্রিমিটিভিজম তার শক্তি ও সৌন্দর্যের উৎস শৈশবের সেই পরিমণ্ডল ছাড়াও আরো কয়েকটি উত্তরাধিকার কাজ করেছে এর পেছনে। তাঁর আগে ব্রিটিশ ভাস্করদের মধ্যে গদিয়ের ব্রজেসকা মাত্র ২৬ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে প্রিমিটিভিজমের রূপকল্পে ভাস্কর্যের নিজস্ব ভাষা গড়ে দিয়েছিলেন। কবি এজরা পাউন্ড তাঁকে নিয়ে বই লিখেছিলেন ১৯১৬-তে। ম্যুরের হাতে সে বই এসেছিল সম্ভবত ১৯২২ বা ২৩-এ। সে বইতে পাউন্ডের একটি মন্তব্য ভাস্কর্যের আধুনিকতা প্রসঙ্গে খুবই সুপ্রযুক্ত। "আমরা আবার একটি যুগে পৌঁছেছি যখন মানুষ একটি মূর্তিকে মূর্তি হিশেবেই দেখতে পারে। কঠিন পাথরের জীবন নেই। এর সৌন্দর্য জীবনের সৌন্দর্যের থেকে আলাদা।" ব্রজেসকার এই দর্শনকে ম্যুর আরো প্রসারিত করেছিলেন তাঁর কাজে। আর তাঁর দেশের গণ্ডির মধ্যে ছিলেন জ্যাকব এপস্টাইন (১৮৮০—১৯৫৯), যিনি জন্মেছিলেন নিউ ইয়র্কে, ১৯০২-তে গিয়েছিলেন প্যারিসে, আর ১৯০৫ থেকে ইংলন্ডেই বসবাস করছিলেন। তাঁর কাজেও ছিল আদিমতার প্রগাঢ় প্রভাব। এই সমস্ত উত্তরাধিকারের সঙ্গে ম্যুরের ছিল শৈশবে দেখা ইয়র্কশয়ারের চার্চে একাদশ শতকের মূর্তির স্মৃতি, যার সঙ্গে পরবর্তীকালে মিল পেয়েছিলেন মেক্সিকোর অ্যাজটেক ভাস্কর্যের।

১৯২২-এ করা তাঁর একেবারে প্রস্তুতি পর্বের একটি কাজ দেখেছিলাম আমরা ১৯৮৭-র দিল্লির প্রদর্শনীতে। মার্বল পাথরে ছোট কাজ। উচ্চতা মাত্র ১৭·২ সেমি। একটি কুকুর উপর থেকে নীচের দিকে মুখ বাড়িয়ে আছে। গঠন অনেকটা জ্যামিতিক। শরীরের এক একটি মসৃণ তল অন্য তলের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান করে তীক্ষ্ণ কোণ তৈরি করেছে। আক্ষরিক অর্থেই ঘনকবাদী গঠনভঙ্গি। আর অভিব্যক্তিতে সুন্দর একটি প্রাণীর জন্য সস্নেহ কৌতুকের প্রকাশ। সূচনাপর্বে এই কিউবিজমের উত্তরাধিকার আত্মস্থ করে হেনরি ম্যুর ক্রমশ আদিমতার সংহত অভিব্যক্তির তীব্রতার দিকে নিজেকে প্রসারিত করেছেন।

১৯২২ থেকে ১৯৮৬-তে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ম্যুরের ভাস্কর্যকে যদি আমরা কয়েকটি প্রবণতায় ভাগ করে বুঝতে চাই, তা হবে অনেকটা এরকম। প্রথম পর্বে ১৯২২ থেকে ৩০ পর্যন্ত তাঁর কাজে পাওয়া যায় মাতৃতান্ত্রিক ধ্রুপদী প্রত্নতার রূপ। দ্বিতীয় পর্বে ১৯৩০ থেকে ৪০ পর্যন্ত সময়ে ভেঙে যেতে থাকে মূর্তির এই সম্পূর্ণতা। শরীর ভেদ করে, শরীরের আয়তনময়তা ভেঙে এ পাশের শূন্যতার সঙ্গে মিলে যেতে থাকে ও পাশের শূন্যতা। সৃষ্টিময় যে মাতৃপ্রতিমা তা একদিকে যেমন নিসর্গের উত্তলতা অবতলতায় বিস্তীর্ণ হতে থাকে, তেমনি সেই ব্যাপ্তির মধ্যে যেন জাগতে থাকে অজানা আশঙ্কা। প্রাগৈতিহাসিক আদিম মানুষের দুর্মর ভয়ের প্রতীকে আভাসিত হতে লাগল সমাগত এক ভাঙাবিশ্বের বিমানবিকতার সম্ভাবনা। ১৯৪০ থেকে ৫৩ পর্যন্ত তাঁর তৃতীয় পর্বে আমরা পাই বিধ্বস্ত পৃথিবীর তীব্রতম এক প্রতিবাদী শিল্পীকে, যিনি মানুষের সমগ্র সম্ভাবনায় বিশ্বাস হারিয়ে যেন হয়ে উঠছেন সেই বিমানবিকতার প্রতিবাদী ভাষ্যকার। যার পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে ওঠে ১৯৫২-৫৩-র 'রাজা ও রানী' বা 'মা ও শিশু' ভাস্কর্যে। তারপর থেকে সেই ধ্বস্ত পোড়া জমিতে, সেই ভাঙা বিশ্বে জাগতে থাকে নতুন এক মানবতার চেতনা। এই ধ্বংসকে, এই তমসাকে সত্য জেনেও জীবন ক্রমশই আকাশের দিকে মাথা তুলতে থাকে। নেতির সমস্ত চেতনাকে আত্মস্থ করেই সদর্থকতার দিকে জেগে উঠতে থাকে হেনরি ম্যুরের মানুষ। মানবতার এই বীরদর্পী জয় ঘোষণাতেই হেনরি ম্যুরের শ্রেষ্ঠত্ব। এ কাজ যে তিনি করতে পারলেন সময়ের সমগ্র কলুষকে আত্মস্থ করে, ইওরোপের ভাস্কর্যের আধুনিকতার উত্তরাধিকারে এটাই তাঁর নিজস্ব সংযোজন। আর এজন্যই তিনি মহৎ শিল্পী।

৪১

ব্রাঁকুসি ও হেনরি ম্যুর দুজনের স্বতন্ত্র প্রয়াসে ভাস্কর্যে বিষয়ের ও প্রকাশভঙ্গির গতানুগতিকতা ভেঙে গেল। দাদাবাদী শিল্পীরা ভাঙতে পেরেছিলেন মাধ্যমেরও গতানুগতিকতা। এই মুক্তি সুররিয়ালিস্ট শিল্পীদের নিয়ে গেল শিল্পের উপর সচেতন মনের নিয়ন্ত্রণকেও আলগা করার দিকে। হেনরি ম্যুরের অনেক ভাস্কর্যেও সুররিয়ালিজমের অনুষঙ্গ ধরা পড়েছে। সুররিয়ালিজম নিয়ে ভাস্কর্যে চূড়ান্ত কাজ করেছেন জিয়াকোমেত্তি, ম্যাক্স আর্নস্ট বা জন মিরোর মতো শিল্পী।

আন্দোলন হিশেবে সুররিয়ালিজমের শুরু ফ্রান্সে ১৯২৪-এ। ১৯২৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল আঁন্দ্রে ব্রেঁতর সুররিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টো, তাতে তিনি সুররিয়ালিজমের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন 'সাইকিক অটোমেটিজম' বলে। চেতনার

৪২· কনস্তান্তিন ব্রাকুসি। মদমোয়াজেল পোজানি। ১৯১৩।

নিয়ন্ত্রণমুক্ত এক স্বপ্ন-তাড়িত অবস্থা থেকে উঠে আসে প্রতিমাকল্প, তাকেই শিল্পী সাজিয়ে নেন নান্দনিক অনুষঙ্গে। আবহমানের শিল্পের ঐতিহ্য থেকেই প্রেরণা নিয়েছিলেন সুররিয়ালিস্টরা। যেখানেই আত্মিক অসন্তোষ থেকে বাস্তবতার অনড় অবয়বকে ভেঙে নতুন সত্যের জন্য আর্তি ধ্বনিত হয়েছে, তাকেই অনুধাবনের যোগ্য ভেবেছেন তাঁরা। প্রাণিত হয়েছেন তা থেকে। সুররিয়ালিস্টরা তাই তাঁদের পূর্বসূরি বলে মনে করেন ড্যুরারের কোনো কোনো কাজকে, হিয়েরোনিমাস বচ বা গোইয়ার মতো শিল্পীকে।

ভাস্কর্যের এতদিনের যে বিবেচ্য বিষয় ছিল আয়তন, জিয়াকোমেত্তি (১৯০১-৬৬) সেই প্রত্যয়কেই নস্যাৎ করে দিলেন। শূন্যতার স্বরূপ তাঁকে তাড়িত করেছে আজীবন। দুটি নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্তী যে শূন্যতা তাকে মনে হত সাহারার মতো রহস্যময়। তাই ভাস্কর্যের আর এক সংজ্ঞা ছিল তাঁর কাছে শূন্যের মধ্যে আঁকিবুঁকি কাটা, শূন্যের মধ্যে আলোড়ন তোলা। তাঁর ১৯২৮-২৯-এর কিছু কিছু ভাস্কর্য দেখি সেখানে তিনি আয়তন ও শূন্যতার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু ১৯৩২-৩৩-এ তিনি একটি অদ্ভুত কাজ করলেন, যার নামকরণ হল 'দ্য প্যালেস অ্যাট ফোর এ এম'—ভোর চারটের প্রাসাদ। সেখানে কিছু প্লেট ও কিছু রড দিয়ে গড়েছেন অদ্ভুত এক বাড়ির আদল—যাতে ঘরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে খাঁচায় বদ্ধ এক শিরদাঁড়া, ছাদের উপরে বর্গাকার চতুষ্কোণে উড়ন্ত একটি পাখি, যেন শুধু হাড় দিয়ে তৈরি। জিয়াকোমেত্তি নিজে বলেছেন এই কাজটি সম্পর্কে যে তিনি ও তাঁর এক বন্ধু দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে অদ্ভুত এক প্রাসাদ তৈরি করতেন— "আমি জানি না কেন এর মধ্যে বাস করতে এল খাঁচায় বদ্ধ একটি মেরুদণ্ড, যে মেরুদণ্ডটি এক নারী আমাকে বিক্রি করেছিল··· এবং একটি হাড়ের পাখি যেটি সেই নারী সে-রাতেই দেখেছিল, যে-রাতে আমাদের জীবন একসঙ্গে শেষ হল, সেই হাড়ের পাখি ছাদহীন সেই হলঘরের উপরে উড়ছিল—ভোররাতে চারটেয়।" তাঁর এই উক্তির মধ্যেও রয়েছে সুররিয়ালিস্ট কবিতার অনুষঙ্গ। পরিত্রাণহীন যে শূন্যতার সত্তা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন জিয়াকোমেত্তি তাই আরো পরিপূর্ণ আদল পেল ১৯৪৮-৪৯-এ করা 'সিটি স্কোয়ার'-এর মতো ভাস্কর্যে, সেখানে এক শূন্য জমিতে নিঃসঙ্গ নিরালম্ব দাঁড়িয়ে আছে যেন সরু তারের তৈরি আয়তনহীন শুধু দৈর্ঘ্যময় চারটি মানুষ। এক নিঃসীম শূন্যতায় তাঁরা যেন উদ্ঘাটিত করতে চাইছে আত্মপরিচয়। শূন্যতাও যে বিষয় হতে পারে ভাস্কর্যের এরকম একটা অসম্ভবকে সম্ভব করার কৃতিত্ব জিয়াকোমেত্তির।

জন মিরো-ও (১৮৯৩-১৯৮৩) তাঁর ভাস্কর্যে ভিন্নধর্মী ফ্যান্টাসির চূড়ান্ত রূপ খুঁজেছেন। ফেলে দেওয়া, কুড়িয়ে পাওয়া সমস্ত অনান্দনিক বস্তু, যেমন ভাঙা পাত্র, শুকনো শিকড়, সেলুলয়েডের পুতুলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কাঠি, ইলেকট্রিক বেল, পাখির পালক, এই সমস্ত দিয়ে তিনি গড়ে তুললেন এক একটি ভাস্কর্য, তাতে করে একদিকে যেমন তা গভীরতর অর্থে অর্থান্বিত হত, তেমনি গড়ে উঠত বাস্তবতা নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র এক একটি সত্তা, শিল্পই যাদের প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যময় করে তুলতে পারে। এভাবে ভাস্কর্যের সামগ্রিক ধারণাই বিবর্তিত হয়ে গেল বিংশশতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে।

ভাইটালিজম বা জীবন্ময়তার ভাস্কর্যের এই যে বিশেষ একটি ধারা যেটা ব্রাঁকুসি, হেনরি ম্যুরে শুরু হয়ে বারবারা হেপওয়ার্থ, হানস আর্প অতিক্রম করে জিয়াকোমেত্তি, জারমেইন রিচিয়ার, থিওডোর রোজাক, জন মিরো, ম্যাক্স আর্নস্ট, লুসিয়ানো মিনগুজি, রেগ বাটলার, লিন চ্যাডউইক পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে তা একভাবে চৈতন্যের অনির্বচনীয় গভীর অন্ধকারকে স্পর্শ করেও জীবনের প্রতি আস্থা রেখেছে, মানবিক শরীরকে বা প্রকৃতির কোনো সত্তাকে ভিত্তি হিসেবে রাখতে চেষ্টা করেছে।

সম্ভবত এই পর্যন্ত আধুনিকতার সীমা। ষাটের দশকের পর থেকে ইওরোপ, আমেরিকায় যে নবীন প্রজন্ম তাঁরা আধুনিকতার এই সীমা বা সংজ্ঞাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন। উত্তর-আধুনিকতার এই নবীন শিল্পীরা আর্ট বা শিল্প কথাটাকেই আর মানতে চাইছেন না। তাঁরা ফাঁকা জমিতে কিছু পাথর জড়ো করছেন, অথবা দুটি বড় কাঠের টুকরোর একটিকে আর একটির উপর রাখছেন, বা কয়েকটি পেডেস্টাল পাখা বৃত্তাকারে সাজিয়ে, তাকেই বলছেন তাঁদের নির্মাণ অথবা সৃষ্টি। এর মধ্যে প্রাচ্য দেশগুলিতে এক নতুন চেতনা জাগছে। জাপানে বিশেষ করে, ইসামু নোগুচির ভাস্কর্যে আমরা যা দেখেছি, পাশ্চাত্যের আধুনিকতা ও প্রাচ্যের দর্শনের এক অভাবিত সমন্বয়, তার অসামান্য প্রসারণ ঘটছে নবীন শিল্পীদের কাজে।

মিশরের ও গ্রিসের অভিজ্ঞতা থেকে একদিকে ইওরোপ আর একদিকে ভারতীয় স্বরূপের প্রকাশকে সমকাল পর্যন্ত
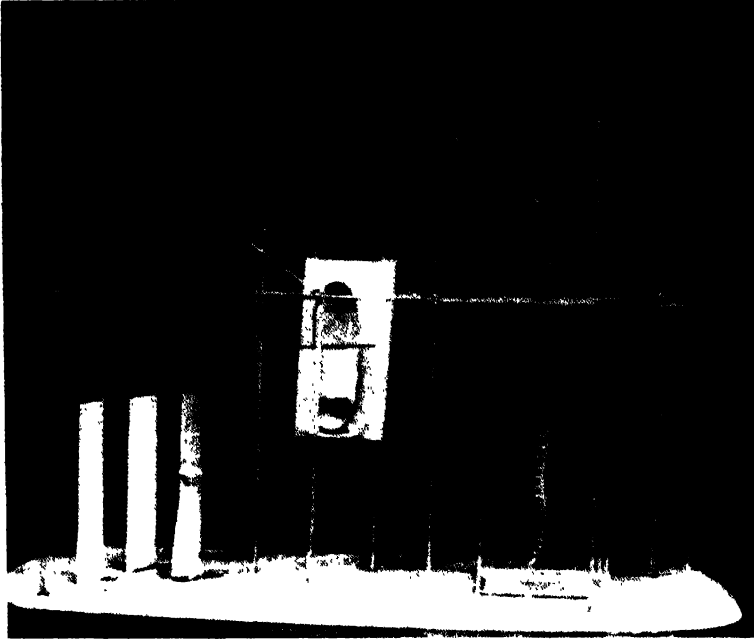
৪৩· আলবার্তো জিয়াকোমেত্তি। ভোর চারটের প্রাসাদ। ১৯৩২-৩৩।

অনুধাবন করে আমরা এখন ভেবে দেখতে পারি তাহলে কোন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় ভাস্কর্যের স্বরূপ ও তার আধুনিকতা।

চার

সংজ্ঞার সন্ধান

বেনভেনুটো সেলিনি (১৫০০-৭১) ছিলেন ষোড়শ শতকের ফ্লোরেন্সের একজন ভাস্কর। ইটালির রেনেসাঁসের অন্যতম পুরোধা শিল্পী। তিনি আরো প্রখ্যাত তাঁর আত্মজীবনীর জন্য। সে আত্মজীবনী থেকে আমরা তৎকালীন ভাস্কর্যের ইতিহাস, আঙ্গিক, প্রকরণ ও নান্দনিকতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। সেই সেলিনি লিখেছিলেন "রেখাচিত্র ভিত্তিক অন্যান্য যে কোনো শিল্প-কলা থেকে ভাস্কর্য আট গুণ মহৎ, কেননা একটি মূর্তি আট দিক থেকে দেখা যায় এবং এই আটটি দিকই সমান রসোত্তীর্ণ হতে হবে।" রেনেসাঁসের সব শিল্পী বা প্রবক্তাই যে তাঁর এই মত নির্দ্বিধায় মানতেন, তা অবশ্য নয়। সেটা ছিল জ্ঞানের যুগ, বুদ্ধির উৎকর্ষের যুগ। সে যুগের জ্ঞানী মানুষরা কায়িক শ্রমের থেকে মস্তিষ্ক-ভিত্তিক কাজকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। লিওনার্দো-দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) যেমন। ফলে তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল চিত্রকলার দিকেই। বলতেন একজন ভাস্করকে তো শ্রমিকের মতো পরিশ্রম করতে হয়। তাঁর মুখ পাথরের গুঁড়োয় ঢেকে যায়। আর পাথরের টুকরো এমনভাবে ছড়াতে থাকে চারদিকে যে মনে হয় যেন বরফের ঝড় উঠছে। তুলনায় ছবি আঁকা অনেক কঠিন। কেননা, তাতে চিন্তা, কল্পনা, বুদ্ধির প্রয়োজন অনেক বেশি।

হয়তো লিওনার্দোর সময়ের থেকে আর একটু এগিয়ে গিয়ে ভাস্কর্যের মর্যাদা কিছু বেড়েছিল, যে কারণে মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪) বা সেলিনির মতো ভাস্করের আবির্ভাব ঘটতে পেরেছিল। তবু গ্রিক সভ্যতায় ভাস্কর্যের যে মর্যাদা ছিল রেনেসাঁসের যুগে ততটা ছিল না। আর এই প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ফলেই হয়তো মাইকেল এঞ্জেলোর পর থেকে ইওরোপে ভাস্কর্যের অবনমন শুরু হয়। যে মর্যাদা ফিরে পেতে অপেক্ষা করতে হয় উনবিংশ শতকে রদাঁর আবির্ভাব পর্যন্ত।

এ সমস্তই হয়তো অসার ও অর্থহীন কথাবার্তা। এ থেকে প্রয়োজনীয় যেটুকু উঠে এল; তা হল এই যে ভাস্কর্য একটি

ত্রিমাত্রিক শিল্প এবং প্রভূত কায়িক পরিশ্রম সাপেক্ষ। চিত্র বা ছবির সঙ্গে এর পার্থক্য হল, মূলত—ছবি দ্বিমাত্রিক, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমন্বিত কোনো সমতল ক্ষেত্রে বা পটের উপর তার অবস্থিতি। সেই পটের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে রং ও রেখায় সাজিয়ে তোলাই ছবির উদ্দেশ্য। তার বেধ বা উচ্চতা বলে কোনো তৃতীয় মাত্রা থাকে না। কিন্তু ছবিতে এই তৃতীয় মাত্রার ইলিউশন বা বিভ্রম আনার চেষ্টা করা হয়। ইওরোপে রেনেসাঁসের সময় থেকে শিল্পী ছবিতে এই ত্রিমাত্রিকতার বৈশিষ্ট্য আনার জন্য বৈজ্ঞানিকভাবে নিজেদের সমৃদ্ধ করেন। এবং এতে তাঁরা এত পারদর্শী হয়ে ওঠেন যে ভাস্কর্যের ত্রিমাত্রিকতাকে তাঁদের কাছে নিষ্ফল মেধাহীন শ্রম বলে মনে হয়। আধুনিক যুগে ছবিতে যখন তথাকথিত ত্রিমাত্রিকতায় বাস্তবের বিভ্রম আনার চেষ্টাকে অর্থহীন ও বাহুল্য বলে মনে করেন শিল্পীরা, তখন কিন্তু তাঁরা আবার আর একভাবে প্রকৃত ত্রিমাত্রিকতার দিকে চলে যেতে থাকেন। ইমপ্যাস্টো পদ্ধতিতে ছবিতে রং এত মোটা করে লাগানো

৪৪· মারসেল ডুচাম্প। ইন অ্যাডভান্স অব আ ব্রোকেন আর্ম। ১৯১৫।

হয় যে তা পটের সমতল থেকে বেধ-বিশিষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসে ত্রিমাত্রিকতার সৃষ্টি করে এবং নান্দনিকভাবেও তার একটা উপযোগিতা তৈরি হয়ে যায়। শুধু ইমপ্যাস্টো পদ্ধতিতে রং লাগানোই নয় ছবিতে বিশেষত কোলাজ জাতীয় ছবিতে অনেক সময় বালি, মোটা করে কাপড় বা পিসবোর্ডের টুকরো, লোহা বা অন্য কোনো ধাতব বা অধাতব পদার্থ সরাসরি চিত্রপটে আটকে দেওয়া হয়। ফলে ত্রিমাত্রিকতা সৃষ্টি হয়ে যায় ছবিতেও।

অন্যদিকে আবার ভাস্কর্য অনেক সময়ই আয়ত্ত করে চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য। শূন্যের উপর নিজের অস্তিত্বকে ত্রিমাত্রিকতায় মেলে ধরে যে পূর্ণাবয়ব ভাস্কর্য ইংরেজিতে যাকে বলে স্কাল্পচার ইন দ্য রাউন্ড, তা ছাড়াও আর এক রীতির ভাস্কর্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। যা কোনো একটা দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রের উপর সংবদ্ধ থাকে, দ্বিমাত্রিক
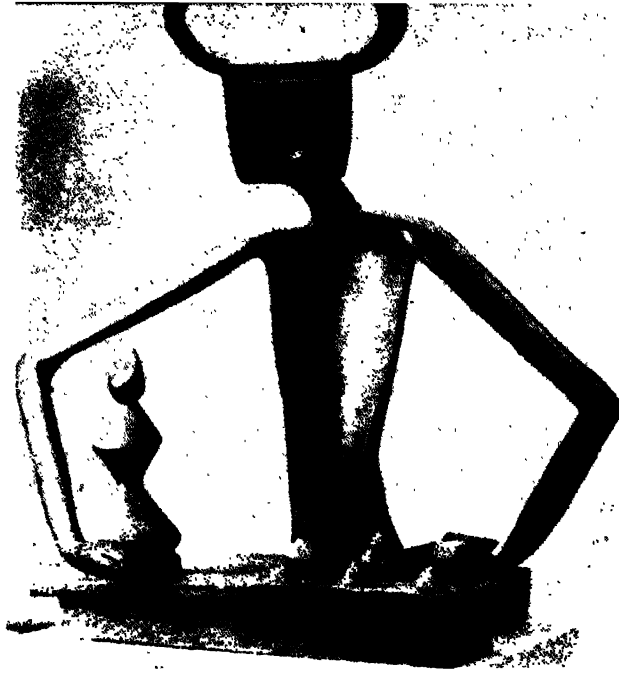
৪৫· ম্যাক্স আর্নস্ট। দ্য কিং প্লেইং উইথ দা কুইন। ১৯৪৪।

তলে স্থিত থেকে সামনের দিকে এগিয়ে আসে। একে বলে নতোন্নত পদ্ধতির ভাস্কর্য বা রিলিফ স্কাল্পচার। রিলিফ আবার দুই বা তিন রকম—লো-রিলিফ এবং মিডিয়াম ও হাই রিলিফ। হাই-রিলিফে মূর্তির একটি দিক সাধারণত পেছন দিকটি শুধু দেয়াল বা কোনো সমতল ক্ষেত্রের গায় সংবদ্ধ থাকে যেমন ভারতের অজস্র মন্দির গাত্রের ভাস্কর্য, কোনারক বা খাজুরাহো যার দৃষ্টান্ত হতে পারে। সেখানে মূর্তি আর তিন দিক থেকে দেখার নয় কিন্তু তাতে ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্যের সমস্ত গুণই থাকে। কিন্তু লো-রিলিফে পশ্চাৎপট থেকে মূর্তির বেধ খুবই কম থাকতে পারে, যেমন আমাদের বিষ্ণুপুরে মন্দির গাত্রের টেরাকোটার ফলকগুলি। রেনেসাঁসের ভাস্কর দোনাতেল্লোর ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দের 'দ্য অ্যাসেনশন অব ক্রাইস্ট' নামে রিলিফে বা ঘিবার্টির ১৪২৫-৪৭ খ্রিস্টাব্দের 'দ্য গেটস অব প্যারাডাইস'-এ নতোন্নত পদ্ধতিতে মূর্তিগুলি দেয়ালে এমনভাবে সংস্থাপিত হয় যে তাতে ছবির পার্সপেকটিভ বা ফোর-শর্টনিং রীতির পূর্ণ ব্যবহার অনুভব করা যায়। আমাদের ব্যারাকপুরের গান্ধিঘাটে সুনীল পালের করা গান্ধীজির জীবন নিয়ে যে রিলিফ প্যানেলগুলি আছে সেখানেও চিত্রের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায়।

কাজেরই দেখা যাচ্ছে চিত্র ও ভাস্কর্যের পার্থক্য অনেক সময়ই খুব কমে আসে। আমরা যদি কে জি সুব্রামনিয়ানের টেরাকোটা রিলিফগুলি দেখি—তাতে চিত্র এবং ভাস্কর্য দুয়েরই রস অনুভব করা যায়। মীরা মুখার্জি তাঁর ভাস্কর্যে এই সীমাকে অনেক কমিয়ে নিয়ে এসেছেন। রিলিফ না করেও পূর্ণাবয়ব ভাস্কর্যেও তিনি চিত্রের সম্পূর্ণ অনুষঙ্গ এনে ফেলতে পারেন।

এক্ষেত্রে তাহলে ভাস্কর্যের ত্রিমাত্রিকতার সংজ্ঞাটাই আর স্থির থাকছে না। চিত্রের সঙ্গে পার্থক্যের ক্ষেত্রটাও কমে আসছে ক্রমশ। তবু যত সংকুচিতই হোক এই তৃতীয় মাত্রা, সামান্য হলেও এর উপস্থিতি থাকে বলেই কোনো কাজ ভাস্কর্য বলে পরিচিত হয়। তার মধ্যে কিছুটা ম্যাস (mass) বা আয়তনের ব্যাপার থাকে, সেই আয়তনের বিভিন্ন অংশ বা তলের মধ্যে টানাপোড়েন বা আততির ব্যাপার থাকে। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সভ্যতায় ভাস্কর্যের মূলগত রসের পার্থক্যও সূচিত হয় এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। যেমন মিশরীয় ভাস্কর্যে যে সুস্থিত সময়হীনতার শীতল পরিমণ্ডল তা গড়ে ওঠে ভারী আয়তনময় তলবিন্যাসের শক্তি ও ঘনত্বে। রোমানেস্ক ভাস্কর্যে রৈখিক গতি বা রেখার চলনের একটা বড় ভূমিকা আছে। গ্রিক ভাস্কর্যের ড্র্যাপারি বা পরিচ্ছদ রূপায়ণে এই রৈখিকতার সুন্দর ব্যবহার দেখা যায়। মাইকেল

এঞ্জেলোর প্রতিভা স্ফুরিত হয় মার্বল কেটে বের করে আনা শরীরের পেশি বিন্যাসের বিস্ফারের সুস্থিত ভারসাম্যে। যেখানে রদাঁর যে মডেলিং তাতে ছোট ছোট তলপুঞ্জ আলোর প্রক্ষেপকে আত্মসাৎ ও প্রতিফলিত করে গতিময়তায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আবার আমাদের ধ্রুপদী ভারতীয় ভাস্কর্যে মূর্তির উপরিতল এমন সুষম সংস্থিতিতে বিন্যস্ত ও প্রবাহিত হয় যেন কেন্দ্র থেকে কোনো শক্তি নিঃসৃত হয়ে ক্রমান্বয়ে ভাস্কর্যের সমস্ত শরীরে নিজেকে প্রসারিত করে দেয়। এর বিপরীত অনুভূতি আসে কোনো নিগ্রো প্রত্ন ভাস্কর্য বা ঘনকবাদী কোনো আধুনিক ভাস্কর্যে। সেখানে তলগুলি পরস্পর সংঘাতময় কৌণিকতায় বিন্যস্ত থাকে।

আয়তনময় বলেই এসব বৈশিষ্ট্য ভাস্কর্যের রসগ্রহণে অন্যতম মাত্রা বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু তথাকথিত অর্থে এই আয়তনের ধারণাই যখন লুপ্ত হয়ে যায়? আধুনিক ভাস্কর্য এই আয়তনময়তাকেই প্রায় অস্বীকার করছে। বারবারা হেপওয়ার্থ বা রেগ বাটলার এমন ভাস্কর্য করেছেন যাতে ভল্যুম বা ম্যাস কিছু নেই। শূন্যস্থানের মধ্যে টান টান কিছু তারের পারস্পরিক আততিই তাঁদের বিবেচ্য। জিয়াকোমেত্তির যে 'ভোর চারটের প্রাসাদ' নামের কাজটি সেখানেই বা ভল্যুম কী আছে? জিয়াকোমেত্তি তাই তাঁর ভাস্কর্যের সংজ্ঞা স্থির করেছিলেন এ কথা বলে যে 'I whirl in void' শূন্যের মধ্যে আঁকিবুঁকি বা অন্য কোনো এক ভাস্কর যেমন বলেছিলেন 'a scribble in the air' সেটাই হতে পারে কি ভাস্কর্যের আধুনিকতম এক সংজ্ঞা?

আধুনিকতম? কথাটায় এসে আটকে যেতে হয়। কবেই কি কেটে যায় নি জিয়াকোমেত্তির কাল? এখন তো পারফরমেন্সও এসে যাচ্ছে ভাস্কর্যের মধ্যে। একজন প্রক্ষিপ্ত আলোতে বিশেষ ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো, সেটাই হল তাৎক্ষণিক এক ভাস্কর্য। অথবা শুধু কি প্রক্ষিপ্ত আলো দিয়েও তৈরি হচ্ছে ভাস্কর্য? কালগত স্থিতি, বা সময়ের একটা মাত্রা যে হতে পারে ভাস্কর্যের একটা বৈশিষ্ট্য—সেরকম কোনো স্থিরতাও তো আর থাকছে না।

তাহলে সংজ্ঞার সন্ধানে বেরিয়ে আমরা কি একেবারেই পথ হারিয়ে ফেললাম? সংজ্ঞার কোনো স্থিতি নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাও পালটে যায়। 'ভাস্কর্য' শব্দটির অভিধানিক অর্থ বলা হয়—'ধাতুপ্রস্তরাদি খোদিত করিয়া মূর্তি-গঠন-শিল্প'। এটি যে আজ আর ভাস্কর্যের একমাত্র সংজ্ঞা নয় এ কথা নিশ্চিত। কিন্তু শব্দটির মূলের দিকে যদি যাই, তাহলে একটা অর্থ হয়তো বেরোতে পারে। 'ভাস্কর' শব্দটির একটি অর্থ তো 'সূর্য'—বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় এরকম—ভাস্ (দীপ্তি) + কৃ (করা) + অ, অর্থাৎ দীপ্ত করে যে, আলোকোদ্ভাসিত করে যে। অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসা—যা ছিল না তা সৃষ্টি করা, বৃহত্তর অর্থে এরকম একটা সংজ্ঞায় এসে হয়তো দাঁড়ানো যায়। কিন্তু এটা এতই ব্যাপ্ত যে এতে আর সংজ্ঞার কাজ চলে না।

এবার আসে আধুনিকতার প্রশ্ন। ইওরোপীয় ভাস্কর্যেও আধুনিকতা কথাটি বিতর্কিত। রেনেসাঁসের প্রবক্তারা গ্রিক ও রোমের ধ্রুপদী যুগের পর নিজেদের আলোকিত যুগের মধ্যবর্তী সহস্রাধিক বছরের ইতিহাসকে বলতেন অন্ধকার যুগ বা মধ্যযুগ। সে অর্থে তখন রেনেসাঁসের যুগটাই আধুনিক ছিল। বিংশ শতকের শিল্প-তাত্ত্বিকেরা যখন আধুনিক ভাস্কর্যের ইতিহাস লিখতে গেলেন, তাদের অনেকে রদাঁকেও আধুনিক বললেন না। তাঁকে বরং বললেন গ্রিক-রেনেসাঁস ধারার শেষ প্রতিনিধি, কেননা তাঁর কাজও ছিল রিপ্রেজেন্টেশনাল, দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রকৃতির বা মানুষের অবয়ব রচনা। ঠিক এই কারণেই তাঁরা ইম্প্রেশনিস্টদেরও আধুনিকতার আওতায় আনতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা বলতেন রূপায়ণে এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল সেখান থেকে, তাই ছবিতে আধুনিকতার শুরুও সেখানেই। আমরা এ লেখায় অবশ্য রদাঁ থেকেই আধুনিকতার সূচনা ধরেছি। কি কারণে—সেটা হয়তো বোঝানো গেছে।

কিন্তু আমাদের দেশে কি ভাস্কর্যে আধুনিকতা বলে কিছু আছে? অনেকে অবশ্য মানতে চান না। এর মধ্যে অনেক সমকালীন ভাস্করও আছেন। তাঁদের মতে আমাদের সবটাই তো ইওরোপের প্রসারণ। আধুনিকতায় ভারতীয় ভাস্কর্যের স্বাতন্ত্র্য বলে তো কিছু নেই। কিন্তু রামকিঙ্কর সত্ত্বেও এ কথা হয়তো গ্রহণযোগ্য নয়। রামকিঙ্করের ভাস্কর্য কেবল পাশ্চাত্যের প্রসারণ নয়। তিনি এমন কিছু এনেছিলেন যা ভাস্কর্যে ভারতীয়তা ও আধুনিকতার চেতনাকে সমন্বিত করেছে। যার সমান্তরাল ঠিক পাশ্চাত্যে কোথাও নেই। সেজন্য আমরা নির্দ্বিধায় রামকিঙ্করকে আমাদের ভাস্কর্যের আধুনিকতার প্রথম প্রবক্তা বলে গণ্য করতে পারি। এবং তারপরেও আমাদের ভাস্কর্য যেভাবে প্রবাহিত হচ্ছে তাতে এই সমন্বয়ের একটা প্রসারণও ঘটছে, যার প্রকৃত স্বরূপ কেমন হবে সেটা ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

সমকালীন ভাস্কর্য: সমস্যা ও সফলতা

এক

রামকিঙ্করই পারেন এত সহজ অথচ এত ইঙ্গিতময় গভীরতায় কথা বলতে। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এক স্মৃতিচারণায় জানিয়েছিলেন তাঁর এক লেখার কথা। যেখানে রামকিঙ্কর প্রকাশ করেছেন ভাস্কর্য সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি। বিনোদবিহারীর স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত তাঁরই দুটি লাইনে আমরা পেয়ে যাই ভাস্কর্যের এক অনুপম সংজ্ঞা। "জীবনের উদ্যানে আমি ঘুরে বেড়াই। যা দেখি হাসি, কান্না, ছোট শিশু, ফুল বা অমুক তা আমি ছবিতে আঁকি। আর অন্ধকার রাত্রে আমার ছেলে যখন আমার বুকের ওপর এসে পড়ে তাকে যখন আমি জড়িয়ে ধরি সেই অভিজ্ঞতা আমি স্কাল্পচারের মধ্যে রাখি।" রং ও রূপের যে আলোকিত জগৎ যা দৃষ্টির ভিতর দিয়ে আমাদের চেতনায় প্রবেশ করে তারই প্রতিফলন ধরা থাকে ছবিতে। আর ভাস্কর্যে আমরা দৃষ্টির মধ্য দিয়েই পাই সংবেদনময় স্পর্শগ্রাহ্যতার অভিজ্ঞতা। চোখ দিয়েই দেখছি, অথচ পাচ্ছি সমগ্র শরীর দিয়ে স্পর্শের উপলব্ধি। ছবির সঙ্গে ভাস্কর্যের নান্দনিক পার্থক্যের একটি সূত্র হতে পারে এরকম।

সংবেদনের এই নিবিড়তাই সনাতন ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রাণ। ধ্রুপদী, লোকায়ত বা আদিম অভিব্যক্তির ভাস্কর্য—সব ক্ষেত্রেই এই জীবন্ময় সংবেদনের গভীর ভূমিকা আছে। বাস্তবচেতনা ও শারীরিকতা ভারতীয় মননের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। আর রূপের সেই স্পর্শগ্রাহ্যতাতে সংলগ্ন থেকেই তা অরূপকে মেলে ধরে পার্থিব জমিতে। ভারতীয়তার এই মর্ম ভাস্কর্যে যত আলোকিতভাবে পরিস্ফুট শিল্পের অন্য কোনো ক্ষেত্রে ততটা নয়। সেজন্যই ভাস্কর্যের মধ্যে ঘটতে পেরেছে ভারতীয় সংবিতের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে যার কোনো সমান্তরাল নেই।

ভারতবর্ষ ভাস্কর্যের এই বৈভবকে ক্রমে ক্রমে হারিয়েছে। মধ্যযুগ থেকে প্রায় আট-নয়শত বছরের বৈদেশিক শাসনে মূল অভাব ছিল পৃষ্ঠপোষকতার। সেই অভাবে উচ্চকোটির ভাস্কর্য ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ হয়েছে। যদিও লৌকিক স্তরে একটা ধারাবাহিকতা থেকে গিয়েছিল বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু অঞ্চলে। এই লৌকিক চেতনা আমাদের সমকালীন ভাস্কর্যে এখনো প্রাণের ছোঁয়া আনে। কিন্তু মূল প্রবাহে যে শূন্যতা দীর্ঘ ছায়া বিস্তৃত করেছে সেখানে আলো ফেলার মতো স্বাতন্ত্র্য ও বৈভব অর্জন করে নি আমাদের সমকালীন ভাস্কর্য। ভাস্কর্যের সেই ভারতীয় ঐতিহ্য বা ইওরোপের আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে আমাদের সমকালীন ভাস্কর্য হয়তো একটু নিরাশাই জাগায়। প্রবীণ ভাস্কর চিন্তামণি কর এ বছর 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর লেখায় এই নিরাশা গোপন করেন নি। বলেছেন, "আজ জীবনের আপরাহ্নে পৌঁছে মনে হয় যে আমাদের দেশে সার্থক সৃষ্টিমূলক ভাস্কর্য শিল্পের পুনরুত্থান একান্তই ঘটবে কি না অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ হয়তো একদিন হদিশ দেবে, কিন্তু তা আমার অজানা রয়ে যাবে।"

এই শতকের গোড়া থেকে আমাদের চিত্রকলার যে বিকাশ শুরু হয়েছে ভাস্কর্যের বিকাশ সেই সমান্তরালে হয় নি। ব্রিটিশ রয়াল অ্যাকাডেমি প্রভাবিত একটি ক্ষীণ ধারা অবশ্য শুরু হয়েছিল বিগত শতকের শেষ দশক থেকেই। প্রথম পর্যায়ে এর মূল কেন্দ্র ছিল বম্বে অঞ্চল। যদিও এ যুগের প্রথম ভারতীয় ভাস্কর বলে কেউ কেউ যাঁর উল্লেখ করেন সেই রোহিণীকান্ত নাগ (১৮৬৮—৯৫) ছিলেন বাংলার ছেলে। ঢাকায় তাঁর জন্ম। ১৮৯০ সালে ইটালিতে গিয়ে রোমের

৪৬· বিনায়ক পাণ্ডুরং কারমাকার। প্লে মেটস।

রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হয়েছিলেন। মাত্র ২৭ বছরের জীবনে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ভাস্কর হিশেবে। তাঁর অকাল মৃত্যুর দু বছর পর ইটালি থেকে তাঁর ছবি ও ভাস্কর্য আনানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ এরই কাছাকাছি সময়ে (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) আরো একজন ভাস্করের কাজ সম্পর্কে উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং সাময়িক পত্রে ('ভারতী' ও 'প্রদীপ') দুটি নিবন্ধও লিখেছিলেন। মহারাষ্ট্রের এই ভাস্করের নাম গণপৎ কাশীনাথ ম্হাত্রে (১৮৭৬-১৯৪৭)। 'টু দ্য টেম্পল' নামে তাঁর প্রদীপ হাতে মন্দিরাভিমুখী এক নারীর রূপায়ণের মূর্তিটি, যে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কলম ধরেছিলেন, সেটি প্লাস্টারে তৈরি, ১৮৯৬-এর রচনা। ১৯০০-তে এই মূর্তিটি তিনি পাথরেও করেছিলেন।

৫৭

'টু দ্য টেম্পল' আমাদের এ যুগের ভাস্কর্যে প্রথম পর্বের একটি রচনাধর্মী কাজ। নিছক প্রতিকৃতি নয়। কিন্তু নিখুঁত ও

৪৭· দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। ট্রায়াম্ফ অব লেবার। ব্রোঞ্জ। ১৯৫৪।

অনুপুঙ্খ স্বাভাবিকতার রূপায়ণ এখানে। পাশ্চাত্যের অ্যাকাডেমিক রীতির দক্ষ অনুসরণ। এই স্বাভাবিকতার রীতিকে বিস্তৃত করে গেছেন যে সব ভাস্কর তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় বিনায়করাও ভেংকটরাও ওয়াঘ (১৮৮৩-১৯৫৮), হিরণ্ময় রায়চৌধুরী (১৮৮৪-১৯৬২), ফণীন্দ্রনাথ বসু (১৮৮৮-১৯২৬), বালাজি বসন্তরাও তালিম (১৮৮৮-১৯৭০), বিনায়ক পাণ্ডুরং কারমাকার (১৮৯১-১৯৬৭), আর· পি· কামাৎ, এন জি· পানসারে প্রমুখ। মহারাষ্ট্র ও বাংলার এই শিল্পীরাই ভাস্কর্যের একটি সম্মানযোগ্য পাদপীঠ রচনা করেন এই শতকে। এদের অনেকেরই দক্ষতার কোনো তুলনা নেই। বিশেষত কারমাকারের নিপুণ প্রয়োগে গ্রিসীয় ভাস্কর্যের আলোকিত উত্তরণের অনুভব জাগে। তালিম তাঁর দেশজ বিষয়ের রূপায়ণে ইওরোপীয় ন্যাচারালিজমের মধ্যেও ভারতীয় পরিমণ্ডলের ছোঁয়া আনতে পারছিলেন।

তবু তাঁরা পারেন নি আধুনিকতার সংবিতকে পরিস্ফুট করতে। পারেন নি এমনকী, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (১৮৯৯-১৯৭৫)। দেবীপ্রসাদ সমকালীন ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বেঙ্গল স্কুলের গণ্ডির মধ্যে চিত্রকলার চর্চা শুরু করে তিনি তাঁর নিজের ছবিতে সেই গণ্ডি পেরিয়ে এক স্বতন্ত্র নন্দন চেতনা মেলে ধরেন। আয়তনিক ও গাঠনিক গুণ আনেন ছবিতে। বেঙ্গল স্কুলের ভারতীয়তাকে আধুনিক ভারতীয়তার সংবেদনের দিকে নিয়ে আসার প্রয়াসে উজ্জ্বল তাঁর ছবির রূপকল্প। ভাস্কর্যে তাঁর শক্তির পরিচয় অতুলনীয়। প্রতিকৃতি ছাড়াও পরিণত পর্যায়ে রচনাধর্মী ভাস্কর্যও তিনি করেছেন বেশ কিছু। 'ট্রায়াম্ফ অব লেবার' (১৯৫৪), 'মার্টার্স মেমোরিয়াল' (১৯৫৬), 'হোয়েন উইন্টার কামস' (১৯৫৭) এই তিনটি কাজ এই শতকের ভারতীয় ভাস্কর্যে উজ্জ্বল সংযোজন। তাঁর রোমান্টিক চেতনার অমেয় স্বাক্ষর এখানে। কিন্তু রদাঁ ও বুর্দেল অনুপ্রাণিত এই রোমান্টিক ন্যাচারালিজমকে ছাড়িয়ে রূপভঙ্গিতে কোনো আধুনিক মননের সঞ্চার ঘটাতে চেষ্টা করেন নি দেবীপ্রসাদ। খোঁজেন নি ভারতীয়তার কোনো স্বতন্ত্র ভাষাও। কিন্তু মাদ্রাজ সরকারি আর্ট কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যক্ষ থেকে তিনি অনেক ছাত্র তৈরি করে গেছেন যাঁদের মধ্য দিয়ে আমাদের ভাস্কর্যে নীবন চেতনার উন্মীলন ঘটেছে। ভাস্কর্যে এটি তাঁর স্মরণীয় অবদান।

৪৭ ৬৪ ৬৫

দুই

রামকিঙ্করই (১৯০৬-৮০) ভারতীয় ভাস্কর্যে আধুনিকতার প্রথম পথিকৃৎ। স্পর্শগ্রাহ্য যে সংবেদনের জগৎ তাকে তিনি ভাস্কর্যে রূপ দিয়েছিলেন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে। শান্তিনিকেতনে ছাত্র হিশেবে যখন প্রথম যোগ দেন তিনি ১৯২৫ সালে, তখন সেখানে ভাস্কর্যের কোনো পরিমণ্ডল ছিল না। কিন্তু শান্তিনিকেতনের হাওয়ায় ছিল যে

৪৮· রামকিঙ্কর। সুজাতা। সিমেন্ট কংক্রিট। ১৯৩৫।

কোনো নবীন চেতনার উন্মীলনের অবারিত সুযোগ। জন্মসূত্রে তাঁর ছিল মূর্তি গড়ার দিকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা। নন্দলালের শিষ্যত্ব তাঁকে দিয়েছিল ভারতীয় জীবন ও প্রকৃতিকে উপলব্ধির নিবিড় প্রেরণা। ভারতীয় আদিম উপজাতির অভিব্যক্তিময় সৌন্দর্য চেতনার অনুরণন ছিল তাঁর রক্তের মধ্যে। কলাভবনে ভাস্কর্য চর্চার জন্য রবীন্দ্রনাথ আনিয়েছিলেন মার্গারেট মিলওয়ার্ড ও লিজা ফন পট নামে দুই ইওরোপীয় ভাস্করকে। তাঁদের কাছে প্রকরণের শিক্ষা আধুনিকতার আঙ্গিক সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করে তোলে। এছাড়া বইয়ের ভিতর দিয়ে আধুনিক ইওরোপকে জানার সুযোগকেও সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। এ সমস্ত উৎস মিলেছিল তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভায়। গড়ে উঠেছিল এ যুগের শ্রেষ্ঠ একজন ভাস্কর। রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনে সারা জীবন নিজের আনন্দে কাজ করেছেন। সহজলভ্য উপাদানে, বিশেষত সিমেন্ট কংক্রিটে, গড়েছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিছু ভাস্কর্য। ১৯২৮ থেকে শুরু হয় ভাস্কর্যে তাঁর সৃষ্টিশীল কাজ। ৪৮ ১৯৩৫-এ 'সুজাতা', ১৯৩৮-এ 'সাঁওতাল পরিবার', বিমূর্ত 'রবীন্দ্রনাথ', ১৯৪১-এ 'দীপস্তম্ভ', ১৯৫৬-তে 'মিলকল', ১৯৬৬-তে দিল্লি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'যক্ষ-যক্ষী' এ সমস্ত কাজের ভিতর ৭৭,৮৫ দিয়ে ভারতীয় ভাস্কর্যে তিনি যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটান, তার কোনো তুলনা নেই। ভাস্কর্য কেবল দৃশ্যতার স্বরূপকে তুলে ধরবে না রূপের মধ্য দিয়ে সে বিশ্লেষণ করবে একটি জাতির নির্দিষ্ট কালের গণ্ডিতে বাঁধা চিরায়ত চেতনা প্রবাহকেও। শুধু প্রকৃতির প্রতিফলন নয়, সে হয়ে উঠবে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বেই তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু আয়তন নয়, আয়তনের বিন্যাসে সে বাঙ্ময় করে তুলবে স্থান বা দেশগত (spatial) শূন্যতাকেও। আধুনিক ভাস্কর্যের এই সব কটি বৈশিষ্ট্যকেই রামকিঙ্কর প্রকাশ করেছেন তাঁর কাজে। ভারতীয় বাস্তবতায় ভাস্কর্যের আধুনিকতার নতুন সংজ্ঞা নির্ণয় করলেন তিনি। এই ভিত্তির উপরই আমাদের সমকালীন ভাস্কর্যের বিকাশ।

৬১ অবনীন্দ্রনাথের চল্লিশের দশকে করা কাটুমকুটুমের (বা কুটুমকাটাম) কাজগুলোকে হয়তো ভাস্কর্যের পর্যায়ে ফেলতে চাইবেন না অনেকে। কেননা সেগুলিতে সচেতন নির্মাণের ভূমিকা কম। কিন্তু যামিনী রায় অল্প হলেও সচেতনভাবে কিছু ভাস্কর্য গড়েছিলেন। লোকায়ত ঐতিহ্যের আলোকিত প্রতিফলনে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ভাস্কর্যের অসামান্য সফলতার দৃষ্টান্ত। তবু রামকিঙ্করের পরে তাঁরই অনুজ সমসাময়িক যে দুজন শিল্পী ভাস্কর্যে ভারতীয়তা ও আধুনিকতার মেলবন্ধন খুঁজছিলেন, তাঁরা হলেন প্রদোষ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯১) ও চিন্তামণি কর (১৯১৫)।

প্রদোষ দাশগুপ্তের কাজে আবেগের থেকে মেধা বা বুদ্ধির ভূমিকা বেশি। ভারতীয়তার মূল কেন্দ্রটিকে তিনি শনাক্ত করেছিলেন রূপাবয়বের আয়তনময় পূর্ণতার প্রকাশের মধ্যে। ভারতীয় দর্শনে বা পুরাণে ব্রহ্মাণ্ডের যে প্রত্যয় সেখানে সমস্ত শক্তি একক একটি কেন্দ্রের আকর্ষণে সংহত থাকে। বিচ্ছুরিত হয়ে বা ছড়িয়ে গিয়ে বিনষ্ট হয়ে যায় না। কেন্দ্রস্থ সেই শক্তির ক্রিয়ায় অবয়বের আয়তনিক জ্যামিতিতে বিভিন্ন তলের সংঘাত না থেকে থাকে সমন্বয় ও সংহতি। স্ফিয়ার বা সিলিন্ডার, গোলক বা বেলনাকৃতি সুষম জ্যামিতির প্রাধান্য সেখানে। ব্রাঁকুসি এই দর্শনকে উপলব্ধি করে আধুনিক ভাস্কর্যের স্বতন্ত্র এক ভাষার উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রদোষ দাশগুপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের এই প্রত্যয়কেই পরিণত পর্বে তাঁর নিজস্ব রূপের সন্ধানে কাজে লাগিয়েছিলেন। চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে তাঁর কাজে যথেষ্ট সমাজ চেতনার প্রকাশ ছিল। ক্রমে তিনি রূপের শুদ্ধতার সন্ধানে ধ্রুপদী অভিব্যক্তির দিকে এগিয়েছেন। ভাস্কর্যে ভারতীয়তার সমস্যাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। ক্যালকাটা গ্রুপের (১৯৪৩-১৯৫৩) আন্দোলনের ভিতর দিয়ে ভারতীয় শিল্পকে আধুনিকতায় উত্তরণ ঘটিয়েছেন।

৪৯· অজিত চক্রবর্তী। পোর্ট্রেট অব অ্যান আর্টিস্ট। ব্রোঞ্জ।

চিন্তামণি কর একাধারে চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এ তিনি ছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের ছাত্র। সেখানেই গিরিধারী মহাপাত্রের কাছে তিনি ভাস্কর্য শেখেন। ১৯৩৮-এর পর দুবছর শিক্ষানবিশি করেছিলেন প্যারিসে অধ্যাপক আর· ভেলরিক ও এম· ভিক্টর জিওভানেল্লির অধীনে। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্যের আধুনিকতার সমন্বয় ঘটেছে তাঁর ভাস্কর্যে। তিনটি সাধারণ ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায় তাঁর বিবর্তনকে। শুরু থেকে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাস্তবধর্মী স্বাভাবিকতা, ষাট থেকে সত্তর দশকের শুরু পর্যন্ত রূপবন্ধের বিমূর্ততা এবং তার পরবর্তী সময়ে বাস্তবতা-আশ্রিত ধ্রুপদী আদর্শায়িত সৌন্দর্যে ফিরে আসা। ১৯৬৩ ও ৬৪-তে তিনি যে দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট দুটি বুদ্ধমূর্তি করেছিলেন ভিট্রিফায়েড টেরাকোটায় সেখানেই তাঁর সমস্ত দার্শনিক প্রত্যয়ের সারাৎসার ধরা আছে বলে মনে করা যায়। আধুনিকতা ও ভারতীয়তার সার্থক সমন্বয় সেখানে।

শঙ্খ চৌধুরী (১৯১৬) চিন্তামণি করের প্রায় সমসাময়িক। রামকিঙ্করের প্রথম পর্বের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন তিনি। তাঁর সহজাত প্রবণতা লিরিসিজম বা গীতিধর্মী প্রকাশের দিকে। ভাস্কর্যের আধুনিক ভাষায় তিনি রূপ দিয়েছেন ধ্রুপদী ও লৌকিক ভারতীয় চেতনার সারাৎসারকে। আয়তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশগত শূন্যতাকেও অর্থময়ভাবে সৃষ্টি করে তুলেছেন। ঋণাত্মক আয়তনকে সৌন্দর্যের অনিবার্য মাত্রায় পরিণত করেছেন।

প্রদোষ দাশগুপ্ত, চিন্তামণি কর ও শঙ্খ চৌধুরী পূর্বাঞ্চলে এই তিনজন শিল্পীই রামকিঙ্করের পরে ভাস্কর্যে পথিকৃতের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে তাঁরাই ভারতীয় ভাস্কর্যকে একটি সম্মানযোগ্য ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন। এই সময় বা আরো একটু পরে তাঁদেরই প্রেরণায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আরো কিছু ভাস্কর একই রকম গুরুত্বে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছেন। পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন স্বকীয়ভাবে আধুনিকতার ভাষার সন্ধানে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তরাঞ্চলে ধনরাজ ভগৎ (১৯১৭), কে· সি· এরিয়ান, (১৯১৯), ও অমরনাথ সেহগাল (১৯২২)। পশ্চিমাঞ্চলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন মহারাষ্ট্রের এ· এম· দাবিয়েরওয়ালা ও পিলু পোচখনওয়ালা (১৯২৩)। এবং দক্ষিণে এস· ধনপাল (১৯১৯)। ইওরোপীয় অ্যাকাডেমিক স্টাইলের সংকীর্ণতা থেকে আমাদের ভাস্কর্যকে মুক্ত করার কৃতিত্ব তাঁদের। তাঁরাই প্রসাবিত করেছেন ভাস্কর্যের মাধ্যমকে। যেমন দাবিয়েরওয়ালা বা পোচখনওয়ালা ধাতব পাত বা পরিত্যক্ত লোহার টুকরোর নির্মাণের মধ্য দিয়ে আধুনিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জটিল যান্ত্রিকতার শিল্পরূপ খুঁজেছেন। ভারতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার এক সমন্বয়েরও সন্ধান করেছেন তাঁরা।

আধুনিক ভাস্কর্যকে ভারতীয়তার স্বতন্ত্র মাত্রায় অন্বিত করার জন্য বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করেন যে শিল্পী—তিনি মীরা মুখার্জি (১৯২৩)। মীরা মুখার্জি প্রথম জীবনে মাত্র ১৪ বছর বয়সে অবনীন্দ্রনাথের ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টে ছবি আঁকার প্রাথমিক পাঠ নেন। তারপর দিল্লি পলিটেকনিকের শিক্ষাক্রম শেষ করে ১৯৫১-তে শান্তিনিকেতনে ইন্দোনেশিযার শিল্পী আফান্দির কাছে শেখেন। ১৯৫২-তে জার্মানি যান। প্রায় ৫ বছর মিউনিখ আর্ট অ্যাকাডেমিতে এক্সপ্রেশনিস্ট ভাস্কর টোনি স্টিডলার ও হেনরিক কির্চনার-এর অধীনে ভাস্কর্য শিক্ষা করেন। দেশে ফিরে অ্যানথ্রপলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ফেলো হিশেবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের, বিশেষত বস্তারের কারুশিল্পীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পান। এখান থেকেই আসে তাঁর নিজের পথের সন্ধান। লোকায়তের মধ্যে আবিষ্কার করেন পার্থিবতা ও আধ্যাত্মিকতার সহাবস্থান। এই দুই দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্যের সমন্বয়ই মীরা মুখার্জির সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র। ধ্রুপদী ও লৌকিক ভারতীয়তার অনন্য জীবনময়তার সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের ধ্যানমগ্ন প্রশান্তিকে মিলিয়েছেন তিনি। ভাস্কর্যের মধ্যে এনেছেন চলমান জীবনের গতি, সুখ, দুঃখ ও বিস্তার। তাঁর সম্পর্কে অনেকে অভিযোগ করেন যে বিশেষ ধাবার একটি কারুশিল্পকে তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। বিশুদ্ধ ভাস্কর্যগুণ নেই এর মধ্যে। কিন্তু এ অভিযোগ অমূলক। তাঁর কাজে যে রসের প্রকাশ ভারতীয়তার আত্মপরিচয়ে তা অনন্য।

উপরোক্ত শিল্পীরা ভাস্কর্যের যে জমিটা তৈরি করলেন, সেই জমিতেই ষাটের দশকের ভাস্করদের আবির্ভাব। কিন্তু এর পরে আমাদের ভাস্কর্যে এক স্বতন্ত্র সমস্যা প্রকট হয়ে উঠল। এবং আজও সেই সমস্যাতেই সংকুচিত হয়ে আছে আমাদের ভাস্কর্য।

রঙিন ছবি ৪· বিপিন গোস্বামী। সিটেড উওম্যান। ব্রোঞ্জ।

রঙিন ছবি ৫· নিরঞ্জন প্রধান। মিউজিক অব দ্য সোল। ব্রোঞ্জ। ১৯৯১।

৫০· রঘুনাথ সিংহ। মুখ। কাঠ ও ধাতু। ১৯৮৯-৯০।

তিন

ভাস্কর্যের এই সীমাবদ্ধতার প্রধানতম কারণ পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। ভাস্কর্য অত্যন্ত শ্রম সাপেক্ষ ও ব্যয় সাপেক্ষ শিল্প। এবং সময় সাপেক্ষও। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতাতেই ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটতে পেরেছে শাসক বা বিত্তবান শ্রেণীর আনুকূল্যে। আমাদের দেশে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ব্রিটিশদের কোনো আনুকূল্য ছিল না। স্বাধীনতার পরেও আমাদের সরকার বা ধনীরা এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ দেখান নি। রামকিঙ্কর যে কিছু কাজ করতে পেরেছিলেন, তা শুধু শান্তিনিকেতনের উদার পরিবেশের জন্য। চল্লিশ দশকের কয়েকজন শিল্পী ভাস্কর্য নিয়ে নিবিষ্ট থেকেছিলেন কেবল নিজেদের প্রতিভায় ও উৎসাহে। প্রদোষ দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে। চল্লিশ দশকে তাঁর প্রস্তুতিপর্বের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলছিলেন—

> "তখন একেবারে ব্যারেন ল্যান্ড··· আমাকে এত ধাক্কা খেতে হয়েছে, বহু কষ্টে, কষ্ট মানে স্ট্রাগল করেছি। একটা কোথাও কেউ ভাস্কর্য কেনে না। মনে আছে ৬৫ টাকা দিয়ে ক্যালকাটা গ্রুপে আমাদের ছোট একটা কাজ বিক্রি হল। ঐ হল আমার প্রথম। না, প্রথম হল ৭৫ টাকায় মেটাল বক্সের তখন ডিরেক্টর ছিলেন, তিনি সাহেব মানুষ, তিনি একদিন আমার স্টুডিওতে এসে কিনে নিয়ে গেলেন।"

পরবর্তীকালেও এই অবস্থাটা বিশেষ পালটায় নি।

ষাট ও সত্তর দশকে বম্বে বা দিল্লিতে ছবি বিক্রির প্রচলন কিছুটা ছিল। কলকাতায় সে অনুপাতে ছবির বাজার ছিল নগণ্য। তবু নিজেদেরই উৎসাহে সৃষ্টির প্রেরণায় প্রতিভাবান কিছু শিল্পী একক বা যৌথ উদ্যোগে ছবি এঁকে গেছেন। ছবির জগতে সুবাতাস এসেছে। কিন্তু ভাস্কর্যকে আঁকড়ে থাকতে পেরেছেন তুলনায় অনেক কমসংখ্যক শিল্পী। আশির দশকে সারা ভারতবর্ষেই ছবির বাজারের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। ব্যবসায়ী ও ধনীকশ্রেণী উৎসাহিত হয়েছেন ছবি সংগ্রহে। ছবির দাম বেড়েছে আশাতীতভাবে। অজস্র আর্ট গ্যালারি খুলেছে। গ্যালারির মাধ্যমে প্রদর্শনী ও বিক্রির সুযোগ বেড়েছে অনেক। কলকাতাতেই এখন গোটা পনেরো আর্ট গ্যালারি। কিন্তু ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এর কোনো ছায়া পড়ে নি। বিক্রি হয় না বলে গ্যালারি পরিচালকরাও ভাস্কর্য বিষয়ে উৎসাহী নন। খুব কম হলেও দু-একটি গ্যালারি অবশ্য ভাস্কর্য প্রদর্শনী মাঝে মাঝে করে। কিন্তু উপযুক্ত সাড়া না পেয়ে তাদেরও আগ্রহ স্তিমিত হয়ে যায়। কলকাতায় যেমন, অন্যত্রও অবস্থা প্রায় একই রকম।

সরকারী স্তরে অনীহা আরো জগদ্দল পাথরের মতো। নিম্নমানের পূর্ণাবয়ব বা আবক্ষ মূর্তিতে ছেয়ে আছে কলকাতা শহর। ভাস্কর্য যে হতে পারে কোনো দেশের বা জাতির সৌন্দর্যচেতনার স্মারক এ বিষয়ে কোনো সচেতনতা নেই। সঙ্গতিও নেই ঠিকই। তবে সচেতনতা থাকলে কিছু সঙ্গতি আসে। ব্যক্তিগতভাবে যারা ছবি কেনেন তাঁরা কেন ভাস্কর্য কেনেন না, এটা ভাববার। হয়তো বড় শহরে ছবির জন্য ফাঁকা দেওয়াল যতটা সুলভ ভাস্কর্যের জন্য মুক্ত ক্ষেত্র ততটা নয়।
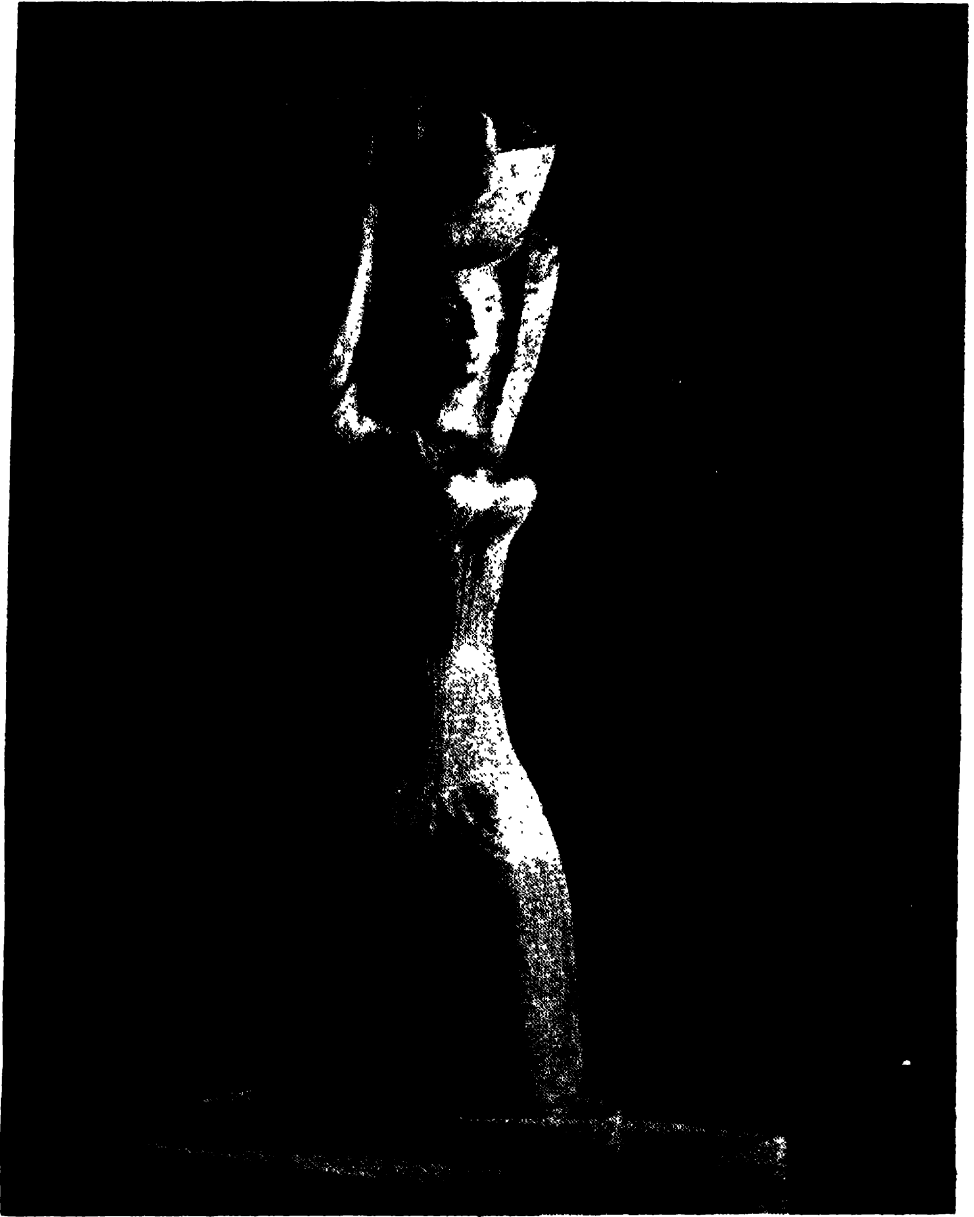
৫১· আই বি গজ্জর। ফিশার উওম্যান। কাঠ।

৫২· ফুলচাঁদ পাইন। পায়রা। প্লাস্টার। ১৯৭১।

৫৩· ফুলচাঁদ পাইন। আই ওন্ট লিভ ইউ। টেরাকোটা। ১৯৭৪-৭৫।

এই বাস্তবতায় সংকুচিত ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবারিত সুযোগ নেই। এখানে ভুলের মাশুল অনেক। অনেকের মনেই আজ এই সংশয় জাগছে ভাস্কর্যের আধুনিকতায় আমরা কি সত্যিই কিছু সংযোজন করতে পেরেছি? না কি আমাদের আধুনিকতা কেবল পাশ্চাত্যেরই ছায়া মাত্র? ইওরোপে বিগত শতকের শেষ ভাগ থেকে এই শতকের ছয়টি দশক জুড়ে সারা পৃথিবীর ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে আধুনিক ভাস্কর্যে যে বিশাল ও গভীর কর্মকাণ্ড হয়েছে, তারপরে কি আর নতুন কিছু করা সম্ভব? এ প্রশ্নও অনেকে তোলেন। অনুকরণের পথে আমাদের ভাস্কর্যের কোনো মুক্তি নেই, এ কথা ঠিকই। এখন পর্যন্ত সদর্থক যেটুকু কাজ হয়েছে, যার কিছু উল্লেখ এর আগে আমরা করেছি, তা আমাদের ঐতিহ্য ও ইওরোপের আধুনিকতার সমন্বয়ের পথে। এর পরে যা হবে, তাও সেভাবেই। কেননা আমাদের ঐতিহ্য রয়েছে অনিঃশেষ। কেবল সঙ্গতি ও প্রেরণার অভাব।

এরকম পরিস্থিতিতে ষাটের দশক থেকে আমাদের ভাস্কররা কাজ করে যাচ্ছেন। পরীক্ষানিরীক্ষার ক্ষেত্র অনেক বেড়েছে। বেড়েছে মাধ্যম ও প্রকরণের বৈচিত্র্য। বাজার নেই বলে সেই আকর্ষণে শিল্পীকে আপোস করতে হয় না। তাঁরা কাজ করেন নিজের প্রেরণায় ও নিষ্ঠায়।

চার

ষাটের দশকে সারা ভারতেই ভাস্কর্যের বিস্তারের কয়েকটি নির্দিষ্ট উৎস আছে। মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শান্তিনিকেতন কলাভবনে রামকিঙ্কর, কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে প্রদোষ দাশগুপ্ত ও চিন্তামণি কর এবং বরোদায় শঙ্খ চৌধুরীর শিক্ষকতার ফলে যে সব ভাস্কর তৈরি হয়েছেন তাঁরাই সারা ভারতে ছড়িয়ে গিয়ে ষাটের দশকে

প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। শিক্ষকদের প্রেরণায় এইসব শিল্পীর মধ্যে এসেছে ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা। তাঁরা অর্জন করেছেন গভীর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। চেষ্টা করেছেন রূপের বিশুদ্ধতার মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবিধৃত সেই মানবতাকে পরিস্ফুট করতে। মোটামুটিভাবে ষাটের দশকের ভাস্কর্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এরকম।

১৯৩০ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে যাঁদের জন্ম, ১৯৬০-এর পর যাঁরা প্রকাশের নিজস্বতায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, দু একটি ব্যতিক্রম বাদে, ষাটের দশকের ভাস্কর বলতে আমরা তাঁদেরই বুঝব। কলকাতায় প্রদোষ দাশগুপ্তের ছাত্র, এবং পরবর্তীকালে ভাস্কর্যকে প্রসারিত করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হারাণচন্দ্র ঘোষ (১৯২৭), অজিত চক্রবর্তী (১৯৩০), গোষ্ঠকুমার (১৯৩২), উমা সিদ্ধান্ত (১৯৩৩), মাধব ভট্টাচার্য (১৯৩৩), রঘুনাথ সিংহ (১৯৩৩), শর্বরী রায়চৌধুরী (১৯৩৩), সুবলচন্দ্র সাহা (১৯৩৩), রণেন দত্ত (১৯৩৩) শঙ্কর ঘোষ (১৯৩৪) সমরেশ চৌধুরী (১৯৩৪), বিপিন গোস্বামী (১৯৩৪), ও সুভাষ রায় (১৯৩৫)। হারাণচন্দ্র ঘোষের কাজে অনুভব করা যায় অনুপম ধ্রুপদী সৌন্দর্য চেতনা। অজিত চক্রবর্তীর সুরেলা জীবন্ময়তা ফুলের ফুটে ওঠার সৌন্দর্যকে ভাস্কর্যে ধরতে পারে। উমা সিদ্ধান্ত অভিব্যক্তিময় মুখাবয়বে অন্তর্লোকের আবরণ উন্মোচন করেন কৌতুক ও করুণায়। মাধব ভট্টাচার্য মানুষের অবয়বের সুরেলা ছন্দকে যেমন রূপ দেন তেমনি শরীর নিয়ে জ্যামিতিক বিমূর্ততার দিকেও যান। রঘুনাথ সিংহের প্রকাশের মূল উৎস আদিমতার গহন সৌন্দর্য ও তীব্রতা। এই আদিম অভিব্যক্তিকেই ভাস্কর্যে সময়চেতনায় সম্পৃক্ত করে তোলেন অসমের শোভা ব্রহ্ম (১৯৩০)। শর্বরী রায়চৌধুরীর অবয়ব থেকে বিমূর্তায়িত কাজগুলো যেন জমাট বাঁধা ধ্রুপদী সংগীত। বিপিন গোস্বামী আয়তনময় অবয়ববাহুল্যে রূপবদ্ধ করেন বাবু-সংস্কৃতির স্তিমিত কৌতুক। ফুলচাঁদ পাইন (১৯৩৩) দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছাত্র। বাংলার সজল সৌন্দর্য ধরা থাকে তাঁর কাজে রূপের পূর্ণতায়। সুরজিৎ দাসও একজন স্বতঃস্ফূর্ত ভাস্কর। নাগরিক জীবনের ক্ষয় ও শূন্যতার পরিমণ্ডল ধরা থাকে তাঁর অভিব্যক্তিময় অবয়বী প্রতিমায়। নিরঞ্জন প্রধান (১৯৪০) চিন্তামণি করের ছাত্র। রেখার প্রাধান্যে তিনি প্রকৃতির সুষমাকে ধরেন মূর্ততা ও বিমূর্ততায়। কলকাতায় ষাটের দশকের আর একজন উল্লেখযোগ্য ভাস্কর দেবব্রত চক্রবর্তী (১৯৩৫)। ধ্রুপদী রূপবোধ ও সময়চেতনার সাযুজ্যে বিশিষ্ট তাঁর রচনা।

৫৪ বেদ পি সন্দীপ। অনামা। কাঠ ও মিশ্র মাধ্যম। ১৯৯৩।

৫৫· আকু। অনামা। ব্রোঞ্জ ও চামড়া।
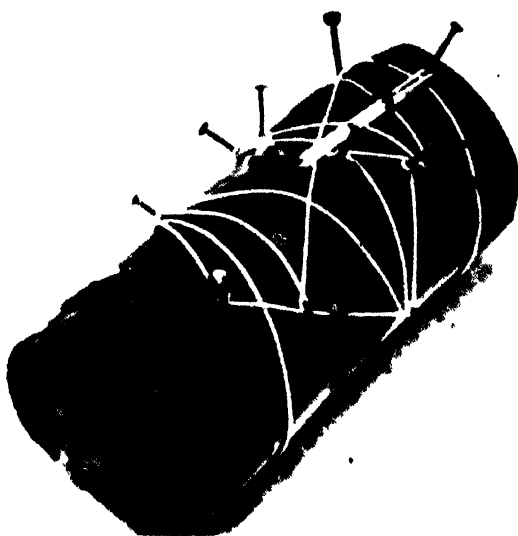
৫৬· রামকুমার মান্না। ম্যাজিশিয়ান। টেরাকোটা। ১৯৯৪।

ষাটের দশকে অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের বরোদা থেকে উঠেছেন নরেন্দ্র প্যাটেল (১৯২৯), রাঘব কানেরিয়া (১৯৩৬), বিদ্যারতন খাজুরিয়া (১৯৩৪), নাগজি প্যাটেল (১৯৩৭), রমেশ পাণ্ডেরিয়া (১৯৩৮), নারায়ণ কুলকার্নি প্রমুখ। উত্তরাঞ্চলে এম· ধর্মানি (১৯৩১), বেদ নায়ার (১৯৩৩), মদন ভাটনগর (১৯৩১), অবতার সিং (১৯৩৬), পুষ্প বেতালা (১৯৩৭) ও এস· আর ভূষণ (১৯৩৮)। দক্ষিণাঞ্চলে দুজন ভাস্কর বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন—পি· ভি· জানকিরাম (১৯৩০) ও কে· কে· রামন (১৯৩৭)। ধাতব পাতের উপর পরম্পরাগত মূর্তির আদলে গড়া জানকিরামের কাজে দক্ষিণভারতীয় ঐতিহ্যের অনুরণন ধরা পড়ে।

সত্তর ও আশির দশকে ভাস্কর্যের বৈচিত্র্যময় বিস্তারের দিকে যাওয়ার আগে আমরা দুজন প্রবীণ শিল্পীর প্রসঙ্গে আসব, যাঁরা মূলত চিত্রকর, কিন্তু সত্তর দশক থেকে স্বতোপ্রণোদিতভাবে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল অবদান রেখেছেন। তাঁরা হলেন সোমনাথ হোর (১৯২১) ও কে· জি· সুব্রামনিয়ান (১৯২৪)। দুজনেই শেষ পর্বে কলাভবনে শিক্ষকতায় কাটিয়েছেন। সোমনাথ হোর অবশ্য তাঁর মোম দিয়ে গড়া ব্রোঞ্জে রূপান্তরিত এই কাজগুলোকে ভাস্কর্য বলতে চান না। বলেন 'ব্রোঞ্জ'। একটি সাধারণ প্রত্যয় এর মধ্য দিয়ে রূপ পায়। তিনি তার নাম দিয়েছেন 'ক্ষত'। বিশ্বব্যাপ্ত শোষণ ও অত্যাচারে মানবিক সত্তার যে নষ্ট হয়ে যাওয়া, সেই ক্ষয়ের করুণাই 'ক্ষত'-তে রূপায়িত হয়। তাঁর এই কাজ সমস্ত প্রথাগত রীতি ও ধারার বাইরের। এক গভীর ও তন্নিষ্ঠ সামাজিক দায়বোধ রূপ পায় এখানে। ভাস্কর্যের প্রচলিত সংজ্ঞার বাইরে হলেও তাঁর এই কাজ ত্রিমাত্রিক শিল্পের এক নতুন দিগন্ত মেলে দিয়েছে। এজন্যই সোমনাথ হোর এখন একজন স্মরণীয় ভাস্কর।

কে· জি· সুব্রামনিয়ান টেরাকোটায় নতোন্নত পদ্ধতির কাজে ছবি ও ভাস্কর্য উভয়ের বৈশিষ্ট্যকে একাধারে মিলিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি পরিস্ফুট করেছেন লোকায়ত সারল্যের স্নিগ্ধ অভিব্যক্তি। তাঁর এই কাজ বিস্তীর্ণ প্রভাব ফেলেছে তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের উপর।

১৯৪১ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে যাঁদের জন্ম, সত্তর দশকে এসে যাঁদের প্রতিষ্ঠা, তাদের কাজের মূলগত বৈশিষ্ট্য ষাটের দশকের শিল্পীদের সঙ্গে অনেকটা মেলে। সত্তরের শিল্পী বিমান দাস (১৯৪৩) অবশ্য জীবন্ময় রূপবন্ধের

বিমূর্তায়ন করেন ধর্মীয় চেতনার মরমী অনুষঙ্গের স্পর্শে। অনিট ঘোষের (১৯৪৪) কাজে থাকে ধ্রুপদী চেতনার প্রকাশ। দিলীপ সাহাও (১৯৪৪) রূপের সারাৎসারে পৌঁছোতে চান অবয়বের বাহুল্য বর্জন করে। বিপুলকান্তি সাহা (১৯৪৪) ও তারক গড়াই (১৯৪৬) প্রেরণা নেন আদিমতা থাকে। মানিক তালুকদার (১৯৪৪) নানা মাধ্যম ও অভিব্যক্তিতে প্রসারিত করেন রূপবন্ধ। গোপালপ্রসাদ মণ্ডল (১৯৪৯) প্রকৃতি থেকে জীবনের প্রস্ফুটনকে রূপ দিতে চান আয়তনিক পূর্ণতায়। দক্ষিণ ভারতের শিল্পীদের মধ্যে দ্রাবিড় ঐতিহ্যের সারাৎসারকে আত্মস্থ করে আধুনিকতার নতুন সংজ্ঞা খুঁজছেন সি· দক্ষিণমূর্তি (১৯৪৩), অনিলা জ্যাকব (১৯৪১), এস· পরমশিবম (১৯৪২), এস· নন্দগোপাল (১৯৪৬) প্রমুখ শিল্পী। উল্লেখযোগ্য বরোদা ঘরানার বলবীর সিং কাট (১৯৪১) ও লতিকা কাট (১৯৪৮)।

আশির দশকেব শিল্পীদের মধ্যে ঝোঁক এসেছে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে প্রথাবহির্ভূত কাজের দিকে। সুনীলকুমার দাস (১৯৫২) একাধিক মাধ্যম মিলিয়ে সমাজ চেতনায় সম্পৃক্ত কাজ করছেন। তাপস সরকার (১৯৫৩) পরিত্যক্ত যন্ত্রাংশ জুড়ে গাঠনিক কাজের মধ্যেও রোমান্টিক সৌন্দর্য চেতনার অনুরণন আনেন। বিমল কুণ্ডু (১৯৫৪) জ্যামিতিক তলের সংযোগে সৃষ্ট তীক্ষ্ণ সরলরেখার কৌণিক সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে ঘনকবাদী রীতির আবহ সৃষ্টি করেন। টেরাকোটায় শ্যামল রায় (১৯৫৭) অসামান্য সফলতা দেখিয়েছেন। বেলনাকৃতি রূপাবয়বকে ভিত্তি করে তাঁর লৌকিক সারল্যের মানব মানবীর প্রতিমা আমাদের মুগ্ধ করে। তেমনি আকর্ষণীয় টেরাকোটা করেন রামকুমাব মান্না। এছাড়া কলকাতায় অভিনিবেশ যোগ্য কাজ করছেন অরুণকুমার চক্রবর্তী (আরু), সোমা চক্রবর্তী (১৯৬০), স্বপন রায়, গোপীনাথ রায়, ঋষি বরুয়া, সন্দীপ চক্রবর্তী, কৃষ্ণেন্দু সিমলাই প্রমুখ। কেরালার কে· এস· সোমন (১৯৫৬) টেরাকোটায় প্রতিবাদী অভিব্যক্তির কাজ করেন মহাকাব্যিক ট্রাজেডির মাত্রায়। হায়দ্রাবাদের সি· জগদীশ (১৯৫৬) পুরোনো খবরের কাগজ জুড়ে এক ধরণের কাজ করেন যাতে নতুনত্ব আছে। বহুমুখী বিস্তারে কাজ করছেন তরুণ শিল্পীরা যার পরিপূর্ণ মূল্যায়নের সময় এখনো হয় নি।

পাঁচ

রামকিঙ্কর সংবেদনময় স্পর্শগ্রাহ্যতার মধ্যে ভাস্কর্যের সংজ্ঞার অন্যতম একটি লক্ষণ দেখেছিলেন। ভারতীয়তার একটি মাত্রা তাঁর কাছে উঠে এসেছিল এভাবে। কিন্তু আধুনিকতার মূল্যবোধ ও জটিল জীবনজিজ্ঞাসা ভাস্কর্যের রূপ ও ভাবে নানা জটিলতা আনছে। সারা ভারতে প্রবীণ ও নবীন শিল্পীরা কাজ করছেন নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও। এব সম্ভাবনার নানা দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাব বিরাম নেই। রামকিঙ্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত চিন্তামণি কর শঙ্খ চৌধুরী মীরা মুখার্জি সোমনাথ হোর পর্যন্ত আমাদের ভাস্কর্যের যে বিস্তার, সেখানে আত্মপরিচয় সন্ধানের যে অভিনবত্ব, তা খুব নগণ্য নয়। এই ধারাকে আরো গভীরপ্রসারী করতে হলে চাই সর্বস্তরে সহযোগিতা। সরকার ও গুরুত্বপূর্ণ সমাজসংস্থার আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ভাস্কর্যের পূর্ণ স্ফুরণ সম্ভব নয়। ঐতিহ্য ও দেশকালের সত্তায় সম্পৃক্ত থাকাই এর মুক্তির একমাত্র পথ। রামকিঙ্কর তাঁর জীবন দিয়ে আমাদের তা দেখিয়েছেন।

ভাস্কর্যের প্রথম প্রজন্ম

এক

পশ্চাৎপট

ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর সামনে আজও তার যেসব উত্তরাধিকারকে গৌরবের সঙ্গে তুলে ধরতে পারে, ভাস্কর্য তাদের মধ্যে প্রধানতম একটি। সিন্ধু সভ্যতা থেকে খাজুরাহো কোনারক পর্যন্ত কয়েক সহস্র বছরের ঐতিহ্যের যে বিস্তার পৃথিবীর সংস্কৃতির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। সেই সমৃদ্ধ সৃষ্টির ধারা ধীরে ধীরে বিস্রস্ত হয়ে স্তব্ধতার দিকে চলে গেল। দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতক থেকে যে ভাঙনের শুরু, পরবর্তী শতকগুলিতে তার আর জীবন্ত কোনো অস্তিত্ব রইল না। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত এর যে অসামান্য সমৃদ্ধি—ভারহুতে, সাঁচী স্তূপে, দিদারগঞ্জের যক্ষীতে মথুরার বুদ্ধমূর্তিতে রয়েছে যার অনুপম দৃষ্টান্ত, সেই সফলতা পরবর্তী শতকগুলিতে হয়তো তত উজ্জ্বল থাকে নি, তবু ত্রয়োদশ শতকে কোনারক পর্যন্ত এই জয়যাত্রা অব্যাহত থেকেছে। তারপর থেকে অবনমনের পথে ক্রমে একেবার স্তব্ধ হয়ে গেছে।

এর কারণ হিশেবে মনে করা হয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, সমাজসংস্থা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রের বিবর্তন। বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুধর্ম যখন শাসকশ্রেণীরও ধর্ম ছিল, ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে যখন একটা ঐক্যবন্ধন স্থাপিত হয়েছিল, সাধারণ মানুষও যখন সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল, তখনই হতে পেরেছিল ভাস্কর্যের এই বিকাশ। এছাড়া স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা তখন পরস্পর সম্পর্কিত ও একাত্ম ছিল। বিকাশের সেটাও একটা বড় কারণ।

ভারতবর্ষে ইসলামিক অধিকার ও আধিপত্যের পর থেকে ভাস্কর্য শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা হারাল। ইসলাম ধর্ম যেহেতু একেশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকতাবিরোধী, তাই মূর্তির কোনো স্থান নেই সেখানে। মূর্তিকলা বা ভাস্কর্য এমন একটি শিল্প সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া যার বিকাশ সম্ভব নয়। তাই দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শতক থেকে ভাস্কর্যের চর্চায় যে ভাটার শুরু, ঊনবিংশ শতকে এসে তা একেবারে শুষ্ক ধারায় পরিণত হয়।

ছবির ক্ষেত্রে কিন্তু ধারাবাহিকতাটা একেবারে লুপ্ত হয় নি। মুঘল সম্রাটরা ছিলেন ছবির পৃষ্ঠপোষক। এমনকী ঔরংজেব পর্যন্ত ছবির ক্ষেত্রে তাঁদের উৎসাহে ভাটা পড়ে নি। এই পৃষ্ঠপোষকতায় ইরানীয় চিত্রধারা এদেশের মাটিতে নতুন রূপ রসে সঞ্জীবিত হয়ে ভারতীয় চিত্রকলায় নতুন মাত্রা এনেছে। সেই ধারাই রাজপুত ও পাহাড়ি কলমে ঐতিহ্যের সারাৎসার আত্মস্থ করে প্রস্ফুটিত হয়েছে। আর লৌকিক একটা ঐতিহ্য তো ছিলই। কলকাতায় কালীঘাট বা বটতলার ছবিতে তার একটা নাগরিক চরিত্র আমরা লক্ষ করি। সেটা কখনো একেবারে রুদ্ধ হয় নি। অবনীন্দ্রনাথ এই উত্তরাধিকারের সুচারু প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। ছবিতে শূন্যতা যদি থেকেও থাকে সেটা খুব কম সময়ের।

ভাস্কর্যে এই ব্যবধানটা খুব দীর্ঘ। যার উপর সেতু রচনা বিংশ শতকে তিরিশের দশকে রামকিঙ্করের আগে সম্ভব হয় নি।

তবে আঞ্চলিকভাবে কিছু কিছু চর্চা যে ছিল না তা নয়। বাংলার মন্দিরের টেরাকোটা ভাস্কর্যগুলি হয়েছে। দক্ষিণ-ভারতে প্রথাগত মূর্তি-শিল্প একেবারে লুপ্ত হয় নি। এখনো বড় বড় ভাস্কর্যের কেন্দ্রগুলিতে গেলে দেখা যায় পরম্পরাগত শিল্পীরা ছোট ছোট মূর্তি তৈরি করে তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণকারীদের কাছে বিক্রি করছেন। পুরী বা

৫৭· জি· কে· ম্হাত্রে। টু দা টেম্পল। মার্বল। ১৯০০।

৫৮· বি ভি তালিম। ইন টিউন উইথ আলমাইটি। প্লাস্টার। ১৯২৫।

মহাবলীপুরমে এই দৃশ্য এখনো দুর্লভ নয়। কিন্তু এ থেকে কোনো আধুনিকতার উন্মেষ হয় নি।

আবার এই পরম্পরাগত ভাস্করদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে আর্ট স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত ভাস্করও হয়েছেন, এবং তাঁদের ঐতিহ্যগত ভাস্কর্যকেই আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন। দৃষ্টান্ত হিশেবে উল্লেখ করা যায় ওড়িশার শ্রীধর মহাপাত্রের কথা। ১৯০২ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা গিরিধারী মহাপাত্র কলকাতায় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস-এ 'পরম্পরাগত ভাস্কর্য শেখাতেন। চিন্তামণি করের ভাস্কর্যের প্রাথমিক শিক্ষা এই গিরিধারী মহাপাত্রের কাছেই। চিন্তামণি অবশ্য সেই শিক্ষায় তৃপ্ত হন নি। ফলে ভাস্কর্য ছেড়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে তিনি ছবি আঁকা শিখতে শুরু করেন। পরে প্রকৃত অর্থে ভাস্কর্যের প্রশিক্ষণ নেন প্যারিসে গিয়ে। এভাবে আমরা দেখব আমাদের প্রথম পর্যায়ের অধিকাংশ ভাস্করই প্রাথমিক শিক্ষাটা নেন বিদেশ থেকে। তবে সে অন্য প্রসঙ্গ।

এই শ্রীধর মহাপাত্র মাত্র ১৬ বছর বয়সে পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। প্রথমে 'সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস'-এই ছবি আঁকা শিখতে শুরু করেন। পরে অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশে তাঁর পিতা গিরিধারী মহাপাত্রের কাছে ভাস্কর্যের তালিম নিয়ে প্রস্তর ও দারু-ভাস্কর্যে দক্ষতা অর্জন করেন। পরে তিনি সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস-এ ভাস্কর্যের শিক্ষকও হন। ১৯৪৩-এ অসিতকুমার হালদারের আমন্ত্রণে লখনৌ-এর সরকারি আর্ট স্কুলে ভাস্কর্যের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এভাবে তাঁর মধ্য দিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যগত ভাস্কর্যের ধারা এ যুগের শিল্পীদের মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছে।

আবার কলকাতার কুমারটুলি বা কৃষ্ণনগরের অনেক মৃৎশিল্পী আর্ট স্কুলে শিখে প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর হয়েছেন এরকম দৃষ্টান্তও অনেক আছে। কিন্তু তাতে করে আমাদের ঐতিহ্যগত ভাস্কর্য আধুনিকতায় প্রবাহিত হয়েছে এরকম বলা যায় না। ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বা নব্য-বঙ্গীয় ঘরানার অন্যান্য শিল্পী যে চেষ্টা করেছিলেন এবং প্রভূত উৎসাহ উদ্দীপনায় যে বিরাট কর্মযজ্ঞ হয়েছিল তার পেছনে একটা গভীর আবেগ ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তর্গত স্বদেশ

চেতনার আবেগ। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে সেই আবেগ জাগানো যায় নি। তার কারণ প্রথমত, পাঁচ-ছশো বছরের চর্চার বিরাট ছেদ এবং এ-যুগেও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।

ফলে চিত্রকলার মতো কোনো নব্য-বঙ্গীয় ঘরানা ভাস্কর্যের নেই। নেই কোনো অবনীন্দ্রনাথ। প্রাথমিক পর্বে আমাদের বোধও শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক রীতির ভাস্কর ও ভাস্কর্য শিক্ষকরা। আর সেই ধারা ছিল মূলত মূর্তি তৈরির ধারা, আধুনিক ভাস্কর্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। এক কথায় বলতে গেলে ভারতবর্ষে ভাস্কর্যের ধারার অবলুপ্তির প্রধান কারণ যেমন পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, তেমনি আধুনিক যুগে ভাস্কর্যে ভারতীয় স্বাতন্ত্র্য না আসার বা বিলম্বিত হওয়ার প্রধান কারণও এই পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। অবনীন্দ্রনাথ বা হ্যাভেল চিত্রকলাকে যেভাবে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন, ভাস্কর্যকে তা পারেন নি।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে এই পৃষ্ঠপোষকতার পেছনে তৎকালীন ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরাট ভূমিকা ছিল। এর প্রথম পদক্ষেপ আর্ট স্কুলগুলো গড়ে তোলা। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য ধাঁচের প্রথম আর্ট স্কুল গড়ে উঠেছিল ১৭৯৮ সালে পুনেতে। চার্লস ওয়ার ম্যালেট নামে এক ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জেমস ওয়ালেস নামে এক শিল্পীর তত্ত্বাবধানে। এটা অবশ্য খুবই অল্পস্থায়ী হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশরা ভারতে শিল্প-শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন ১৮৫০-এর পর থেকে।

পার্থ মিত্রের লেখা থেকে ('স্ট্যাটাস অ্যান্ড পেট্রনেজ অব আর্টিস্টস ডিউরিং ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া ১৮৫০-১৯০০', দ্য পাওয়ার্স অব আর্ট—পেট্রনেজ ইন ইন্ডিয়ান কালচার, বারবারা স্টোলার মিলার সম্পাদিত অক্সফোর্ড প্রকাশিত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত) জানতে পারি ১৮৫৪-র ১৯ জুলাই তারিখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাতে ভারতে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের কিছুটা আভাস ধরা আছে। তাঁদের বক্তব্য ছিল এরকম :

> "শিক্ষার ক্ষেত্রটি ছাড়া অন্য কোনো কিছুই আমাদের অধিকতর মনোযোগ দাবি করতে পারে না। যে বিরাট নৈতিক ও বস্তুগত আশীর্বাদ প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিস্তার থেকে প্রবাহিত, সেটা ভারতীয় নেটিভদের মধ্যে সঞ্চার করা আমাদের অন্যতম পবিত্র কর্তব্য, যেটা ভারতবর্ষ সৌভাগ্যবশত (আন্ডার প্রভিডেন্স) ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্রে অর্জন করতে পারে।" (পৃ ২৭৮)

ব্রিটিশরা ভারতীয় নেটিভদের মধ্যে যে জ্ঞানের সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, সেই জ্ঞান হবে বাস্তবসম্মত ও জাগতিক। শিল্প-বিপ্লবের (ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন) ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ছিল পুরোভাগে। শিল্প-বিপ্লব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিরই অবদান। ফলে বিজ্ঞানচেতনা তাঁদের মধ্যে এতই সার্বিক ছিল যে ললিতকলাকেও তাঁরা বিজ্ঞান ও গণিতের নিরিখেই অনুধাবন করতেন। রেনেসাঁস থেকে অর্জিত তাঁদের যে নন্দনচেতনা, তা তাঁদের বাস্তব-আশ্রিত প্রকৃতির যথাযথ রূপায়ণকেই ললিতকলার একমাত্র আদর্শ বলে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সার্বিক না হলেও প্রাধান্য ছিল এই প্রবণতার। বিচারের সেই মাপকাঠিতে ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যকে হৃদয়ঙ্গম করা তাঁদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। যে কারণে রাসকিনকে বলতে হয়েছিল—"ভারতীয়েরা কখনো মানুষ আঁকতে পারে না, তাঁরা কেবল আঁকে আটবাহু বিশিষ্ট জানোয়ার।" বা বার্ডউড বলেছিলেন, "ললিত শিল্প হিশেবে চিত্র বা ভাস্কর্যের কোনো অস্তিত্বই ভারতবর্ষে নেই।"

ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় কারিগর বা কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণের জন্য যখন আর্ট স্কুল খোলার কথা ভাবলেন তখন তাঁরা স্বভাবতই জোর দিলেন যথাযথ অঙ্কন বা প্রকৃতির যথাযথ রূপায়ণের উপরে। যদিও সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই আর্ট স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু প্রথম দিকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই আর্ট স্কুলের সূচনা হয়েছিল। এভাবে ১৮৫০ সালে মাদ্রাজের রেসিডেন্ট সার্জন ডঃ আলেকজান্ডার হান্টার তাঁর নিজের খরচে মাদ্রাজে প্রথম আর্ট স্কুল খুললেন। উদ্দেশ্য ছিল "ললিতকলা সংস্কৃতির মানবিকীকরণ" ("দ্য হিউম্যানাইজিং কালচার অব দ্য ফাইন আর্টস")। পরের বছর সেখানে কারু-শিল্পের প্রশিক্ষণের জন্য আর একটি স্কুল খুলেছিল। হান্টার-এর নেতৃত্বে এই দুটি স্কুল কিছুদিনের মধ্যেই যুক্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং সরকারি অনুদানের ভিত্তিতে পরিচালিত হতে শুরু করেছিল। মাদ্রাজে কারুশিল্প প্রশিক্ষণ গুরুত্ব পেয়েছে বেশি এবং প্রকৃত কারিগর শ্রেণীর মানুষের শিক্ষাটা ফলপ্রসূ হয়েছে বেশি। কলকাতা ও বম্বেতে শিক্ষাটা ক্রমে মধ্যবিত্তের দখলে চলে যায়।

কলকাতায় 'দ্য স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'-এর সূচনা হয়েছিল ১৮৫৪ সালের ১৬ আগস্ট গরানহাটায় সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তিগত পরিচালনার প্রতিষ্ঠান হিশেবে। এরও একটু পূর্ব ইতিহাস আছে। ১৮৩৯-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় 'দ্য মেকানিকস ইনস্টিট্যুট' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের কারিগরি শিক্ষা দেওয়া। 'ইন্ডিয়া রিভিউ' নামে এক মাসিক পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক ডঃ ফেডেরিক কোরবিন-এর উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল এই স্কুল। প্রভাবশালী ইওরোপীয় ও ভারতীয় ব্যক্তিরা পরিচালন সমিতিতে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইয়ংবেঙ্গল-এর নেতা বিখ্যাত তারাচাঁদ চক্রবর্তী একজন। ভালোভাবে শুরু হয়েও এই সংস্থা বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে নি সম্ভবত জনসাধারণের সক্রিয়তার অভাবে। চল্লিশ দশকের (উনবিংশ শতক) শেষ দিকে এর সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু শোনা যায় না। কিন্তু প্রয়োজন বোধটা থেকে গিয়েছিল। ইচ্ছেটাও থেকে গিয়েছিল। এরই পরিণতি ১৮৫৪-র স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট। (সূত্র যোগেশচন্দ্র বাগল : হিসট্রি অব দ্য গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফটস, ক্যালকাটা, শতবার্ষিকী সংকলন)।

বম্বেতে এরকম একটি স্কুলের সূচনা হয়েছিল ১৮৫৬-তে। এর পেছনে পারসি শিল্পপতি জমসেদজি জিজিভাই-এর বিরাট অবদান ছিল। ১৮৫১-তে লন্ডনে 'গ্রেট একজিবিশন' নামে একটা বিরাট প্রদর্শনী হয়েছিল। ব্রিটেনে শিল্প-শিক্ষার বিবর্তনে এই প্রদর্শনীর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এবং ভারতেও আর্ট স্কুল গড়ার সিদ্ধান্তের পেছনে এই 'গ্রেট একজিবিশন'-এর প্রভাব কাজ করেছে। জামসেদজি জিজিভাই-এর ওপর দায়িত্ব ছিল এই প্রদর্শনীতে ভারতীয় শিল্প-দ্রব্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার। এই প্রদর্শনীতে ভারতীয় বিভাগের সাফল্য তাঁকে খুব উদ্বুদ্ধ করে। এবং ১৮৫৩ সালে তিনি একটি আর্ট স্কুল খোলার জন্য এক লাখ টাকা দিতে সম্মত হন। যেজন্য বম্বের আর্ট স্কুল ও পরবর্তীকালে আর্ট কলেজের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হয়ে আছে। সেই ১৮৫৬ সালে বম্বেতে যে স্কুলটি খোলা হয়েছিল, তার প্রশিক্ষণ তালিকায় ছিল—পেইন্টিং, ড্রয়িং ও ডিজাইন, অর্নামেন্টাল পটারি, মেটাল ও উড কার্ভিং। উড কার্ভিং-এর মধ্য দিয়ে ভাস্কর্যের শিক্ষাটাও সেখানে শুরু হয়েছিল।

কলকাতায় ১৮৫৪-তে স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট সূচনার সময় থেকেই পাঠক্রমের মধ্যে মৃৎশিল্প বা ক্লে মডেলিংটা ছিল। এম রিগো (M. Rigaud) নামে একজন শিল্পী সাময়িকভাবে ক্লে-মডেলিং শেখাতে রাজি হয়েছিলেন। এবং একেবারে শুরুতেই ক্লে-মডেলিং বিভাগে ৪৫ জন ছাত্র ভরতি হয়েছিলেন। পেইন্টিং-এ ছিল ৫০ জন।

৫৬. এন জি পানসারে। আর্কিটেকচারাল রিলিফ। পাথর। ১৯৪৮।

৬০· *হিরণ্ময় রায়চৌধুরী। বসন্ত। মার্বল।*

মডেলিং-এর এই ৪৫ জন ছাত্রের একজনের কথা আমরা জানতে পারি কমল সরকারের 'ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী' গ্রন্থে। তাঁর নাম গোপালচন্দ্র পাল। এম রিগোর অধীনে তিনি মডেলিং অনুশীলন করেন। অন্নদা-জীবনী (১৩১৪) গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বলা আছে, "শিল্প বিদ্যালয়ে সুবিখ্যাত মডেলিং শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র পাল মুসে রিগোর শ্রেষ্ঠতম ছাত্র।···তিনি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের ইচ্ছানুসারে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হন।" পরে হেনরি ডোভার লক যখন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ, তখন তিনি এই স্কুলেরই মডেলিং শিক্ষক নিযুক্ত হন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ওড়িশাব পুরাতত্ত্ব ও স্থাপত্য বিষয়ক গবেষণার সাহায্যের জন্য যে দলটি ওড়িশায় যায় সেই দলে তিনিও ছিলেন। ১৮৮০-৮১-তে মেলবোর্নে যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়, তাতেও তাঁর ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়েছে।

যদিও ১৮৫৪-তে প্রতিষ্ঠিত স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট-এর প্রথম পর্যায়ের ৪৫ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র একজনের কথাই আমরা এখন জানতে পারি, অন্যদের সম্বন্ধে বলার মতো কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই, তবু একথা মনে রাখতে হয়, কলকাতায় এরকম ভাস্করদের আবির্ভাব স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই মাত্র নয়। পরম্পরাগত মূর্তি-শিল্পের একটা ধাবা অবশ্যই ছিল। তাঁদের কেউ কেউ মূর্তি রচনায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধিও অর্জন করেছেন এই স্কুলের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতভাবেই।

এরকম একজন মৃৎশিল্পী সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাই কমল সরকারের বইতে। তিনি নবকুমার পাল। কলকাতায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠাব অনেক আগেই ভাস্কর হিশেবে তিনি বিখ্যাত হন। উনবিংশ শতকের চল্লিশের দশকেই তিনি লর্ড অকল্যান্ড, এইচ টি প্রিন্সেপ, ডাঃ এইচ এইচ গুডিভ, ডাঃ ডাবলিউ বি ওশানেশি, ডাঃ এগারটন ও ডেভিড হেয়ারের মূর্তি করেন এবং কলকাতার মেডিকেল কলেজে এগুলো সংগৃহীত হয়। কলকাতার রাজভবনের সামনের সিংহদুটিও নাকি তাঁরই করা। কলকাতার স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট-এ পরে তাঁকে মডেলিং শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়।

কলকাতা বা কৃষ্ণনগরে এরকম বহু মৃৎশিল্পী স্বভাবতই ছিলেন। মূর্তি শিল্পে তাঁদের পারদর্শিতা আর্ট স্কুলের শিক্ষা-নিরপেক্ষভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আধুনিক যুগে ভাস্কর্য কলার সূচনায় তাঁরা অবশ্যই স্মরণীয়। সেই পরম্পরার অনেক শিল্পী আর্ট স্কুল বা কলেজের শিক্ষা নিয়ে বা না নিয়ে সম্প্রতিকালেও মূর্তি বা সৃজনশীল ভাস্কর্যেও যথেষ্ট অভিঘাত রেখেছেন। ঐতিহ্যের একটা প্রসারণ এই সব শিল্পীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

কিন্তু ছবির ক্ষেত্রে আধুনিকতার আগে যেমন বিশেষ কতকগুলি ধারা আমরা দেখতে পাই, যেমন—কোম্পানি স্কুল, কালীঘাটের পট, বটতলার কাঠখোদাই ছবি ইত্যাদি, যেগুলো পরে আধুনিকতাকেও খুব প্রভাবিত করেছিল, ভাস্কর্যে সেরকম কোনো পরম্পরা নেই। এর প্রধান কারণ পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। তবে কলকাতার ছবির কথা বলতে গিয়ে আমাদের যেমন ইওরোপ থেকে ভারতে আগত শিল্পীদের চর্চার কথা মনে রাখতে হয়, ভাস্কর্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তেমনি। কোনো ব্রিটিশ বা ইওরোপীয় ভাস্কর সেই যুগে ভারতে এসে চিত্রকরদের মতো প্রভাব বিস্তার করেছিলেন কিনা বা অভিঘাত সৃষ্টি করেছিলেন কিনা সেরকম কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই, তবে কলকাতা বা অন্যান্য বড় শহরে রাজন্যবর্গ বা বিখ্যাত ব্যক্তিদের মূর্তি প্রতিষ্ঠার একটা ইতিহাস আছে।

এখানে কমল সরকারের 'কলকাতার স্ট্যাচু' বইটি আমাদের সহায়ক। কলকাতায় প্রথম মূর্তিটি বসেছিল ১৮০৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে। সঠিক তারিখটি জানা যায় না। মার্কুইস কর্নওয়ালিসের এই মূর্তিটির রচয়িতা ছিলেন জন বেকন নামে ইংল্যান্ডের পিতা ও পুত্র দুই ভাস্কর। পাদপীঠ সহ ১৫ ফিট উচ্চতার শ্বেতপাথরের এই মূর্তিটির দুপাশে আছে পূর্ণাবয়ব বসে থাকা দুই নারীর দুটি অঙ্গমূর্তি। ভাস্কর্যটির মোট প্রস্থ দশ ফিট ছয় ইঞ্চি। মূর্তিটি প্রথম বসানো হয়েছিল কলকাতায় টাউন হলে। ১৯২০ সাল পর্যন্ত সেখানেই ছিল। তারপর সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে স্থানান্তরিত করা হয়। এখন পর্যন্ত সেখানেই মূর্তিটি রয়েছে। কলকাতার দ্বিতীয় মূর্তিটি মার্কুইস হেস্টিংস-এর। বসেছিল ১৮২৯ সালে। শিল্পী ছিলেন জন ফ্ল্যাক্সম্যান।

এইভাবে ১৯৪৭ এ স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ভারতীয়দেরও উৎসাহে অজস্র মূর্তি বিভিন্ন শহরে বসে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের মূর্তির বাইরে ভাস্কর্যের যে অন্য কোনো অর্থ আছে এটা ইংরেজ রাজত্বে ভারতবাসী প্রায় জানেই নি। তবে ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে আর এক ধরণের ভাস্কর্যের খুব আমদানি ঘটেছিল ভারতবর্ষে। এই

৬১· অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাটুমকাটাম: বার্ড ইন স্টর্ম।

৬২· এন জি পানসারে। স্ট্যান্ডিং উওম্যান। কাঠ।

লর্ড কর্নওয়ালিশ-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত হয়েছিল যে উঠতি ধনী ও জমিদার শ্রেণী, তাদের বাড়ি ও বাগানবাড়ি সাজানোর জন্য আমদানি করা হচ্ছিল মিলোর ভেনাস-এর মার্বলের নকল, দোনাতেল্লোর অর্ধশায়িত ভেনাস, রোমান ও গ্রিক দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি নকল ভাস্কর্য।

১৮২০ থেকেই যদিও রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল কিন্তু তার কোনো প্রভাব চিত্র-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পড়ে নি। ১৮৫৪-তে গরানহাটায় 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'-এর প্রতিষ্ঠা, আগেই বলা হয়েছে, কলকাতায় প্রথম ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পশিক্ষার সূচনা। ১৮৬৪-র ২৯ জুন এইচ এইচ লক এর অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। স্কুলটি স্থানান্তরিত হয় ১৬৬ নম্বর বউবাজার স্ট্রিটে এবং ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন-এর পরিচালনাধীনে আসে। ১৮৬৫-তে এর নাম হয় গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট। ১৯৫১-তে 'গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট' নামকরণের আগে পর্যন্ত ওই নামই ছিল।

এই আর্ট স্কুল সত্ত্বেও ১৮৯৫-এর আগে চিত্রকলায় কোনো জাতীয় চেতনা বা আধুনিকতার উন্মেষ ঘটে নি। আর্ট স্কুলের শিক্ষাক্রমে অবশ্য মডেলিং ও প্লাস্টার কাস্টিং বিষয়টি শুরু থেকে বরাবরই ছিল। এবং মডেলিং-এ এখানকার অনেক ছাত্র যথেষ্ট পারদর্শিতাও দেখিয়েছেন। যেমন ১৮৬৫-তে অধ্যক্ষ লক-এর সহায়তায় এখানকার ছাত্ররা এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর মানুষের আদলে অনেক আবক্ষ মুখাবয়ব (ethnological bust) ভাস্কর্য করেছিলেন, যেগুলো যথেষ্ট প্রশংসিতও হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ভাস্কর্যের কোনো চেতনা জাগে নি বিংশ শতকের আগে পর্যন্ত।

এমনকী আমাদের যে সমৃদ্ধ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও নবজাগরণের প্রবক্তাদের কোনো সচেতনতা জাগে নি। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত তাঁর এক লেখায় বলেছেন—এর একমাত্র ব্যতিক্রম ঈশ্বর গুপ্ত। (বিভাব, বিশেষ ভাস্কর্য সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৩) ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৫১-তে তাঁর 'ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র' নামে রচনায় লিখেছিলেন যে গৌড়ের মন্দির ও স্মৃতিস্তম্ভগুলি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে, এদের আশু সংস্কারের প্রয়োজন।

আমাদের স্থাপত্য ও পুরাকীর্তি সম্বন্ধে সচেতনতার প্রকাশ শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের সত্তরের দশক থেকে। ১৮৭৫-এ বেরিয়েছিল ওড়িশার পুরাকীর্তি বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বইয়ের প্রথম খণ্ড। ১৮৯৬-তে প্রকাশিত হয়েছিল জেমস ফারগুসনের ভারতীয় স্থাপত্যের উপর বই। ১৮৯৮-তে বেরোয় ফরাসি ভাষায় মরিস স্যাঁদ্র বই। তারও আগে ১৮৭৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ভাষায় প্রথম শিল্প বিষয়ক আলোচনা—শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্প-চাতুরি।'

এই সচেতনতা চিত্রকলার ক্ষেত্রে নবজাগরণের সূচনা করেছিল। অবনীন্দ্রনাথ ১৮৯৫-তে 'রাধাকৃষ্ণ' চিত্রমালা শুরু করেন। ই বি হ্যাভেল ৬ জুলাই ১৮৯৬ মাদ্রাজ থেকে এসে কলকাতার আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেন। এই দুটি ঘটনা নব্য-বঙ্গীয় চিত্রধারার সূচনার ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু ভাস্কর্যে তখনো তেমন কোনো ইশারা দেখা গেল না। তখন পর্যন্ত ইওরোপীয় অ্যাকাডেমিক রীতির বাইরে পা দিতে পারে নি ভাস্কর্য। বা অ্যাকাডেমিক রীতিতেও তেমন দক্ষতা বা বৈদগ্ধ্য আসে নি।

এর মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় প্রথম চারুকলা সংস্থা 'ব্রাশ ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩১ সালে। ১৮৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় শিল্প-সংস্থার নাম—'সোসাইটি ফর দা ইমপ্রুভমেন্ট অব ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং অ্যান্ড স্কাল্পচার'। এর নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে সেই ১৮৪২ সালেই প্রাচ্য ভাস্কর্য সম্পর্কে আগ্রহ জেগেছিল কিছু মানুষের মনে। কিন্তু এই সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। কমল সরকার লিখছেন, 'কিন্তু কে বা কারা সংস্থাটির উদ্যোক্তা তার কোনো উল্লেখ নেই খবরে। ফলে কলারসিক ওই ভারতীয়দের নামও জানা যায় না। তা ছাড়া এঁরা কোনো প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন কিনা, তাও অজ্ঞাত। তবুও এই উদ্যোগটি উল্লেখযোগ্য। কারণ, প্রাচ্য অর্থাৎ ওরিয়েন্টাল শিল্পকলা সচেতন কয়েকজন রসজ্ঞ এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তা কৌতূহলোদ্দীপক।' (দেশ, ৫ জুন ১৯৮৩)

তবু বিংশ শতকের প্রথম তিনটি দশক পর্যন্তও ভাস্কর্যে যে কোনো আধুনিকতা বা ভারতীয় স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিত এল না, তার প্রধানতম একটি কারণ হতে পারে এরকম যে—যে ব্রিটিশ প্রবর্তিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাধারায় ভারতবর্ষ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পদার্পণ করছিল, সেই শিক্ষাধারায় প্রকৃত নন্দনচেতনার বিকাশ সম্ভব ছিল না। আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন অনেক প্রভাবশালী ইওরোপীয় ও ইংরেজের মনে বিজ্ঞান ও ললিতকলার সম্পর্ক বিষয়ে এরকম এক ধারণা এনেছিল যে ললিত-কলাকেও হতে হবে বাস্তবের অনুরূপ, গাণিতিক হতে পারাতেই তার সফলতা। এই প্রত্যয় থেকে ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় ঐতিহ্যসম্পৃক্ত আধুনিকতার বিকাশ দুরূহ ছিল। আমরা জানি বা দেখব যে এটা শেষ পর্যন্ত ঘটতে পেরেছিল রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডল থেকেই।

দুই

পূর্বসূরি

এই প্রবন্ধে আমাদের প্রধান আলোচ্য ভাস্কর্যের প্রথম প্রজন্ম। এখানে ভাস্কর্য বলতে আমরা আধুনিক ভাস্কর্য বুঝব। এর আগে ইওরোপীয় ভাস্কর্যের আধুনিকতা বিষয়ক আলোচনাটিতে আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি ইওরোপে ভাস্কর্যের আধুনিকতার স্বরূপ কি। রদাঁর 'ব্রোঞ্জ এজ' ভাস্কর্যটি থেকে আমরা শুরু করেছিলাম। পূর্ববর্তী ভাস্কর্য-সম্পর্কিত যে প্রত্যয় তার সামনে একটি প্রশ্নচিহ্নের মতো আবির্ভূত হয়েছিল এই 'ব্রোঞ্জ এজ'। রদাঁর ভাস্কর্যকে অনেকে ইম্প্রেশনিস্টদের তত্ত্ববিশ্বের সঙ্গে যোগ করতে চান। প্রকারান্তরে ইম্প্রেশনিজমও প্রকৃতির প্রতিরূপ বা প্রতিফলন বলে অনেকে হয়তো আধুনিকতার সন্ধানে পিকাসো বা ব্রাঁকুসি পর্যন্ত এগিয়ে যেতে চান। আধুনিকতা বলতে একটা স্বতন্ত্র বিশ্বদৃষ্টিকে বোঝাতে চান তাঁরা যেখানে ভাস্কর্য প্রকৃতির প্রতিরূপ না হয়ে বা প্রকৃতিকে নকল না করে প্রকৃতির নিহিত সত্যকে উন্মীলিত করবে, হয়ে উঠবে প্রকৃতিরই সমান্তরাল এক সৃষ্টি।

আধুনিকতার এই প্রত্যয়ে পৌঁছতে ভারতীয় ভাস্কর্যের অনেক সময় লেগেছে। এখনো সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় স্বাতন্ত্র্য বলে কিছু আছে কিনা আধুনিক ভাস্কর্যে সে বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন। তবে সেই সন্ধানটা যে আছে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই; সেই সন্ধানের স্বরূপ কি, কেমন করে সেই সন্ধানের মধ্য দিয়ে আমাদের সভ্যতার বিস্তীর্ণ ঐতিহ্য সাম্প্রতিক বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বিত হয়ে এক অভিনব রূপচেতনার সৃষ্টি করছে, সেটাই এ প্রবন্ধে ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রবন্ধে আমাদের অন্বিষ্ট।

ভাস্কর্যে সেই সন্ধানটা শুরু হয়েছিল মোটামুটি বিংশ শতকের তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে। এবং রামকিঙ্করই আনেন প্রথম সেই মুক্তির ইঙ্গিত। এ লেখায় আমাদের মুখ্য আলোচ্য রামকিঙ্কর ও তাঁর সমসাময়িক ভাস্করদের অবদানের স্বরূপ। কিন্তু এখানে পৌঁছোনোর আগে আরো প্রায় চারটি প্রজন্মের বা প্রায় এক শতকের ইতিহাস ছিল আমাদের ভাস্কর্যের। তারই কিছুটা আভাস আমরা পূর্ববর্তী অংশে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বুঝতে চেষ্টা করেছি সনাতন ভারতীয় ভাস্কর্য ও সমকালীন ভাস্কর্যের মধ্যবর্তী যে শূন্যতা, সেই শূন্যতার কারণ কি। সেই শূন্যতাকে অতিক্রম করার প্রয়াস চলেছে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। কিন্তু উনবিংশ শতক জুড়ে ভারতীয় ভাস্করদের যে সন্ধান তাতে

ব্রিটিশ শিক্ষা ও ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক রীতির প্রভাব এত প্রবল যে সেই প্রভাবের বাইরে গিয়ে নতুন কোনো দিগ্‌দর্শন খোঁজা সম্ভব হয় নি অনেকের পক্ষেই। তবু সেই সব শিল্পীর কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের ভাস্কর্য বিংশ শতকে এসে পৌঁছেছে।

এই অংশে তাই আমাদের আলোচ্য সেইসব শিল্পী মূলত পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতি যাঁরা অনুসরণ করেছেন। এরই চূড়ান্ত সফলতা আমরা দেখি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাজে। ভারতীয় ভাস্কর্যে আধুনিকতার যাঁরা প্রবক্তা তাঁদের অনেকেই দেবীপ্রসাদের ছাত্র। সেই হিশেবে সমকালীন ভাস্কর্যে দেবীপ্রসাদের অবদান অপরিসীম। এ লেখার পরবর্তী বা তৃতীয় অংশে আমরা কেবল দেবীপ্রসাদের কাজ অনুধাবনের চেষ্টা করব। তার আগে এই দ্বিতীয় অংশে আমরা আলোচনা করব সেই সব ভাস্করের কথা উনবিংশ শতকে যাঁদের জন্ম, উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশক পর্যন্ত যাঁরা কাজ করেছেন। এদের অনেকেই ইওরোপে গিয়ে কাজ শিখেছেন, কেননা তখন ভারতবর্ষে ভাস্কর্য শেখার সুযোগ ছিল খুবই সীমিত।

সেই সময় বহু ভাস্করই সারা ভারতবর্ষে কাজ করেছেন। কলকাতা ও বম্বেতেই তাদের সংখ্যা ছিল বেশি। তাদের অধিকাংশই প্রতিমূর্তি শিল্পী। এর বাইরে রচনাধর্মী ভাস্কর্য করার তখন বিশেষ প্রচলন বা সুযোগ ছিল না। তাঁদের অনেকের সম্বন্ধে এখন কোনো তথ্য সংগ্রহ কবা দুরূহ। আমরা এখানে মোটামুটি ১৫ জন ভাস্করকে বেছে নিলাম, যাঁদের জন্ম ১৯০০ সালের আগে। জন্ম-বছরের ক্রম অনুসারে তাঁদের উল্লেখ করা হল। এ ব্যাপারে খুবই সহায়ক হয়েছে কমল সরকারের 'ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী' বইটি।

এঁদের মধ্যে প্রবীণতম যদুনাথ পাল। তাঁর জন্ম ১৯৩৮-এ। প্রায় একশো বছর বেঁচেছিলেন। মৃত্যুর তারিখ সঠিক জানা যায় না। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণিতে তাঁর জন্ম এক মৃৎশিল্পী পরিবারে। বাবা আনন্দ পাল ও কাকার কাছেই তাঁর মৃৎশিল্পে হাতে খড়ি। পরে কলকাতার আর্ট স্কুলে মডেলিং শেখেন, হেনরি হোভার লক তখন অধ্যক্ষ। পরে সরকারি আর্ট স্কুলেই মডেলিং শিক্ষক নিযুক্ত হন। যদুনাথ মূলত মূর্তিশিল্পী ছিলেন। বহু বিখ্যাত মানুষের মূর্তি রচনা করে তিনি দেশ-বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি রচনা করে আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হ্যাভেলের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং সেজন্য আর্ট কলেজের চাকরিও ছেড়ে দেন।

রোহিণীকান্ত নাগকে বলা হয় ইটালিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম বাঙালি ভাস্কর। মাত্র ২৭ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। ১৮৬৮-তে জন্ম, ১৯৮৫-তে মৃত্যু। ঢাকা জেলার এক ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান তিনি। কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে তাঁর শিক্ষা। হেনরি জবিন্স তখন অধ্যক্ষ। ১৮৯০ সালে ২২ বছর বয়সে তিনি ইটালি যাত্রা করেন এবং রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। ১৮৯১-তে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। রোমে অন্যান্য শিল্প-প্রতিযোগিতায়ও তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। ১৮৯২-তে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাঙালি শিল্পীদের প্রথম চারুকলা সংস্থা, নাম 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য প্রমোশন অব ফাইন আর্টস অ্যান্ড ন্যাশনাল গ্যালারি'। তিনি এর অন্যতম আহ্বায়ক ছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর প্রবাসের পর তিনি ইটালিতেই যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হন, এবং ১৮৯৫-এর এপ্রিল মাসে অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৩ মে, ১৮৯৫ কলকাতায় ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রচুর ছবি ও ভাস্কর্য তিনি ইটালিতেই ফেলে এসেছিলেন। দুবছর পর ১৮৯৭ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজ ব্যয়ে সেগুলি ইটালি থেকে কলকাতায় আনান। তাঁর অকাল মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন সম্ভাবনাময় ভাস্করকে হারিয়েছে।

মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত ভাস্কর গণপৎ কাশীনাথ ম্হাত্রের (১৮৭৬-১৯৪৭) সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের নামটি যুক্ত হয়ে আছে।
৫৭ ম্হাত্রে ১৮৯৬ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে 'টু দ্য টেম্পল' নামে একটি প্লাস্টারের মূর্তি গড়েন। পরে ১৯০০ সালে সেটিকে মার্বল-এ রূপান্তরিত করেন। প্রদীপ হাতে মন্দির অভিমুখী এক মহারাষ্ট্রীয় নারীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি এটি। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এটি কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি নয়; রচনাধর্মী ভাস্কর্যের একেবারে গোড়ার দিকের একটি দৃষ্টান্ত। সেই হিশেবে যথেষ্ট অভিনব। প্লাস্টার মূর্তিটির দুটি আলোকচিত্র লন্ডনে স্যার বার্ডউডের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এই শিল্পী যাতে বিদেশে গিয়ে শেখার সুযোগ পান সেজন্য। এই প্রসঙ্গ নিয়ে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তখন রবীন্দ্রনাথ মূর্তিটির ও এর শিল্পীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অস্বাক্ষরিত দুটি রচনা লেখেন। প্রথমটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায়, দ্বিতীয়টি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রদীপ' পত্রিকায়

রঙিন ছবি ৬· ভি·পি· কারমাকার। ব্লোইং দ্য কোঞ্চ (শঙ্খধ্বনি)। ১৯২৪।

রঙিন ছবি ৭· পিলু পোচখনওয়ালা। আইকন-১। সিরামিক ও ইস্পাত। ১৯৮১।
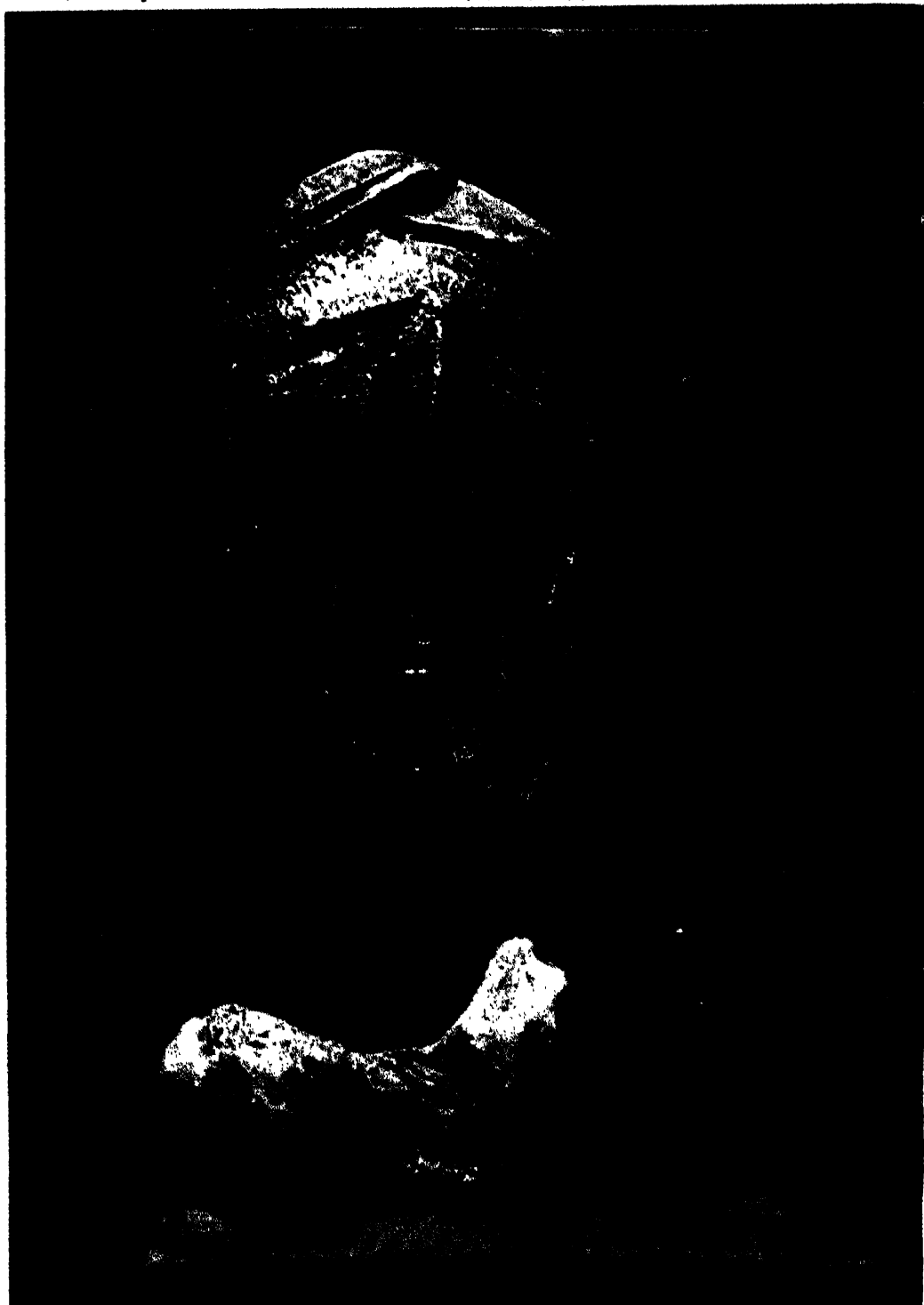
১৩০৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বলেছিলেন—"এই নবীন শিল্পীর অভ্যুদয়ে আমাদের চিত্ত আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।"

ম্হাত্রের জন্ম পুনায়। ১৮৯১-তে তিনি বম্বের স্যার জে জে স্কুল অব আর্টে ভর্তি হন। এবং চিত্র ও ভাস্কর্য উভয়েতেই কৃতিত্ব দেখান। তাঁর 'টু দ্য টেম্পল'-এর ছবি দেখে বার্ডউড খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর সেজন্যই তাঁর বিদেশে শিক্ষা অনুমোদন করেন নি। বলেছিলেন, যে তাতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে যাবে। পরবর্তী জীবনে ম্হাত্রে অজস্র কাজ করেছেন। প্রস্তর ভাস্কর্যেই তিনি বিখ্যাত।

কলকাতার শীতলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৭৯-তে। নিজের চেষ্টায় তিনি চিত্র ও ভাস্কর্য আয়ত্ত করেন। সেই সময়ের বড় শিল্পী শশীকুমার হেশ তাঁর ভাস্কর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ইটালিতে গিয়ে শেখার অনুরোধ করেন। খানিকটা এগিয়েও শেষ পর্যন্ত পারিবারিক কারণে তাঁর যাওয়া হয় নি। তাঁর একটি শ্বেতপাথরের লক্ষ্মীমূর্তি দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে এক চা-চক্রে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ অনেককে দেখানো হয়। সকলেই এর উচ্চ প্রশংসা করেন। ষাটের দশকে ৮০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

অশ্বিনীকুমার বর্মণ (রায়)-এর জন্ম ১৮৮২ সালে ময়মনসিংহ জেলায়। প্রখ্যাত সাংবাদিক দেবজ্যোতি বর্মণ তাঁরই পুত্র। আনুমানিক ১৯০৯ সালে তিনি ইওরোপ যান। ইংলন্ডে উইলিয়াম চার্লস মে-র স্টুডিওতে ভাস্কর্য শেখেন। উইলিয়ম রদেনস্টাইন-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ভাস্কর্য করা ছাড়াও শিল্পকলা বিষয়ক লেখালেখিতেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য: 'বেদব্যাস', 'ক্যালভেরির যন্ত্রণা', 'স্নেক চার্মার', 'কিউপিডস সিমপ্যাথি ইন লভস ডিসট্রেস' ইত্যাদি। নাম থেকেই বোঝা যায় নিছক প্রতিকৃতির বাইরেও তিনি ভাস্কর্য করতেন। সম্ভবত ইংলন্ডেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিনায়করাও ভেঙ্কটরাও ওয়াঘ (১৮৮৩-১৯৫৮) মূলত প্রতিকৃতি-ভাস্কর ছিলেন। মহারাষ্ট্রের কারোয়ারে তাঁর জন্ম, বোম্বাই-এর স্যার জে জে স্কুল অব আর্ট-এ শিক্ষা। শ্বেতপাথর ও ব্রোঞ্জ উভয় মাধ্যমেই তাঁর প্রতিকৃতি ভাস্কর্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। ১৯৫১-তে রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন ভারতের রাষ্ট্রপতি, তখন তিনি রাষ্ট্রপতির ভাস্কর নিযুক্ত হন। কলকাতার গিরিশ পার্কে তাঁর করা গিরিশচন্দ্র ঘোষের শ্বেতপাথরের মূর্তি আছে।

হিরণ্ময় রায়চৌধুরী (১৮৮৪-১৯৬২) একজন বড় প্রতিকৃতি ভাস্কর ছিলেন, এর সঙ্গে তাঁর আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় যে তিনি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সুধীররঞ্জন খাস্তগীর ও প্রদোষ দাশগুপ্তের মতো প্রথম প্রজন্মের প্রখ্যাত ভাস্করদের শিক্ষক ছিলেন। সেদিক থেকে সমকালীন ভাস্কর্যে তাঁর অবদান গভীর। যশোরে তাঁর জন্ম। ১৯০৫ সালে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। ই বি হ্যাভেল তখন অধ্যক্ষ। ১৯০৭ সালে কলকাতায় এসেছিলেন স্থপতি ও ভাস্কর লিওনার্ড জেনিংস। তাঁর সহকারীরূপে তিনি কাজ করেন, পরে জেনিংস-এর পরামর্শে তিনি ১৯১০ সালে ইংল্যান্ড যান এবং লন্ডনের রয়াল কলেজ অব আর্ট-এ ভরতি হন। ফিরে এসে ১৯১৫ সালে শ্রীনগরের ড্রয়িং স্কুলে অল্প কিছুদিনের জন্য শিক্ষকতা করেন। ১৯২৫-এ জয়পুরের মহারাজার আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯২৯-এ লখনৌ-এর সরকারি আর্ট স্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দেন। লখনৌ-এ তিনিই মডেলিং শিক্ষার সূচনা করেন। বহু প্রখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি ভাস্কর্য তিনি করেছেন। মানুষের অবয়বকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর জুড়ি ছিল না। ৬০

মহীশূরের মানুষ কে· ভেংকটাপ্পা (১৮৮৭-১৯৬৫) নব্য-বঙ্গীয় ঘরানার একজন প্রখ্যাত চিত্রকর। কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে এবং অবনীন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মার কাছে তাঁর শিক্ষা। ভাস্কর্যেও তাঁর নৈপুণ্য ছিল কিন্তু প্রতিকৃতি ভাস্কর্যই তিনি প্রধানত করেছেন। এই একটি দৃষ্টান্ত যে স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন শিল্পী ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাকাডেমিক রীতির বাইরে যেতে পারলেন না। সেই সময়ের ভাস্কর্যে এটাই ছিল একটা সমস্যা।

মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত ভাস্কর বালাজি বসন্তরাও তালিম-এর জন্ম ১৮৮৮ সালে হায়দরাবাদে। বোম্বাই-এর স্যার জে জে স্কুল অব আর্ট-এ তিনি চিত্রকলা ও ভাস্কর্য শেখেন। পরে সেই স্কুলেই শিক্ষকতা করেন। প্রস্তর ও ধাতুতে অজস্র প্রতিকৃতি ভাস্কর্য যেমন তিনি করেছেন, তেমনি রচনামূলক ভাস্কর্যও করেছেন। রচনাধর্মী ভাস্কর্যেও অবশ্য যথাযথ স্বাভাবিকতায় রূপায়িত মানুষের অবয়বই প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন ১৯২৫-এ করা 'ইন টিউন উইথ দ্য অল মাইটি' ৫৮ নামে ভাস্কর্যটিতে দেখা যাচ্ছে এক বৃদ্ধ বসে দোতারা জাতীয় যন্ত্র বাজিয়ে তন্ময় হয়ে গান গাইছে। রূপায়ণে

স্বাভাবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হতে হয়। এরকম দক্ষতা তাঁর সমস্ত কাজে। ১৯৭০-এর ২৫ ডিসেম্বর প্রায় ৮২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মাত্র ৩৮ বছর জীবনকালের মধ্যে ফণীন্দ্রনাথ বসু (১৮৮৮-১৯২৬) ভারতে এবং ইওরোপে ভাস্কর হিশেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ঢাকা বিক্রমপুরে জন্ম। প্রথমে জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমি পরে সরকারি আর্ট স্কুলে তাঁর শিল্প-শিক্ষা। ১৯০৪ সালে ইটালি যান। পরে সেখান থেকে লন্ডনে আসেন এবং এডিনবরা কলেজ অব আর্ট-এ ভর্তি হন। সেখানে পার্শি পোর্টসমাউথ-এর অধীনে ভাস্কর্য শেখেন। এরপর তিনি ফ্রান্স ও ইটালিতে যান। ফ্রান্সে রদাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ইওরোপে থাকার কারণেই হয়তো বেশ কিছু রচনাধর্মী ভাস্কর্য তিনি করেন।

মহারাষ্ট্রের বাবুরাও পেন্টার (১৮৯০-১৯৫৪) নিজের চেষ্টায় ছবি ও ভাস্কর্য শেখেন। প্রতিকৃতি ভাস্কর্যে তাঁর খ্যাতি ছিল। এছাড়া তিনি একজন প্রথিতযশা চলচ্চিত্র নির্মাতাও ছিলেন।

এই শতকের প্রতিভাদীপ্ত ভাস্করদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের বিনায়ক পাণ্ডুরং কারমাকার (১৮৯১-১৯৬৬) প্রধানতম একজন। বাস্তববাদী ভাস্কর্যে তাঁর সমকক্ষ খুব কমই আছে। মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার সাসোনে নামে গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা পাণ্ডুরং কারমাকার ছিলেন প্রসিদ্ধ গণপতি প্রতিমা নির্মাতা। কৃষি ছিল তাঁর জীবিকা। ধ্রুপদী সংগীতেরও একজন শিল্পী ছিলেন তিনি। পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত তাঁর মূর্তি নির্মাণের দক্ষতা নিয়ে বিনায়ক তরুণ বয়সে ওই অঞ্চলের কালেকটারের নজরে পড়ে যান। তাঁরই চেষ্টায় বোম্বাই-এর জে জে স্কুল অব আর্টে ভর্তি হন ১৯১০ সালে। বোম্বাইতে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সুরেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে কারমাকার কলকাতায় আসেন ১৯১৬-তে এবং ঝাউতলা রোডে স্টুডিও তৈরি করেন। ১৯২৫ পর্যন্ত কলকাতায় তাঁর স্টুডিও ছিল। ফলে কলকাতায় তিনি খুব পরিচিত এবং এখানে তার করা অনেক ভাস্কর্যও আছে। ১৯২০-তে তিনি লন্ডন যান। সেখান থেকে ফ্রান্স, ইটালি ও সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করেন। কারমাকার অবিশ্রান্ত ধারায় কাজ করেছেন। ভারতীয় জীবনকে, এর

র-৬ নর-নারী পশু সব কিছু নিয়ে, তিনি ভাস্কর্যে রূপ দিয়েছেন। ১৯২৪-এ করা 'ব্লোইং দ্য কঞ্চ' বা শাঁখ বাজাচ্ছে এক তন্বী তরুণী এই মার্বল ভাস্কর্যটি আদর্শায়িত স্বাভাবিকতাব সৌন্দর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত। তেমনি বাস্তব জীবনের সাধারণ মানুষও তাঁর অজস্র ভাস্কর্যের বিষয় হয়েছে। সিমেন্টকে ভাস্কর্যের মাধ্যম হিশেবে ভারতবর্ষে তিনিই সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করেন। ফর্মকে তিনি কখনো ভাঙেন নি, কিন্তু অ্যাকাডেমিক বাস্তবতার চূড়ান্ত সফলতা তিনি দেখিয়ে গেছেন।

নারায়ণ কাশীনাথ দেবল (১৮৯৪—?)-এর জন্ম ব্রহ্মদেশে। অল্প বয়সে তিনি শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে লন্ডনে পড়তে যান। লন্ডনে চেলসি পলিটেকনিকে ডিজাইনিং ও ক্লে মডেলিং শেখেন। শান্তিনিকেতন ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শিল্পচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেন। আবার বিদেশে গিয়ে ভালোভাবে ভাস্কর্য শেখেন। প্রধানত প্রতিকৃতি ভাস্কর্যে দক্ষতা ও সাধারণভাবে শিল্পকলা সম্পর্কে উৎসাহ তাঁকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

গোপেশ্বর পাল (১৮৯৪-১৯৮৩) কৃষ্ণনগরের এক মৃৎশিল্পী পরিবারের মানুষ। যদুনাথ পালের কাছে মৃৎশিল্প শেখেন এবং পরবর্তী কালে প্রতিকৃতি নির্মাণে বিখ্যাত হন। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে টাউন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাটিতে বিশ্বকবির মুখাবয়ব রচনা করেছিলেন তিনি। এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে।

প্রিয়নাথ মল্লিকও (১৮৯৪-১৯৮৩) প্রতিকৃতি ভাস্কর হিশেবেই প্রখ্যাত। তাঁর শিক্ষা জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমিতে। পরে কারমাকারের কাছে তিন বছর ভাস্কর্য শেখেন। অবয়বী কিছু রচনাধর্মী ভাস্কর্যও তিনি তৈরি করেন।

এই ১৫ জন ভাস্কর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে আধুনিকতার পদপাতের আগে পর্যন্ত ভারতীয় ভাস্কর্যের সাধারণ স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করলাম। অ্যাকাডেমিক রীতি প্রভাবিত প্রতিকৃতি ভাস্কর্যেরই প্রাধান্য ছিল। প্রতিকৃতির বাইরেও স্বাভাবিকতা-আশ্রিত অবয়বী রূপাবোধে রচনাধর্মী কাজও কিছু কিছু হয়েছে। কিন্তু রূপাবয়বের ভাঙনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির বা বাস্তবের নিহিত সত্য ও স্বরূপকে বোঝার কোনো চেষ্টা হয় নি। এর পরের অংশে আমরা বোঝার চেষ্টা করব দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর অবদান।

তিন

দেবীপ্রসাদ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের কবিতা' চিত্রায়নের জন্য দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে অনুমোদন করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন ৯ শ্রাবণ ১৩৩৫ (বঙ্গাব্দ) তারিখে, "ভালোই হয়েছে। আমার বিশ্বাস দেবীর হাতে ছবি আরো ভালো হবে। ওর তুলিতে রস আছে, শুধু রূপ নয়।"

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ২৪ জানুয়ারি ১৯৪৩ তারিখে এক চিঠিতে দেবীপ্রসাদকেই লিখছেন—"তোমার লেখা আমি পড়েছি। নবপত্রে বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে এইটুকু জানিয়ে রাখি যে—শক্তির প্রচণ্ড পরিচয় দিয়েছ এ শক্তিকে আমি বারবার শ্রদ্ধা জানিয়েছি, নমস্কার জানিয়েছি।"

জানুয়ারি ১৯২৭-এর 'মডার্ন রিভিউ'-তে তাঁর ছবি সম্পর্কে লেখা হয়েছিল (লেখকের নামের আদ্যাক্ষর কে এন·) : "ইয়েট দ্য আর্টিস্ট হ্যাজ গিভেন আ সাফিসিয়েন্ট জার্ক অব হিজ ইন্ডিয়ান সোল টু প্রডিউস ফাইনালি দ্য সাইকোপোর্ট্রেট অব অ্যান আর্টিস্টস সোল।"

আবার ১৯২৮-এর ১২ মে দক্ষিণ ভারতের কোনো এক দৈনিকের আর্ট নোটস বিভাগে জি ভেঙ্কটাচলম লিখছেন তাঁর ভাস্কর্য সম্বন্ধে

"গ্রেট অ্যাজ হি ইজ ইন দ্য ইউজ অব ব্রাশ অ্যান্ড কালারস, হি ইজ গ্রেটার স্টিল অ্যাজ আ স্কাল্পটর। দো দ্য নেমস অব স্কাত্রে, ওয়াঘ, ফাড়কে অ্যান্ড তালিম অব বম্বে অ্যান্ড নাগাপ্পা অব ম্যাড্রাস আর ওয়াইডলি নোন অ্যাজ লিডিং স্কাল্পটরস অব মডার্ন ইন্ডিয়া, ইয়েট ফর অরিজিনালিটি, সিনসিয়ারিটি অ্যান্ড ফর হাইলি ইমাজিনেটিভ ওয়ার্ক রায়চৌধুরী ইজ সেকন্ড টু নান ফর দীজ। দেয়ার ইজ আ কোয়ালিটি অব স্ট্রেংথ অ্যান্ড ভিরিলিটি ইন দ্য ল্যাটার আর্টিস্টস ওয়র্কস দ্যাট ইজ সাজেসটিভ অব গ্রেট ফ্রেঞ্চ মাস্টার রদাঁজ ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড হুইচ বিস্পিকস অব দ্য গ্রেট অ্যাডাপটেবল নেচার অব দিস ইয়ং আর্টিস্ট।"

উদ্ধৃতির বাহুল্যের জন্য পাঠক, মার্জনা করবেন। কিন্তু এই কটি উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে আমরা দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর বহুমুখী প্রতিভা ও জীবনকালে তাঁর স্বীকৃতির কয়েকটি নজির তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। একাধারে সাহিত্যিক, চিত্রকর ও ভাস্করই নন, দেবীপ্রসাদ খুব ভালো বাঁশি বাজাতেন, অত্যন্ত বিচক্ষণ শিকারী ও দক্ষ কুস্তিগীরও ছিলেন। একই মানুষের মধ্যে এতগুলি বিপরীতধর্মী গুণের সমাবেশ হওয়ার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে খুবই বিরল।

খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৫ জুন রংপুরের তাজহাটে তাঁর মাতুলালয়ে। তাঁর মাতামহ মহারাজা গোবিন্দলাল রায় সেখানকার জমিদার ছিলেন। তাঁর পিতা উমাপ্রসাদ রায়চৌধুরীও জমিদার বংশের মানুষ। একজন বিত্তবান পরিবারের সন্তান হয়েও সেই সমস্ত বৈভব ও সম্পদ পরিত্যাগ করে তাঁকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হয় প্রথম যৌবন থেকেই। ছবি আঁকার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল আশৈশব। কিন্তু ছবিকেই জীবিকা করবেন এটা অভিভাবকরা কেউ চাইতেন না। কিন্তু দেবীপ্রসাদ এই সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন বলে তিনি বাড়ি থেকে কোনো অর্থ কোনোদিন গ্রহণ করেন নি। ফলে প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁকে অনেক কষ্ট করে শিল্পী হতে হয়েছে। প্রথম জীবনে নিজে নিজেই ছবি এঁকেছেন। কুড়ি বছর বয়সে অবনীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন ছবি আঁকা শিখতে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে পাঠান কারী ঈ বইস নামে এক ইটালীয় শিল্পী ও ভাস্করের কাছে। তাঁর কাছে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষা নেন। পরে আবার শেখেন অবনীন্দ্রনাথের কাছেই। ফলে তাঁর চিত্রকলার ভিত্তিতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় ধারার শিক্ষাই ছিল। পরে তিনি হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর কাছে ভাস্কর্য শেখেন।

কর্মজীবনে থিয়েটারে দৃশ্যসজ্জা রচনার কাজ থেকে শুরু করে, স্কুলে শিক্ষকতা পর্যন্ত নানা ধরণের কাজ করেন। পরে ১৯২৮-এর ২৮ ডিসেম্বর মাদ্রাজের সরকারি আর্ট স্কুলে ভাইস প্রিন্সিপাল হিশেবে যোগদান করেন। সেখানে ১৯২৯ সালে প্রিন্সিপাল হন। ১৯৫৭ পর্যন্ত সেই পদেই ছিলেন। ১৯৫৭-র জুনে সেখান থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৯৭৫-এর ১৬ অক্টোবর ৭৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর যুগের অন্যান্য অনেক

৬৩· দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। মাই ফাদার। মাটি। ১৯২৪।

৬৫· দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। মারটার্স মেমোরিয়াল-এর অংশ। ব্রোঞ্জ। ১৯৫৬।

৬৪· দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। হোয়েন উইন্টার কামস। প্লাস্টার। ১৯৫৭।

ভাস্করের মতো তিনি ভাস্কর্য শিখতে বিদেশে যান নি। একমাত্র একবার জাপান ছাড়া কাজ বা ভ্রমণের সূত্রেও কখনো অন্য কোনো দেশে যান নি।

তাঁর এই ঘটনাবহুল, অনেকটা নাটকীয় সংঘাতময় জীবনের প্রতিফলন কিছুটা তাঁর শিল্পেও রয়েছে। তাঁর ছবির বিষয় ও আঙ্গিকে বহুমুখিনতা আছে। কালী বিশ্বাস ললিতকলা অ্যাকাডেমির মনোগ্রাফে লিখেছেন—তাঁর সব ছবি একই শিল্পীর আঁকা বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—তাঁর ছবিতে রস আছে। তারাশঙ্কর বলেছেন তাঁর সাহিত্যে আছে শক্তির পরিচয়। দুটোই সত্যি। শক্তির পরিচয় তাঁর ছবিতেও আছে, ভাস্কর্যেও আছে। কিন্তু ছবির রস বহুমুখী। তাতে যেমন নব্য-বঙ্গীয় ঘরানার স্নিগ্ধতা ও লাবণ্য আছে, তেমনি রেমব্রান্টের মতো আলো-ছায়ার রহস্যময়তা আছে, সেজানীয় ঘনত্ব আছে আবার ইম্প্রেশনিস্টদের আলোক-বিন্যাসের আবিলতা আছে। আসলে নব্য-বঙ্গীয় ঘরানার মধ্যে থেকেও তিনি তাকে প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছেন। ইওরোপীয় আধুনিকতার আঙ্গিককে আমাদের দেশীয় পরিমণ্ডলে আত্তীকৃত করতে চেষ্টা করেছেন। ছবিতে তাঁর একান্ত নিজস্ব রূপচেতনা গড়ে ওঠে নি। কিন্তু এই একলেকটিসিজম বা নানা উৎসের সমন্বয় আমাদের ছবির আধুনিকতাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়েছে। এটা তাঁর বিশিষ্ট অবদান। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে একটা দেশাত্মবোধ বা জাতীয় চেতনা তাঁর ছবির আঙ্গিকে কাজ করেছে। এই জাতীয় চেতনাই বলা যায় তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভাস্কর্যের দিকে তাকালে ভাস্কর্যের আঙ্গিকে এক বিপরীত প্রবণতা দেখি। তিনি বরাবরই পাশ্চাত্যের অ্যাকাডেমিক বাস্তবতার রীতি অনুসরণ করেছেন। রদাঁর প্রতি তিনি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর কাজে রদাঁ বা বুর্দেল-এর ছায়া বা প্রভাবের কথা কেউ কেউ বলেন। কিন্তু তাঁর ভাস্কর্যের আঙ্গিকে জাতীয় চেতনার কোনো প্রতিফলন নেই। বিষয়ে হয়তো আছে কিন্তু আঙ্গিকে নেই। আমাদের ধ্রুপদী বা লৌকিক ভাস্কর্যের এত বড় উত্তরাধিকারের দিকে তিনি কখনো তাকান নি বা তা থেকে কিছু গ্রহণ করেন নি। বা তাঁর জীবনকালে ভাস্কর্য নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে পাশ্চাত্যে, রদাঁ-র পরবর্তী সেই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছায়াও খুব কমই পড়েছে তাঁর কাজে। এজন্যই তাঁকে আমরা আধুনিকতার প্রথম প্রজন্মের প্রতিভূ বলছি না। তিনি তাঁদের পূর্বসূরি।

এর কারণ কী? ছবিতে তাঁর দুটি ঘরানার শিক্ষা ছিল বলে কি তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুটি দিককে ব্যবহার করতে পেরেছেন? আর ভাস্কর্যে কেবল পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতিতে শিক্ষা বলে কি শুধু সেটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছেন? হয়তো তা নয়। এর আসল কারণ হয়তো এই যে তখন পর্যন্ত, অর্থাৎ তিনি যখন প্রবেশ করেছেন ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে সে সময় পর্যন্ত ভাস্কর্যে কোনো জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে নি। তাই তাঁর শিক্ষা যে পাশ্চাত্যের অ্যাকাডেমিক রীতিতে, তাকে তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি।

তবু চিত্রকর হিশেবে তাঁর খ্যাতিকে ছাড়িয়ে ভাস্কর হিশেবে তাঁর পরিচিতিই যে বেশি গুরুত্ব পায় তার কারণ তাঁর ভাস্কর্যের সংখ্যা, পরিমাণ, আয়তন, দক্ষতা, অনেক ছাত্রছাত্রীকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা, প্রথম প্রজন্মের কয়েকজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাস্করের শিক্ষক হিশেবে তাঁর অবদান। ভাস্কর্যে নতুন কোনো প্রত্যয় আনতে না পারলেও প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত পথে এই মাধ্যমটিতে তিনি যে চূড়ান্ত কাজ করেছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও তাঁর অধিকাংশ কাজই মাটি বা প্লাস্টারে করে ব্রোঞ্জে রূপান্তরিত, অর্থাৎ সংযোজনের রীতিতে করা, তবু সেখানেই আয়তন ও অন্তর্নিহিত শক্তির সঞ্চারে তিনি অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছেন।

৬৩ প্রতিকৃতি ভাস্কর্যে ১৯২৪-এ মাটিতে করা 'মাই ফাদার' কাজটিই এই বলিষ্ঠতার অনন্য দৃষ্টান্ত। এটি তাঁর মাত্র ২৫ বছর বয়সে করা। তখনই ভালো ভাস্কর্যের সমস্ত গুণাবলীই তাঁর আয়ত্তে। এই কাজটির পৃষ্ঠতলের অমসৃণতায় যে শক্তি সংহত হয়ে আছে সেই শক্তি বাইরের রূপকে ছাড়িয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে উদ্ভাসিত করে তুলছে। এই মনস্তাত্ত্বিক ব্যক্তিত্বকে তুলে আনা, তাঁর ভাস্কর্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কয়েকটি প্রতিকৃতি ভাস্কর্যে তিনি যে সফলতা দেখিয়েছেন তাঁর সব কাজে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় নি। তাঁকে সারা জীবন কমিশনড কাজ বা অজুরার কাজই করতে হয়েছে বেশি। সেখানে সম্পূর্ণভাবে তিনি নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারেন নি। আমরা কলকাতায় তাঁর যে বিখ্যাত গান্ধীমূর্তিটি দেখি—এটাই নির্দেশ করে এ ধরণের ভাস্কর্যে তাঁর সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা। এই ভাস্কর্যটি সম্বন্ধে তাঁর ছাত্র, শিল্পী ও শিল্প সমালোচক সুশীল মুখার্জি লিখেছেন—

"আমরা জানি গান্ধীজির মৃত্যুর পরে তিনি তাঁর ডান্ডি অভিযানের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি করেছিলেন তাঁর স্মৃতি থেকে। কিন্তু খুবই বিপর্যয়কর হয়েছিল এই উপস্থাপনা। আজ ভারতের অনেক শহরে এই মূর্তিটি দাঁড়িয়ে আছে তাঁর প্রতিভার অবক্ষয়ের জীবন্ত বিদ্রূপ হিশেবে। কেননা দেবীপ্রসাদ কি দেশের বেশ কিছু অনবদ্য মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যের স্রষ্টা ছিলেন না?" ('বিভাব' বিশেষ ভাস্কর্য সংখ্যা, ১৯৮৩। ইংরেজি থেকে অনূদিত)

তাঁর শেষ দিকের কোনো কোনো ভাস্কর্যে এরকম এক ক্লান্তির ছাপ পড়েছিল।

শুধু প্রতিকৃতি ভাস্কর্যই নয়, কয়েকটি রচনাধর্মী ভাস্কর্যও দেবীপ্রসাদ করেছেন। তার মধ্যে একটি গৌণ কাজ দেখলে ভাস্কর হিশেবে তাঁর সমস্যাটা আমরা অনুধাবন করতে পারি। 'রিদম' বা ছন্দ নামে প্লাস্টারের একটি ভাস্কর্যে দেখি এক গোলাকার পাথরের উপর এক নারী দাঁড়িয়ে আছে। এই কাজটিতে নারীর শরীরের আদল ভারতীয় কিন্তু স্বাভাবিকতাধর্মী উপস্থাপনার মধ্যে প্রাচ্য-ছন্দের কোনো রেশ অনুভব করা যায় না। ফলে মূর্তিটি ছন্দ বিবর্জিত পুতুল-প্রতিম হয়ে ওঠে। ভাস্কর্যে ইওরোপীয় বাস্তবতার উত্তরাধিকারকে কিছুতেই তিনি ছাড়াতে পারলেন না, এটাই সম্ভবত তাঁর প্রধান সমস্যা।

৪৭ তবু 'যখন শীত আসে' (১৯৫৭), 'ট্রিয়াম্ফ অব লেবার' (১৯৫৪), 'মারটার্স মেমোরিয়াল'-এর (১৯৬৯) মতো
৬৪ অনুভূতিদীপ্ত ও বিশালকায় কাজ তিনি করেছেন। 'যখন শীত আসে'-তে উপবিষ্ট এক বৃদ্ধের মূর্তিতে তিনি যে
৬৫ এক্সপ্রেশনিস্ট বা অভিব্যক্তির অনুষঙ্গ এনেছেন, তা অতুলনীয়। 'ট্রায়াম্ফ অব লেবার'-এ শ্রমের জয়গান এবং 'মারটার্স মেমোরিয়াল'-এ দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ শহিদদের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা, তা শৈল্পিক বিভায় উজ্জ্বল। আসলে এই দেশাত্মবোধই তাঁর শিল্পের প্রধান প্রেরণা। কিন্তু এই স্বদেশ চেতনাকে তিনি শিল্পের বহিরঙ্গেই রূপ দিয়েছেন অন্তস্থ আঙ্গিকে উদ্ভাসিত করতে পারেন নি। তাঁর ভাস্কর্যের সমস্যা এখানেই।

তাঁর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র প্রখ্যাত ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্তের বক্তব্য এই পরিপ্রেক্ষিতে খুবই প্রাসঙ্গিক। ১৯৮৯-৯০-এর ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে দেবীপ্রসাদের ছবি ও ভাস্কর্য নিয়ে যে বড় প্রদর্শনী হয়েছিল তার স্মারক পত্রে লিখেছিলেন প্রদোষ দাশগুপ্ত :

"আমি জানি না কেন দেবীপ্রসাদ ভাস্কর হিশেবেই বেশি পরিচিত। সন্দেহ নেই ত্রিমাত্রিক সৃষ্টিতেই বিরাট মাপে শক্তি

৬৬. দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। মহাত্মা গান্ধী। ব্রোঞ্জ। ১৯৫৮।

ও বীরত্ব দেখানোর সুযোগ ছিল তাঁর। কিন্তু সেখানে আমরা দেখি তিনি নিজের রোমান্টিক ব্যক্তিত্ব ছেড়ে বহিঃস্বরূপের প্রকাশেই বেশি উন্মুখ, যে শারীরিকতা তাঁর ভাস্কর্যে ভিতরের সুষমার বদলে বাইরের বিশালতারই প্রকাশ ঘটিয়েছে বেশি। মল্লযোদ্ধা দেবীপ্রসাদ তাঁর বড় অজুবার কাজে মানুষের শরীরের বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপনার সংঘাত ও টানাপোড়েনকেই উপভোগ করেছেন। এরই এক অভিনব দৃষ্টান্ত নতুন দিল্লির ন্যাশনাল ৪৭ গ্যালারি অব মডার্ন আর্টের মুক্ত প্রাঙ্গণে রাখা তাঁর বড় মাপের 'ট্রায়াম্ফ অব লেবার' ভাস্কর্যটি। ভাস্কর্যে দেবীপ্রসাদের শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য নিঃসন্দেহে তাঁর ব্রোঞ্জে করা সুন্দর মুখাবয়বের কাজগুলি, যেখানে তিনি তাঁর মডেলের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্যবোধে দক্ষ ও কুশলী কারুকৃৎ বা টেকনিশিয়ান হিশেবে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছেন। দেবীপ্রসাদের সংখ্যায় অল্প রচনাধর্মী ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক প্রবণতা থাকলেও নান্দনিকভাবে তারা ভারতীয় ভাস্কর্যের অনবদ্য গুণাবলীকে প্রতিফলিত করে না। অথবা ভাস্কর্যে তিনি আধুনিক পৃথিবীর উত্তরাধিকারকেও সমন্বিত করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন নি।" (ইংরেজি থেকে অনূদিত)

চার

প্রথম প্রজন্ম

দেবীপ্রসাদ পর্যন্ত বিগত প্রায় তিনটি প্রজন্মে আমাদের ভাস্কর্য অ্যাকাডেমিক বাস্তবতাকে অনেকটাই আয়ত্ত করেছিল। এবং শুধু মানুষের প্রতিমূর্তি রচনার বাইরেও ভারতীয় জীবনের নানা দিক নিয়ে নানা কাজ হয়েছে। তা সত্ত্বেও দেশের মাটিতে তার কোনো শিকড় ছিল না। সে অর্থে ভারতীয় আধুনিকতার পদপাত ঘটে নি তখন পর্যন্ত। সেটা ঘটল রামকিঙ্করে এসে।

কিন্তু কী বুঝব ভারতীয় আধুনিকতা বলতে? চিত্রকলার ক্ষেত্রে আমরা প্রথম আধুনিক বলি অবনীন্দ্রনাথকে। কেননা, অবনীন্দ্রনাথেই প্রথম ছবিতে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব মর্যাদা পেল। অর্থাৎ শিল্পী কী আঁকবেন, কেন আঁকবেন, কিভাবে আঁকবেন, তিনি নিজেই হলেন তার নিয়ন্তা। এর আগে পর্যন্ত তা ছিল না। শিল্পী কী আঁকবেন, তাতে পৃষ্ঠপোষকের ইচ্ছাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে আঁকবেন তাতেও থাকত প্রথাগত রূপরীতির নিয়ন্ত্রণ। অবনীন্দ্রনাথেই প্রথম বাইরের নিয়ন্ত্রণকে কাটিয়ে ছবি শিল্পীর ব্যক্তিত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল। আমরা এটাকেই আধুনিকতার একটা লক্ষণ বলে ধরছি। দ্বিতীয়ত, অবনীন্দ্রনাথে এসেই ছবিতে একটা জাতীয় ঐতিহ্যের স্পন্দন ধরা পড়ল। এবং সেই সময়ের এবং বাস্তবতার অন্তর্নিহিত যে আবেগ সেটাও রূপ পেল। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের নিয়ন্ত্রণ, ঐতিহ্যের স্পন্দন এবং বাস্তবতার অন্তর্নিহিত আবেগ—এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বা তিনটি মাত্রা যখন এক জায়গায় মেলে, তখন সেটাকেই আমরা আধুনিকতা বলে মনে করছি বা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ভারতীয় আধুনিকতা বলে মনে করছি।

এই নিরিখে বিচার করলে আমরা দেখি ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে রামকিঙ্করেই প্রথম এই তিনটি মাত্রার সমন্বয় ঘটল। সেজন্য রামকিঙ্করেই প্রথম ভারতীয় ভাস্কর্যে আধুনিকতার সূত্রপাত। শিল্পী হিশেবে রামকিঙ্কর এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। ভারতে তো বটেই সারা পৃথিবীতেই এর দৃষ্টান্ত বিরল। ১৯০৬ সালে বাঁকুড়ার এক দরিদ্র ক্ষৌরকার পরিবারে তাঁর জন্ম। ছবি আঁকার দিকে ছেলেবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল। পাড়ায় প্রতিবছর দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতেন একজন মৃৎশিল্পী। বৃত্তিতে কুমোর। নাম অনন্ত পাল। রামকিঙ্কর তাঁকে ডাকতেন অনন্তজ্যাঠা বলে। এই অনন্তজ্যাঠার মূর্তিগড়া দেখতেন রামকিঙ্কর তন্ময় হয়ে। তাঁর আকর্ষণ ও তন্ময়তা দেখে মূর্তির চক্ষুদানের সুযোগ দিতেন তাঁকে অনন্ত পাল। মূর্তিগড়ার সঙ্গে সেই তাঁর শৈশবের সংযোগ।

'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়ার মানুষ। রামকিঙ্করের গ্রামের কাছেই তাঁর বাড়ি। তাঁর নজরে পড়ল এই তরুণের অসামান্য প্রতিভা। তিনি তাঁকে বললেন, শান্তিনিকেতনে গিয়ে নন্দলালের কাছে ছবি আঁকা শেখার কথা। এই সুযোগ রামকিঙ্করের কাছে পৃথিবীর দরজা খুলে দিল। ১৯ বছর বয়সে নিঃসম্বল এই গ্রাম্য তরুণ শান্তিনিকেতনে পৌঁছলেন। তারপর থেকে শুরু হল এক স্বপ্নের সাধনা। নন্দলাল আর রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে

সামনে রেখে এগিয়ে চললেন রামকিঙ্কর। ছবি আঁকায় শান্তিনিকেতনের ঘরানাকে ছাড়িয়ে পশ্চিমের হাওয়ায়ও অবগাহন করলেন তিনি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মেলাতে পারলেন তাঁর ছবির মধ্য দিয়ে।

কিন্তু ভাস্কর্যই রামকিঙ্করের ভবিতব্য। অথচ তখন শান্তিনিকেতনে ভাস্কর্য শেখানোর মতো কেউ নেই। নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করলেন ভাস্কর্যের করণ-কৌশল। দুজন বিদেশিনী ভাস্কর এসেছিলেন সেই সময়—লিজা ভন পট ও মার্গারেট মিলওয়ার্ড। তাঁদের কাছ থেকে শিখেছেন কিছু প্রকরণ। বাকিটা বিদেশী বই দেখে, নিজের সহজাত শিল্পচেতনায় অর্জন করেছেন ধীরে ধীরে।

১৯৩৫-এ বিশ্বভারতীর সংগীতভবন প্রাঙ্গণে ইউক্যালিপটাস গাছের মধ্যে রামকিঙ্কর তাঁর সহযোগীদের সাহায্যে সিমেন্ট ও কংক্রিটে গড়ে তুললেন একটি ভাস্কর্য। পরে নন্দলাল এব নাম দিয়েছিলেন 'সুজাতা'। দীর্ঘায়ত শীর্ণা এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস গাছের মাঝখানে। বৃক্ষের আদলে গড়ে ওঠা এক শরীর। এই কাজটি এতদিনকার ভারতীয় ভাস্কর্যেব পরিপ্রেক্ষিতে এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটাল। ঠিক এরকম কাজ আগে কখনো হয় নি। এর মধ্যে ভারতীয় জীবনধারার প্রাণস্পন্দন আছে, আবার ইওরোপীয় আধুনিকতার নির্যাসও আছে। দুইয়ে মিলে এক স্বতন্ত্র সত্তার সঞ্চার আছে। ভাস্কর্যে ভারতীয় আধুনিকতার পদপাত ঘটল ১৯৩৫-এ এই ভাস্কর্যটির মধ্য দিয়ে। ৪৮

এর পর রামকিঙ্করের প্রতিভা আবো নানা শাখা-প্রশাখায় উন্মীলিত হয়েছে। এর বিস্তৃত আলোচনা 'রামকিঙ্কর—ভাস্কর্যের মুক্তি' নামে পরবর্তী প্রবন্ধটিতে আমরা করেছি। এখানে সেই বিস্তৃতিতে যাচ্ছি না। প্রায় এক শতকের নানা টানাপোড়েনের পর ভারতীয় ভাস্কর্য আধুনিকতায় পৌঁছল রামকিঙ্করের হাতে। এর পর থেকে শুরু হল তার নতুন যাত্রাপথ। ৬৭

সে পথের, সেই বিকাশের প্রেক্ষাপট ও স্বরূপ বোঝার চেষ্টাই এই প্রবন্ধে আমাদের উদ্দেশ্য। রামকিঙ্কর ও তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের হাতে ভাস্কর্যের যে বিকাশ, সেটাকেই আমরা বলছি ভাস্কর্যের প্রথম প্রজন্ম। মোটামুটি ১৯০০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন যে সব শিল্পী—১৯৩৫ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যাঁরা অর্জন করেছেন রূপচেতনার স্বাতন্ত্র্য এবং তার পরেও সম্প্রতি পর্যন্ত উন্মীলিত করেছেন নিজেদের, সেইসব ভাস্করদেরই আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে চাই প্রথম প্রজন্মের মধ্যে। ষাটের-দশক থেকে পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের হাতে আবার নতুন মাত্রা পেল ভাস্কর্য। সেই বিবর্তনকে আমরা বলব ভাস্কর্যের দ্বিতীয় প্রজন্ম। এরকম বিভাগের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কেবল আলোচনার সুবিধার জন্যই এই সরলীকরণ।

৬৭ প্রভাস সেন। ফ্লাট প্রেয়ার।

৬৮· ধনরাজ ভগৎ। ফ্লাট প্রেয়ার। ওয়েলডেড কপার। ১৯৫৮।

৬৯ ধনরাজ ভগৎ। লাফিং ফেসেজ। সিরামিকস। ১৯৬২।

ভাস্কর্যের এই মুক্তির ক্ষেত্রে পূর্বসূরি আরো দুজন শিল্পীর প্রচ্ছন্ন কিছু অবদান আছে। তাঁরা অবশ্য ভাস্কর নন। দুজনেই চিত্রকর। ভারতীয় চিত্রকলা তাঁদের হাত দিয়েই আধুনিকতায় উন্নীত হয়েছে। প্রথমজন অবনীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয়জন যামিনী রায়।

অবনীন্দ্রনাথ চল্লিশের দশকে তাঁর শেষ বয়সে অদ্ভুত এক খেলায় মেতেছিলেন। গাছের ডালপালা আর শিকড়, ফলের বীজ, টিনের পাত ইত্যাদি কুড়িয়ে এনে তার মধ্যে তিনি আবিষ্কার করতেন বিচিত্র সব রূপ। এগুলিকে একটু কেটে একটু মার্জিত করে বের করে আনতেন সেই রূপটি। বাস্তব জগতের কোনো আদলের সঙ্গে তার মিল থাকত সামান্যই। তারা হয়ে উঠত কল্পজগতের অনিঃশেষ রূপের নির্ঝর। এগুলিকে তিনি বলতেন কুটুম কাটাম। ছবিতেও এত নির্ভার কল্পনার এত স্বচ্ছন্দ বিস্তারের দিকে তিনি কমই গিয়েছেন। এগুলি নিছকই খেলা ছিল বলে এখানে তিনি সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। ফলে ত্রিমাত্রিক নির্মাণের এক নতুন ধরণ তৈরি হল তাঁর হাতে যেরকম ঠিক আগে কখনো হয় নি। এগুলিকে আমরা ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রথম দিকের ঐশ্বর্য বলে মনে করতে পারি। ভাস্কর্যের আধুনিকতায় অবনীন্দ্রনাথের কুটুম কাটাম-এর বিশিষ্ট স্থান আছে।

কেউ কেউ অবশ্য এগুলোকে ভাস্কর্য হিশেবে মানতে চান না। যেমন পরিতোষ সেন বলেছিলেন তাঁর এক লেখায়—"আমার মতে তাঁর কৃত কুটুম কাটামগুলো ঠিক ভাস্কর্যের পর্যায়ে পড়ে না, ওগুলো ফরাসি ভাষায় যাকে বলা হয়, 'objects trouvé', অর্থাৎ ফাউন্ড অবজেক্টস-এর শ্রেণীভুক্ত। যদিও শিল্পীর নিজস্ব শিল্পদৃষ্টির সুস্পষ্ট ছাপ এতে বর্তমান এবং তাঁর সৃজনীশক্তির পরিচায়ক।" (যামিনী রায়ের চিত্রকলা, দেশ, ১৮ এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ ২৮)। আবার ভারতীয় সমকালীন ভাস্কর্যে এর প্রাসঙ্গিকতাকে স্বীকার করেন এমন দৃষ্টান্তও আছে। যেমন 'মার্গ' পত্রিকার ভারতীয় ভাস্কর্য বিষয়ক এক সংখ্যায় (ডিসেম্বর ১৯৬২) এ সম্পর্কে বলা হয়েছিল—"দ্য সিগনিফিকেন্স অব অবনীন্দ্রনাথ টেগোরস টয়জ ফর ল্যাটার স্কাল্পটরস লাইজ ইন দা ফ্রিডম ফ্রম অল রিস্ট্রেইনস হোয়েন হি মেড দেম।" কাজেই কুটুম কাটামকে ভাস্কর্য বলা হোক বা না হোক ভাস্কর্যের আধুনিকতায় এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। 'কুটুম কাটাম' ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ পাথরের কয়েকটি ছোট ভাস্কর্যও করেছিলেন। পাথরে খোদাই করে তাঁর নিজের মুখ, অন্য একটি মুখাবয়ব, 'মকর', 'কচ্ছপ', 'গণ্ডার' ইত্যাদি কয়েকটি কাজ ভাস্কর্যে তাঁর স্বতন্ত্র প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ১৯৯৪-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ কলকাতার গোর্কি সদনে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে আমাদের দেখার সুযোগ হয় এই ভাস্কর্য।

যামিনী রায়ও চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে মাটি ও কাঠে অনুপম সারল্যময় কিছু মূর্তি গড়েছিলেন। সিগারেট মুখে এক সাহেব, কোনো এক টোটেম ফিগার এ ধরণের মূর্তিতে শিল্পী যে রূপের মুক্তি এনেছিলেন ভারতীয় ভাস্কর্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল। পরিতোষ সেন পূর্বোক্ত লেখায় অবশ্য বলেছেন "যামিনী রায়ের এ ভাস্কর্য কর্মগুলোতে বাংলার লোকশিল্পের কোনো প্রভাবই নেই।" তিনি বলতে চেয়েছেন ট্রাইবাল আর্ট এবং আধুনিক ইওরোপীয় ভাস্কর্যই এখানে তাঁর প্রেরণা হিশেবে কাজ করেছে। একথা অযৌক্তিক নয়। যেভাবেই হোক একটা লৌকিক উত্তরাধিকার এর পেছনে কাজ করেছিলই।

প্রথম প্রজন্মের ভাস্করদের কাছে প্রধান সমস্যা হল, ভাস্কর্য এতদিন যে শুধু মানুষের বাস্তব ও স্বাভাবিক রূপের মধ্যে আটকে থাকছিল, তা থেকে মুক্ত করে ভাস্কর্যকে নিজস্ব রূপাবয়বের স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট ও উদ্ভাসিত করে তোলা। পাশ্চাত্য ভাস্কর্যের আধুনিকতা এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। দেবীপ্রসাদ পর্যন্ত যে আধুনিকতার সঞ্চার ঘটে নি, রামকিঙ্কর ও সমসাময়িক ভাস্করদের কাছে সেই আধুনিকতাই হয়ে উঠল প্রধান অন্বিষ্ট। এ ছাড়া তাঁদের সামনে এল দেশীয় আইডেনটিটির সমস্যা। ধ্রুপদী ও লৌকিক স্তরে ভাস্কর্যের যে বিপুল ঐতিহ্য সেটা স্বভাবতই তাঁদের কাজকে প্রভাবিত করবে। সেই ভিত্তির উপরই তাঁরা গড়ে তুলবেন তাঁদের সময়ের প্রতিফলন। কাজেই একটা সমন্বয়ের সমস্যা তাঁদের সামনে দেখা দিল। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সুষম সমন্বয়ই প্রথম প্রজন্মের ভাস্করদের প্রধান অন্বিষ্ট। এ ব্যাপারে তাঁরা অনেকটাই সফল হয়েছেন।

পূর্বভারত

পরবর্তী কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রদোষ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯১), চিন্তামণি কর (১৯১৫) ও শঙ্খ চৌধুরীর (১৯১৬), ভাস্কর্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। দেখেছি তাঁরা তিনজনই প্রথম জীবনে আমাদের দেশে চিত্র ও ভাস্কর্য শিক্ষা নিয়েছেন। প্রদোষ দাশগুপ্ত শিখেছেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে। চিন্তামণি কর গিরিধারী মহাপাত্র ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে। এবং শঙ্খ চৌধুরী শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্করের কাছে। পরবর্তীকালে তাঁরা সকলেই ইওরোপে গেছেন। ভাস্কর্যের প্রাকরণিক শিক্ষা যেমন নিয়েছেন, তেমনি ইওরোপীয় আধুনিকতার স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। এবং সেই আধুনিকতাকে ভারতীয় নান্দনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

পূর্বাঞ্চলের ভাস্করদের মধ্যে সুধীররঞ্জন খাস্তগীর (১৯০৭-৭৪) প্রভাস সেন (১৯১৯) ও সুনীলকুমার পালের (১৯২০) নামও এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

সুধীররঞ্জন খাস্তগীর কলাভবনে নন্দলালের ছাত্র। চিত্রকলার শিক্ষা তাঁর নন্দলালের কাছেই। ভাস্কর্যেও হাতেখড়ি কলাভবনে। পরে বম্বেতে গণপৎ কাশীনাথ ম্হাত্রের কাছে কিছুদিন পাথর খোদাই শেখেন ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৬ সাল থেকে দেরাদুনে দুন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ২০ বছর ওখানেই ছিলেন। ১৯৩৭-এ তিনি ইওরোপ যান এবং

৭০· এস ধনপাল। প্রসাধন। ব্রোঞ্জ। ১৯৫৬।

সেখানকার চিত্রকলা ও ভাস্কর্য গ্যালারিগুলি পরিদর্শন করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি লখনৌ-এর সরকারি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯৬২-তে সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। প্রতিকৃতি ভাস্কর্য ও রচনাধর্মী ভাস্কর্য উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অজস্র কাজ করেছেন।

প্রভাস সেনও রামকিঙ্করেরই ছাত্র। রামকিঙ্করের অনেক কাজেই তাঁর সহায়তা ছিল। কলাভবন থেকে ১৯৪৩-এ ৬৭ তিনি স্নাতক হন। ফরাসি সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে ব্রোঞ্জ কাস্টিং ও সিরামিকসের উচ্চতর শিক্ষা নেন ১৯৫০-৫১-তে। তাঁর ভাস্কর্য অনেকটা অভিব্যক্তিধর্মী। আদিমতার প্রাখর্যের সঙ্গে রূপের সারল্য মিশে অনুপম এক প্রজ্ঞার প্রতিফলন ঘটে তাঁর কাজে।

সুনীলকুমার পাল কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন ১৯৩৫ সালে। মুকুল দে তখন অধ্যক্ষ। সেখানে তিনি ভাস্কর্য শেখেন বলাই দাসের অধীনে। পরে তিনি বিদেশেও গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজের ভাস্কর্যের শিক্ষক ছিলেন। অনেক ছাত্র সেখান থেকে তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে। ভাস্কর্যে রূপ ও ভাব দুদিক থেকেই দেশাত্মবোধ তাঁর আদর্শ ছিল। প্রাচ্য-চেতনাকে কি করে ভাস্কর্যের আধুনিকতায় আনা যায় এটা তাঁর অন্বিষ্ট ছিল। ব্যারাকপুরের গান্ধিঘাটে মহাত্মা গান্ধির জীবনী নিয়ে বিরাট প্যানেল ভাস্কর্যটি তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কলকাতায়

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের সামনে দেয়ালের উপর মিশরীয় রীতিতে করা রিলিফ ভাস্কর্যটিও তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেয়। এছাড়া সারা জীবন আরো অজস্র ভাস্কর্য তিনি করেছেন।

সোমনাথ হোর (১৯২১) ও মীরা মুখার্জি (১৯২৩) সম্পর্কেও পরবর্তী দুটি আলাদা প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। গ্রাফিক আর্টে অসামান্য অবদানের জন্য সোমনাথ হোর প্রখ্যাত, তেমনি সত্তর দশক থেকে ব্রোঞ্জে 'ক্ষত' শীর্ষক ভাস্কর্যগুলিতে সামাজিক দায়বোধের যে উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন ভাস্কর্যেব প্রকরণ ও আঙ্গিকেও তা এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে।

মীরা মুখার্জি তাঁর ভাস্কর্যের মধ্যে যে দেশীয় ঐতিহ্যের সঞ্চার ঘটিয়েছেন সমকালীন ভাস্কর্যে তাব তুলনা বিরল। লৌকিক সারল্য ও অধ্যাত্ম চেতনায় উদ্ভাসিত তাঁর কাজগুলি ভাস্কর্যে ভারতীয় আইডেনটিটি সন্ধানের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

কে জি সুব্রামনিয়ন (১৯২৪) জন্মসূত্রে কেরালার মানুষ। কিন্তু ১৯৪৪ সাল থেকে তিনি প্রথমে ছাত্র ও পরে শিক্ষক হিশেবে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সেই হিশেবে তাঁকে আমরা শান্তিনিকেতনের বা পূর্বাঞ্চলের শিল্পী হিশেবেই গণ্য করতে পারি। মূলত চিত্রকর সুব্রামনিয়ন আশির দশকে টেরাকোটা রিলিফে যে অসামান্য কাজ করেছেন তা তাঁকে ভাস্কর হিশেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ে এই কাজগুলি ভারতীয় ভাস্কর্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

পশ্চিম ভারত

পশ্চিমাঞ্চলে অ্যাকাডেমিক রীতির ভাস্কর্যের মূলকেন্দ্র ছিল বম্বে। এবং সেখানেই এই রীতির ভাস্কর্য প্রথম সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এই ফরমায়েসি ভাস্কর্যের নান্দনিক সীমাবদ্ধতা থেকে সৃজনশীল ভাস্কর্যের প্রথম মুক্তির ইঙ্গিত এসেছিল এন জি পানসারের (১৯১২-১৯৬৮) কাজের মধ্য দিয়ে। পানসারে তাঁর অজুরামূলক (commissioned) কাজের মধ্য দিয়ে চল্লিশের দশকে ভাস্কর্যে ঐতিহ্য-সচেতন এক নান্দনিক বিভা আনলেন। পাথরে করা তাঁর আর্কিটেকচারাল ৫৯ রিলিফগুলিতে মিশরীয় ভাস্কর্যের প্রেরণায় ভারতীয় জীবনের যে প্রতিফলন তা ভাস্কর্যে এক নতুন চেতনার সঞ্চার করল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে গভীর সম্পর্ক সনাতন ভারতীয় ভাস্কর্যের একটি মূলগত বৈশিষ্ট্য। আধুনিক যুগে ৬২ পানসারেই প্রথম এই ছিন্ন সূত্রটিকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলেন। তাঁর কোনো কোনো কাজে রূপায়ণের স্বাভাবিকতার মধ্যেও ধ্রুপদী প্রশান্তির সঞ্চার আছে। রিলিফগুলির মধ্যেও ধ্রুপদী প্রাচ্য চেতনাকেই তিনি প্রকাশ করেছেন।

এই আধুনিকতার চেতনা প্রসারিত হল আরো দুজন ভাস্করের কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরা হলেন পিলু পোচখনওয়ালা (১৯২৩) ও এ দাবিয়েরওয়ালা (১৯২২)। তাঁরা কেউই আর্ট কলেজের প্রথাগত শিক্ষা নেন নি। দুজনেই অন্য বৃত্তির মানুষ। পরিণত বয়সে ভাস্কর্য তাঁদের আকর্ষণ করেছে। ফলে তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিকতাকে একেবারে পরিহার করে আধুনিক ভাস্কর্যের প্রাণকেন্দ্রটি স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। কিউবিজম ও কনস্ট্রাকটিভিজমের মধ্য দিয়ে যন্ত্রসভ্যতার সংঘাত প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁদের কাজে।

পিলু পোচখনওয়ালা ১৯৫১-তে ইওরোপ গিয়েছিলেন নিজস্ব কিছু কাজে। সেখানে মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি দেখতে দেখতে আধুনিক ভাস্কর্যের শক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়লেন। লৌহ সভ্যতার ভাস্কর্যের যে রূপ বিকশিত র·৭ হয়েছিল পিকাসো, জুলিও গনজালেজ, ডেভিড স্মিথ, আলেকজান্ডার ক্যালডার এবং থিওডোর রোজাক-এর কাজে, সেটাই তাঁকে অনুপ্রাণিত করল। দেশে ফিরে তিনি ভাস্কর্যের চর্চা শুরু করলেন। তাঁর প্রথম দিকের কাজে হেনরি ম্যুরের জীবন্ময় (vitalistic) ভাস্কর্যের প্রভাব ছিল। ক্রমে তিনি লোহা ও স্ক্র্যাপ মেটালের কনস্ট্রাকশন-এর দিকে চলে যান। যন্ত্র সভ্যতার এক বিপন্ন সৌন্দর্য রূপ পেতে থাকে তাঁর কাজে।

দাবিয়েরওয়ালা ছিলেন একজন ভেষজ রসায়নবিদ। সেই বৃত্তি ছেড়ে তিনি ভাস্কর্যে চলে আসেন। প্রথমে জীবন্ময় ৭২ ভাস্কর্যের চর্চা করে তারপর নির্মাণমূলক ভাস্কর্যের দিকে চলে আসেন। ইওরোপীয় আধুনিকতার কনস্ট্রাকটিভিজমের দিকটা এই দুজনের মধ্য দিয়েই আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করল।

শঙ্খ চৌধুরীর একক প্রচেষ্টায় এর পর বরোদায় ভাস্কর্যের বিরাট প্রসার ঘটল। সেখান থেকে বেরোলেন যাঁরা তাঁরা ভাস্কর্যের দ্বিতীয় প্রজন্মের অন্তর্গত।

৭১ *অমরনাথ সেহগাল। আপরাইজিং। ব্রোঞ্জ। ১৯৫৭।*

উত্তর ভারত

উত্তর ভারতে ভাস্কর্য শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে লখনৌ এক সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর (১৮৮৪-১৯৬২) শিক্ষকতায় অনেক প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর এখান থেকে বেরিয়েছেন, বা তাঁর কাছে শিখেছেন। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও প্রদোষ দাশগুপ্ত এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে এখানকার ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান অবতার সিং পানওয়ার একজন প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর। তিনি শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্র ছিলেন। প্রতিকৃতি ভাস্কর্যে তাঁর খ্যাতি আছে।

অন্যান্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে দিল্লি, বেনারস, চণ্ডীগড়, জম্মু ও কাশ্মীর গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরাঞ্চলের প্রথম প্রজন্মের ভাস্করদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যাঁরা ভারতীয় ভাস্কর্যের আধুনিকতার গভীর অবদান রেখেছেন। এরা হলেন ভবেশচন্দ্র সান্যাল (১৯০৪), ধনরাজ ভগৎ (১৯১৭) ও অমরনাথ সেহগাল (১৯২২)।

ভবেশচন্দ্র সান্যালের জন্ম আসামের ডিব্রুগড়ে। কলকাতায় সরকারি আর্ট স্কুলে ভরতি হন ১৯২৩-এ। ১৯২৯-এ তিনি লাহোরের মেয়ো স্কুলে ভাইস-প্রিন্সিপাল হন। ১৯৩৬-এ মেয়ো স্কুল ছেড়ে লাহোর স্কুল অব ফাইন আর্টস-এ চিত্রকলা ও ভাস্কর্য শিক্ষাদান শুরু করেন। ১৯৫০-এ দিল্লিতে 'দিল্লি শিল্পী চক্র' সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫২ থেকে দিল্লি পলিটেকনিকের চারুকলা বিভাগের প্রধানরূপে যোগ দেন। দীর্ঘদিন তিনি ললিতকলা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান ছিলেন। শ্রীসান্যাল একাধারে চিত্রকর ও ভাস্কর। ভাস্কর্যে নতুন কোনো আঙ্গিক সৃষ্টি না করলেও শিক্ষক ও সংগঠক হিশেবে আধুনিকতায় তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে।

ধনরাজ ভগৎ-এর ভাস্কর্য সম্বন্ধে ললিতকলা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত মনোগ্রাফে চার্লস ফাবরি লিখেছেন— "হোয়াইলস্ট আদারস হ্যাভ লস্ট ম্যান ধনরাজ ভগৎ হ্যাজ ফাউন্ড হিম।" কেশব মালিক লিখেছেন— "অ্যান
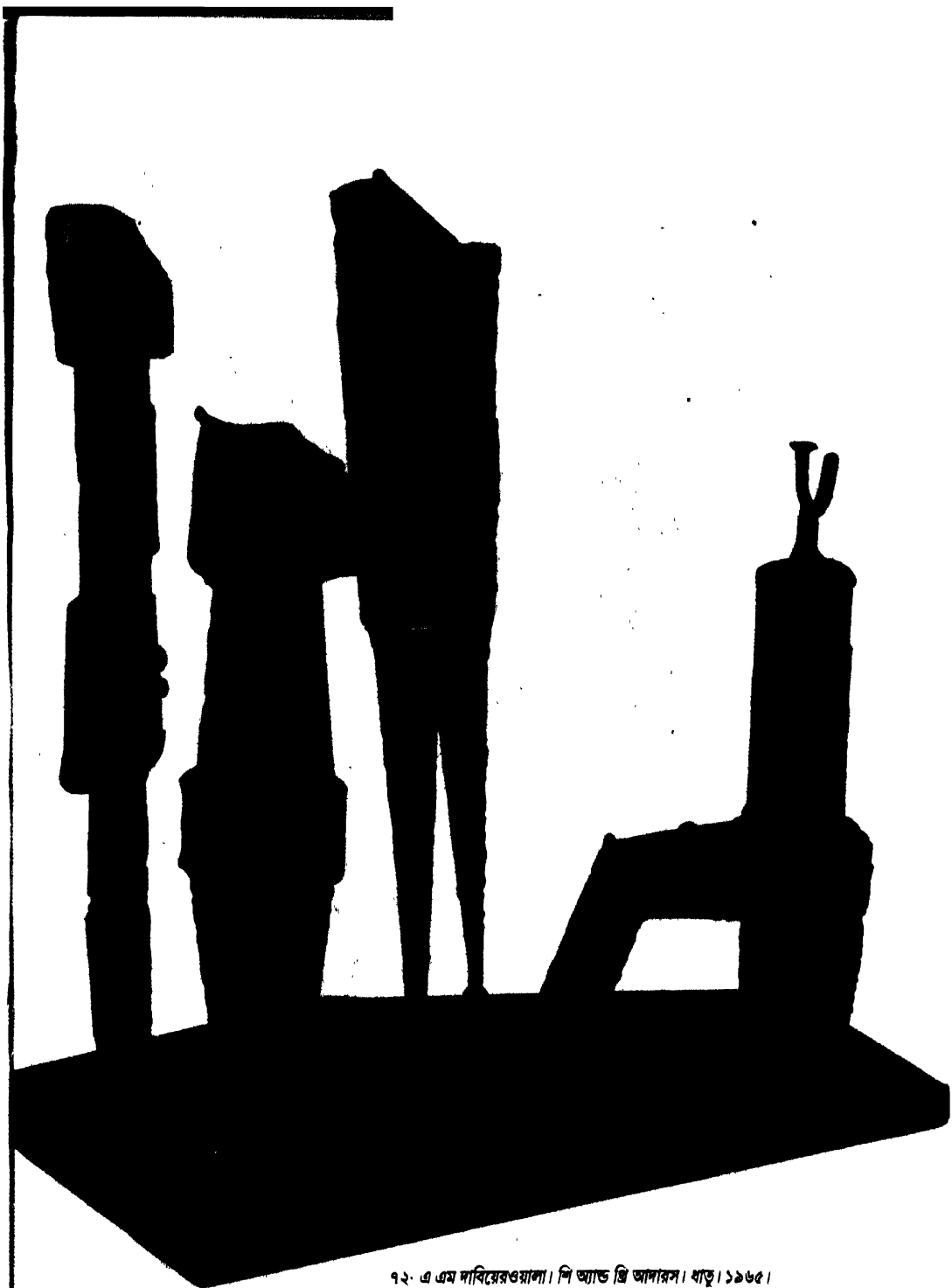
৭২· এ এম দাবিয়েরওয়ালা। শি অ্যান্ড থ্রি আদারস। ধাতু। ১৯৬৫।

৭৩· এম ধরমানি। হতাশা। পাথর। ১৯৬০।

এক্সকারশন ইনটু এনসিয়েন্ট এসোটেরিক মিস্ট্রিজ।" ('বিভাব' পত্রিকার ভাস্কর্য সংখ্যা ১৯৮৩)। তাঁর ভাস্কর্যের ভাব ও রূপ দুটোই বেরিয়ে আসে এই উক্তি থেকে। প্রত্ন শিল্পের রহস্যকে উদঘাটন করে মানবতাবাদের উন্মেষ ঘটেছে তাঁর ভাস্কর্যে। জন্মসূত্রে লাহোরের মানুষ ধনরাজ লাহোরের মেয়ো স্কুল থেকে পাশ করেন ১৯৩৭-এ। সেখানেই ভবেশ সান্যালের সান্নিধ্য লাভ করেন। পরে দিল্লি শিল্পীচক্রেও তাঁরা একসঙ্গে ছিলেন। ১৯৬২-তে তিনি দিল্লির কলেজ অব আর্টের ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান হন।

চল্লিশের দশক থেকে তিনি নিয়মিত ভাস্কর্য করছেন। প্রথম দিকে মাটির কাজে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে নি। পরে কাঠের ভাস্কর্যে তিনি নিজস্ব রূপকল্প আবিষ্কার করেন। দেশভাগের ভয়ঙ্করতা ও বিমানবিকতা তাঁর কাজে গভীর প্রভাব ফেলে। ১৯৫০-৫১ সালে আমেরিকা ভ্রমণ করেন এবং ভাস্কর এম আর্চিপেঙ্কোর সান্নিধ্যে আসেন। ক্রমে তাঁর ভাস্কর্যের রূপ হতে থাকে নির্ভার। দেহকে ছাড়িয়ে অন্তর্নিহিত সত্তার অনুরণন জাগতে থাকে। সংগীত ও অধ

প্রাধান্য পায়। ইওরোপীয় আধুনিকতার সংঘাতের পরিবর্তে ভারতীয় ধ্রুপদী ও লৌকিক অনুষঙ্গের মহত্ত্ব ও সারল্য প্রকাশ পেতে থাকে তাঁর কাজে। ভারতীয় আধুনিকতার এক বিশিষ্ট রূপভঙ্গি তৈরি করেন তিনি।

প্রথম জীবনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রির একজন ইঞ্জিনিয়ার অমরনাথ সেহগাল (১৯২২) নিজের চেষ্টায় ভাস্কর্য শেখেন (১৯৪৫-৪৭)। তাঁর জন্ম বর্তমানের পশ্চিম পাকিস্তানে, শিক্ষা লাহোরে। দেশভাগের পর ভারতে চলে আসেন। দেশভাগের স্মৃতি তাঁর ভাস্কর্যেও আনে প্রতিবাদী চেতনা। তাঁর ভাস্কর্য যেন মানুষের আর্ত চিৎকার জনিত শূন্যতার ঘনীভূত দৃশ্যরূপ। জিয়াকোমেত্তি যে শূন্যতাকে রূপ দিয়েছিলেন তাকেই যেন তিনি প্রসারিত করেন। ১৯৫৭-র ব্রোঞ্জের 'আপরাইজিং'-এ শীর্ণকায় কতকগুলি দণ্ডায়মান উত্তোলিত হাতবিশিষ্ট মানবিক প্রতিমায় বন্দিত্বের সেই আর্ত ক্রন্দনই যেন ধ্বনিত হয়। ১৯৫৭-র 'ক্রাইজ আনহার্ড' এরকম আর্তিরই ঘনীভূত রূপ। পাশ্চাত্য আধুনিকতার আঙ্গিকে ভারতীয় বাস্তবতারই প্রতিবাদী ভাষ্য রচনা করেন তিনি।

৭৪ ভবেশ সান্যাল। উপবিষ্টা নারী। টেরাকোটা। ১৯৪৮।

উত্তর ভারতের আরো কয়েকজন ভাস্কর, ষাটের দশকের আগেই যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এস এল প্রসার, এম ধরমানি (১৯৩১), রাজারাম প্রমুখ। ওদিকে পশ্চিম ভারতে বরোদা স্কুলে শঙ্খ চৌধুরীর কয়েকজন ছাত্র ষাটের দশকের আগেই প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাঘবন কানেরিয়া, রজনীকান্ত পাঞ্চাল, নাগাজিভাই প্যাটেল প্রমুখ।

দক্ষিণ ভারত

মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল-এ (পরে কলেজ) দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অধ্যক্ষ থাকার সময়ই সেখানে ভাস্কর্যচর্চায় যথেষ্ট সাড়া জাগে। কিন্তু সে অর্থে আধুনিকতার সঞ্চার ঘটে নি তাঁর সময়ে বা তাঁর নিজের কাজেব মধ্য দিয়ে। সেটা আরো পরে ঘটেছে। বিশেষত পানিকর যখন অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তাঁর প্রভাবে একদিকে লৌকিক শিল্প অন্যদিকে আদিম শিল্প উদ্বুদ্ধ করেছিল ওখানকার শিল্পীদের। পানিকর নিজে ভাস্কর ছিলেন না, ছিলেন চিত্রকর। এই দুটি উৎসকে ছবিতে তিনি যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন, ভাস্কররাও তা থেকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রেরণা বেশি করে কাজ করেছিল দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্করদের মধ্যে।

কিন্তু একজন ভাস্কর পঞ্চাশের দশকেই যথেষ্ট ভালো কাজ করছিলেন। তিনি ধনপাল (১৯১৯)। ধনপালের ১৯৫৫ সালেব একটি কাজ ছিল প্লাস্টারে করা, নাম 'নমস'। একজন শীর্ণ মানুষ নিয়ে দীর্ঘায়ত রচনা। হাটুমুড়ে অনেকটা নমস্কারের ভঙ্গিতে বসে আছে লোকটি। নামাজ পড়ার আদলেও বলা যায়। বিশদ বর্জিত উপস্থাপনার এই সারল্য ভাস্কর্যে এক নতুন তত্ত্ববিশ্বের ইঙ্গিত আনছিল। ১৯৫৭-র 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড' নামে একটি টেরাকোটায় এই সারল্য রূপায়ণের আয়তনময়তার সঙ্গে মিশে কৌতুকদীপ্ত এক প্রশান্তির পরিমণ্ডল আনছে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ভাস্কর্যে অভিব্যক্তিময় এক করুণার সঞ্চার ঘটতে থাকে এবং তাতে ধরা পড়ে বাস্তবতার বিশ্লেষণ। এইভাবে ইওরোপীয় আধুনিকতাব অভিজ্ঞতাকে দেশীয় ঐতিহ্য ও বাস্তবতায় মেলাতে চেষ্টা করছিলেন ধনপাল। ভাস্কর্যে এটাই প্রথম প্রজন্মের অর্জন ও অবদান।

১৯৩৫ থেকে ১৯৬০-এর আগে পর্যন্ত যেসব ভাস্কর আমাদের ভাস্কর্যকে অ্যাকাডেমিক রীতির গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত কবে আধুনিক জীবনের জটিলতাকে ভাস্কর্যের মধ্যে ধরতে চেয়েছেন এবং যাঁরা রূপাবয়বের একটা ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্যেরও সঞ্চার করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরই আমরা বলেছি ভাস্কর্যের প্রথম প্রজন্ম। কেননা ভারতীয় ভাস্কর্যে আধুনিকতার স্ফূরণ ঘটাতে পেরেছিলেন তাঁরাই প্রথম। তাঁদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজনেরই মাত্র নাম এখানে উল্লেখ কবা হল। রামকিঙ্কর থেকে মীরা মুখার্জি পর্যন্ত পাঁচজন ভাস্করের বিবর্তন ও কাজের স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এর পরে করা হয়েছে। এই নিবন্ধটিকে তার সঙ্গে মিলিয়ে নিলে প্রথম প্রজন্মের ভাস্কর্যের স্বরূপ হয়তো সম্পূর্ণতা পাবে। এই ভিত্তির উপর ১৯৬০ পরবর্তী ভাস্কর্যের বিকাশ। সেটা আমরা দেখব 'ভাস্কর্যের দ্বিতীয় প্রজন্ম' নামের পরবর্তী আলোচনায়।

রামকিঙ্কর : ভাস্কর্যের মুক্তি

এক

সৃষ্টির বিস্তীর্ণ বিশ্ব

রামকিঙ্করে (১৯০৬-৮০) পৌঁছনোর আগে একটু প্রসঙ্গান্তর থেকে শুরু করা যাক। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয় বিজ্ঞানী এস চন্দ্রশেখরের বিভিন্ন সময়ে দেওয়া বক্তৃতা সংকলন করে ইংরেজিতে একটি বই বেরিয়েছে কিছুদিন আগে (১৯৮৭/১৯৯১), নাম—'ট্রুথ অ্যান্ড বিউটি'। শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ 'ইসথেটিকস অ্যান্ড মোটিভেশনস ইন সাইন্স'। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নন্দন ও সৌন্দর্যের স্বরূপ ও দর্শন নিয়ে এরকম প্রাজ্ঞ ও গভীর আলোচনার দৃষ্টান্ত বিরল। এই বইয়েরই একটি প্রবন্ধের নাম 'শেকস্‌পিয়র, নিউটন, অ্যান্ড বিঠোফেন, অর প্যাটার্নস অব ক্রিয়েটিভিটি'। এই প্রবন্ধে ডঃ চন্দ্রশেখর সাহিত্য, সংগীত ও বিজ্ঞানের অবিসংবাদিত তিন মহত্তম প্রতিভার সারা জীবন ব্যাপ্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন শিল্পে ও বিজ্ঞানে সৃজনধর্মিতার মধ্যে রয়ে গেছে মূলগত এক পার্থক্য।

শেকস্‌পিয়র ও বিঠোফেনের ক্ষেত্রে, তিনি দেখিয়েছেন, তাঁদের প্রতিভার বিকাশ অনেক ধীর, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে উন্মীলিত হয়েছে। যতই তাঁরা পরিণত বয়সের দিকে এগিয়েছেন, ততই স্ফুরিত হয়েছে তাঁদের সৃজন ক্ষমতা। ততই পল্লবিত হয়েছে তাঁদের প্রতিভা। ১৫৮৭-তে তেইশ বছর বয়সে লন্ডনে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন যে তরুণ শেকস্‌পিয়র তাঁর কোনো ব্যাপ্ত শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার পটভূমি ছিল না। সেখান থেকে নিজেকে তৈরি করতে শুরু করে ১৫৯২-তে 'হেনরি সিক্স', 'দ্য কমেডি অব এররস', 'লভস লেবারস লস্ট' ও 'টু জেন্টলমেন অব ভেরোনা'-র রচয়িতা ১৬০৪ থেকে ১৬০৮-এর মধ্যে যেভাবে পৌঁছলেন 'ওথেলো', 'কিং লিয়ার', 'ম্যাকবেথ', 'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' ও 'ক্যারিওলেনাস'—এই কয়েকটি তাঁর শ্রেষ্ঠতম ট্র্যাজেডিতে তার মধ্যে রয়েছে বিকাশের এক ধীর ও ক্রমান্বিত পদ্ধতি। তাঁর ৫২ বছরের জীবনে (১৫৬৪-১৬১৬) ক্রমেই পরিশুদ্ধ হয়েছে, উজ্জ্বলতর হতে থেকেছে তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা। বিঠোফেনের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায় এরই প্রতিসাম্য। ১৮০১ সালে তাঁর বয়স তখন ৩১, রচনা করেন প্রথম সিমফনি। আর ১৮১২-তে ৪২ বছর বয়সে রচিত হল অষ্টম সিমফনি। এর পরের সাত বছর বিঠোফেন রয়ে গেলেন প্রায় সম্পূর্ণ নীরব। যেন ধ্যানের গভীরে নতুন সৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা। তারপর তাঁর নবম সিম্ফনি, শেষ চারটি পিয়ানো সোনাটা ও পাঁচটি কোয়ার্টেটে পাওয়া গেল অন্য এক বিঠোফেনকে সংগীতের ইতিহাসে যার সিদ্ধি যেন 'মাউন্ট এভারেস্টের' চূড়া স্পর্শ করেছে। অবশ্য আমাদের আরো কাছেই তো রয়েছে এরকম ধীর ও ক্রমান্বিত বিকাশের অনন্য দৃষ্টান্ত: রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথ। বয়স ও অভিজ্ঞতা কেমন করে স্বর্ণাভায় বিচ্ছুরিত করে, ক্রমেই গভীর-প্রসারী ও দিগন্ত থেকে দিগন্তে প্রস্ফুটিত করে সৃষ্টিকে—এর এত সার্থক তুলনা আর কোথায় আছে?

নিউটনের ক্ষেত্রে, চন্দ্রশেখর দেখিয়েছেন, তাঁর প্রতিভার বিকাশে যেন একটা 'জ্বলন্ত বিস্ফোরণের' চরিত্র আছে।ছেলেবেলায় তেমন কিছু অসাধারণ ছিলেন না নিউটন। ১৬৬১-তে ২০ বছর বয়সে যখন তিনি কেমব্রিজে গেলেন তখন নাকি তাঁর গণিতের জ্ঞান সাধারণের সামান্য উপরে। ১৯৬৪-তে যখন তাঁর বয়স ২৩ হঠাৎই যেন বিস্ফোরণ ঘটল তাঁর প্রতিভায়। তখন প্লেগের প্রকোপে কেমব্রিজ ছেড়ে তাঁকে যেতে হল উলসথোর্পে। উলসথোর্পে থাকার দুবছরেই সেই ২৩ থেকে ২৫ বছরে তাঁর কাছ থেকে পৃথিবী পেল বিজ্ঞানের তিনটি মহত্তম আবিষ্কার:

৭৫ রামকিঙ্কর। সাঁওতাল পরিবাব : কংক্রিট। ১৯৩৮।

ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস, আলোর বিশ্লেষণ, ও অভিকর্ষের তত্ত্ব। ৪২-বছর বয়সে নিউটন 'প্রিন্সিপিয়া' লেখা শেষ করেছিলেন। তারপর আরো চল্লিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। এই দীর্ঘ জীবনে বিজ্ঞানের সঙ্গে তিনি আর কোনো নিবিড় সম্পর্ক রাখেন নি।

এই উদাহরণ থেকে এরকম সিদ্ধান্তে আসতে চেয়েছেন চন্দ্রশেখর যে, সাহিত্যে বা শিল্পে প্রতিভার বিকাশ যেমন ধীর ও সারা জীবন ব্যাপী প্রক্রিয়া, বিজ্ঞানে, বিশেষত গণিতে, তা নয়। সেখানে প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটে একেবারে তারুণ্যে বা যৌবনে। নতুন উদ্ভাবনের ক্ষমতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ম্লান হয়ে আসে তারপরে। এজন্য সি পি স্নো বলেছিলেন—গণিত তারুণ্যের বা যৌবনের খেলা। টমাস হাক্সলি বলেছিলেন আরো সাংঘাতিক কথা—ষাট পেরনো কোনো বিজ্ঞানীর চর্চা বিজ্ঞানের ভালোর চেয়ে ক্ষতিই করে বেশি। দৃষ্টান্ত হিশেবে এসেছে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, জর্জ গ্যাব্রিয়েল স্টোকস, এমনকি আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানীরও নাম। আবার এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন লর্ড র‍্যালে। তাঁর ৫০ বছর ব্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক জীবনে কখনো ম্লান হয় নি উদ্ভাবনী প্রতিভা।

এই লর্ড র‍্যালেকে তাঁর ৬৭ বছর বয়সে যখন অনুরোধ করা হয়েছিল, হাক্সলির সেই ৬০ পেরনো বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের ভালোর চেয়ে ক্ষতিই করেন বেশি—এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে, তিনি নাকি বলেছিলেন, "হতে পারে তা, যদি তিনি (ষাট পেরনো বিজ্ঞানী) তরুণতর প্রজন্মের কাজের সমালোচনারই শুধু দায় নেন, কিন্তু আমি বুঝি না এর কী দরকার আছে, যদি তিনি তাঁর নিজের জ্ঞানের গণ্ডির মধ্যেই সঞ্চরণ করেন।"

সাহিত্য, শিল্প বা বিজ্ঞান সকলেরই তো কেন্দ্রে রয়েছে এক সৌন্দর্যের সন্ধান। সৌন্দর্যের কি কোনো একক সংজ্ঞা সম্ভব? বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ বলেছিলেন অংশের সঙ্গে সমগ্রের যে ছন্দের সৌষম্য, সৌন্দর্য সেটাই। এর সঙ্গে কবি কিটসের 'সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য' এই প্রত্যয়কে মেলালে আমরা হয়তো একটা ধারণার কাছাকাছি যেতে পারি যা দিয়ে বিজ্ঞান ও শিল্প দুটোরই কেন্দ্রীয় সন্ধানের কিছুটা কাছাকাছি হওয়া যায়। বিজ্ঞান কেন সেই সৌন্দর্য থেকে, সৌন্দর্যের সন্ধান থেকে বিচ্যুত হয় মাঝে মাঝে, কেন বিজ্ঞানী বিচ্ছিন্ন হয়ে যান বিজ্ঞান থেকে, এর উত্তর খুঁজতে চন্দ্রশেখর শেলির 'আ ডিফেন্স অব পোয়েট্রি'-তে এসেছেন শেষ পর্যন্ত। শেলির সেই বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, "Man, having enslaved the elements, remains himself a slave"। বস্তু বা বিষয়ের উপর প্রভুত্ব করতে চেয়ে মানুষ নিজেই হয়ে যায় তার দাস।

মহৎ প্রতিভা এই দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকেন। রামকিঙ্করের প্রতিভার মহান দিক এটাই যে তিনি আজীবন মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে, কোনো পর্যায়ে এই দাসত্ব তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি।

রামকিঙ্করের প্রতিভা ও দক্ষতার বিকাশের মধ্যে অমলিন স্বতঃস্ফূর্ততা আছে যদিও তা নিরন্তর প্রয়াসের ভিতর দিয়ে পরিশ্রুত। শেকসপিয়র প্রসঙ্গ আগে এসেছে বলেই প্রশ্ন জাগে এরকম, এর সঙ্গে কি কোনো সাযুজ্য আছে শেকসপিয়রের? শেকসপিয়র লন্ডনে এসেছিলেন ২৩ বছর বয়সে। নিজেই নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন ক্রমে ক্রমে। বাঁকুড়া থেকে শান্তিনিকেতন এসে পৌঁছেছিলেন যখন রামকিঙ্কর, তিনিও তখন নবীন যুবক, সবে তারুণ্য পেরিয়েছে, বয়স মাত্র ১৯। তারও তখন পুথিগত বিদ্যা বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। ছবি আঁকার দক্ষতা কিছুটা অর্জন করেছিলেন একান্ত নিজেরই চেষ্টায়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' কাগজের সম্পাদক। তিনিও বাঁকুড়ার লোক। রামকিঙ্করের ছবি ও নাটকের জন্য আঁকা দৃশ্যাবলী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনিই তাঁকে পাঠান শান্তিনিকেতনে নন্দলালের কাছে কিছুদিন শিক্ষানবিশির জন্য। রামকিঙ্করের জীবনে সেই কিছুদিন আর শেষ হয় নি কখনো। তিনি হয়ে উঠেছিলেন শান্তিনিকেতনেরই জল মাটি আকাশ বাতাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। শান্তিনিকেতন তাঁকে আমূল পালটে দিয়েছিল। আবার কতকগুলো জায়গায়, বিশেষত শিল্পের নন্দন ও প্রকরণ সম্পর্কে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁকুড়ার অর্জিত ধ্যান-ধারণাকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে নি শান্তিনিকেতনও। সেইখানে তিনি তাঁর বিশ্বাসে অটল ছিলেন আজীবন। তাঁর ব্যক্তিত্বে সেই দৃঢ়তা, সেই অনমনীয়তা ছিল। যেমন তেলরঙে ছবি আঁকা, শিল্পের বাস্তবতা সম্পর্কে আশৈশব অর্জিত বোধ, এগুলোতে তিনি একভাবে স্থির ছিলেন।সেই বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিতে শান্তিনিকেতন, নন্দলাল, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্ত ও গভীর দর্শন ও জীবনচেতনার নিপুণ বুনন চলেছে। সেই বুননে দুই সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছেন আমাদের এই যুগে ভারতবর্ষের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ একজন আধুনিক ভাস্কর।

৪৮

৭৬· *রামকিঙ্কর। কচ ও দেবযানী। প্লাস্টার। ১৯২৯।*

সেখানেও তো রামকিঙ্কর একেবারেই নিজেই নিজের স্রষ্টা, নন্দলাল যেমন বলতেন। সেই শৈশবে অনন্ত জ্যাঠার (পাল) কাছে দুর্গা মূর্তি গড়ার হাতেখড়ি আর নিজেরই চেষ্টায় মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে যে ভাস্কর্যের অলিন্দে প্রবেশ সেই অভিজ্ঞতাটুকুই তো ক্রমে বিবর্ধিত হয়েছে। তারপর শান্তিনিকেতনে অস্ট্রিয়ার লিজা ফন পট বা বুর্দেল শিষ্যা মার্গারেট মিলওয়ার্ড কিছু প্রকরণ হয়তো শিখিয়েছেন। কিন্তু নন্দন ও রূপবোধের বাকি সমস্তটাই তো শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরিতে বিদেশী বই দেখে আর নিজেরই ধ্যানের ভেতর থেকে পাওয়া। সেজনাই রামকিঙ্কর শিল্পের জগতে একটা বিস্ময়।

অথচ কত ধীরে, কত দীর্ঘ সময় ধরে, কত আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে তাঁর প্রতিভা। এই ক্রমিক বিস্তারই আমাদের নিয়ে যায় ডঃ চন্দ্রশেখর বর্ণিত সেই প্রত্যয়ে যে কলাশিল্পে প্রতিভার কোনো হঠাৎ বিস্ফোরণ নেই, তা দীর্ঘজীবনব্যাপী এক প্রক্রিয়া। জীবন থেকে ধীরে ধীরে রসদ সংগ্রহ করে ক্রমান্বয়ে তা পূর্ণতর হয়। সেই পূর্ণতায় আমরা পাই শেক্‌সপিয়রের 'কিং লিয়ার', বিঠোফেনের 'নবম সিম্‌ফনি', রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' বা ছবির অর্ঘ্য, অথবা রামকিঙ্করের 'যক্ষ-যক্ষী'। এই বিবর্তনের ক্রম থেকে আমরা রামকিঙ্করের প্রতিভার মহত্ত্বের সামান্য আভাস পেতে চেষ্টা করব প্রথমে। তারপর আরো বিস্তারে বুঝতে চেষ্টা করব তাঁর সৃষ্টির বিবর্তনের স্বরূপ।

১৯২৮ থেকে রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনে নিয়মিত সৃজনশীল ভাস্কর্য শুরু করেছেন। তার কিছু কিছু নানা ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছড়িয়ে আছে, কিছু কিছু হারিয়ে গেছে। তবে আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যে প্রথম সংযোজন হিশেবে গণ্য করা যায় যে কাজটিকে সেটি হয়তো ১৯৩৫-এ করা 'সুজাতা'। বিশ্বভারতীর সংগীতভবন প্রাঙ্গণে ইউক্যালিপটাস গাছের সমারোহের মধ্যে ডাইরেক্ট কংক্রিটে গড়া বৃক্ষেরই সাযুজ্যে দীর্ঘায়ত বেড়ে ওঠা ও সুস্থির দাঁড়িয়ে থাকা অথচ জঙ্গমতায় ভরপুর এই শীর্ণা নারীপ্রতিমা এ যুগের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি সন্দেহ নেই। রামকিঙ্কর ভেবেছিলেন এর নাম দেবেন 'বনবালা', বৃক্ষের মধ্যে বৃক্ষের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী, এই বোধ থেকে। পরে নন্দলালের নির্দেশে মাথায় বসিয়ে দেন পায়সান্নের বাটি। কিছু দূরে আছে বুদ্ধের ছবি। যেন এই নারী সেদিকেই চলেছে মিষ্টান্নের অর্ঘ্য নিয়ে। তাই নাম হয় 'সুজাতা'। জয়া আপ্পাসামির চেহারার আদলটি ছিল

উপলক্ষ। তা থেকে পৌঁছল যে লক্ষ্যে তাকে বলা যায় আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের মুক্তির প্রথম সোপান। অথচ এর সঙ্গে প্রথাগত ভারতীয়তার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো সমান্তরাল কি আছে ইওরোপীয় ভাস্কর্যের আধুনিকতায়? অ্যালবার্ত জিয়াকোমেত্তির কাজে রয়েছে এক ধরণের শীর্ণতার দীর্ণ প্রকাশ।

আয়তনহীনতায় নর-নারীর অবয়বের উর্ধ্বমুখী বেড়ে ওঠা দিয়ে এক বিপন্ন শূন্যতাকে পরিস্ফুট করতে চাইতেন জিয়াকোমেত্তি। সার্ত্রে তাঁর উপর এক লেখায় বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন সেই শূন্যতার স্বরূপ: "বস্তুর মধ্যে, মানুষের পরস্পরের মধ্যে পড়ে থাকে ভাঙা সেতু; শূন্যতার অনুপ্রবেশ ঘটে সর্বত্র; প্রতিটি প্রাণী সৃষ্টি করে চলে তার নিজস্ব শূন্যতা।" (সার্ত্রে: 'এসেস ইন ইসথেটিকস', পৃষ্ঠা ৮১)। জিয়াকোমেত্তির কাছে মানুষের দুটি নাসারন্ধ্রের মধ্যবর্তী যে শূন্যস্থান সেটাও ছিল অসীম রহস্যের আধার। সেই শূন্যতার দর্শন ছিল তাঁর এই শীর্ণাবয়ব ভাস্কর্য। কিন্তু জিয়াকোমেত্তির এইসব ভাস্কর্যের রচনাকাল ১৯৪৭, ৪৮ ৪৯ এরকম। আর স্বভাবতই এরকম শূন্যতার দর্শনে রামকিঙ্করের কোনো আস্থা ছিল না। আবার পিকাসোর 'স্টিক স্ট্যাচুজ' নামে কিছু দীর্ঘায়ত শীর্ণাবয়ব ভাস্কর্য আছে যা ১৯৩১-এর কাজ। এর মধ্যে একটা অজানা রহস্যের উন্মোচন আছে। কিন্তু রামকিঙ্করের 'সুজাতা' একেবারেই অন্য ধরণের কাজ। তাতে আছে বৃক্ষের বেড়ে ওঠা, প্রশান্তির মধ্যে জঙ্গমতা, যৌবনের রহস্য ও উদ্বেলতা এবং এক ধ্রুবত্বের প্রতি বিশ্বাস। ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্যের এই প্রশান্তি ও বিশ্বাসের তত্ত্ববিশ্ব থেকেই রামকিঙ্কর শুরু করলেন তাঁর যাত্রা আরো ব্যাপ্ত, বলিষ্ঠ পাদপীঠের দিকে। তখন তাঁর বয়স প্রায় ২৯ বা ৩০। শিল্পে এতটা সময় যায় শুধু প্রস্তুতিতেই।

এরপর আসা যায় রামকিঙ্করের শেষদিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বা বড় মাপের কাজের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে। পরিকল্পনাটিকে শেষপর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে যেতে পারেন নি তিনি। সমাজসংস্থার নিয়ামকদের বাধার কবলে পড়ে অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেল হয়তো এই সময়ের মহৎ একটি সৃষ্টি। কিন্তু ১৯৭৪ থেকে ৭৬-এর মধ্যে এর কয়েকটি ম্যাকেট তিনি করেছিলেন মাটি ও সিমেন্টে। সেই খশড়া মূর্তিগুলিই এখন সেই পরিকল্পনার সাক্ষ্য বহন করে। এই ভাস্কর্যের নাম: 'কংকালীতলার পথে'। রবি পাল এই কাজটি প্রসঙ্গে একটি বড় লেখা লিখেছিলেন 'শারদীয় দেশ' ১৩৯৫-তে। সেই লেখা থেকেই জানি এ সম্পর্কে।
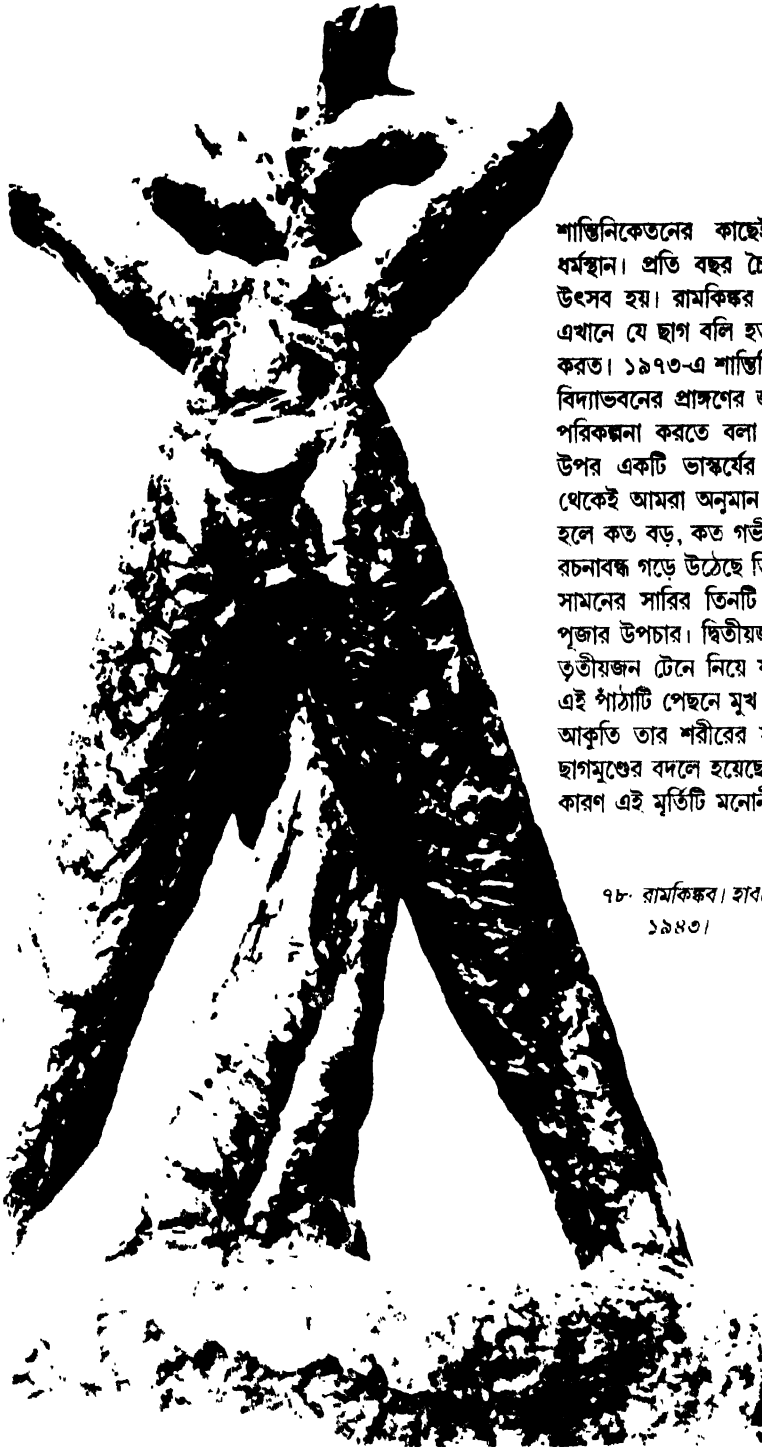
শান্তিনিকেতনের কাছেই 'কংকালীতলা' নামে একটি ধর্মস্থান। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে পূজা ও উৎসব হয়। রামকিঙ্কর প্রতি বছর যেতেন তা দেখতে। এখানে যে ছাগ বলি হত, সেই বীভৎসতা তাঁকে পীড়িত করত। ১৯৭৩-এ শান্তিনিকেতনে পরিকল্পিত একটি নতুন বিদ্যাভবনের প্রাঙ্গণের জন্য তাঁকে যখন একটি ভাস্কর্যের পরিকল্পনা করতে বলা হয়, তখন তিনি এই বিষয়টির উপর একটি ভাস্কর্যের কথা ভাবেন। খশড়া মূর্তিগুলি থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি ঠিকভাবে রূপায়িত হলে কত বড়, কত গভীরপ্রসারী কাজ হতে পারত এটি। রচনাবন্ধ গড়ে উঠেছে তিনটি পুরুষ ও একটি পাঁঠা নিয়ে। সামনের সারির তিনটি পুরুষের মধ্যে একজনের হাতে পূজার উপচার। দ্বিতীয়জন বহন করছে একটি হাড়িকাঠ। তৃতীয়জন টেনে নিয়ে যাচ্ছে পাঁঠাটিকে। দ্বিতীয় সারিতে এই পাঁঠাটি পেছনে মুখ ফিরিয়ে—যেতে না চাওয়ার তীব্র আকৃতি তার শরীরের সমগ্র অভিব্যক্তিতে। এর মাথাটি ছাগমুণ্ডের বদলে হয়েছে মানুষের। জানা যায় এটাই নাকি কারণ এই মূর্তিটি মনোনীত না হওয়ার। এই যুগল মূর্তির

৭৮· রামকিঙ্কর। হাবভেস্টার (ধানমাড়াই)। ব্রোঞ্জ। ১৯৪৩।

গতির তীব্রতায়,প্রতিমাকল্পগুলির পারস্পরিক আততি বা টেনশনে এবং সমগ্র অভিব্যক্তিতে প্রকট হয়ে উঠছে মানুষের মধ্যে দীর্ঘলালিত এক পাশবিকতার প্রতি তীব্র ধিক্কার ও প্রতিবাদ। রামকিঙ্কর তাঁর সারা জীবন অর্জিত মানবতাবোধ, নন্দনচেতনা ও প্রকরণজ্ঞান নিয়ে শিল্পের এক দুর্লভ সিদ্ধিতে পৌঁছলেন, যেখানে জীবনদর্শন ও শিল্পদর্শনের সমন্বয় ঘটল। এর পেছনে রয়েছে তাঁর সেই সময় পর্যন্ত প্রায় ৭০ বছরের জীবনে ৫০ বছরের একনিষ্ঠ শিল্প সাধনার ইতিহাস।

মহৎ শিল্পীর ক্রমান্বিত হয়ে ওঠায় যে দীর্ঘ ব্যাপ্তি ও সাধনা থাকে রামকিঙ্করের তা ছিল। তবু আমরা যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের সঙ্গে তাঁর কাজের পরিমাণের তুলনা করি, তাহলে দেখব হয়তো রদাঁ, ব্রাঁকুসি বা হেনরি ম্যুরের তুলনায় তাঁর কাজের সংখ্যা বা ব্যাপ্তি কম। কিন্তু ভারতবর্ষে আধুনিক ভাস্কর্যের যে শূন্যতায় রামকিঙ্কর শুরু করেছিলেন, যে প্রতিকূলতায় কাজ করে তিনি ভাস্কর্যের রূপ ও ভাবের নান্দনিক পাদপীঠ সন্ধান করেছেন, তার তুলনা ভারতবর্ষে তো নেই, পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রামকিঙ্করের অবদানের দিকে আমাদের তাকাতে হয়।

আমাদের সৌভাগ্য রামকিঙ্করকে নিয়ে সমরেশ বসু একটি জীবন-উপন্যাস শুরু করেছিলেন। 'দেশ' পত্রিকায় 'দেখি নাই ফিরে' নামে ৬৫টি কিস্তিতে সেই লেখা বেরিয়েছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য সমরেশ বসু সেটা শেষ করে যেতে পারেন নি। সেটা শেষ হলে বাংলা উপন্যাসেও একটি মহৎ সৃষ্টি সংযোজিত হত। তবু ১৯৩৫ পর্যন্ত রামকিঙ্করের জীবনের যেটুকু ধরা আছে সেখানে তাঁকে জানার পক্ষে সেটা খুবই প্রয়োজনীয়। ঋত্বিক ঘটক তাঁকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। খানিকটা তোলাও হয়েছিল। সেটাও শেষ করে যেতে পারেন নি ঋত্বিক। প্রকাশ দাসের সম্পাদনায় 'রামকিঙ্কর' নামে বেরিয়েছে একটি সংকলন-গ্রন্থ। তাঁর সাক্ষাৎকার, লেখা, তাঁকে নিয়ে লেখা নানা রচনা ও তথ্যে সমৃদ্ধ বইটি। রবি পাল লিখছেন গত কয়েক বছর ধরে 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় এবং অন্যত্রও তাঁর জীবনের ও কাজের বিভিন্ন অংশের উপর স্বতন্ত্র আলোচনা। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে তাঁকে নিয়ে ছোট বড় নানা প্রবন্ধ ও আলোচনা। সেইসব তথ্যের উপর ভিত্তি করেই বর্তমান এই লেখাটির অবতারণা।

দুই

'লীলায়িত প্রাণ উৎসের পাশে জন্মমৃত্যুর খেলা'

আইনস্টাইনকে একবার এক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপেক্ষিকতা তত্ত্বের আবিষ্কারটা যে তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছিল, এটা কেন? অন্য কেউ-ও তো তাঁর আগে বা পরে আবিষ্কার করতে পারতেন তা? উত্তরে বলেছিলেন আইনস্টাইন, শৈশবটা তার অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, কুড়ি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর মনের বিকাশ ছিল খুবই ধীর ও শ্লথ। তাই যৌবনে পৌঁছেও শিশুর বিস্ময়টা হারান নি তিনি। নানা রকম অসম্ভব প্রশ্ন আর সমস্যা নিয়ে তিনি মুগ্ধতায় ভাবতে ভালোবাসতেন। সেই বিস্ময়বোধ থেকেই হয়তো আপেক্ষিকতার মতো জটিল তত্ত্ব তাঁর মাথায় খেলে গিয়ে থাকবে।

রামকিঙ্করের মধ্যে এই শিশুর সারল্য ও বিস্ময়বোধ বজায় ছিল সারা জীবন। অথচ যে গ্রামীণ পরিবেশে যে দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে তা ছিল খুবই বাস্তব। সেখানে কোনো ভাবালুতার প্রশ্রয় ছিল না। বাঁকুড়ার যুগিপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম ১৯০৬ সালে ২৫ মে। তাঁর জন্মবছর নিয়ে অনেক সংশয় দেখা যায়। এমনকী ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্টের বিভিন্ন ক্যাটালগে তাঁর জন্মসাল ১৯১০ বলে উল্লেখ আছে। রামকিঙ্কর শেষ জীবনের অনেক সাক্ষাৎকারে প্রথমোক্ত তারিখটিই উল্লেখ করতেন। তাঁর পিতা চণ্ডীচরণ বেইজ। মা সম্পূর্ণা। পারিবারিক বৃত্তিতে তাঁরা ছিলেন ক্ষৌরকার। দারিদ্র্য ছিল তাঁদের নিত্যসঙ্গী। সেখানে ছবি আঁকার মতো কোনো বিলাসিতার সুযোগ ছিল না। পারিবারিক ঐতিহ্যও কিছু ছিল না। প্রকৃতির নিয়মের এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম যে তাঁর ভবিতব্য শৈশব থেকেই চিত্র ও ভাস্কর্যের দিকে টেনেছিল তাঁকে।

শেষ জীবনে এক স্মৃতিচারণায় রামকিঙ্কর বলেছেন,

৭৯· রামকিঙ্কর। কলের বাঁশি। কংক্রিট। ১৯৫৬।

৮০· রামকিঙ্কর। গান্ধী। ডাণ্ডি মার্চ। সিমেন্ট, প্লাস্টার ১৯৪০। ব্রোঞ্জ ১৯৭২।

৮১· রামকিঙ্কব। রবীন্দ্রনাথ। বিমূর্ত। প্লাস্টার। (পরে ব্রোঞ্জ)। ১৯৩৮।

"আমাদের বাড়ির ঘরগুলোয় দেয়ালভর্তি নানারকমের দেবদেবীর ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার ছিল। তার মধ্যে ওঁ এর ভেতর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। আমি তখন খুব ছোট। পড়াশুনা ও খেলাধুলার ফাঁকে ফাঁকে সেইসব ছবিগুলো অনেকক্ষণ ধরে দেখতাম। নানা রঙের দেবদেবীর ছবি দেখতে ভালো লাগত। ওঁ-এর ভেতর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির প্রথম কপি করি। ছবি আঁকায় সেই আমার প্রথম হাতেখড়ি।" (পরিচয়, শারদীয়, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ৩০৬, অনুলিখন: বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়)

সরল জীবনের প্রখর বাস্তবতার ভিতর দিয়ে তিনি যেমন বড় হচ্ছিলেন, তেমনি প্রথম জীবনে ছবির যে জগতের সঙ্গে তিনি পরিচিত হচ্ছিলেন নান্দনিক দিক থেকে সেখানেও ছিল প্রগাঢ় বাস্তবতাশ্রিত রীতির অনুশীলন। রূপায়ণের বাস্তবতার সঙ্গে এই সংযোগ তাঁর কিন্তু কোনোদিন কাটে নি। এমনকী নন্দলাল বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যের দোহাই দিয়েও তাঁকে সামাজিক, নান্দনিক ও প্রাকরণিক বাস্তবতা বা বাস্তবচেতনা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি। একদিকে সরলতা, অপার বিস্ময়বোধ, অন্যদিকে প্রখর বাস্তবতা—রামকিঙ্করের শিল্পীজীবনে এটাই একটা ডাইলেমা। এই দুইয়ের সহাবস্থানের ভিতর থেকে তাঁকে একটা স্বসৃষ্ট সমন্বিত নন্দন-চেতনায় পৌঁছতে হয়েছে। শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আগে একেবারে কৈশোরেই তিনি তেলরঙে যে সমস্ত ছবি এঁকেছেন তাতে যে অনুপুঙ্খ স্বাভাবিকতা প্রতিফলিত তার সঙ্গে হেমেন মজুমদারের সাদৃশ্যের কথাও কেউ কেউ বলেন। অথচ তেলরং তাঁকে কেউ শেখায় নি। তিনি খুব মজা করে বলতেন, তাঁকে তেলরং শিখিয়েছিল কলকাতায় এক রঙের দোকানের বিক্রেতা। বাঁকুড়া থেকে একবার কলকাতায় এসেছিলেন। এক রঙের দোকানে গিয়েছিলেন রং কিনতে। দোকানীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: তেলরং কেমন করে আঁকে? সে কিছু না বলে টিউব থেকে রঙ বের করে লিনসিডে মিশিয়ে আঙুল দিয়ে কাগজের উপর দাগ কেটে দেখিয়েছিল, এই হল তেলরঙের পদ্ধতি। সেই থেকে হয়ে গেল তাঁর তেলরঙের শিক্ষা। এই অনুপুঙ্খ স্বাভাবিকতার সঙ্গে, এই বাইরের বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের অন্তর্লীন বাস্তবের বোঝাপড়া করতে হচ্ছিল কলাভবনে শিক্ষার প্রথম কয়েক বছরে।

সমরেশ বসু 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসের একটি অংশে এই প্রশ্নটির অবতারণা করে এর একটি সুন্দর সমাধানও খুঁজেছেন। প্রশ্ন জেগেছে রামকিঙ্করের মনে,

"অবিকলের সঙ্গে মনের ভিতরের আঁকা ছবিটির ফারাক কোথায়? যে-কথা কখনো বলা যায় না অথচ ঘটে আর তা গোপন আনন্দের মতো, তা-ই কি অবিকলের সঙ্গে ভিতরের আঁকার ফারাক? অথবা আনন্দের পরিবর্তে, তা কষ্টেরও হতে পারে। কিন্তু সে কষ্টও গোপনীয়। তাকে প্রকাশ করা যায় না।" অনেক ভাবনার পর এরকম এক সমাধানে আনা হয় তাঁকে, "যার ছবি আঁকা হবে, তার ভিতরের মানুষটিকে আঁকা করতে হবে। গাছপালা নদী আকাশ মানুষ, অবিকল আঁকা করলে, উটি আঁকা হয় না। মন আঁকে। শুধু চোখ আঁকা করে না। বাইরের দেখাটাকে, নিজের মতো করে একবার মনে মনে দেখলে, সেটাই হবে শিল্প।" (দেশ ১১ জুলাই ১৯৮৭)

এসব প্রশ্নের তো কোনো শেষ সমাধান হয় না। আসলে রামকিঙ্কর সত্য ও সুন্দরের সমন্বয়ে সত্যকে সবসময়ই গভীর গুরুত্ব দিয়েছেন। বাস্তবতার সত্যকেই সুন্দরে অন্বিত করেছেন। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছেও এক সাক্ষাৎকারে (২৬ নভেম্বর ১৯৬৯) জীবন কী?—এরকম জটিল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন একজন বাস্তব সচেতন মরমী শিল্পীর মতোই। তাঁর সেই একান্ত নিজস্ব অনুপম ভঙ্গিতে বলা কথাগুলো একটু শুনে নিতে পারি আমরা। তাঁর সৃষ্টির স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করবে তাঁর এই জীবন ও শিল্পদর্শন।

"অ্যানাটমি। আসছি এরপর। মাসল আছে, মাসল। তার ওপরে ফেক্স আছে। তার ওপরে তোমরা হাসি দেখছ। প্রেম করছ। এ করছ, সে করছ। অ্যা, করছ তো? এই রকম আমরা আর্টের মধ্যে দেখছি। সেইগুলো কপি করে করে আমরা আবার শিখছি। আচ্ছা, ডাক্তাররা কী করছে? তোমাদের হার্ট, হাড্ডি, মাসল এরকম কেটেকুটে দিয়ে তার মধ্যে স্পষ্ট দেখছে। ডাক্তারদের ব্যাপার আলাদা। আমাদের একটু বাইরের। বাইরের যা সুন্দর দেখছি। আচ্ছা সুন্দরটা কী করে হচ্ছে? এগুলো সব নিয়ে সুন্দর হচ্ছে। উ। কিন্তু সুন্দর তো রইছে। একটি গাছ ধরো। সেটিও এরকম হাড্ডি-ফাড্ডি, তার ভিতরে রইছে। মাস্‌ল রইছে। তার ভিতরে স্নায়ু রইছে। তার মধ্যে রক্ত রইছে। রস রইছে। দিয়ে একটিগাছ হয়েছে। ফুল ফুটছে। তুমি সেই ফুল দেখে আনন্দ পাচ্ছ। আমরা সেই ফুলটাই আঁকছি আবার। আঁকছি, কিন্তু ভিতরে ফিলিংটা আছে। ফিলিংটা আছে ওর ভিতরে হাঃ-হাঃ-হাঃ।— সে ফিলিংটা দিয়ে ওই

ছবি আঁকছি।"—('শিল্পের মানুষ রামকিঙ্কর'—বাসুদেব চন্দ্র। প্রতিক্ষণ ১৭ আগস্ট ১৯৮৪)

সুন্দরের মধ্যে সত্যের এই জোরটাই রামকিঙ্করকে তাঁর সময়ের বিশ্বভারতীর বা কলকাতার নব্য-বঙ্গীয় ধারা থেকে স্বতন্ত্র করেছে। শিল্পের এক স্বতন্ত্র সত্যের সন্ধানে প্রাণিত করেছে। ছবিতে ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম, কিউবিজম থেকে শুরু করে ইওরোপীয় আধুনিকতার সবগুলো আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে। কিউবিজম ও এক্সপ্রেশনিজমকে তিনি যেমন সারা জীবন চিত্রপটের দ্বিমাত্রিকায় বুঝে নিয়েছেন, তেমনি আরো গভীর প্রয়োগ করেছেন ভাস্কর্যের ত্রিমাত্রায়। এসবে ইওরোপ তাঁকে সাহায্য করেছে ঠিকই। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি তিনি নিয়েছেন আমাদেরই দেশের মাটি থেকে। 'পরিচয়'-এর সেই পূর্বোক্ত স্মৃতিচারণায় বলেছেন:

"আমি নিজে সাধারণ, গরিবঘরের মানুষ। ছোট থেকেই আমার আশেপাশে খেটে খাওয়া মানুষ দেখে অভ্যস্ত। এদের সহজ সরল জীবন, কাজ করার ভঙ্গি, চলমান রূপ—এ সবই আমার ছবি ও মূর্তির বিষয়বস্তু। শান্তিনিকেতনে সাঁওতালরা আমায় বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এদের মেয়ে-পুরুষ সকলেই কাজ করে। কাজ করে হাসিমুখে। আবার সামান্য ফাঁক পেলেই নাচে গানে মেতে ওঠে। এঁদের জীবনের চাহিদা খুব সীমাবদ্ধ। কিন্তু আনন্দ পাওয়া ও আনন্দ দান করার ক্ষমতা অসীম। তাই এদের এই চলমান জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তগুলিকে আমি আমার ছবি ও মূর্তিতে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।"

রদাঁর স্টুডিওতে নাকি নগ্নিকা ও নগ্ন স্ত্রী পুরুষ মডেল সব সময় ঘুরে ফিরে বেড়াত। তিনি যখন ইচ্ছা তাদের দেখতেন, স্কেচ করতেন, মূর্তির কোনো অংশ তাঁদের ভঙ্গির আদলে ভাঙতেন, জুড়তেন। রামকিঙ্করের তো সেরকম কোনো স্টুডিও ছিল না। এই বিস্তীর্ণ জীবনই ছিল তাঁর কাজের সবসময়ের মডেল। এই জীবন থেকে পাওয়া প্রগাঢ় এক ভালোবাসা, আদিমতার নিষ্কলুষ আবেগ তাঁর সৃষ্টির উৎস, সমস্ত কাজের প্রেরণা। কে জি সুব্রামনিয়ান হয়তো এই চেতনাকেই বলেছেন— 'অ্যান ইন-বোর্ল্ট প্যানথেয়িস্টিক রোমান্টিসিজম' ('মোভিং ফোকাস'—পৃষ্ঠা ৭৯)। এই রোমান্টিসিজম দিয়েই তিনি গড়েছেন আবার ভেঙেছেন। বস্তুর বা জীবনের বাইরের অবয়বের কাঠামোর বলিষ্ঠ গাঠনিকতার মধ্যে সত্তার অলৌকিক আলোর প্রতিফলন এনেছেন। জীবনের শেষপর্বে (৬.৮.১৯৭৬) শান্তিনিকেতনে একটি লিখিত ভাষণে অনুপম একটি কথা বলেছিলেন, 'লীলায়িত প্রাণ উৎসের পাশে ছন্দোবদ্ধ কাঠামোর জন্মমৃত্যুর খেলা কী সুন্দর। দেখতে দাও।' ('রামকিঙ্কর', পৃষ্ঠা ২৫) এই লীলায়িত প্রাণছন্দের জন্মমৃত্যুর খেলার প্রধান উৎস বা প্রেরণা তাঁর কাছে বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে আজীবন তিনি তাঁর একমাত্র গুরু বলে মেনেছেন। সনাতন ভারতের আদিমতার ছন্দের সঙ্গে রাবীন্দ্রিক জীবনদর্শনের সমন্বয় তাঁর ভাস্কর্যের নান্দনিকতার প্রধান উৎস।

তিন

ভাস্কর্যের রামকিঙ্কর

তাঁর প্রথম মূর্তি গড়া প্রসঙ্গে রামকিঙ্কর বলেছেন:

"(ছেলেবেলায়) একদিন ধারা-বর্ষণের পর দেখি আমাদের বাড়ির সামনে মোরামে ঢাকা রাস্তা ধুয়ে নীল রঙের মাটি বেরিয়ে পড়েছে। কি যে হল খাবলা দিয়ে সেই খানিকটা তুলে এনে ছোট বড় নানা মূর্তি ও পুতুল তৈরি করতে লাগলাম। সেই আমার প্রথম মূর্তি গড়ার কাজ।" (পরিচয়-পূর্বোক্ত উৎস)

তারপর অনন্ত জ্যাঠার সংস্পর্শে আসেন। অনন্ত পাল ছিলেন কুমোর। প্রতি বছর দুর্গা প্রতিমা গড়তেন তাঁদের গ্রামে। রামকিঙ্করের হাতের কাজ আর আগ্রহ দেখে তাঁকে স্নেহ করতেন খুব। প্রতিমা গড়ার করণ-কৌশল তিনিই হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন। আর সব নিজে করলেও দুর্গার চোখ আঁকার বা চক্ষুদানের দায়িত্ব ছিল রামকিঙ্করের। তখন ধ্যানের মধ্য দিয়ে যুক্ত করতে হত নিজেকে প্রতিমার অলৌকিকত্বের সঙ্গে। ধ্যানের মধ্য দিয়ে এই যে শিল্পের সত্তায় পৌঁছনো এর প্রথম শিক্ষা বাঁকুড়ার সেই শৈশবেই। তারপর শান্তিনিকেতনে জাপানের এক শিল্পীকে দেখেছেন, ছবি আঁকার আগে ধ্যানে বসে গিয়ে মূর্তির রূপকল্পনা করতে। 'মন আঁকে। শুধু চোখ আঁকা করে না।' এই সত্য তিনি শৈশব থেকেই অর্জন করেছেন। সেই প্রতিমা গড়ার মধ্যেও তাঁকে বুঝতে হয়েছে বাস্তবের মানবী ও দেবীর অলৌকিকতার মধ্যে সম্পর্ক,

অনুধাবন করেছেন রক্ত-মাংসে হাড়-চামড়ার মানবীয় অস্তিত্বকে আত্মস্থ করেই দেবীত্বের সত্তায় পৌঁছতে হয়। তাই তাঁর দেবী মূর্তিতে তাঁর দেখা পার্থিব কোনো মানবীর আদল এসে গেছে। কিন্তু সেই আদলকে মানুষী সীমায় আটকে রাখেন নি। তাঁকে দেবীত্বে উত্তীর্ণ করেছেন।

এই দুইয়ের টানাপোড়েনের খেলা চলেছে তাঁর সারা জীবনের ভাস্কর্য-শিল্পে। বিশেষত মানুষের মুখের প্রতিকৃতি গড়েছেন যখন, তখন সব সময়ই তাঁকে ভাবতে হয়েছে মুখের আদলটি মেলানো বড় কথা নয়, তাঁর কাজ হচ্ছে মুখের রূপায়ণের মধ্য দিয়ে মানুষটির ভিতরের চরিত্র বা সত্তার স্বরূপটিকে প্রস্ফুটিত করা। এজন্য স্থির বা স্থবির মূর্তিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। মডেলকে কখনো স্থিরভাবে বসিয়ে রাখার দরকার হত না। সে তার কাজের মধ্যে কথার মধ্যে থাকত আর তখনই ধরা পড়ত তাঁর সত্যিকারের চরিত্র। ১৯৩৫-এ সংগীতশিল্পী আলাউদ্দিন খাঁ শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন যখন, রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় তাঁর একটি মূর্তি করেছিলেন রামকিঙ্কর। তখন দেখেছিলেন শিল্পী যখন মডেল হয়ে বসে থাকেন নীরবে, সেই সময় গড়া হয় যে মূর্তি তা হয়ে ওঠে কাঠ-কাঠ, প্রাণের স্পন্দন থাকে না তাতে। শিল্পীর সত্তার সবটুকু আলো, সবটুকু সৌন্দর্য, তাঁর প্রকৃত চরিত্র ফুটে ওঠে যখন তিনি সরোদ হাতে বাজাতে বসেন। তখন মুখাবয়বের পেশিমগুলীর যে আততি, পারস্পরিক অবস্থান, তাতেই ধরা পড়ে শিল্পীর স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত মূর্তিটি তিনি গড়েছিলেন ১৯৩৮-এ। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সত্তায় পৌঁছতে ভেঙে দিয়েছিলেন বাইরের রূপের সমস্ত আদল। চোখের জায়গায় চোখের বদলে বসিয়েছেন দুটি বল। নিজেই বলেছেন, "অত সুন্দর চোখ গুরুদেবের। আর আমি কিনা একজোড়া কিম্ভুতকিমাকার বল বসিয়ে কাজ সারলাম?" আসলে তিনি ধরতে চাইছিলেন রবীন্দ্রনাথের সত্তার গহনতর আর্তি, যে আর্তি, যে ক্রাইসিস, তখন সারা বিশ্বকে আলোড়িত করছিল, যে আর্তিরই রূপ দিয়ে যাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষজীবনের সাহিত্যে ও ছবিতে, সেই আর্তিকে তিনি ধারণ করেছিলেন নিজের সত্তাতেও। কেমন করে একজন ভাস্কর ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে এই গভীর ব্যক্তিত্বের কাছে পৌঁছবেন? রামকিঙ্কর এরই সমাধান খুঁজেছেন তাঁর মুখাবয়বের ভাস্কর্যে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ শিল্পের নন্দনে শিক্ষিত হল না। তাই ওই ভাস্কর্য নিয়ে আজও বিতর্কের ঝড় ওঠে। হাঙেরির বুদাপেস্টে রয়েছে ওই ভাস্কর্যের যে প্রতিলিপি সেটাকে সরিয়ে নেওয়ার দাবিও উঠেছিল আমাদের অনেক রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে। ৮১

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে সারাজীবনই প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে রামকিঙ্করকে। আমরা তো দেখলাম আগে এমনকী তাঁর পরিণত বয়সে পৌঁছেও, যখন ভাস্কর হিশেবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অবিসংবাদিত, তখনো তিনি শান্তিনিকেতনের পরিমণ্ডলে করতে পারেন নি নিজের পছন্দমতো একটি কাজ। ১৯৩৫-এ 'সুজাতা' গড়েন যখন, বিতর্ক উঠেছিল তখনো। রবীন্দ্রনাথ সেই মূর্তি দেখে খুশি হয়েছিলেন। তাঁকে ডাকিয়ে বলেছিলেন সমস্ত শান্তিনিকেতন ভরে দিতে ওরকম বড় বড় মূর্তি দিয়ে। তখন যদি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন না পেতেন, তাহলে ওভাবে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। সেই সময় কলাভবনে ভাস্কর্য শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ভাস্কর্যই যে শিখবেন তিনি এমন কোনো পরিকল্পনা গোড়াতে রামকিঙ্করেরও ছিল না। কিন্তু ভাস্কর্যের প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহেই নন্দলাল শেখার মতো পরিমণ্ডল তৈরি করে দেন। দুজন বিদেশিনীকে অবশ্য আনিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে মার্গারেট মিলওয়ার্ডের কাছেই কিছু কিছু প্রকরণ শিখেছিলেন। এর বাইরে ভাস্কর্যে রামকিঙ্কর সব অর্থেই স্ব-শিক্ষিত শিল্পী। তখন কলাভবনের আর্থিক সঙ্গতিও ছিল খুবই সামান্য। রামকিঙ্করের নিজের তো কিছুই ছিল না। ব্রোঞ্জ, পাথর তো দূরের কথা ঠিকমতো প্লাস্টার জোগাড় করাও কষ্টসাধ্য ছিল। তাই মাটিই ছিল ভরসা। রামকিঙ্কর রং-তুলির মতো মাটিতেও স্কেচ করার অভ্যাস করেছিলেন। আর এই অভাব থেকে একটি সরল মাধ্যমের বহুল প্রচলন করেছিলেন তিনি। সিমেন্ট কংক্রিটকেই তিনি করে তুলেছিলেন নিজের মাধ্যম। এই সিমেন্ট কংক্রিটেই তিনি বড় বড় যে কয়েকটি পরিবেশীয় ভাস্কর্য গড়েছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণ জুড়ে, সেগুলিই ভারতীয় ভাস্কর্যে আধুনিকতার সূচনা করল। পেলবতাবর্জিত আদিমতার অভিব্যক্তির দিকে তাঁর যে স্বতঃস্ফূর্ত টান কংক্রিটের অমসৃণতায় এর কিছু সাযুজ্যও থেকে যায়। জীবনের অনেক ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য অনুভব করা যায় তাতে। প্রথম থেকেই অভিব্যক্তিময় (এক্সপ্রেশনিস্ট) আদিমতার (প্রিমিটিভিজম) দিকে ছিল তাঁর ঝোঁক। এমনকী পৌরাণিক বিষয়ের মধ্যে তথাকথিত ভারতীয়তাকে পরিহার করে বা রূপান্তরিত করে মূর্তিকে অভিষিক্ত করতেন আদিমতাময় অভিব্যক্তির শক্তিতে। ১৯২৯-এ করা 'কচ ও দেবযানী' নামে রচনাটিতেও এই অভিব্যক্তির জোর অনুভব করা যায়। যেন ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের তমিস্রাকে আত্মস্থ করছে মানুষ। সেই ৪৮ ৭৬

অন্ধকারের অন্তঃস্থ শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার অবয়বে। এই অভিব্যক্তির শক্তির, ভারতীয়তার স্থৈর্যের, ধ্যানমগ্নতার সংহত সৌন্দর্যের, কেন্দ্র থেকে স্ফুরিত আয়তনগত পূর্ণতার সমীকরণ করতে হয়েছে তাঁকে। চল্লিশের দ্বিতীয়ার্ধে করা কলাভবন মুক্তাঙ্গনের বুদ্ধ মূর্তিটিতে (সিমেন্ট) এই ধ্যানের সংহতিকে ধরেছেন তিনি। এই পদ্মাসনে বসা ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ অনুরাধাপুরের বুদ্ধের আদলে গড়া। সেই অনুরণনকে নিজের কাজের মধ্যে গ্রহণ করেছেন রামকিঙ্কর। আবার
৮৩ ১৯৪৯-এ করা 'মধুরা সিং'-এর আবক্ষ মূর্তিটির (ব্রোঞ্জ) দিকে যদি তাকাই সেখানে এক স্ফুরিত আয়তনময়তার বিচ্ছুরণ দেখতে পাই। এই যে কৌণিকতার সংঘাতহীন গোলকীয় (স্ফেরিক্যাল) পূর্ণতার দিকে রূপাবয়বের চলা যা প্রশান্তিতে অন্তঃস্থ শক্তি ও সুষমাকে বিচ্ছুরিত করছে ভাস্কর্যে ভারতীয় রূপবোধের একটি লক্ষণ বলতে পারি একে। যদিও এ কথা ঠিক, বিষয়েরই প্রয়োজনে আঙ্গিক আসে, তবু এই সমস্ত চর্চার মধ্য দিয়ে রামকিঙ্কর ভারতীয়তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে ইওরোপীয় আধুনিকতার সঙ্গে সমীকৃত করছিলেন। যার শ্রেষ্ঠ স্ফুরণ আমরা দেখতে পাব দিল্লি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'যক্ষ-যক্ষী' ভাস্কর্যে। এর মধ্যে আদিবাসী জীবনের প্রাণ-চঞ্চলতা, নির্বাধ আনন্দ ও মুক্তির ছন্দকেই রামকিঙ্কর তাঁর ভাস্কর্যের প্রধান শক্তি হিশেবে ব্যবহার করেছেন। আধুনিকতার সঙ্গে সনাতন বা চিরায়ত এই সমন্বয়ই সমকালীন ভারতীয় ভাস্কর্যে রামকিঙ্করের শ্রেষ্ঠ অবদান।

৭৫ আমরা এখানে তাঁর সুপরিচিত ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দুটি ভাস্কর্য প্রসঙ্গে আসব। প্রথমটি ১৯৩৮-এর 'সাঁওতাল
৭৯ পরিবার', দ্বিতীয়টি ১৯৫৩-র 'মিলকল' বা 'কলের বাঁশি'। দুটিই কলাভবনের মুক্তাঙ্গনে কংক্রিটে করা। এই সাঁওতাল জীবন নিয়ে ভাস্কর্যের সূচনা 'শ্যামলী'-র প্রবেশ দ্বারের মাঝি ও মেঝেন বা 'সাঁওতাল-সাঁওতালী' নামে 'ক্লে-রিলিফ' দুটি মাটির মূর্তি দিয়ে। সেটি ১৯৩৫-এর কাজ। এই মূর্তি দুটির অবয়ববিন্যাসে আয়তনিক পূর্ণতার মধ্যেও এক ধরণের ঋজু তীক্ষ্ণতার ভাব আছে। শরীরের নিটোল বর্তুলতাকে ভেঙে কতকগুলি তলে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সেই তলগুলি পরস্পরের সঙ্গে তীক্ষ্ণ সরলরেখায় মিলেছে। এই দৃঢ় তল ও রেখাবিন্যাসই এই কাজটিতে পাশ্চাত্য-প্রভাবিত খানিকটা ঘনকবাদী রীতির অনুরণন আনে। শঙ্খ চৌধুরী লিখেছেন, "এ দুটো দেখলে বোঝা যায় বুর্দেল কিঙ্করদার মনকে বেশ নাড়া দিয়েছিল।" (দেশ, ৩ জানুয়ারি, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৪৭)

'সাঁওতাল পরিবার'-এ রামকিঙ্কর পাশ্চাত্য প্রভাবের এই প্রত্যক্ষতা থেকে দূরে সরেছেন। সাঁওতাল পুরুষ-নারী যেন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছে সারা দিনের কাজ সেরে। নারীর মাথায় ঝুড়িতে নানা জিনিশপত্র। পুরুষের কাঁধে বাঁক। একটিতে বসানো রয়েছে শিশু। একটি কুকুর চলছে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি। অনন্তকাল ধরে সাঁওতাল পরিবারের ঘরে ফেরার পরিচিত দৃশ্যটিকে রামকিঙ্কর অমর করে দিলেন এই ভাস্কর্যে। এখানে ফর্মের কোনো ভাঙন নেই। রূপায়ণের স্বাভাবিকতায় তাঁদের জীবনের, দৈনন্দিনতার সারল্য ফুটে উঠেছে। জীবনের কবিতা চিরস্থায়ী দৃশ্যরূপ পেয়েছে এখানে। এই হল ভারতবর্ষের চিরায়ত জীবন। 'কলের বাঁশি'তে পাই গতির দীপ্ত ছন্দ। দুটি সাঁওতাল রমণী কলের বাঁশি শুনে কাজের ডাকে ঘর থেকে বেরিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছে। পেছনে তাঁদের একটি শিশু। ভেজা কাপড় পেছনে হাওয়ায় মেলে দিয়ে তারা চলেছে। বাতাসে উড়ছে সেই কাপড়; এখানে নারী ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে কোনো প্রেমের বাঁশি শুনে নয়। সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারিণী এই দুই নারী চলেছে জীবন ও জীবিকার ডাকে। বিংশ শতকের ভারতবর্ষের জীবনধারার আশা ও উদ্দীপনার প্রতীক এই কাজটি। রামকিঙ্কর চিরদিনের আশাবাদী ছিলেন। শিশুর সারল্যে ভরা ছিল সেই আশা ও বিশ্বাস। জীবনের সেই আলোর জন্য কোনো আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই। দুটি হাত পেয়েছে মানুষ। সেই হাত কাজ করবে, সৃষ্টি করবে। সেই কাজ ও সৃষ্টির স্বপ্নের ঘোরে মানুষ বাঁচবে। গান্ধীজির প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি ও আস্থা। গান্ধীর স্বপ্নের ভারতই যেন শিল্পিত রূপ পেল সাঁওতাল জীবনের এই দুটি ভাস্কর্যে। এখানে যে গতির দ্যোতনা তা ব্যক্ত হয়েছে দেহবিন্যাসের সমান্তরালের সঙ্গে কৌণিক অবস্থানের কর্ণরেখায়। প্রণবরঞ্জন রায় তাঁর এক লেখায় বলেছেন এই কর্ণরেখার বিন্যাস রামকিঙ্কর পেয়েছেন ধ্রুপদী উত্তর ভারতীয় শিল্প থেকে। (১৯৭২-এ বিড়লা অ্যাকাডেমি আয়োজিত রামকিঙ্কর প্রদর্শনীর ক্যাটালগে সন্নিবিষ্ট আলোচনা)

আধুনিক ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যে রামকিঙ্কর বিমূর্ততার প্রধানতম একজন পথিকৃৎ। ছবিতে প্রথম বিমূর্ততার চর্চা শুরু করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামকিঙ্কর গগনেন্দ্রনাথের কাজের দ্বারা খুবই অনুপ্রাণিত ছিলেন। ভাস্কর্যে এ মর্যাদা রামকিঙ্করের প্রাপ্য। 'মন আঁকে, চোখ আঁকা করে না'—এই সত্য রামকিঙ্কর উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর শিল্পী জীবনের শুরুতেই। প্রকৃতির দৃশ্যতাকে এর বাইরের অবয়বের স্বাভাবিকতা থেকে সরে গিয়ে অন্তর্লীন ছন্দের মধ্যে

রঙিন ছবি ৮· রামকিঙ্কর। কোনারকের পথে টেম্পেরা, ১৯৩৬ (ছবি)।

রঙিন ছবি ৯· রামকিঙ্কর। বিনোদিনী। জলরং। ১৯৪৮। (ছবি)।

ধরার যে প্রয়াস তা থেকেই বিমূর্ততার অবতারণা। ১৯৪১-এ বিশ্বভারতী প্রাঙ্গণেই একটি ভাস্কর্য করলেন সিমেন্ট দিয়ে, তার নামকরণ হল 'দীপস্তম্ভ'। এটিই ভাস্কর্যে তাঁর বিমূর্ততার চর্চার প্রথম প্রধান প্রয়াস। এখানে কোনো মানুষের অবয়ব ৭৭ আছে, আবার যেন নেইও। কখনো মনে হয় যেন একটি বৃক্ষের বেড়ে ওঠার ছন্দই ধরা আছে এখানে। অথবা একটি ফুলের ফুটে ওঠা। কখনো-বা ঊর্ধ্বমুখী প্রদীপ্ত মৃদু বাতাসে আন্দোলিত দীপশিখাও মনে হতে পারে একে। সব মিলে একটি প্রাণছন্দ, একটি আনন্দের ছন্দ যেন রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৪৯-এর 'কম্পোজিশন' (প্লাস্টার) যেন আলিঙ্গনরত দুটি নরনারীর শরীরের ছন্দের বিমূর্ত রূপ। ১৯৫৩-র 'স্পিড' (প্লাস্টার)-এ ধরা থাকে কোনো মানুষেরই ৮২ চলার গতি-ছন্দ। রামকিঙ্করের বিমূর্ততাও সব সময়ই মানবিক, জীবন্ময় বা ভাইটালিস্টিক। জীবনকে বাদ দিয়ে তিনি কখনো বিমূর্ত শিল্পের কথা ভাবেন নি। জীবনেরই এসেন্স, সত্তা বা সারাৎসার ধরতে চেয়েছেন তার অবয়বকেই রূপান্তরিত করে। কখনো প্রখর প্রতিবাদী সমাজবাস্তবতা রূপ পেয়েছে। ১৯৪৩-এ কংক্রিটে করা বিশ্বভারতী প্রাঙ্গণের ৭৮ 'হারভেস্টার' যার অনন্য দৃষ্টান্ত। এক নগ্নিকা নারী সুঠাম দাঁড়িয়ে যেন ধান ঝাড়াই করছে। হাত দুটি মাথার উপরে তোলা। দুহাতে ধরা ধানের গুচ্ছ পেছনে ছড়িয়ে ভূমিস্পর্শ করছে। এবার যেন দুই হাতের সঞ্চালনে উড়ে এসে আছড়ে পড়বে সামনে। তারই জন্য অপেক্ষা। অথচ নারীর মাথা বা মুখমণ্ডল অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিতি তাঁর কাজের ছন্দকে প্রগাঢ় করেছে।

কিন্তু শুধু কি তাই? এর চেয়েও প্রগাঢ় কোনো সত্য কি উঠে আসে না এই ভাস্কর্য থেকে। ১৮৭৭-এ রঁদা গড়েছিলেন একটি ভাস্কর্য: 'দ্য ওয়াকিং ম্যান'। দুটি পা বিস্তৃত করে হাঁটছে যে মানুষ তার কাঁধের উপর মাথা নেই। মুণ্ডহীন মানুষ তাহলে কিভাবে হাঁটছে? মাথার অনুপস্থিতি কোন সত্যের দিকে নিয়ে যায় দর্শককে। এই কাজটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে কলকাতায়, রঁদা প্রদর্শনীর অসামান্য এক আলোচনায় ভিন্ন এক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন সিদ্ধার্থ রায় ('পরিচয়', এপ্রিল ১৯৮৩)। সেই লেখা থেকেই উদ্ধৃত করা যায় এখানে—

> "স্পেনীয় শিল্পী আন্তোনিও সোওরা এক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন আমাদের—মাদ্রিদে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় তিনি তাকিয়ে ছিলেন জানালা দিয়ে—সামনে ফুটপাথে এক পদযাত্রী, চলমান। হঠাৎ মুহূর্তে ফেটে পড়ল এক বোমা আর নিক্ষিপ্ত স্প্লিনটারের আঘাতে লহমায় উড়ে গেল পদযাত্রীর মুণ্ড গলার কাছ থেকে, বিস্ফারিত চোখে সোওরা দেখলেন সেই মুণ্ডহীন, স্বাস্থ্যবান ধড় হেঁটেই চলেছে সামনে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধেই তো এমন কত ভাস্কর্য পড়েছিল সারা ইওরোপ জুড়ে।"

আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে ভারতবর্ষে সরাসরি যুদ্ধের কারণে হয়তো উড়ে যায় নি এরকম কোনো মাথা। কিন্তু তার দুর্মর দুর্ভোগ তো ভারতের বিশেষত বাংলার আনাচে-কানাচে গ্রামে-গঞ্জেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তারই এক ডকুমেন্টেশন কি বলা যায় না একে। পরে ১৯৫২ নাগাদ 'আননোন পলিটিক্যাল প্রিজনার' এই বিষয় অবলম্বনে বিশ্বব্যাপী এক প্রতিযোগিতার জন্য ভাস্কর্য আহ্বান করা হয়েছিল। রামকিঙ্কর পাঠিয়েছিলেন 'হারভেস্টার'-এরই একটি মডেল। কিভাবে সম্পর্কিত হল এই ধান ঝাড়াইয়ের অবয়ব অনামা রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে? উত্তরে বলেছিলেন রামকিঙ্কর, "যখন ওদিকে লড়াই চলছে বিয়াল্লিশের উত্তেজনায় গুলি চলছে। দুর্ভিক্ষ হল। তখন আসলে ভুক্তভোগী কারা? পোলিটিশিয়ানরা তো জেলে গিয়ে বসে আছেন। এই মাঠে কাজ করা কুলি-মজুররই তো আসল প্রিজনার!" (সূত্র: শঙ্খ চৌধুরী 'কিঙ্করদাকে যেমন দেখেছি।' 'রামকিঙ্কর', পৃষ্ঠা ১৮৪) বলা বাহুল্য প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত হয় নি সেই মডেল। কিন্তু ভাস্কর্যের মধ্যে, বিমূর্ততার মধ্যে রামকিঙ্করের প্রগাঢ় সমাজচেতনার অসামান্য নিদর্শন এই কাজটি।

এবার আসা যায় দিল্লি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শিলা ভাস্কর্য 'যক্ষ-যক্ষী'-তে। তাঁর কাজের জেনিথ যেন এটা। যেন শিল্প-সিদ্ধির আকাশ স্পর্শ করেছেন সুবিশাল এই ভাস্কর্যে। সংখ্যার দিক থেকে তাঁর কাজ বিপুল নয়। কিন্তু প্রতিটি কাজেই তিনি আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের এক একটি দিগদর্শন দিয়ে গেছেন। তাঁর এতদিনের সাধনার সফল সমন্বয় ধরা আছে 'যক্ষী-যক্ষী'তে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ইচ্ছায় ও প্রয়াসে রূপায়িত হতে পেরেছিল এই পরিকল্পনাটি। পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল ১৯৫৪-তে, কাজ শেষ হয়েছিল ১৯৬৬-তে। ধূসর রঙের পাথর সংগৃহীত হয়েছিল হিমালয়ের বৈজনাথ ও কুলু-মানালির মধ্যবর্তী এক স্থান থেকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল প্রবেশদ্বারের দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে ১২ ফুট বেদির উপর ২২ ফুট উঁচু এই যক্ষ ও যক্ষী। ধ্রুপদী ভারতীয় ভাস্কর্যই ছিল এই মূর্তির পেছনে তাঁর প্রধান প্রেরণা। মথুরা সংগ্রহশালায় গিয়ে সেখানকার যক্ষ-যক্ষী মূর্তি অধ্যয়ন করেছেন অনেকবার। কিন্তু এই ভাস্কর্যে ধ্রুপদী

৮২· রামকিঙ্কর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রোঞ্জ।

অনুভবের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে লোকায়তিক অনুভবের কিছু রেশও। অবয়বের তলগুলি এখানে বর্তুলতায় পেলব নয়। গোলকের (স্ফিয়ার) বক্রতলের পূর্ণতায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে না। আলম্ব সঞ্চরণের এক একটি সমতল পরস্পর তীক্ষ্ণ কৌণিক সরলরেখায় মিলছে। শ্যামলীর সামনের মাটির সাঁওতাল-সাঁওতালী মূর্তিতেও আমরা এরকম তল-বিন্যাস দেখেছিলাম, শঙ্খ চৌধুরী যেটাকে বুর্দেল অনুপ্রাণিত বলেছিলেন। এখানে তল-বিন্যাসের জ্যামিতিকতায় পাশ্চাত্য আধুনিকতার অর্জন আছে। আয়তনের পূর্ণতা-অভিমুখিনতায় রয়েছে ভারতীয় দর্শনের সাযুজ্য। আবার শরীর ও মুখের অভিব্যক্তির সাবল্য ও তীক্ষ্ণতায় রয়েছে আদিমতার অনুরণন। এ সমস্তেরই সমন্বয়ে গড়ে উঠল 'যক্ষ-যক্ষী'র রূপকল্পনা। অথচ এর মধ্যে রয়েছে শিল্পীর নিজেরই জীবনের প্রতিচ্ছবি। তিনি বলেছেন পুরুষ মূর্তির দেহবিন্যাসে তিনি অনুসরণ করেছেন তাঁর নিজেরই শরীরের আদল। নারী মূর্তিটি গড়ে উঠেছে তাঁরই সঙ্গিনী রাধারানীর চেহারার আদলে। আর তাঁর প্রিয় সাঁওতাল জীবনের সারাৎসার এর প্রতিটি অভিব্যক্তিতে। শুধু মূর্তির দৃশ্যতা নয় রামকিঙ্কর এর মধ্যে ধরেছেন তাঁর সারাজীবনের উপলব্ধিজাত দর্শনও। এসে গেছে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'-র অন্তর্নিহিত ভাবের ব্যঞ্জনা। তাঁর নিজের কথায়—

"শিল্প ও কৃষির লড়াই। ব্যাপারটা কী সাংঘাতিক, বোঝো। আমার লড়াই, দুটোকে মেলাবার। ইন্ডাস্ট্রি ও কৃষি, আধুনিক ভারতের সচ্ছলতার হাতিয়ার। তাই আমি যক্ষীর বাঁ হাতে পদ্মের কুঁড়ি ও ডান হাতে শস্যের থোকা দিয়ে শিল্প ও কৃষির মিলন ঘটাতে চেয়েছি। শস্যথোকা সচ্ছলতার আর শতদল কুঁড়ি মানব মনের জমাট বাঁধা শত ভাবনার প্রতীক।" (সূত্র: শারদীয় 'দেশ' ১৩৯৭. রবি পালের আলোচনা, পৃষ্ঠা ৩৩৪)

যক্ষের হাতে রয়েছে পিনিয়ন ও টাকার থলি। শিল্প-বাণিজ্য ও মূলধনের প্রতীক।

'যক্ষ-যক্ষী'-র ভাব ও রূপকল্পনায় রামকিঙ্কর ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক সমন্বয় ঘটালেন। ভারতীয় ভাস্কর্যে আধুনিকতা সম্পূর্ণ আদল পেল।

চার

ভাস্কর্যের মুক্তি

অগুস্ত রদাঁ ছিলেন ইম্প্রেশনিস্টদের সমসাময়িক। তাঁর জন্ম ১৯৪০-এ। ওই একই বছর জন্মেছিলেন মোনে, রেনোয়া ও সিসলে। সেজানের জন্ম এক বছর আগে। পিসারো, মানে, দেগা যথাক্রমে ১৮৩০, ১৮৩২ ও ১৮৩৪। (সূত্র: উইলিয়াম টাকার: দ্য ল্যাঙ্গোয়েজ অব স্কাল্পচার, টেমস অ্যান্ড হাডসন) রদাঁর প্রথম সাড়া জাগানো কাজ 'দ্য এজ অব ব্রোঞ্জ' (বা 'ব্রোঞ্জ এজ') শেষ হয়েছে ১৮৭৭-এ। সেই পূর্ব প্রসঙ্গ স্মরণ করে বলা যায়— একজন ভাস্করের সৃষ্টির নিজস্ব কেন্দ্রটিতে পৌঁছানো খুবই সময়সাপেক্ষ। খুবই ধীর সেই নিজস্বতার উন্মোচন। এখানে পৌঁছে রদাঁ বলতে পারতেন— হ্যাঁ, তিনি এখন শিখেছেন কি করে একটি ভাস্কর্য দাঁড় করাতে হয়। ডঃ চন্দ্রশেখর বলেছিলেন— একজন বিজ্ঞানীকে এই বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয় না এটা বুঝতে যে, কেমন করে গবেষণা করতে হয়। সে যাই হোক, ওই ১৮৭৭-এর মধ্যে ইম্প্রেশনিস্টরা কিন্তু ভেঙে দিয়েছেন প্রকৃতির দৃশ্যগত সমস্ত স্বাভাবিকতা। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাঁরা বুঝতে চাইছেন প্রকৃতির অন্তর্নিহিত স্বরূপ। রদাঁ কিন্তু তখন ফিরতে চাইছেন প্রকৃতিরই স্বাভাবিকতায়। তবু, কেবল সমসাময়িক বলে নয়, রদাঁকে যে ভাস্কর্যে ইম্প্রেশনিজমের রূপকার বলে মনে করেন অনেকে, তা হয়তো তাঁর বাইরের আলোর প্রক্ষেপকে মূর্তির একটি মাত্রা হিশেবে ব্যবহার করার প্রবণতার জন্য। কিন্তু ইম্প্রেশনিস্টরা যেভাবে প্রকৃতির আপাতস্বাভাবিকতাকে ভেঙে দিয়ে সংশয়দীর্ণ আধুনিকতার দিকে যাত্রার পথ তৈরি করতে পারছিলেন রদাঁ তা পারেন নি। কেননা রদাঁকে ভাস্কর্যের হারানো স্বদেশ পুনরাবিষ্কার করে নিতে হচ্ছিল। ইম্প্রেশনিস্টদের পূর্বসূরি ছিলেন কনস্টেবল, টার্নার, দ্যলাক্রোয়া, কোরো, কুর্বে, পুসাঁ, বডিন এবং বারবিজোন পেইন্টাররা। একটা তৈরি জমি পেয়েছিলেন তাঁরা যার উপরে সহজতর ছিল নতুন দিগন্তের উন্মেষ। রদাঁর ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ছিল না। মাইকেল এঞ্জেলোর পরে ইওরোপীয় ভাস্কর্য অবনমিত হতে থাকে ক্রমশ। সত্যের গহন তাৎপর্যের দিকে না গিয়ে হয়ে উঠতে থাকে অর্থবানদের অবনমিত রুচির পরিপোষক। উইলিয়াম টাকার তাঁর 'দ্য ল্যাঙ্গোয়েজ অব স্কাল্পচার' গ্রন্থে বলছেন, রেনেসাঁসের বৈজ্ঞানিক, প্রাকরণিক ও অর্থনৈতিক নতুন পদক্ষেপগুলি সম্ভব করেছিল পার্সপেকটিভ প্রযুক্ত আয়তন ও গভীরতায় বিন্যস্ত তেলরঙের ছবির। রেনেসাঁসের ভাস্কর্য সে তুলনায় সীমাবদ্ধ ছিল। আবহমণ্ডল ও দেশগত (spatial) ক্ষেত্রের নন্দনসমৃদ্ধ ব্যবহার আয়ত্ত করতে পারে নি তা। পারে নি মাধ্যমের, নির্মাণের বাস্তব ও ভৌত সমস্যাবলীর কোনো প্রকৃষ্ট সমাধান আনতে। এর ফলে মাইকেল এঞ্জেলো-পরবর্তী ভাস্কর্য শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর বিশ্বদৃষ্টি এবং তাঁর মাধ্যম ও প্রকরণের মধ্যে সমীকরণ ও সংলাপের সেতুবন্ধ হারিয়েছিল। রদাঁকে সেই হারানো সেতু পুনর্নির্মাণের দায় বহন করতে হচ্ছিল।

প্রকৃতিকে বুঝতে প্রকৃতিকে ভাঙতে পারছিলেন ইম্প্রেশনিস্টরা। রদাঁকে গড়ে নিতে হচ্ছিল প্রকৃতির স্বরূপ। মাইকেলএঞ্জেলোর পরবর্তী ভাস্কর্যে প্রকৃতির সত্য ও শিল্পের সৌন্দর্য এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক আবৃত হয়ে গিয়েছিল, ঘুলিয়ে উঠেছিল। রদাঁকে সেই আবরণ উন্মোচন করতে হচ্ছিল। তাই তিনি বলেছিলেন একবার,

"কিছুই আবিষ্কার করি নি আমি। আমি কিছু হারিয়ে যাওয়া সত্য ও পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস ঘটিয়েছি।"

তিনি বিশ্বাস করতেন— সত্যই শুধু হতে পারে সৌন্দর্যের মাপকাঠি। সত্যই শুধু ধারণ করতে পারে সুন্দরকে। আর সেই সত্য রয়েছে একমাত্র প্রকৃতিতে।

"প্রকৃতিকে অনুসরণ করেই পৌঁছানো যেতে পারে সত্যের সমগ্রতায়। যখন একজন সুন্দরী নারীর শরীর মডেল হিশেবে থাকে আমার সামনে, যখন আমি ড্রয়িং করি তার, সেই ড্রয়িং তুলে আনে পোকা, পাখি আর মাছের ছবিও। অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, আমি নিজেও প্রথমে জানতাম না এটা, যতক্ষণ না নিজে করতে গিয়ে দেখেছি… (কাজেই) নতুন কিছু সৃষ্টি করা কথাটার কোনো অর্থ নেই। চোখ আর বুদ্ধিকে সঠিক ব্যবহার করতে জানাই প্রতিভার লক্ষণ। একটি নারী, একটি পর্বত বা একটি ঘোড়া সবই গঠিত হয় ওই একই মূল নীতি থেকে।"

তাই রদাঁ প্রকৃতিতে ফিরেছিলেন। প্রকৃতির বাইরের আপাতপেলব মোহে নয় কেবল, তার গাঠনিক জ্যামিতিতে। গ্রিক ধ্রুপদী ভাস্কর্যের কাছ থেকে সেই জ্যামিতিটাই তিনি নিয়েছিলেন। সেই জ্যামিতি দিয়ে মানবিক শরীরের স্বাভাবিকতার নানা বিচ্ছুরণে রচনা করেছিলেন ধ্রুপদী সংগীত সমকালেরই অনুরণনে। সিদ্ধার্থ রায়ের সেই পূর্বোক্ত সামালোচনায় ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় আবার। কিছুটা উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা যায় না:

"বালজাকের মনুমেন্টাল মাথা পাহাড়ের পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে কারো কাছে বার্নার্ড শ'-এরই মতো, হয়ে উঠতে পারে বেঠোভেনের স্মৃতিময় কোনো তুঙ্গ নিনাদ: তাই 'ব্রোঞ্জ এজ'-এর সুপ্তোত্থিত আদল যেন শঁপার বাজনার নিবিড়

৮৩· রামকিঙ্কর। মথুরা সিং। সিমেন্ট ১৯৪০। ব্রোঞ্জ ১৯৪৯।

৮৪· রামকিঙ্কর। মিথুন। সিমেন্ট।

শারীরিক আবেগ, 'ক্যাথিড্রালের' আবর্তময় ঊর্ধ্বগতিতে, মোৎসার্টের মার্বেল মুখাবয়বে, লেগ্রস-এর মুখে উচ্চাবচ বলিরেখায়, ক্যালের আত্মবিসর্জনের ভিস্যুয়ালে দেখি শুম্যান, চাইকোভস্কিরই কোনো কোনো সুরের গড়ন। বিভিন্ন সাঙ্গীতিক কাঠামোর প্রতিভাসের সমবেত ঐকতান যে রণন তোলে সুরেরই স্থাপত্যে, তার কথা ভেবেই হয়তো রদাঁ বলেছিলেন, 'এ হোল নিউ ওয়র্ল্ড ইজ পালসিং'। আর আমাদের মনে হয়, সে স্পন্দন ইতিহাসের পাতালে যে ভাবি কম্পনের ছন্দ, তারই গতি। পাথর কাঁধে রমণীর মতোই, রদাঁকেও ধরতে হয় সেই ছন্দ। ইতিহাসেরই দায়ে, বাধ্যতায়।"

প্রকৃতিরই জ্যামিতিক সত্যের অভিষেকে রদাঁর হাতে ঘটেছিল মাইকেলএঞ্জেলো পরবর্তী ও আধুনিকতার পূর্ববর্তী ইওরোপীয় ভাস্কর্যের মুক্তি।

আমাদের ভারতবর্ষে ভাস্কর্যের এই মুক্তির দায় বহন করেছিলেন রামকিঙ্কর। দুই মহাদেশের পরিস্থিতির মধ্যে খানিকটা প্রতিসাম্যই যেন আছে। ওদেশে ফাঁকটা ছিল শ-তিনেক বছরের। আমাদের আরো কিছু বেশি, আট-নশো বছর। আমাদের পরিস্থিতিতে অন্ধকার ছিল আরো অনেক ব্যাপ্ত। অথচ এত ঐশ্বর্য ছিল আমাদের—হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো থেকে খাজুরাহো পর্যন্ত, তারও পরে বাংলার মন্দিরগুলো ছিল। কিন্তু আমাদের সময়ের সঙ্গে তার কোনো সংযোগ ছিল না। একদিকে ওই আলোকিত ঐশ্বর্যের ঐতিহ্য, অন্যদিকে রদাঁ ও তাঁর পরবর্তী ইওরোপের আধুনিকতা, আর এক দিকে স্বদেশের সমকালীন বাস্তবতা, এই তিনটি পশ্চাৎপটের সামনে দাঁড়িয়ে রামকিঙ্করকে খুঁজতে হচ্ছিল ভাস্কর্যের স্বতন্ত্র বিশ্ব।

রদাঁ পরবর্তী ইওরোপীয় ভাস্কর্যের অভিমুখ হয়ে গেল দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে জীবনের স্পন্দন থেকে জাত ত্রিমাত্রিক রূপায়ণ, যাকে বলা যায় 'ভাইটালিস্টিক', আর এক দিকে জীবনের বাইরে ও সমান্তরালে স্বতন্ত্র এক জ্যামিতিক নির্মাণ, যাকে বলে 'কনস্ট্রাক্টিভিস্টিক'। রদাঁকে আধুনিকতার গণ্ডির বাইরে রাখতে চান অনেকে তাঁর পরিপূর্ণ ধ্রুপদী বিশ্বাসের জন্য, ভাঙা বিশ্বের কোনো শূন্যতার আর্তির প্রতিফলন না থাকার জন্য। রামকিঙ্করের এক দিকে ছিল আলোকিত ধ্রুপদী অতীত, আর এক দিকে ক্রান্তিলগ্নের আধুনিক ইওরোপ। এই টানাপোড়েনের মধ্যে একটা সমন্বয়ে আসতে হয়েছিল তাঁকে।

রদাঁকেই তিনি আদর্শ করেছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

" ওরে সে অর্থে বলা যেতে পারে পিকাসো আমার ফেভারিট। ওঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। তবে কিছু মডেল যা তৈরি করেছেন তার প্রায় সবই বোগাস। ভাস্কর বলতে ম্যুর রদাঁ আছেন। রদাঁই আমার প্রিয়। ওঁর কাজের সঙ্গে আমার মিল আছে প্রচ্ছন্ন। আমি কোনোদিন কোনো স্থির মডেল নিয়ে কাজ করি নি। রদাঁও তাই। বলতেন মুভ মুভ। মুভমেন্ট না করলে ক্যারেক্টার জীবন্ত হয় না। আমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ানো মানুষজন, তাদের মুভমেন্ট, কথা বলা, হাসি, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের মিশে থাকা আমার স্মৃতিতে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি মূর্তি গড়তে পারি।" ('রামকিঙ্কর' পৃষ্ঠা-৬৫-৬৬)

কেন পিকাসোকে ছবিতে তিনি গ্রহণ করছেন, অথচ বর্জন করছেন ভাস্কর্যে? অনেকে তো বলেন ভাস্কর্যেও পিকাসোই আধুনিকতার অন্যতম প্রবক্তা। ছবিতে রামকিঙ্কর নিজেও তো ভেঙেছেন ফর্ম। কিউবিজমকে বুঝে নিতে চেয়েছেন ভারতীয় বাস্তবতায়। সে কি তাহলে এজন্য যে নব্য-বঙ্গীয় ঘরানার আদর্শায়িত অতীতের মেরুদণ্ডহীনতা থেকে তাকে অভিষিক্ত করার দরকার ছিল সমকালের সতেজ শিরদাঁড়ায়! আর ভাস্কর্যে তো কোনো অতীতই ছিল না বা সমস্ত অতীতই হারিয়ে গিয়েছিল, সেখানে প্রয়োজন ছিল সত্যে-অন্বিত সুন্দরের স্বতন্ত্র সংজ্ঞা নির্ধারণের, আর সেটা সম্ভব ছিল একমাত্র প্রকৃতির সাযুজ্যে, চলমান লোকায়তিক জীবনপ্রবাহের প্রাণছন্দে, বিশ্বাসময় এক ধ্রুপদী চেতনারই উদ্বোধনে। তাই কি রদাঁর মতো প্রকৃতিকে বড় প্রয়োজন ছিল তাঁরও? তাই কি এই প্রাণছন্দের সাধক রদাঁ ও হেনরি ম্যুর ছিলেন তাঁর প্রিয়? অথচ সৌন্দর্যের মোহন রূপকে পরিত্যাগ করেছিলেন রদাঁ। বলতেন, 'সুন্দর' কথাটির মতো বিপজ্জনক আর কিছু নেই শিল্পে। রামকিঙ্করও তাই। সৌন্দর্যের বদলে তিনি চাইতেন 'ক্যারেকটার'। তাঁর কোনো কাজকে কেউ সুন্দর বললে আগাগোড়া ভেঙে ফেলতেন সেটা। বুঝতেন পেলবতা মুছে দিয়ে তাতে আনতে হবে অমসৃণ কর্কশ চারিত্রিক দৃঢ়তা।

প্রদোষ দাশগুপ্ত অভিযোগ এনেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে,

৮৫· রামকিঙ্কর। গতি। প্লাস্টার। ১৯৫৩।

"তাঁকে এই বলে দোষারোপ করা যেতে পারে তাঁর নিজের গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে তাঁর বেশিরভাগ কাজেরই কোনো সম্পর্ক নেই। রামকিঙ্করকে আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে গণ্য করার সময় এই প্রশ্ন সবসময়েই আমাদের মনে জেগে থাকবে। শান্তিনিকেতনের গ্রাম্য আবহাওয়া, তার পটুয়া, কুমোর কামার এদের কাজের ছন্দ এবং নকশার বিশিষ্টতা রামকিঙ্করকে কোনো প্রকারেই অনুপ্রাণিত করতে পারে নি এটা খুবই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার।" ('স্মৃতিকথা শিল্পকথা', পৃঃ ১২৯)।

রামকিঙ্কর লোকশিল্পের সরলতার মধ্যে নিজেকে আটকে না রেখে লোকায়তিক জীবনপ্রবাহকেই তাঁর ভাস্কর্যে রূপ দিলেন একযোগে আধুনিকতা ও চিরায়তের মূল্যমানে। ভারতবর্ষের ভাস্কর্য আধুনিকতায় অভিষিক্ত হবে যাঁর হাত দিয়ে তিনি কেন আটকে থাকবেন কেবল লৌকিক সরলতার সীমাবদ্ধতায়? অথচ স্বদেশ কী প্রবলভাবে ছিল তাঁর ভাস্কর্যে এটা বুঝেছেন পরবর্তী প্রজন্মের ভাস্কররা। শর্বরী রায়চৌধুরী লিখেছেন,

"কিঙ্করদা কিন্তু লোক্যাল, যেটা কিন্তু আমাদের কোনোদিন হল না, কিঙ্করদার কাজে লোক্যাল সাবজেক্ট নিয়ে এমন একটা আর্ট কোয়ালিটি, প্লাস আমাদের ইন্ডিয়ান গন্ধ আছে-- যেটা কিন্তু খুব রেয়ার।" ('আমি ও আমার সময়', প্রতিক্ষণ, সংস্কৃতি সংখ্যা ১৩৯৩; পৃষ্ঠা-৫৬)।

নব্য-বঙ্গীয় ঘরানার স্বদেশকে রামকিঙ্কর পরিহার করেছেন। ভাস্কর্যের মুক্তির জন্য খুঁজেছেন স্বতন্ত্র এক স্বদেশ।

ব্রিটিশ আসার পরে তাঁদের গড়া আর্ট কলেজের দৌলতে রয়্যাল অ্যাকাডেমির ধাঁচে কিছু ভাস্কর তৈরি হয়েছিল আমাদের দেশে। তাঁদের দক্ষতার কোনো অভাব ছিল না। মানুষের শরীরের নিটোল রূপায়ণে তাঁদের পারদর্শিতা নিয়ে

কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এ যুগের প্রথম ভারতীয় ভাস্কর বলে অনেকে যার পরিচয় দেন সেই রোহিণীকান্ত নাগ (১৮৬৮-৯৫) মাত্র ২৭ বছর বয়সে ইটালিতে শিক্ষারত অবস্থায় মারা যান। বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে মহারাষ্ট্র ও বাংলায় জেগেছিলেন কয়েকজন স্বনামখ্যাত ভাস্কর। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গণপৎ কাশীনাথ ক্ষাত্রে (১৮৭৬-১৯৪৭), বিনায়করাও ভেঙ্কটরাও ওয়াঘ (১৮৮৩-১৯৫৩), হিরণ্ময় রায়চৌধুরী (১৮৮৪-১৯৬২), ফণীন্দ্রনাথ বসু (১৮৮৮-১৯২৬), বালাজি বসন্তরাও তালিম (১৮৮৮-১৯৭০), বিনায়ক পাণ্ডুরং কারমাকার (১৮৯১-১৯৬৭), আর পি কামাথ, এন জি পানসারে প্রমুখ। গণপৎ কাশীনাথ ক্ষাত্রে ১৮৯৬-তে 'টু দ্য টেম্পল' নামে মন্দিরাভিমুখী এক নারীমূর্তির ভাস্কর্য করেছিলেন প্লাস্টারে। ১৯০০ সালে এই মূর্তিটি পাথরেও রূপান্তরিত করেছিলেন। আমাদের দেশে এটিকেই প্রথম রচনাধর্মী ভাস্কর্য বলা যায়। এই কাজটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন। সে বিষয়ে খানিকটা বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে প্রদোষ দাশগুপ্তের ভাস্কর্য সম্বন্ধে পরবর্তী নিবন্ধে। এই কাজটিও এক নারীরই যথাযথ রূপায়ণ।

এর বাইরে ১৯২৮-২৯ এর আগে আমাদের দেশে রচনাধর্মী ভাস্কর্য হয় নি বললেই চলে। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (১৮৯৯-১৯৭৫) ভাস্কর্যে রামকিঙ্করের পূর্বসূরি। কিন্তু তাঁর অবদান প্রধানত স্বাভাবিকতা-অনুসারী প্রতিকৃতি ভাস্কর্যে। তাঁর প্রথম রচনাধর্মী ভাস্কর্য 'ট্রায়াম্ফ অব লেবার' রচিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। তাঁর আরো দুটি বিখ্যাত রচনাধর্মী ভাস্কর্য 'মারটার্স মেমোরিয়াল' ও 'হোয়েন উইন্টার কামস' যথাক্রমে ১৯৫৬ ও ১৯৫৭-র কাজ। যদিও ১৯২৪-এর 'মাই ফাদার' শীর্ষক মুখাবয়বটি আধুনিক মূল্যমানে সঞ্জীবিত কিন্তু সেটিও প্রতিকৃতি মাত্র এবং সেই আধুনিকতার কোনো বিকাশও ঘটান নি দেবীপ্রসাদ তাঁর পরবর্তী কাজে। সেদিক থেকে ভারতীয় ভাস্কর্যের আধুনিকতায় রামকিঙ্করই পথিকৃৎ। একটা শূন্য ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম প্রাণের স্পন্দন এনেছেন। শূন্যতায় এনেছেন সুরের রণন।

সংগীত খুব ভালোবাসতেন রামকিঙ্কর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুটোই। হ্বাগনার তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এটাও তাঁর ভাস্কর্যের চরিত্রের সঙ্গে বেশ মেলে। শর্বরী রায়চৌধুরী লিখেছেন পূর্বোক্ত স্মৃতিচারণায়, "উনি আমায় অনেকবার বলেছেন, তোমার কাছে হ্বাগনার আছে? হ্বাগনার? হ্বাগনার আমার খুব ভাল লাগে। হ্বাগনারের মিউজিক খুব গ্রেট। হ্বাগনারের মিউজিক সত্যজিৎ আমাকে অনেক শুনিয়েছে। তুমি আমায় একটু হ্বাগনার শোনাও।" আর তাঁর চিরসাথী চিরসখা ছিল রবীন্দ্রসংগীত। একটা গান বিশেষ করে সারাজীবন ধুয়ার মতো গাইতেন 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা…'। পদ্মভূষণ দেওয়া হয়েছিল যখন, তখনো সেই সংবর্ধনা সভায় ভাষণের বদলে গেয়েছিলেন এই গানটিই। এক নিবিড় প্রেম জড়িয়ে ছিল তাঁকে। শান্তিনিকেতনের নিদারুণ গ্রীষ্মে সমগ্র সত্তা পুড়িয়ে কাজ করতেন। মুগ্ধ হতেন বিস্তীর্ণ খোয়াই জুড়ে অঝোরে বৃষ্টি হওয়া দেখে। তাঁর সহজ সরল জীবনে এই সর্বগ্রাসী, সর্বব্যাপী প্রেমই মুক্তি পেয়েছে তাঁর ভাস্কর্যে। ভাস্কর্যেরও মুক্তি এই প্রেমে।

প্রদোষ দাশগুপ্তের ভাস্কর্য: প্রজ্ঞাদীপ্ত ধ্রুপদী অন্বেষণ

এক

মুখবন্ধ

কিছুদিন আগে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন প্রদোষ দাশগুপ্ত (২৮ এপ্রিল ৯১) খুবই কৌতুককর এটা যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানা সম্মানে ভূষিত করেছেন তাঁকে তাঁর কাজকর্ম বিশেষ কিছু না দেখেই। কলকাতায় কখনো তাঁকে আহ্বান করেন নি তাঁরা প্রদর্শনী করার জন্য। ১৯৪৫-এ তাঁর ভাস্কর্যের প্রথম একক প্রদর্শনী হয়েছিল কলকাতায়। তারপর চার দশকেরও বেশি সময় কলকাতার মানুষ তাঁর কাজের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কোনো প্রদর্শনী হতে পারে নি কলকাতায় ১৯৯১-এর আগে। তবু আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যে প্রদোষ দাশগুপ্তের অবদান ও প্রতিষ্ঠা এতই অবিসংবাদিত যে কলকাতার শিল্পানুরাগীরা তাঁর গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে বা তাঁর প্রাধান্যকে মেনে নিতে কখনোই ভুল করেন নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মান জানানো হয়তো সেই সচেতনতারই প্রকাশ। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে এবং কলকাতায় বিশেষত, তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রভাব বয়ে গেছে সাম্প্রতিক ভাস্কর্যের ক্রমবিবর্তনে। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত তিনি কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে অধ্যাপক হিশেবে যুক্ত ছিলেন। তখন তাঁর হাতে তৈরি হয়েছে অনেক ছাত্র, পরবর্তীকালে যাঁরা ভাস্কর হিশেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যে একটি ঘরানা তৈরি হয়েছে এভাবে, প্রদোষ দাশগুপ্তের চিন্তা, বা রূপাবয়ব নির্মাণে তাঁর বিশ্বদৃষ্টি যেখানে উৎসের মতো কাজ করেছে। এবং সেই উৎস থেকে তা আরো বিবর্তিত হয়েছে।

ভাস্কর্যের সেই দর্শন বা বিশ্বদৃষ্টির স্বরূপ কী, এটা আমরা আংশিকভাবে জেনেছি বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর নানা কাজ দেখে এবং তাঁর লেখা পড়ে। প্রদোষ দাশগুপ্ত একজন স্বতঃস্ফূর্ত লেখকও। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতে তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক, শিল্পকলা সম্বন্ধীয় ও আত্মজৈবনিক লেখাগুলো পাণ্ডিত্য, মনন ও রসবোধের সমন্বয়ে তাঁর নিজের কাজ সম্পর্কে যেমন, তেমনি শিল্প ও জীবনের নানা নিভৃত প্রকোষ্ঠে আলো ফেলে। কিন্তু তাঁর কাজের বিবর্তনকে সময়ের ক্রম অনুসারে একসঙ্গে দেখতে পাবার সুযোগের অভাবে সেই জানা অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণতা পায় নি, বিশেষত এই প্রজন্মের তরুণতর শিল্পানুরাগীদের কাছে। সেই সুযোগটি এসেছিল ১৯৯১-এর এপ্রিলে। বিড়লা অ্যাকাডেমির পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর পূর্বাপর কাজের একটি বড় প্রদর্শনী যখন অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়। দীর্ঘ ৪৫ বছর পর কলকাতায় আবার একক প্রদর্শনী করতে পারলেন সেই শিল্পী, কলকাতার শিল্পকলায় আধুনিকতার আন্দোলনে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন যিনি 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিশেবে।

এই দেখার সুযোগে তাঁর কাজের স্বরূপ ও ক্রমবিবর্তন, এবং ভাস্কর্যে যে বিশেষ বিশ্বদৃষ্টির উপস্থাপনা তিনি করেছেন, সেটাই অনুধাবনের চেষ্টা এ লেখায়। প্রদোষ দাশগুপ্ত দীর্ঘদিন দিল্লিতেই থেকেছেন স্থায়ীভাবে। কলকাতায় এসেছেন মাঝে মাঝে। প্রদর্শনী উপলক্ষে এসেছেন এবার। তখন কথা বলার সুযোগ হয়েছিল একদিন শিল্পকলা সম্পর্কিত নানা বিষয়ে, বিশেষত তাঁর নিজের সৃজনশীলতা ও চিন্তা সম্পর্কে। সেই সাক্ষাৎকার এ লেখায় তথ্যের অন্যতম প্রধান উৎস হিশেবে ব্যবহৃত হবে।

দুই

পূর্বসূরি

একথা আজ আর অজানা নয় যে বেঙ্গল স্কুল আমাদের চিত্রকলার ক্ষেত্রটিকে আত্মপরিচয়ের স্বাতন্ত্র্যে যেভাবে প্রস্ফুটিত করে তুলেছিল, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রটি সেই তুলনায় কোনোই গুরুত্ব পায় নি তাঁদের আন্দোলনে। ভারতবর্ষ ভাস্কর্যের দেশ। এই শতকে ভাস্কর্যে আধুনিকতার সঞ্চার ঘটতে যে এত দেরি হল, তার কারণ মুসলিম ও ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রায় হাজার বছর, সামান্য দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে, ভারতবর্ষে ভাস্কর্যের চর্চার কোনো প্রসার ঘটে নি। বরং সেই ঐতিহ্য ক্রমে বিনষ্ট হয়েছে। ব্রিটিশরা তাঁদের দেশে চর্চিত অ্যাকাডেমিক ন্যাচারালিজমের রীতি যেমন চিত্রকলার ক্ষেত্রে আমদানি করছিলেন আমাদের দেশে, তেমনি ভাস্কর্যেও সেই অ্যাকাডেমিক রীতির সামান্য কিছু চর্চা শুরু হয়েছিল। বিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বম্বেতে কয়েকজন প্রতিভাবান ভাস্করের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা এই অ্যাকাডেমিক রীতিকে দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করে কেবল রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি নির্মাণেই আবদ্ধ থাকেন নি,

৮৬ প্রদোষ দাশগুপ্ত। টো পয়েন্ট। সিমেন্ট। ১৯৫০।

৮৭· প্রদোষ দাশগুপ্ত। ইন বন্ডেজ। ব্রোঞ্জ। ১৯৪৩।

যথাযথভাব রীতির অনুসৃত সেই মূর্তিকলাকে নিছক প্রতিকৃতি-নিরপেক্ষ ভাব প্রকাশেও কাজে লাগিয়েছেন। উনবিংশ শতকের শেষ পর্বে জন্ম এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভাস্করূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন বম্বে ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলের এরকম শিল্পীদের মধ্যে গণপৎ কাশীনাথ ম্হাত্রে (১৮৭৬—১৯৪৭), বিনায়ক পাণ্ডুরং কারমাকার (১৮৯১—১৯৬৭), বালাজি বসন্তরাও তালিম (১৮৮১—১৯৭০) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৯৬-তে করা ম্হাত্রের একটি ভাস্কর্য সেই সময় দেশে ও বিদেশে বেশ আলোড়ন এনেছিল। 'টু দ্য টেম্পল' বা 'মন্দিরাভিমুখে' নামে এই ভাস্কর্যটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ইংরেজি থেকে বাংলা করে 'মন্দিরাভিমুখে' নামটিও রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। এই দুটি নিবন্ধের বাইরে ভাস্কর্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আর কোনো রচনা সম্ভবত নেই। প্রসঙ্গ-বহির্ভূত মনে হলেও, তাই এই দুটি রচনা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া যায়। প্রথম আলোচনাটি 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় 'প্রসঙ্গকথা' বিভাগে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় লেখাটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রদীপ' পত্রিকায় 'মন্দিরাভিমুখে' নামে মুদ্রিত হয় ১৩০৫-এর পৌষ সংখ্যায়। দুটি রচনাই ছিল অস্বাক্ষরিত। কিন্তু দুটিই যে রবীন্দ্ররচনা পরবর্তীকালে পুলিনবিহারী সেনের সাক্ষ্যে তার প্রমাণ মেলে। (তথ্যসূত্র: অনাথনাথ দাস সংকলিত রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ মে ১৯৮৮-তে প্রকাশিত)

ম্হাত্রে যখন 'টু-দ্য টেম্পল' নামে নারী মূর্তিটি প্লাস্টারে প্রথম রচনা করেন ১৮৯৬-তে, তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি। পরে ১৯০০ সালে এটি তিনি মার্বল পাথরেও রূপান্তরিত করেন। রবীন্দ্রনাথের লেখাদুটি প্লাস্টার সংস্করণ সম্পর্কেই। মূর্তিটি নিয়ে সে সময় যে বিতর্ক হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেই তার পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করতে পারি আমরা। 'ভারতী'-তে প্রকাশিত রচনাটির শুরুতে তিনি লিখছেন:

"'ম্হাত্রে' উপাধিকারী একটি মহারাষ্ট্রীয় ছাত্র 'মন্দিরপথবর্ত্তিনী' (To the temple) একটি রমণীমূর্ত্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাহারই সম্মুখের ও পার্শ্বের দুইখানি ফোটোগ্রাফি, ভারতীয় শিল্পকলার গুণজ্ঞপ্রবর স্যার জর্জ বার্ডবুডের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। প্রস্তাব ছিল এই ছাত্রটিকে য়ুরোপে শিক্ষাদানের সুযোগ করিয়া দিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।"

"তদুত্তরে উক্ত ভারত-বন্ধু ইংরেজ মহোদয় এই মূর্তির প্রচুর প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন। তাহাতে প্রকাশ করেন, এই মূর্ত্তিখানি গ্রিক ভাস্কর্যের চরমোন্নতিকালীন রচনার সহিত তুলনীয় হইতে পারে এবং বর্তমান ইওরোপীয় শিল্পে ইহার উপমা মেলা দুষ্কর। তাঁহার মতে যে শিল্পী ইওরোপীয় কলাবিদ্যা না শিখিয়া নিজের প্রতিভা হইতে এমন একটি অপরূপ সৌন্দর্যের উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন তাহার ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হইবার পূর্বে তাহাকে বিলাতে শিক্ষাদান না করাই শ্রেয়, কারণ ইওরোপীয় শিল্পের অনুকরণে ভারতবর্ষের বিশেষ প্রাণটুকু অভিভূত হইয়া যাইতে পারে।

"এইখানে বলা আবশ্যক, বার্ডবুড সাহেব দুইটি ভুল করিয়াছিলেন। প্রথমত, তিনি ফোটোগ্রাফ হইতে বুঝিতে পারেন নাই যে, মূর্ত্তিটি প্রস্তরমূর্ত্তি নহে, তাহা প্যারিস প্লাস্টারের রচনামাত্র। দ্বিতীয়ত, ম্হাত্রে বোম্বাই আর্ট স্কুলে ইওরোপীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

"এই দুই ভ্রম উপলক্ষ করিয়া চিজহলম নামধারী কোনো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পায়োনিয়র পত্রে বার্ডবুড সাহেবের প্রতি কুটিল বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন— এবং ম্হাত্রে রচিত মূর্ত্তির গুণপনা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াও তাহাকে খর্ব করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।"

রবীন্দ্রনাথের কলম ধরার কারণ সম্ভবত এই অবজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এর পরে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে তৎকালীন ভারতীয় শিল্পকলা ও শিল্প আলোচনা সম্পর্কেও সারগর্ভ দু-একটি মন্তব্য করেছেন, যা সেই সময়ের পরিস্থিতির উপর অনেকটা আলোকপাত করে। তিনি লিখেছেন:

"শিল্প সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ কেন, অনারব্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই তর্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে ভারতবর্ষীয় কাহারও অধিকার আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু এই নবীন শিল্পীর অভ্যুদয়ে আমাদের চিত্ত আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

"বার্ডবুড সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত ভারতশিল্পপত্রিকায় পূর্বোক্ত দুটি ফোটোগ্রাফ বাহির হইয়াছে। তাহা বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়াও আমাদের পরিতৃপ্তি হয় না। রমণীর উত্তোল বাম বাহুতে একটি থালা ও অধোলম্বিত দক্ষিণ হস্তে

পাত্র উরুদেশে সংলগ্ন। তাহার দক্ষিণ জানু সুন্দর ভঙ্গিতে পশ্চাদ্বর্তী হইয়া সুকুমার পদাঙ্গুলির অগ্রভাগে ধরণীতল স্পর্শ করিয়া আছে। তাহার দেবীতুল্য গঠনলাবণ্য নিবিড় নিবদ্ধ কঞ্চুলিকা ও কুটিলকুঞ্চিত অঙ্গবস্ত্রদ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়াও, অতিশয় মনোরমভাবে সম্বৃত। তরুণ মুখখানি আমাদের ভারতবর্ষেরই মুখ, সরল স্নিগ্ধ, শান্ত এবং ঈষৎ সকরুণ। সবসুদ্ধ চিত্রখানি বিশুদ্ধ, সংযত এবং সম্পূর্ণ।

"এই চিত্রটি দেখিতে দেখিতে আমাদের বহুকালের বুভুক্ষিত আকাঙ্ক্ষা প্রতিক্ষণে চরিতার্থতা লাভ করিতে থাকে। সহসা বুঝিতে পারি যে, আমরা ভারতবর্ষীয় নারীরূপের একটি আদর্শকে মূর্তিমান দেখিবার জন্য এতদিন প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। সেই সৌন্দর্যকে আমরা লক্ষ্মীরূপে সরস্বতীরূপে অন্নপূর্ণারূপে অন্তরে অনুভব করিয়াছি, কিন্তু কোনো গুণীশিল্পী তাহাকে অমর দেহদান করিয়া আমাদের নেত্র সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন নাই।"

কিছুটা আবেগতাড়িত এই লেখাটি হয়তো শিল্প আলোচনার আদর্শ দৃষ্টান্ত নয় এবং এটি লেখার আগে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ মূর্তিটি দেখেনও নি। ছবি দেখেই তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। শিল্প সমালোচনার চেয়ে এখানে বড় উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী সমালোচকদের সমালোচনার প্রত্যুত্তর। সেদিক থেকে লেখাটির উৎকর্ষ ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে সংশয় থাকে না। আমাদের উদ্দেশ্য এখানে সেই ১৮৯৬-তে ভারতীয় ভাস্কর্যের আধুনিকতার দিকে পদপাতের পরিপ্রেক্ষিতটি অনুধাবনের চেষ্টা। ম্হাত্রে ছাড়া, তালিম, কারমাকার, আর পি কামাত বা মাদ্রাজের এম এস নাগাপ্পা-র মতো ভাস্করেরা মূলত প্রতিকৃতি-আশ্রিত যথাযথতার রীতিতে যে ধরণের কাজ করেছেন বিংশ শতকের প্রথম দু-তিনটি দশকে, তাকে ইন্দো-ইওরোপীয় স্টাইল বলেন অনেক সমালোচক। এরই চূড়ান্ত সফলতায় পৌঁছতে পেরেছিলেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (১৮৯৯-১৯৭৫)। কিন্তু ভাস্কর্যে আধুনিকতার ক্ষেত্রটিতে পৌঁছতে চেয়েছেন যাঁরা, এই পর্যায়টিকে আত্মস্থ করে তারপর একে অতিক্রম করে যেতে হয়েছে তাঁদের।

এর পাশাপাশি ইন্দো-ইওরোপীয় রীতির আরো কয়েকজন ভাস্করের নাম করা যায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর যাঁরা পূর্বসূরি। এঁদের মধ্যে আছেন রোহিণীকান্ত নাগ (১৮৬৮-৯৫), ফণীন্দ্রনাথ বসু (১৮৮৮-১৯২৬) ও হিরণ্ময় রায়চৌধুরী (১৮৮৪-১৯৬২)। প্রথম দুজন খুবই স্বল্পায়ু হয়েছিলেন। ভাস্কর্যের পরবর্তী বিবর্তনে হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর অনেকটা অবদান আছে। বিলেতে রয়্যাল আর্ট কলেজের শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে তিনি প্রথমে জয়পুরের আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ হিশেবে নিযুক্ত হন। পরে লখনৌ আর্ট স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হন। সেখানে ভাস্কর্যের অনেক ছাত্র তাঁর হাতে তৈরি হয়েছে। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী তাঁরই ছাত্র ছিলেন। প্রদোষ দাশগুপ্তও ১৯৩২-৩৩ এই দুই বছর লখনৌ স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটসে ভাস্কর্য শিখেছেন।

ইন্দো-ইওরোপীয় রীতির ভাস্কর্যে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর অবদান সম্পর্কে অনেক সমালোচক ও শিল্পতাত্ত্বিকই নিঃসংশয়। চিত্রশিল্পী হিশেবে বেঙ্গল স্কুলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বেঙ্গল স্কুলের ছত্রছায়ায় পরিণতি পাওয়া শিল্পীদের মধ্যে তিনিই বোধহয় একমাত্র বা অন্যতম প্রধান যিনি ভাস্কর্যে প্রগাঢ় অবদান রেখেছেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে

৮৮ প্রদোষ দাশগুপ্ত: ক্যাকটাস ফ্যামিলি: সিমেন্ট। ১৯৫৩।

৮৯ প্রদোষ দাশগুপ্ত। ব্রোকেন আইডল। প্লাস্টার। ১৯৭০।

প্রথম একবছর ভাইস-প্রিন্সিপাল, এবং বাকি সময় প্রিন্সিপাল ছিলেন। অনেক ভাস্কর তখন তাঁর হাতে তৈরি হয়েছেন এবং চল্লিশ দশক ও পরবর্তী সময়ে আমাদের চিত্র ও ভাস্কর্যে নতুন চেতনা ও নতুন সংবেদন এনেছিলেন যাঁরা, তাঁদের অনেকেই তাঁর ছাত্র ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদোষ দাশগুপ্ত ছাড়াও উল্লেখ করা যায় গোপাল ঘোষ, পরিতোষ সেন ও ফুলচাঁদ পাইনের নাম। সেদিক থেকে বলা যায়, দেবীপ্রসাদ ছিলেন বেঙ্গল স্কুল থেকে পরবর্তী আধুনিকতায় উত্তরণের অন্যতম নিয়ামক বা নিয়ন্ত্রক।

কিন্তু যদি প্রশ্ন ওঠে ভাস্কর্যের আধুনিকতায় তাঁর অবদান কতটুকু সেখানে সংশয়মুক্ত নন সকলে। হুসেনকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল কোনো এক সাক্ষাৎকারে, "আপনি আপনার পিকটোরিয়াল ডায়ারিতে ভাস্কর হিশেবে শুধু রামকিঙ্করকে স্থান দিয়েছেন। দেবীপ্রসাদ (রায়) চৌধুরী কি অন্যায় করলেন?" উত্তরে বলেছিলেন হুসেন, "অন্যায় একটাই— ভাস্কর হিশেবে দেবীপ্রসাদ শূন্যের ওপরে উঠতে পারেন নি।" পরবর্তী প্রশ্ন, "কিন্তু পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে ওঁর প্রসিদ্ধ গান্ধীমূর্তি?" উত্তর, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা চমৎকার উপহাস। ভেরি ইন্টারেস্টিং।" (উৎস: রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ জানুয়ারি, ১৯৯০)

প্রদোষ দাশগুপ্ত যদিও দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছাত্র ছিলেন তবু ভাস্কর হিশেবে তিনি তাঁকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না, বিশেষত আধুনিকতার ক্ষেত্রে। অবশ্য চিত্রকর দেবীপ্রসাদ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্টই উচ্ছ্বসিত। এমনকী ভাস্কর্যের শিক্ষক হিশেবেও দেবীপ্রসাদকে খুব একটা গুরুত্ব দেন নি তিনি। তাঁর বই 'স্মৃতিকথা শিল্পকথা'-য় সরাসরি বলেছেন, "আমার সত্যিকারের ভাস্কর্যের প্রাথমিক শিক্ষা দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে। সত্যি কথা বলতে কি উনি নিজে খুব ভালো শিক্ষক ছিলেন বলে আমার মনে হয় না।" (পৃষ্ঠা-২১) পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে (১৭ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখে গৃহীত) তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনি তো দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে শিখেছেন। ভারতীয় ভাস্কর্যে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর অবদান সম্পর্কে কিছু বলুন।" তখন তিনি যে দীর্ঘ উত্তর দিয়েছিলেন, তা থেকে দেবীপ্রসাদের কাজের সুন্দর একটা মূল্যায়ন বেরিয়ে এসেছিল। এখানে উদ্ধৃত করা যায় সেই বক্তব্য।

"ভারতীয় ভাস্কর্য বাদ দিয়ে, ভারতীয় যে চিত্রকলা, তাতে ওঁর অবদান আছে। সেখানে তিনি বেঙ্গল স্কুল থেকে এগিয়ে গিয়ে অনেক কাজ করবার চেষ্টা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছিলেন। দেবীপ্রসাদের ছবি আমার ভালো লাগে। দেবীপ্রসাদের ছবির মূল কথা হল দুটো জিনিশ। উনি বেঙ্গল স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ওকে ঠিক ফেলা যায় না বেঙ্গল স্কুলে। বেঙ্গল স্কুলের রীতিনীতি উনি সম্পূর্ণ মানেন নি, যার জন্য অবনবাবু ওকে পছন্দ করতেন না। এবং উনি সেজন্য ছেড়ে এলেন। ওয়াশ টেকনিক যেটা, জল দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে রং দেওয়া, তার সঙ্গে উনি চেষ্টা করেছিলেন, পরে মাদ্রাজে এসে. ভারতীয় রীতিকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে মিলিয়ে যদি কিছু করা যায়। এই ভাবনা তাঁর ছিল। এবং উনি রেমব্রান্টের খুব ভক্ত ছিলেন। ওই যে 'নির্বাণ' ছবিটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের, রেমব্রান্টের প্রভাব আছে ওখানে। তারপরে ওঁর ছবিতে আর একটা জিনিশ, যেটা ছিল শেষের দিকে, রোবাস্টনেস।

উনি নিজে খুব শক্তিমান পুরুষ ছিলেন, কুস্তিটুস্তি করতেন। উনি দেহটাকে খুব বড় করে দেখতেন। সেই দেহের যে শক্তি তার প্রতিফলন হয়েছে ওর ছবিতে। এবং আগে যে সেন্টিমেন্টাল অ্যাপ্রোচটা ছিল, রোমান্টিক অ্যাপ্রোচ, সেটাকে ভেঙে উনি দেহে আসলেন, ফিজিক্যালিটিতে। ওইখানে আসতে গিয়ে দেহের খাতিরে রেমব্রান্টকে ফলো করতেন। রেমব্রান্ট স্টাডি করে উনি পেলেন অন্ধকার, ডার্ক অ্যান্ড লাইট। শেষে উনি রোমান্টিসিজমের খাতিরে ফ্রেঞ্চ রোমান্টিক স্কুল থেকেও অনেকখানি পেয়েছিলেন, সাহায্য নিয়েছিলেন। আমাদের বেঙ্গল স্কুল, পিওরলি রোমান্টিক, কিন্তু উনি ওই রোমান্টিসিজম থেকে এগিয়ে, রেমব্রান্ট হয়ে, ফরাসি রোমান্টিক স্কুলের সঙ্গে এক যোগসূত্র খুঁজেছিলেন। সেটা ছিল খুবই ভালো প্রয়াস, এবং আমার মনে হয়, সেদিক থেকে যদি উনি কাজ করতেন, তাহলে অনেক কিছু সম্ভব হত। কিন্তু উনি দুর্ভাগ্যক্রমে ভাস্কর্য নিয়ে মেতে গেলেন। ভাস্কর্য বলতে কমিশনড ওয়র্ক, বাস্ট এবং ফুল ফিগার। এবং সময় ওতেই চলে গেছে। ক্রিয়েটিভ কাজ, সৃজনধর্মী ভাস্কর্য বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। ওই নিয়ে ওঁকে আমি একদিন বলেছিলাম, যে আপনি ক্রিয়েটিভ কাজ কিছু করছেন না, আমরা শিখতে পারছি না। বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, দেখো, সময় পাই না। তুমি ঠিকই বলেছ। দেখি এবার চেষ্টা করব।' যখন ফিরে আসি বিলেত থেকে, চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে, মাদ্রাজে গিয়েছিলাম। তখন বললেন, প্রদোষ,

৯০· প্রদোষ দাশগুপ্ত। পিকিং লাইস। সিমেন্ট। ১৯৪৮।

'এস এস, তোমাকে আমার কাজ দেখাই।' কতগুলো কাজ দেখালেন, 'ট্রায়াম্ফ অব লেবার', এর একটা স্টাডি, ছোট কাজ, একটা মেয়ে স্নান করছে 'অ্যাট দি ওয়েল', 'হোয়েন উইন্টার কামস', কতগুলো কাজ করেছিলেন। তার মধ্যে বেশির ভাগই বুর্দেল-এর প্রভাব ছিল। 'হোয়েন উইন্টার কামস' ডেফিনিটলি বুর্দেলের ইনফ্লুয়েন্স। তবে উনি বরাবরই রোমান্টিক। ছবিতে এবং মূর্তি গড়াতে রোমান্টিক অ্যাটিচ্যুড ওর বরাবরই ছিল। এবং দেহ, ফিজিক্যালিটি। মূর্তি যখন গড়েছেন ওখানেও রোমান্টিক অ্যাপ্রোচ—ভায়া (via) বর্দা।"

কাজেই দেবীপ্রসাদের মধ্যে আধুনিকতার অনিবার্য লক্ষণ দেখেন নি প্রদোষ দাশগুপ্ত। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে সৃজনশীল ভাস্কর্য, যা নিছক প্রকৃতির অনুকরণ নয়, তা শুরু হয়েছে আরো একটু পরে। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হলেন রামকিঙ্কর, তিনি নিজে, এবং তাঁদের একটু পরে এলেন চিন্তামণি কর ও শঙ্খ চৌধুরী। ওদিকে বম্বেতে দুজন বাক্রে এবং পানসারে। ভাস্কর্যে আধুনিকতার মূল প্রেরণাটা যে বাংলা থেকে এসেছিল, এবিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। (তথ্য সূত্র পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার)

নিরাসক্তভাবে দেখলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রথম পথিকৃৎ রামকিঙ্কর বেইজ

৯১· প্রদোষ দাশগুপ্ত। জয় হিন্দ। ব্রোঞ্জ। ১৯৪৮।

(১৯০৬-৮০)। তাঁর আদিতম যে ভাস্কর্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা ১৯২৮-এর 'মা ও ছেলে' নামে একটি প্লাস্টারের কাজ। তারপরে ১৯২৮-এর 'দ্য বনডেজ' (প্লাস্টার), 'কচ ও দেবযানী' (প্লাস্টার), ১৯৩১-এর 'মিথুন' (সিমেন্ট) পেরিয়ে আমরা যখন ১৯৩৫-এর [৪৮] 'সুজাতা' (কংক্রিট), 'সাঁওতাল দম্পতি' (ক্লে-রিলিফ) বা [৭৫] ১৯৩৮-এর 'সাঁওতাল পরিবার'-এ (কংক্রিট) পৌঁছাই তখন ভাস্কর্যের আধুনিকতা ও ভারতীয়তা এক নতুন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত হয়ে ওঠে। (তথ্য সূত্র : প্রকাশ দাস সম্পাদিত 'রামকিঙ্কর')

সৃজনশীল ভাস্কর্যে প্রদোষ দাশগুপ্তের আবির্ভাব আরো কয়েকটি বছর পরের ঘটনা। ১৯৩৬-এ করা তাঁর 'কমলা' নামে হেড-স্টাডি যথেষ্ট দক্ষ ও নন্দনময় কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাস্কর্যের আধুনিকতা বলতে তিনি নিজেও যা বোঝেন বা বোঝাতে চান, সেই নিরিখে তাঁর এরকম কাজ নিশ্চয়ই আধুনিকতার মর্যাদা পাবে না। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডনে রয়াল অ্যাকাডেমি অব আর্টসে ভাস্কর্যে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং লন্ডনের এল সি সি সেন্ট্রাল স্কুলে ব্রোঞ্জ কাস্টিং শেখেন। ১৯৪০-এ দেশে ফিরে কলকাতায় নিজের স্টুডিও তৈরি করে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করেন। এখানে সেই বছরই একটি কাজ শুরু ও শেষ করেছিলেন তিনি, তার নাম ·

৯২· প্রদোষ দাশগুপ্ত। ক্র্যাডল। সিমেন্ট। ১৯৫০।

'দ্য মাদার'। পশুর ভঙ্গিতে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মানা এক মানবী-প্রতিমা এবং দুটি শিশু তাঁর স্তন পান করছে দু-দিক থেকে শুয়ে। এই মূর্তির "কল্পনার পেছনে যে দর্শন রয়েছে", সেটা তাঁর নিজের ভাষায়, "মনস্তাত্ত্বিক বিচারে মানুষ-মা পশুত্ব লাভ করে স্বর্গীয় হয়। সেটা এক মাতৃত্বেই সম্ভব, আর কিছুতেই নয়।" কাজটি ১৯৪৫ সালে 'ক্যালকাটা গ্রুপের' প্রথম প্রদর্শনীতে প্রথম দেখানো হয়। এবং যথেষ্ট সমাদৃত হয়। অধ্যাপক বিনয় সরকার শিল্পীকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, "বাঘের বাচ্চা, আপনি সত্যিকারের বাঘের বাচ্চা। আপনার মাতৃমূর্তি একটা জবরদস্ত সৃষ্টি।" (তথ্য সূত্র প্রদোষ দাশগুপ্ত : 'মডেলের সন্ধানে', প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯২) এরপর ১৯৪১-এর 'সোলেস', ১৯৪৪-এর 'গসিপ' (ব্রোঞ্জ), ১৯৪৬-এর 'ফার্স্ট বর্ন' (ব্রোঞ্জ) ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে যে রূপাবয়ব ও অভিব্যক্তির দিকে যেতে থাকেন তিনি, তাতেই তাঁর সৃজনশীল নিজস্বতা প্রস্ফুটিত হতে থাকে ক্রমে ক্রমে।

তিন

ভাস্কর্যে আধুনিকতা

এখানে আমরা অনুধাবনের চেষ্টা করতে পারি ভাস্কর্যে আধুনিকতা বলতে কী বুঝতে চান প্রদোষ দাশগুপ্ত। একজন আধুনিক ভাস্করের কাছে আধুনিকতার সঙ্গে ভারতীয়তার বোধের অন্বয়ও প্রত্যাশা করেন তিনি। কি-ই বা বুঝব আমরা সেই ভারতীয়তা বলতে?

রদাঁ সম্পর্কে একবার লিখেছিলেন প্রদোষ দাশগুপ্ত,

"...মনে হয় রদাঁ মানুষের শরীরকেই ভালোবেসেছিলেন বেশি। শরীরের ঊর্ধ্বে যে কল্পিত মানবিক আত্মা তার বিশেষ কোনো প্রকাশ কিংবা খোঁজ আমরা পাইনি তাঁর কাজে, যেমন পেয়েছিলাম চিত্রকলায় তাঁর পূর্বসূরিদের কাছ থেকে জিওত্তোর ফ্রেস্কোতে এবং পরবর্তীকালে বত্তিচেলির কাজে। কিন্তু দেখা যায় রদাঁ এক চুলও নড়েন নি তাঁর রক্ষণশীল মনোবৃত্তি থেকে। তাই মনে হয় নতুন কোনো পথের সন্ধান তিনি দিতে পারেন নি তাঁর পরবর্তী যুগের শিল্পীদের জন্য।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ মে ১৯৮৩)

রদাঁ সম্পর্কে এরকম সমালোচনা হয়তো উত্তেজিত করবে অনেককে। এ উক্তির সত্যতা বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে এখানে আমরা কোনো তর্কে যাচ্ছি না। ভাস্কর হিশেবে রদাঁর মহত্ত্বকে একটি বাক্যে পরিস্ফুট করে গিয়েছিলেন তাঁর এক সময়ের সচিব, প্রখ্যাত কবি রাইনার মারিয়া রিলকে। জাঁ পল লরেন্স নামে এক চিত্রশিল্পীর রদাঁকৃত মুখাবয়ব রচনা সম্পর্কে রিলকে বলেছিলেন, "এত গভীর অনুভবে সম্পৃক্ত এই রচনা, এত বিনম্র সংবেদনে গড়া এর তলগুলি, অভিব্যক্তিতে এত নিবিড়, এত সুঠাম গঠনে, এত জঙ্গম ও জাগরিত, যে মনে হয় প্রকৃতি যেন একে তুলে নিয়েছিল ভাস্করের হাত থেকে, তার একান্ত নিজের অমূল্য এক সংগ্রহের মর্যাদায়।" (রিলকে : অগুস্ত রদাঁ, ১৯০৩, অনু : জেসি লেমন্ত ও হানস এসিল, লন্ডন, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা : ৪৫, হার্বার্ট রিড : 'মডার্ন স্কাল্পচার' থেকে উদ্ধৃত) শিল্পীর আত্মচেতনার আলোয় উদ্ভাসিত প্রকৃতির বা জীবনের এই যে রূপান্তরিত রূপ, রদাঁর মহত্ত্ব এখানে, আধুনিকতায় তাঁর দানও এখানে, আবার অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীরতর ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষত, তাঁর সীমাবদ্ধতাও এখানে। তাই তাঁরই পরবর্তী প্রজন্মের ভাস্কর অরিস্টিদ মাইঅল (১৮৬১-১৯২৯) ইম্প্রেশনিজমের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়া থেকে বলেছিলেন,

"প্রকৃতি প্রবঞ্চনাময়। তার দিকে যদি কম তাকাই, বাস্তবকে হয়তো নির্মাণ করব না আমি, কিন্তু সৃষ্টি করব সত্যকে। রদাঁকে আমি বলেছিলাম, শিল্পসৃষ্টি জটিল। তিনি মৃদু হেসেছিলেন। কেননা, তিনি ভেবেছিলেন, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে রত আমি। আমি চেষ্টা করেছিলাম, সহজ করে নিতে, আর তিনি অনুপুঙ্খ বিশদে ধরছিলেন অবয়বকে।"

(অ্যান্ড্রু সি রিচি সম্পাদিত অরিস্টিদ মাইঅল, ১৯৪৭, হার্বার্ট রিড : 'মডার্ন স্কাল্পচার্স' থেকে উদ্ধৃত)

রদাঁর সঙ্গে মাইঅলের পার্থক্য আছে, রোমান্টিক আত্মতার সঙ্গে ধ্রুপদী নৈর্ব্যক্তিকতার পার্থক্য।

প্রদোষ দাশগুপ্তের আকর্ষণ ছিল রদাঁর থেকে মাইঅলের দিকে বেশি। সেদিনই কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন,

"রদাঁর চেয়েও আমার (প্রিয়) মাইঅল, বুর্দেল-এর (১৮৬১-১৯২৯) কাজ। বুর্দেল আর একটু ডেকরেটিভ, আর একটু অর্নামেন্টল, আর্কায়িক; মাইঅল তা নয়। মাইঅল একেবারে ফর্ম নিয়ে কাজ করেছেন। এবং সলিড (Solid), এক্সাজারেট করেছেন ফর্মটাকে, করে একেবারে নতুন অথচ ক্লাসিক্যাল। দুজনেই ক্লাসিক্যাল, মাইঅল ও বুর্দেল। কিন্তু এলিমেন্ট-এ পার্থক্য আছে। বুর্দেল কখনো ফর্মটাকে অতিরঞ্জিত করেন নি। উনি ক্লাসিক্যাল থেকে আর্কায়িক ফর্মে এসেছেন। এসে সেটাকে ডেকরেটিভ মোটিভ দিয়েছেন। এ দুজনকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। যাই হোক, (বিলেত থেকে) ফিরে এসে আই প্রেফারড মাইঅল।"

সুতরাং এই ধ্রুপদী নৈর্ব্যক্তিকতাকেই তিনি বেছে নিলেন নিজের পথ বলে।

আবার রদাঁ, মাইঅল, বুর্দেলের পরেও তো বিবর্তিত হয়েছে আধুনিক ইওরোপীয় ভাস্কর্য। সেই বিবর্তনে কোন দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন প্রদোষ দাশগুপ্ত? 'আ স্টাডি অব হেনরি মুরস স্কাল্পচারস' নামে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত (মিসেলানি, ১১ অক্টোবর ১৯৮৭) এক লেখায় পাশ্চাত্য ভাস্কর্যে রূপের বিবর্তনকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন একবার। বলেছিলেন, গ্রিক ভাস্কর্য থেকে শুরু করে রদাঁ-মাইঅল যুগ পর্যন্ত ইওরোপীয় ভাস্কর্য 'দেহ বা অবয়বের

৯৩· প্রদোষ দাশগুপ্ত। টয়লেট। সিমেন্ট। ১৯৪৭।

৯৪ প্রদোষ দাশগুপ্ত। এগ ব্রাইড। ১৯৭৩।

সৌন্দর্যের' ধারণায় ভরপুর ছিল। গ্রিক ভাস্করদের হাতে মানুষের শরীর আদর্শায়িত হয়ে উঠেছিল দেব-দেবীর সৌন্দর্যের অলৌকিকতাকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য। প্রায় দুহাজার বছর পরে, সেই মানব দেহ শক্তিতে ও পৌরুষে হয়ে উঠল আরো মানবিক। এমনকী মাইকেল এঞ্জেলোর হাতে নারীর অবয়বেও পৌরুষের দৃঢ়তা সঞ্চারিত হয়ে গেল। ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে, সেই মানবিক প্রতিমা, রদাঁর হাতে, স্বাভাবিকতা-আশ্রিত বিনম্রতায় রোমান্টিক অনুভবের দিকে মোড় নিল। সঠিকভাবে বলতে গেলে, মানবিক রূপাবয়বের এই বহুযুগ প্রাচীন ঐতিহ্যকে ভাঙতে পেরেছিলেন ব্রাঁকুসি ও জাঁ আর্প। তাঁদের হাতেই শুদ্ধ বিমূর্ততার দিকে যেতে পেরেছিল ভাস্কর্য। ব্রাঁকুসির এই রূপের সংহত সরলতা, যাকে বিমূর্ততা বলছেন তিনি, পরিণতির দিকে যেতে প্রদোষ দাশগুপ্ত সেই আদর্শকেই অনেকটা নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে বলে রাখা ভালো, বিমূর্ততা বা অ্যাবস্ট্রাকশন বলতে প্রাকৃতিক অবয়বের পূর্ণ বিলোপকে বোঝেন নি তিনি। বুঝেছেন স্বাভাবিকতা থেকে দূরে সরে যাওয়াকে। রূপের বা সত্তার সারাৎসারকে ধরার জন্য শিল্পীর ব্যক্তিত্ব রূপকে যে বিশদহীন সরলতায় বা অতিশয়তায় রূপান্তরিত করে নেয়, সেই রূপান্তরণকে। ১৯৬৬-তে সিমলার 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব অ্যাডভানসড স্টাডিজ'-এর এক আলোচনাচক্রে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি 'রোল অব অ্যাবস্ট্রাকশন ইন মডার্ন আর্ট' নামে। পরে সেটি প্রকাশিত হয় ওই ইনস্টিট্যুটের 'ইন্ডিয়ান ইসথেটিকস অ্যান্ড আর্ট অ্যাকটিভিটি' গ্রন্থে। সেই প্রবন্ধে তিনি বিমূর্ততা সম্বন্ধে যে চিন্তার কথা বলেছিলেন, তা অনেকটা এরকম। ব্রাঁকুসির

ভাস্কর্যে প্রাকৃতিক রূপ কখনো কখনো এতটাই বিবর্তিত হয়েছে যে প্রকৃতির সঙ্গে তার সাযুজ্য ক্ষীণ হয়ে গেছে। যেমন তাঁর ১৯১৯-এ করা 'বার্ড ইন স্পেস' নামে ব্রোঞ্জের কাজটি। এটি যখন আমেরিকায় কোনো এক প্রদর্শনীর জন্য যাচ্ছিল, তখন বন্দর কর্তৃপক্ষ শিল্পকর্ম বলে কিছুতেই মানতে রাজি হন নি একে। একটি ধাতব পদার্থ হিশেবে শুল্ক ধার্য করেছিলেন এর। বাস্তবের পাখির সঙ্গে এই প্রতিমাটির সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল এতটাই ক্ষীণ। ব্রাকুসিকে প্রায় বছর চারেক মামলা লড়তে হয়েছিল এ নিয়ে আমেরিকার সরকারের সঙ্গে। তবু ভাস্কর্যে, হার্বার্ট রিড যাকে বলেছেন, ভাইটালিজম বা জীবন্ময়তার ঐতিহ্য, তা থেকে বিচ্যুত হয়ে বিশুদ্ধ বিমূর্ততায় নিমজ্জিত হন নি ব্রাকুসি। প্রদোষ দাশগুপ্তের ভাস্কর্যেও প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধন সব সময় থেকেছে।

তাঁর সৃষ্টির অন্তর্নিহিত প্রেরণা হিশেবে আমরা পেলাম একদিকে মাইঅলের ধ্রুপদী-চেতনা, আর এক দিকে ব্রাকুসির দর্শনচেতনা ও রূপাবয়বের সংহত সরলতা বা বিমূর্ততা। তাঁর যে ভারতীয়তার চেতনা বা ভারতীয় দর্শনের মূলগত সত্যকে যে ভাস্কর্যের ভাষায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা, তারও পূর্বদৃষ্টান্ত তিনি দেখেছিলেন ব্রাকুসি বা জাঁ আর্পের মধ্যে। ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্মাণ্ডের ধারণার সঙ্গে ব্রাকুসির দর্শনদীপ্ত রূপনির্মাণ ভঙ্গি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁর চেতনায়। লন্ডনে থাকাকালীন ছাত্র অবস্থায় ব্রাকুসির একটি প্রদর্শনী দেখেছিলেন। তাঁর কথায় :

"বিরাট প্রদর্শনী। তার মধ্যে ব্রাকুসির একটা ছোট্ট কাজ ছিল। একটা কালো কিউব, পালিশ করা, তার উপর দুটো শাদা ডিম, ঠিকভাবে সাজিয়ে রাখা। আমি দেখে, একটা অত্যন্ত রেভলিউশনারি সামথিং ফিল করলাম। সেই থেকে আমি আরম্ভ করলাম স্টাডি করতে। এখন এই ব্রহ্মাণ্ডের রেফারেন্সটা ব্রাকুসি আমাদের থেকে পেয়েছেন। শুধু উনি না, আর্প পর্যন্ত, জাঁ আর্প। তিনি পর্যন্ত আমাদের গীতার ফিলসফির উপর স্টাডি করেছেন। দাদাবাদী আন্দোলনে উনি জয়েন করেন প্রথম। মহাভারতের যুদ্ধ তাঁকে ভয়ানক ইনফ্লুয়েন্স করেছিল। যাই হোক, ব্রাকুসি যেটা করেছেন, সেটা একটা আউটার ফর্ম-এ, তার ভেতরে যে প্রাণশক্তি, আমি সেটাকে বড় করে দেখেছিলাম।"

এই প্রাণশক্তিরই সন্ধানে তিনি পৌঁছে যান ভারতীয়তায় বা ভারতীয় দর্শনে। ১৯৭০-এ দিল্লির ললিতকলা অ্যাকাডেমিতে দেওয়া কুমারস্বামী স্মৃতি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন দুরকম রূপের কথা : 'ইন্টারেস্টিং ফর্ম' এবং 'সিগনিফিকেন্ট ফর্ম'। এই সিগনিফিকেন্ট ফর্মকেই তিনি বলেছিলেন, শিল্পের ফর্ম, শিল্পঋদ্ধ রূপাবয়ব। জীবনের বীজ থাকে এর মধ্যে। জড় মাটি, পাথর, ধাতু বা অন্য উপকরণে এই জীবনের বীজ, এই প্রাণশক্তির সঞ্চার ঘটিয়েই তাকে শিল্পে উত্তীর্ণ করা যায়।

এই প্রাণশক্তির ধারণা, তাঁর মতে, ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য। ব্রহ্মাণ্ডের বোধের মধ্যে রয়েছে এক সংহত শক্তির উৎস। সেই শক্তি কেন্দ্রাভিমুখী। ভিতরের দিকে সংবদ্ধ। বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় না তা। ভারতীয় শিল্পী সবসময়ই সেই শক্তিকে ধরে রাখেন। ধরে রাখেন, কেননা তা নইলে সেই প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃতির যে কোনো সৃষ্টির মধ্যে, বীজের সঞ্চার ও পরিপূর্ণতায় প্রস্ফুটনের পথে, ডিমের হয়ে ওঠা এবং জীবনের জন্মে আত্মোৎসর্গের মধ্যে এই প্রাণশক্তিরই অন্তর্মুখী সংহত প্রকাশ। কেন্দ্রাভিমুখী সংহত শক্তি ভারতীয় দৃশ্য-শিল্পে যখন রূপ হয়ে ফুটে ওঠে, তখন তার মধ্যে থাকে এক ধরণের প্রবহমানতা, এক ধরণের 'ডোসিলিটি ইন ক্যারেকটার', এক বিনম্র মাধুর্য যেন ভাস্করের ছেনি, হাতুড়ির কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করে তা, কখনো সংঘাত সৃষ্টি করে না। ভারতীয় ভাস্কর্যে একটি তল আর একটি তলের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে। নিবিড় সাযুজ্যে মিলে যায় একে অন্যের সঙ্গে। কৌণিকতায় নিজ অস্তিত্বকে প্রকট করে তুলতে চায় না।

প্রদোষ দাশগুপ্ত অনুভব করেন মিশরীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের এটাই পার্থক্য।

"ইজিপশিয়ান কিউবিক্যাল ফর্ম দেখলে মনে হয় পাথর, আমাদের কিন্তু দেখলে তা মনে হয় না। আমাদের হল ওই যে ডোসিলিটি, সফটনেস, গ্লাইডিং ফর্ম, একটা আরম্ভ হয়ে গ্লাইড করে আর একটা তলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তল যে ওদের দেশে ভাগ করে তল ভাগ করলেই হয়কি, কিউবিক ফর্ম হয়। একটা কাটা কাটা ফর্ম হয়। আমরা এগুলো কেটে দিই। একটা ফর্ম গিয়ে মিলে যায় আর একটা তলে। এই যে মিলে যাওয়ার প্রবণতা, এটাই আনে ডোসিলিটি, মুভমেন্ট, বিনম্রতা ও জঙ্গমতা। এটাই হচ্ছে আমাদের ভারতীয় চরিত্রের মূল কথা, ভারতীয় ভাস্কর্যেরও। আমি মহেঞ্জোদারো স্টাডি করেছি। মহেঞ্জোদারোর যে ষাঁড়, ছোট্ট, দু-ইঞ্চি, কিন্তু অসম্ভব শক্তিশালী, পরুষদীপ্ত। ওই যে কনটুর, প্রবহমান তলসংযোগ রেখা, যেটা কখনো থামে না। ওইগুলো হচ্ছে জঙ্গমতা,

কাইনেটিক মুভমেন্ট, কিন্তু মূর্তিটা স্থির; স্ট্যাটিক। ষাঁড় নিজে স্ট্যাটিক, সচল নয়। কিন্তু সচল একটা গতি এসেছে তার মধ্যে, রেখার গতির মধ্যে দিয়ে। এগুলোই খুব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ভারতীয় ভাস্কর্যের।"

পাশ্চাত্য ভাস্কর্য-সঞ্জাত ধ্রুপদী-চেতনা ও ভারতীয় এই প্রাণশক্তির ধারণা এই দুটিকে মিলিয়েছেন প্রদোষ দাশগুপ্ত তাঁর ভাস্কর্যে।

একজন শিল্পীকে যে নিজের দেশ-কাল ও পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করতে হয় তাঁর শিল্প-সৃষ্টির রসদ একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন তিনি। রিচার্ড হান্ট বা মার্ক টোবির মতো পাশ্চাত্য শিল্পীকে এক আলাপচারিতায় স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে একজন পাশ্চাত্য শিল্পী যদি প্রাচ্যের দর্শন ও পরিবেশ থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করেন তাঁর কাজের জন্য, সেটাও এক ধরণের পলায়নী মনোবৃত্তি। (দ্রষ্টব্য : ললিতকলা কন্টেম্পোরারি ২৬ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১৯৭৮)। রামকিঙ্করকে তিনি সমালোচনা করেছেন এই বিচ্যুতির জন্য। 'রামকিঙ্করস ইউনিকনেস' নামে ললিতকলা কন্টেম্পোরারি'-র ৩০ সংখ্যার (সেপ্টেম্বর, ১৯৮০) এক প্রবন্ধে লিখেছেন, আবার সেই একই কথা লিখেছেন তাঁর নিজের বই 'স্মৃতিকথা শিল্পকথা'-য় :

"রামকিঙ্কর তাঁর জীবনব্যাপী শান্তিনিকেতনের গ্রাম্যভাবাপন্ন সঙ্কীর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছেন এবং তাঁর ভেতরকার মানুষটিও তাই সেই গ্রাম্য, সহজ, সরল, দিলখোলা মানুষটিই ছিল। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে তাঁর কাজ বিশেষ করে ভাস্কর্যে তাঁকে আমরা অন্যভাবে দেখতে পাই। সেখানে তিনি পুরোপুরি একজন শহুরে ভাবাপন্ন বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসম্মত যান্ত্রিক সভ্যতার আওতায় সমৃদ্ধ মানুষ, শহুরে কল্পনাবিলাসে ব্যস্ত। কলকাতায় আঁকা যামিনী রায়ের ছবিতে গ্রাম্য পটচিত্রের রীতি যদি কোনো সমালোচকের মনে সংশয়ের কারণ জন্মায় তাহলে

৯৫· প্রদোষ দাশগুপ্ত। মাদার অ্যান্ড চাইল্ড। ড্রয়িং।
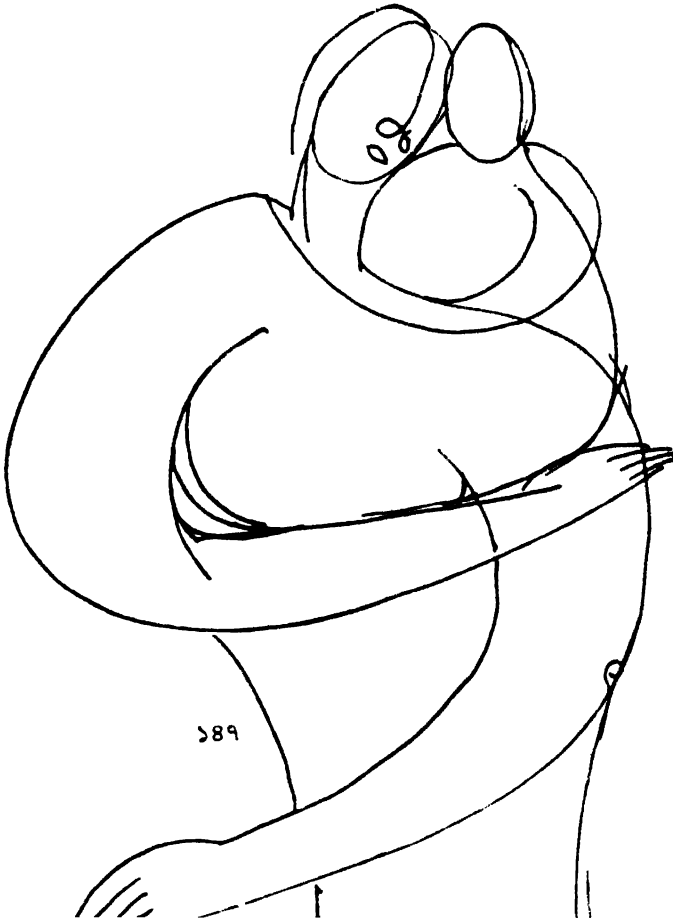
রামকিঙ্করের কাজও সেইভাবে একই কারণে সমালোচকদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করবে সন্দেহ নেই। তাঁকে এই বলে দোষারোপ করা যেতে পারে যে তাঁর নিজের গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে তাঁর বেশিরভাগ কাজেরই কোনো সঙ্গতি নেই। রামকিঙ্করকে আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিশেবে গণ্য করার সময় এই প্রশ্ন সবসময়ই আমাদের মনে জেগে থাকবে।" (পৃ ১২৯)

সব শেষে তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন "কিন্তু তা সত্বেও রামকিঙ্কর, রামকিঙ্কর তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে।" রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের সঙ্গে পরিচিত কোনো মানুষের হয়তো এই সমালোচনার সারবত্তা সম্পর্কে সন্দেহ জাগবে। রামকিঙ্করের কাজে যে শক্তি ও বলিষ্ঠতা তার প্রধানতম উৎস জীবনের নিহিত আবেগ, যা ভারতীয়তারই অন্যতম এক অভিব্যক্তি। রামকিঙ্কর ও প্রদোষ দাশগুপ্ত দুজনেই আধুনিকতার অভিব্যক্তিতে পাশ্চাত্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আবার দুজনেই ভারতীয়তাকে মিলিয়েছেন তার সঙ্গে। রামকিঙ্কর অনুপ্রাণিত হয়েছেন ভারতীয় আদিম জনগোষ্ঠীর জীবন ও প্রকাশের সারাৎসার থেকে, সেখানে তাঁর শিকড় অত্যন্ত গভীর। এবং প্রদোষ দাশগুপ্ত গ্রহণ করেছেন ধ্রুপদী চেতনা থেকে। তাঁদের দুজনের কাজের মূলগত পার্থক্য এখানেই।

চার

ভাস্কর্যের বিস্তার

প্রদোষ দাশগুপ্ত সব সময়ই চেয়েছেন তাঁর কাজ যেন রূপাবয়বের শুদ্ধতায় ভাবাবেগহীন বিশুদ্ধ ভাস্কর্য হয়ে ওঠে। মূর্তির মধ্য দিয়ে কোনো গল্প বলতে চান নি তিনি। কোনো সামাজিক বা দার্শনিক সত্যের প্রতিরূপও করতে চান নি। চল্লিশের দশকের শুরুতে যখন তিনি শিল্পের নিজস্বতায় পৌঁছতে চেষ্টা করছেন ধীরে ধীরে, যখন আধুনিকতার আন্দোলন গড়ে তুলছেন 'ক্যালকাটা গ্রুপের' (১৯৪৩—৫৩) মধ্য দিয়ে সেই সময় যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সমাজ বাস্তবতা অনেক সময়ই তাঁকে অভিভূত করেছে। কাজের মধ্যেও এসে গেছে তার প্রতিফলন। তখনো বাস্তবতার খাতিরেও আপোস করেন নি ভাস্কর্যের শুদ্ধতার সঙ্গে। ললিতকলা অ্যাকাডেমির মনোগ্রাফে তাঁর উপর লেখা ভূমিকায় বিষ্ণু দে বলেছেন, ১৯৪৩-এর কাছাকাছি সেই সময়ে শিল্পী নিজের উপর কখনো কখনো অতিরিক্ত কঠোর হয়েছেন। সহজ আবেগ জাগাতে পারে এরকম অনেক মূর্তিই নিজ হাতে নষ্ট করে ফেলেছেন। বাস্তবতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন নি তিনি। বাস্তবতা নানা ভাবমূর্তিতে বারবার এসেছে তাঁর কাজে। কিন্তু শিল্পের ধ্রুপদী শুদ্ধতাই সব সময় তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল। আবেগেব অতিরেক সবসময়ই এক দর্শনচেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

তাঁর কাজের বিবর্তনের দিকে যাওয়ার আগে জীবনী-সংক্রান্ত সাধারণ কয়েকটি তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিতে পারি আমরা। প্রদোষ দাশগুপ্ত ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন ঢাকায়। তাঁর পিতা ছিলেন 'আইনজ্ঞ হয়েও নিজে কবি, দার্শনিক ও লেখক'। ছেলেবেলায় তাঁর স্কুল জীবনের অনেকটা কেটেছে কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পড়েছেন। শৈশব সম্পর্কে লিখেছেন 'স্মৃতিকথা শিল্পকথা'-য়:

> "আমাদের বাড়িতে তখন প্রতি মাসে অনেক মাসিক পত্রিকা এসে জড়ো হতো। প্রবাসী এবং মডার্ন রিভিউ তার মধ্যে অন্যতম ছিল। আমার সঙ্গে শিল্পের পরিচয় ঐসব মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে। আমার কাজই ছিল ঐসব মাসিক পত্রিকা থেকে ছাপানো ছবি ছিঁড়ে নিয়ে আমার অ্যালবাম ভরতি কবা। আমার এই ছাপা ছবি সংগ্রহ করার অভ্যেস অনেকদিন পর্যন্ত ছিল, ১৯৩৭ সাল অবধি, অর্থাৎ বিলেত যাবার প্রাক্কাল পর্যন্ত।... সেই সময়কার আঁকা অবনীন্দ্রনাথের অনেক ছবি আমার খুব ভাল লাগত বোধহয় তার লিরিক্যাল, কাব্যধর্মী ভাবের জন্য। তাছাড়া অবনীন্দ্রনাথের হালকা রঙ-এর ব্যবহার, ছন্দোময়, লাইনের গতি, সব মিলিয়ে আমার মনে যেন একটা স্বপ্নের আবেশ এনে দিত।"

স্কুল জীবন থেকেই বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর আকর্ষণ ছিল, যাকে তিনি বলেছেন, জন্মগত, অনেকটা পিতৃদত্ত। তাঁব বাবা যদিও দর্শনশাস্ত্রে এমএ পাশ করে জজিয়তি করতেন, তবু সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর অসামান্য দখল ছিল। নিজে লেখক ছিলেন। শৈশব থেকেই সংগীতের প্রতিও ছিল তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ। তা থেকে
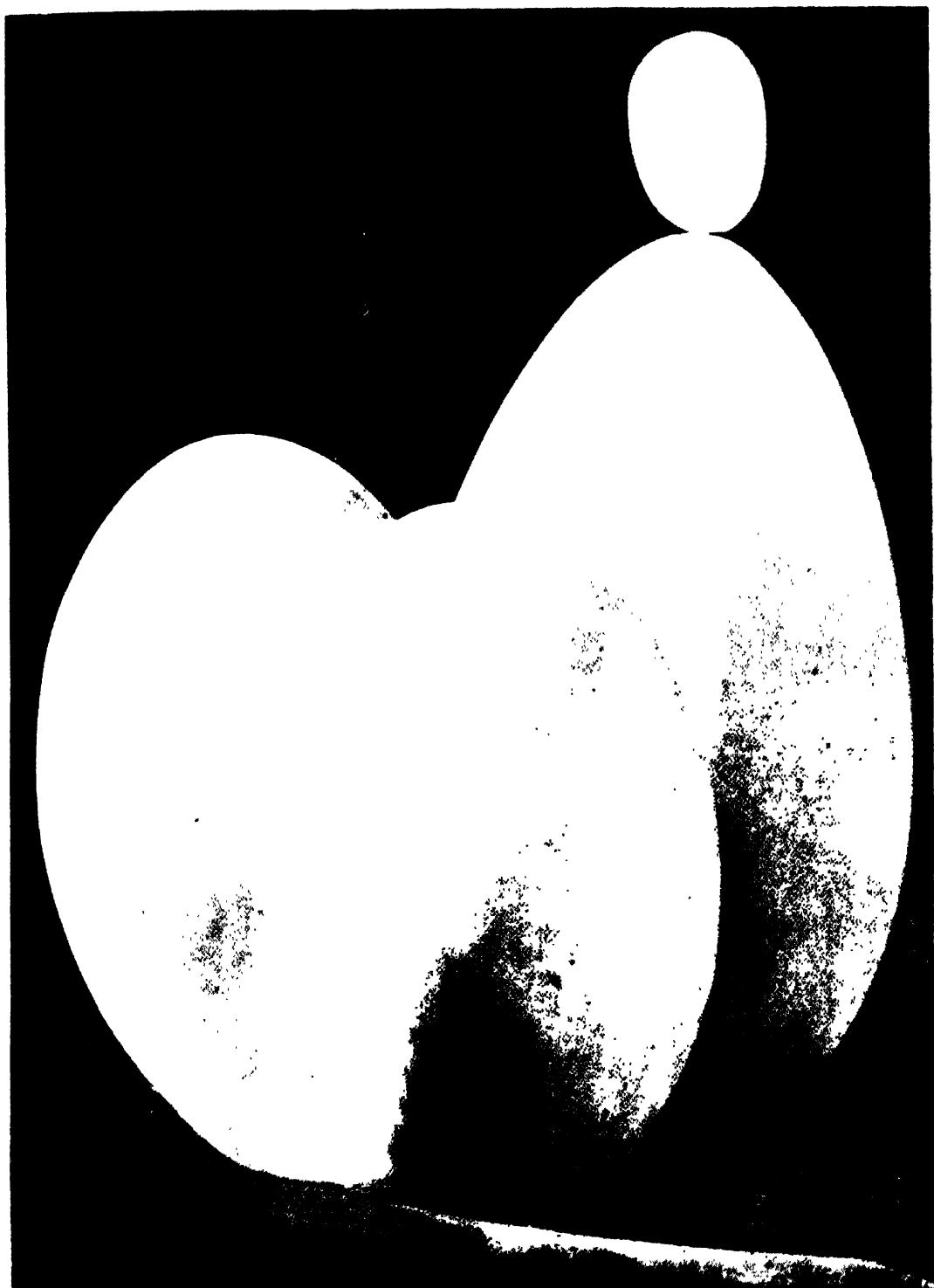
৯৬· প্রদোষ দাশগুপ্ত। এগ ব্রাইড। মার্বল-এর জন্য প্লাস্টার। ১৯৭২।
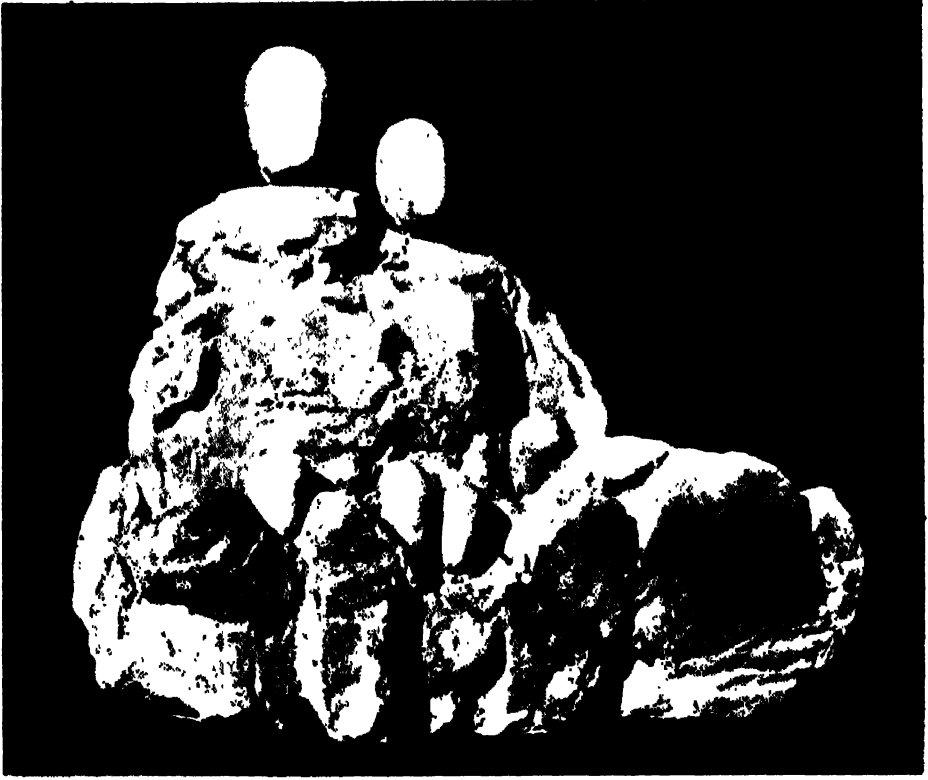
৯৭ *প্রদোষ দাশগুপ্ত। এগ ফেমিলি। ব্রোঞ্জ। ১৯৭৩।*

এসেছে ছন্দোজ্ঞান। তিনি বলেছেন, "সেই ছন্দোজ্ঞানই আমার মনে হয় আমার শিল্পকলা শিক্ষায় উদবুদ্ধ করেছে।" গান ও ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক ছিল ছেলেবেলা থেকেই। ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করবেন। কিন্তু ভাস্কর্যের দিকে আসতে হল তাকে তাঁর পিতার একান্ত ইচ্ছায়। তিনি বলেছিলেন আমাদের দেশে শিল্পীর, বিশেষত ভাস্করের অনিশ্চিত জীবনের কথা। তাঁর পিতা তাঁকে ভরসা দিয়েছেন, কথা দিয়েছেন পেছনে দাঁড়াবেন।

১৯৩২ সালে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হন। ১৯৩২ ও ১৯৩৩, দুবছর লখনৌ আর্টস স্কুলে হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর কাছে ভাস্কর্য শেখেন। কাছেই ছিল শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকারের মরিস মিউজিক কলেজ। রতনজনকারের কাছে দুবছর মার্গীয় সংগীতেও তালিম নেন ওখানে। ১৯৩৪ থেকে ৩৭ পর্যন্ত চার বছর মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে ভাস্কর্য শেখেন। ওখানেই স্কুলের লাইব্রেরিতে বই-এর মাধ্যমে পরিচয় হয় ইওরোপের শিল্পের আধুনিকতার সঙ্গে। আবিষ্কার করেন এপস্টাইন, সেজান ও পিকাসোকে। পরিচিত হন কিউবিজমের সঙ্গে। 'আলট্রা-মর্ডানিস্ট' বা অতি-আধুনিকা বলে নারী মুখাবয়বের একটি ভাস্কর্য করেছিলেন সেই সময়, ক্লাসের কাজের ফাঁকে। কিউবিজম নিয়ে চর্চার প্রথম পরিচয় আছে ওই কাজটিতে।

১৯৩৭-এ লন্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন ভাস্কর্য বিভাগে। কঠোর পরিশ্রমে মডেলিং ও ব্রোঞ্জ কাস্টিং শেখেন। বহু প্রদর্শনী দেখেন। পাশ্চাত্য আধুনিকতার সঙ্গে পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। মাইওল, ব্রাঁকুসি ও জাঁ আর্পের ভাস্কর্যে আধুনিকতার যে লক্ষণ দেখেন, নিজের প্রবণতার সঙ্গে অনুভব করেন তার কিছু সাযুজ্য। কিন্তু ভারতীয় হিশেবে নিজের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত না হলে তাঁর শিল্পের মুক্তির দরজা যে খুলবে না, এই উপলব্ধিও স্বভাবতই আসতে থাকে তাঁর মধ্যে। এই সমাহারের মধ্য দিয়ে আজীবন চলেছে তাঁর নিজস্বতার সন্ধান।

১৯৪০ সালে বিলেত থেকে ফিরে এলেন কলকাতায়। তখন নিজের একটা স্টুডিও করার ইচ্ছে। জায়গা খুঁজলেন। সুবিধে মতো না পেয়ে শেষে ওয়েলিংটনে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে করলেন নিজের স্টুডিও। অদ্ভুত একটা নাম দিয়েছিলেন স্টুডিওর : GLYPTOTHER। ওই স্টুডিও ও ১৯৪০-এর কয়েকটি দিনের কথা লিখেছেন শারদীয় 'প্রতিক্ষণ', ১৩৯২-তে 'মডেলের সন্ধানে' নামে স্মৃতিচারণায়। এত সাহিত্যগুণসম্পন্ন, গল্পের মাধুর্যমাখা স্মৃতিচিত্রণ, সব সময়ের সাহিত্যিক নন, এরকম একজন শিল্পীর হাত থেকে বেরোনো খুবই বিরল ঘটনা। তাঁর মধ্যে যে একজন বড় সাহিত্যিকেরও সম্ভাবনা ছিল, এই লেখাটি পড়লে বোঝা যায়। এখানেই লিখেছেন ১৯৪০-এর জুন মাসের শেষের দিকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে সামনে বসিয়ে তাঁর মূর্তি গড়ার কথা।

১৯৪৩-এ 'ক্যালকাটা গ্রুপ' গড়লেন। কলকাতার সৃজনশীল শিল্প আন্দোলনে এটি তাঁর স্মরণীয় অবদান। ছবির আধুনিকতা নতুন মোড় নিল এই গ্রুপের সংঘবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। সৃজনশীল আধুনিক ভাস্কর্য শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্কর শুরু করেছেন কয়েক বছর আগে। কলকাতায় আধুনিক ভাস্কর্যের সূচনা ঘটল এই গ্রুপের কাজের মধ্য দিয়ে, বিশেষত তাঁর নিজের কাজের মধ্য দিয়ে। 'স্মৃতিকথা শিল্পকথায়' তিনি নিজেই লিখেছেন ক্যালকাটা গ্রুপের বিতর্কিত ইতিহাস।

১৯৪৫-এ কলকাতায় তাঁর ভাস্কর্যের প্রথম একক প্রদর্শনী করেন। ১৯৫০-এ বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ভাস্কর্য বিভাগের প্রধানের পদে। ১৯৫১ থেকে ৫৭ পর্যন্ত ছিলেন কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজের অধ্যাপক। আজকের অনেক প্রখ্যাত ভাস্কর সেই সময় তৈরি হয়েছে তাঁর হাতে। ১৯৫৭-তে কিউরেটর হিশেবে যোগ দেন দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্টে। ১৯৭০-এ অবসর নেন সেখান থেকে।

তাহলে বলা যায়, সেই ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৯১-তে, তাঁর প্রায় আশি বছর বয়সে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত, প্রদোষ দাশগুপ্ত কাজ করে গেছেন নিরবচ্ছিন্ন। কমিশনড বা অজুরার কাজ তিনি প্রায় করেন নি বললেই চলে। এমনকী নিজের সৃষ্টি বিক্রি করে জীবিকানির্বাহের প্রবণতাও কোনোদিন তাঁর ছিল না। তিনি কাজ করে গেছেন হৃদয়ের তাগিদে, ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৌদ্ধিক প্রেরণায়। বিশ্বের আধুনিকতার ধারায় ভারতীয়তার নতুন মাত্রা যোগ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাস্কর্যকে কালক্রমে ও ফর্ম বা রূপাবয়বের বিবর্তন অনুযায়ী কয়েকটি ধারায় ভাগ করে নেওয়া যায়।

প্রথম পর্যায়ে আনা যায় তাঁর পোর্ট্রেট বা মুখাবয়ব রচনার কাজগুলি। ১৯৩৬-এ করা 'কমলা' নামে তাঁর স্ত্রী কমলা দাশগুপ্তার মুখাবয়বটি এখনো আদর্শ পোর্ট্রেট বলে স্বীকৃত। এর মধ্যে ব্যক্তিকে যেমন চিনে নেওয়া যায়, তেমনি তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যও ফুটে ওঠে। মূল ধারাটা এখানে বাস্তববাদী রীতির। এর পরে তাঁর বিখ্যাত পোর্ট্রেটগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ১৯৪০-এ করা রবীন্দ্রনাথ, ১৯৪৩-এ তাঁর কন্যা 'বাচ্চু', ১৯৪৫-এ 'ডেভিস', ১৯৪৭-এ পরিতোষ সেনের মুখ, ১৯৫০-এ 'সাঁটুল গুপ্ত', ১৯৫২-তে 'হানস গ্লাস' ইত্যাদি। মুখাবয়বে চরিত্রটিকে আনাই তাঁর বড় উদ্দেশ্য। এজন্য নানা উপায় অবলম্বন করেছেন। যেমন 'সাঁটুল গুপ্ত'র কাজটিতে তাঁর কালো চশমাটিই চোখকে ঢেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। ১৯৫২-র পরে আর কোনো পোর্ট্রেট তিনি করেন নি। ১০০

১৯৪০-এ করা 'দ্য মাদার' কাজটির কথা আগে বলা হয়েছে। এই সময় থেকেই তিনি বাস্তবতাকে তার উপরিতল থেকে না দেখে তার অন্তর্লীন গভীরতর সত্যকে রূপাবয়বের অভিনবত্ব ও বৌদ্ধিক সমন্বয়, যাকে তিনি বলেন 'ইনটেলেকচুয়াল মিক্সিং', তার সাহায্যে রূপ দিতে চেষ্টা করেন। আয়তনময়তা তাঁর এই পর্যায়ের কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উত্তলতা বা কনভেকসিটি প্রাধান্য পায় অবতলতা বা কনকেভিটির থেকে। সমস্ত আবেগ ও শক্তি যেন সংহত হয়ে আছে এবং স্ফুরিত হয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু বিকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না। ধরা আছে এক কেন্দ্রগ শক্তিতে। দেশগত শূন্যতা, স্পেশিয়াল ভয়েড বা নেগেটিভ স্পেস-এর ব্যবহার খুবই কম এই পর্যায়ে। তলসংযোগের কৌণিকতা তো নেই-ই। তলগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বৃত্তীয় চাপের সাবলীলতায় মিলে যাচ্ছে। সংঘাত সৃষ্টি করছে না। এটাকে তিনি ভারতীয়তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলেও মনে করেন।

চল্লিশ দশকের এই কাজগুলোতে বিষয় উঠে আসছে অনেক সময়ই বাঙালির সাধারণ জীবনধারা থেকে। প্রাধান্য থাকছে বিশেষত নারী-অবয়বের। যেমন ১৯৪৪-এর 'গসিপ', ১৯৪৫-এর 'বাথিং উওম্যান', ১৯৪৬-এর 'ফার্স্ট বর্ন' বা ৯৩ 'প্রথম জাতক', ১৯৪৭-এর 'টয়লেট' বা প্রসাধন, ১৯৪৮-এর 'পিকিং লাইস' বা 'উকুন বাছা' ইত্যাদি। এর পাশাপাশি ৯০ এসে যাচ্ছে সেই সময়ের সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিফলনে সমৃদ্ধ কিছু কাজও। ১৯৪১-এর 'ওয়ার অ্যান্ড
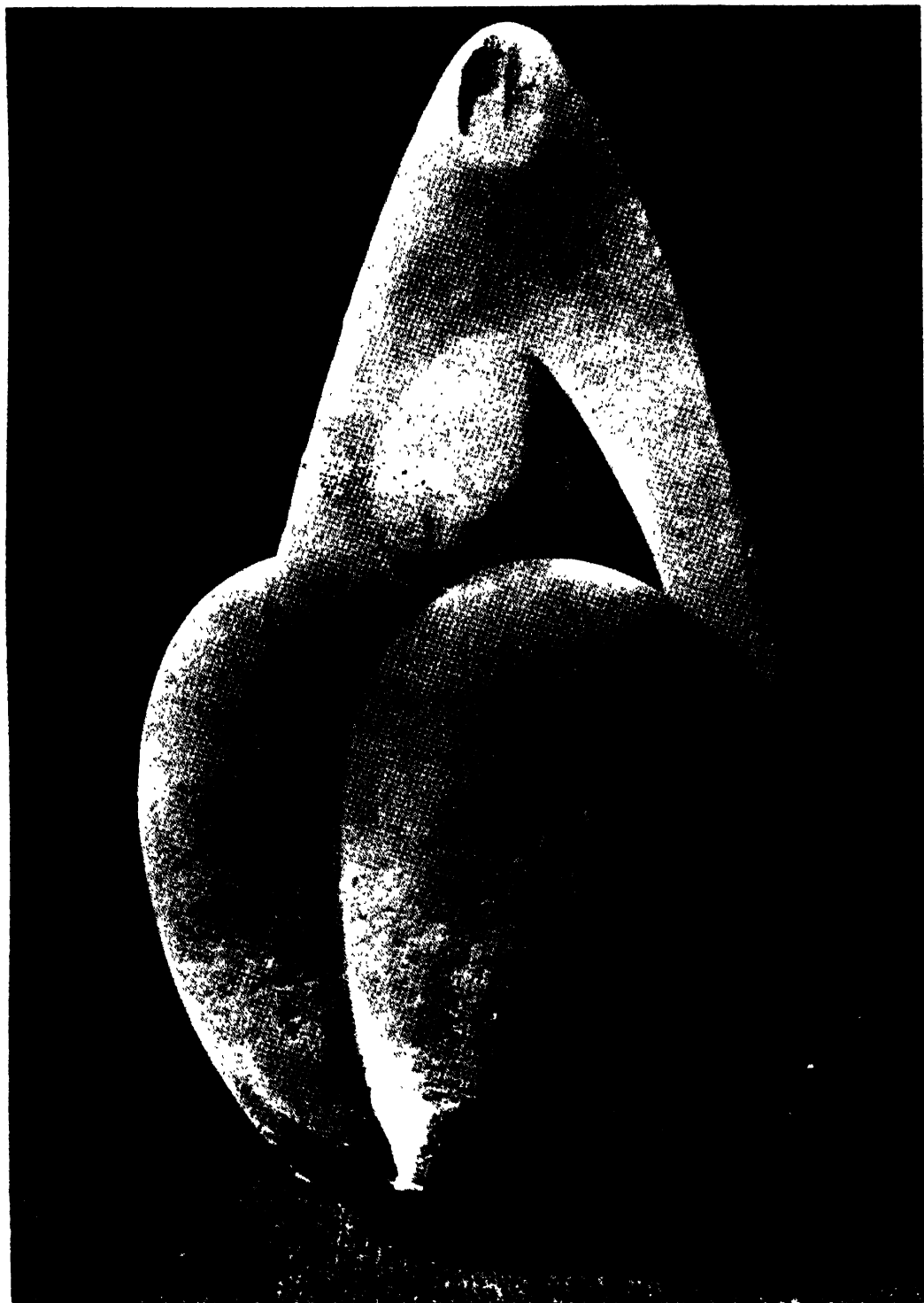
৯৮· প্রদোষ দাশগুপ্ত। এগ মাদার। প্লাস্টার। সত্তর দশক।

৯৯· প্রদোষ দাশগুপ্ত। ড্রয়িং।

হিউম্যানিটি', ১৯৪৩-এর 'ইন বনডেজ', ১৯৪৮-এর 'জয় হিন্দ' এইসব কাজ তাঁর সমাজসচেতনতারও দীপ্ত দৃষ্টান্ত। ৮৭
ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আপাত কৌতুককর বিষয়ও এসেছে। যেমন ১৯৪৩-এর 'মিস ব্যারেল'। সেই ৯১
সময় কলকাতায় চৌরঙ্গির দিকে ট্রামে যেতে যেতে একদিন এক অতি স্থূলকায়া মহিলাকে কুকুর নিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছিলেন। সেদিনই বাড়ি এসে শুরু করেছিলেন আয়তনময় শরীরের উপর ছোট্ট মাথা-বিশিষ্ট এক কৌতুকদীপ্ত নারী প্রতিমা।

পঞ্চাশ দশকের কাজেও আয়তনময়তার এই বৈশিষ্ট্য মূলত প্রাধান্য পায়। কিন্তু এর পাশাপাশি অবতলতা ও নঞর্থক আয়তন বা নেগেটিভ ভলিউমের সঞ্চারও ঘটতে থাকে ধীরে ধীরে। 'লুপ হোলস' নামে ১৯৫২-র একটি সিমেন্টের কাজ আছে। বিমর্ষ এক নারীর উপবিষ্টা মূর্তি। বেলনাকৃতির বা সিলিন্ড্রিক্যাল দেহটি মাথা থেকে বৃত্তাংশের মতো নীচের দিকে নেমে এসেছে, বাইরে উত্তল, ভেতরে অবতল রেখায়। পা দুটি হাঁটু পর্যন্ত উঠেছে বেলনের আয়তনময়তায়। কাঁধ থেকে হাত দুটি নেমে এসে হাঁটুর উপর ভর রেখে আবার গোল হয়ে উঠে গিয়ে স্থাপিত হয়েছে গালের উপর। ফলে বৃত্তের মতো দুটি লুপ সৃষ্টি হয়েছে। 'ট্রি আন্ড টুইগ' (সিমেন্ট, ১৯৫১) ও 'প্রাউড মাদার'-এ (সিমেন্ট, ১৯৫২) ফর্ম উঠে গেছে উপরের দিকে ক্ষীণ আয়তনে সুষমাময় অবতল বাঁক রচনা করতে করতে। এরই মধ্যে ১৯৫৪-র 'সিম্ফনি ইন কার্ভস' (সিমেন্ট) নামে একটি কাজে এক নতুন অনুভবের সঞ্চার দেখি। নারীর টরসো বা শরীরাংশ শায়িত অবস্থায় রয়েছে। দুটি পা হাঁটু পর্যন্ত আছে অবশ্য। বক্ষদ্বয়ের আয়তনময় উত্তলতা থেকে কোমর পর্যন্ত

১০০. প্রদোষ দাশগুপ্ত। সাটুল গুপ্ত। ব্রোঞ্জ। ১৯৫০।

সরু হয়ে এসেছে দেহ। তারপর আবার ক্রমান্বয়ে স্ফীত হতে হতে নাভিমূল অতিক্রম করে পূর্ণ স্ফীতিতে দুটি জানুর আয়তনময় বক্রতায় প্রবাহিত হয়ে গেছে। নারীর শরীরকে অবলম্বন করে সংহত করুণা যেন সাংগীতিক বিমূর্ততায় স্থির হয়ে আছে এখানে। মূর্তির সামান্য আভাসকে অবলম্বন করে বিমূর্ত ভাব অভিনব স্বাতন্ত্র্যে ফুটে উঠেছে। এই প্রতিমাকল্পের একটি সাংগীতিক সত্তা আছে। সংগীতকে দৃশ্যতায় রূপান্তরণের প্রথম দিককার দৃষ্টান্ত এটি।

এই ধরনের ফর্ম, অর্থাৎ নারীর শরীরকে সংহত সংগীত করে তোলা, এর পরেও বিভিন্ন সময় তাঁর কাজে এসেছে। কোথাও তা কারুণ্যে, কোথাও প্রশান্তিতে সঞ্জীবিত থেকেছে। ১৯৭০-এর 'ফলেন উওম্যান' (ব্রোঞ্জ,) ১৯৭৯-এর 'আনফোল্ডিং অব স্প্রিং' এর দুটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত।

রূপাবয়বের বিবর্তনের দিক থেকে এর পরবর্তী পর্যায়টি হচ্ছে গোলক বা ডিম্বাকৃতির আবির্ভাব। সেদিকে যাওয়ার আগে আমরা শিল্পীর নিজের কথায় শুনে নিতে পাবি রূপের বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা। তিনি বলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেতনা ও ব্যক্তিত্বও বিবর্তিত হচ্ছে। তার ক্রমোন্নতি ঘটছে। স্বভাবতই প্রকাশভঙ্গিতেও বিবর্তন আসছে।

"সুতরাং আমি একথা বলছি না ১৯৪৩-এ যে আমার মেয়ের মুখটা ('বাচ্চু') করেছিলাম সেটা খারাপ কাজ; ঐ

স্ট্যান্ডার্ডে ওটা খুব ভাল কাজ, ওটা চিরন্তন, ওটা বেঁচে থাকবে অ্যাজ আ পিস অব হেড। কিন্তু ঐটাই ত শেষ কথা নয়। এখন আমি যেটা বললাম, আমি যত বাড়ছি, আমার চিন্তাধারা তত বেড়ে যাচ্ছে, ভাবনাটা বেড়ে যাচ্ছে। বিশ্বের অনেক জায়গায় ঘুরেছি, কত কাজ দেখেছি, মিশরীয়, আসিরীয় চৈনিক ইত্যাদি। এখন আর একটা জিনিশ মনে রাখি সব সময়, আমি ভারতীয়, ভারতে আমার জন্ম... যাই কিছু করি, আমাদের নিজস্ব একটা অভিব্যক্তি আছে, নিজস্ব একটা আইডেনটিটি আছে। এটা আমি কনসাসলি ফলো করবার চেষ্টা করি। কারণ ওটাতেই আমার আইডেনটিটি, ওটাতেই আমার এক্সপ্রেশন, ওটাতেই আমি। আই মাস্ট ট্রাই টু অ্যাসিমিলেট টু এনবিচ মাই একসিসটেন্স, মাই ফ্যাকালটি অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইনটেলেকচুয়াল প্যাটার্ন।... আমি যে কাজটা করছি পশ্চাতের দিকে তাকিয়ে, নিজস্ব ভূমিতে দাঁড়িয়ে, ভবিষ্যতের দিকে বিচার করে। আমার কাজে ওইটাই হচ্ছে মূল কথা।... ফর্মের এভলিউশন মানে ইনটেলেকচুয়াল মিক্সিং। ফর্ম ইজ এসেনশিয়ালি স্ট্যাটিক। আমি একটা সিলিন্ডার, একটা স্ফিয়ার, একটা কোন-এর (Cone) বাইরে যেতে পারছি না। জিওমেট্রিক ফর্মে বাঁধা। সুতরাং এর বাইরে তো আমি যেতে পারছি না। আমি বেছে নিয়েছি স্ফেরিক্যাল ও সিলিন্ড্রিক্যাল ফর্ম। কেন? আমার ঐতিহ্য সেকথা বলছে। ওই যে আগে বললাম মার্জিং প্লেনস, মুভমেন্ট, কাইনেটিক মুভমেন্ট। সেজন্য আমি কিউবে যাচ্ছি না, কোন বা শঙ্কুতে যাচ্ছি না। স্ফেরিক্যাল ও সিলিন্ড্রিক্যাল—আমার যা কিছু কাজ সবই এর মধ্যে। এখন এই ফর্মকে আমি ভেঙে দরকার হলে টুকরো টুকরো সাজিয়ে নতুন ফর্ম তৈরি করতে পারি। কিন্তু মূলত সেটা একটা সিলিন্ডার।"

ডিম্বাকৃতি রূপের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল অনেক আগেই। ১৯৪৮-এ 'রিমোর্স অব এ্যান এগ' নামে একটি কাজ করেছিলেন। তাঁর মতে ডিম্বাকৃতি নিয়ে সেটাই ছিল প্রথম পরীক্ষা। (সূত্র: ১৯৭৩-এর মার্চে বম্বের তাজ আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত তাঁর একক প্রদর্শনীর পরিচিতিপত্রে তাঁর লেখা ভূমিকা) তারপর সত্তরের দশকে এই ডিম্বাকৃতির রূপবন্ধ সম্পূর্ণ এক দর্শনগত ভিত্তি থেকে উঠে আসে তাঁর কাজে। ডিম্বাকৃতির বাইরের কঠিন আবরণের গড়ন এবং তার ভিতরের সংস্থিত শক্তির ভারসাম্য, ছন্দ ও গতির শিল্পিত ভাষায় নানা রূপ নিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। আমরা আগে দেখেছি, এর মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি। 'ব্রহ্মাণ্ড' কথাটির দর্শনগত স্ফুরণ। তাঁর

১০১ প্রদোষ দাশগুপ্ত। আনফোল্ডিং অব স্প্রিং। ব্রোঞ্জ ১৯৭৯।

মতে ব্রাকুসি বা জাঁ আর্পের ডিম্বাকৃতির যে দর্শন তা ভারতীয় দর্শন থেকেই আহৃত। সেদিক থেকে তাঁর নিজের কাজ কোনোক্রমেই পাশ্চাত্য আধুনিকতার অনুরণন নয়, বরং একই তত্ত্ববিশ্বের দ্বিমুখী প্রকাশ।

সত্তরের দশকে আমরা পাই এরকম অজস্র কাজ। কয়েকটিরই মাত্র উল্লেখ করা যায়। যেমন ১৯৭১-এর 'জেনেসিস-১', ডিম্বাকৃতি থেকে একটি অংশ কেটে নিয়ে গড়া, 'ফ্রুটফুল কিস', বেলন (সিলিন্ডার), গোলক (স্কিয়ার) ও ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট চারটি অংশ একত্রিত করে তৈরি, 'এগ বার্ড'—ডিম্বাকৃতি পাচ্ছে পাখির অবয়ব, ১৯৭২-এ পাই ৯৪ 'রিক্লাইনিং এগস' আবার 'এগ বার্ড', ১৯৭৩-এ 'এগ-ব্রাইড'—ডিম্বাকৃতি থেকে একটি অংশ কেটে নিয়ে হাঁটুমোড়া দুই পায়ের গড়ন আনা হয়েছে, ত্রিকোণ পিরামিড উপর দিকে যুক্ত করে আনা হয়েছে নাক বা মুখের আভাস। বর্তুল ও ৯৬ আলম্ব সমতলতার মধ্যে সুন্দর সংহতি ও সমন্বয় এখানে। ১৯৪৭-এর 'রিমোর্স'-এ শুভ্র পাথরের গোলকাকৃতিতে নারীর অবয়বের সামান্য আদল এনে এক সংক্ষুব্ধ করুণার মূর্ত রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরকম অজস্র রূপ সৃষ্টি করেছেন শিল্পী গোলক ও ডিম্বাকৃতি থেকে। কখনো সম্পূর্ণ বিমূর্ততার দিকে যান নি। মানবিক প্রতিমার সঙ্গে সংযোগ রেখে রূপাবয়বকে দর্শন বা ভাবে উত্তীর্ণ করেছেন।

একেবারে শেষ পর্বে তিনি পৌঁছেছেন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। ভাস্কর্য যেন স্থাপত্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, আবার স্থাপত্যই ভাস্কর্য হয়ে উঠছে। এই দুইয়ের নিকট সম্পর্ক আগে ছিল আমাদের দেশে। মন্দিরগাত্রে স্থাপত্যকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠত ভাস্কর্য। আধুনিক যুগে এই দুইয়ের নিকট সম্পর্ক অবহেলিত। তিনি চাইছেন সেটাকেই ফিরিয়ে আনতে। 'ম্যাটারনিটি' বলে একটা কাজ আছে, মন্দিরের ধারণা থেকে গড়া, মা বসে আছে ছেলে কোলে করে। মন্দিরের গর্ভগৃহের গড়ন দেওয়া হয়েছে। শিবলিঙ্গের সঙ্গে সাযুজ্য এসেছে। 'কুইন বিল্যার্কসিং' বলে ১৯৯৩-এর কাজটিতে সমস্ত শরীরটি একটি সিংহাসনের মতো। সিংহাসন এখানে স্থাপত্যের অঙ্গ। সিংহাসন ও রানী এক হয়ে গেছে।

তাঁর প্রায় আশি বছরের জীবনে, প্রায় ষাট বছরের ব্যাপ্ত যে শিল্পের অভিজ্ঞতা, তা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে, গ্রহণ-বর্জন ও আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে তাঁর ভাস্কর্যকে যেখানে পৌঁছে দিয়েছে, জীবনের ধ্যানমগ্ন আলোকিত এক উত্থান সেখানে আমরা অনুভব করি। এরই দৃষ্টান্ত হিশেবে যে কোনো দুটি কাজ যদি বেছে নিতে হয়, তাহলে বলব, ১৯৭০-এর 'ব্রোকেন আইডল' এবং ১৯৮০-র 'সূর্যমুখী' এই দুটি ভাস্কর্যের কথা। প্রথমটিতে বসে আছে এক নারী ৮৯ প্রতিমা, ক্ষীণকায়া দীর্ঘায়ত হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। যেন আকাশের অভীপ্সা সেখানে, সেই শীর্ণ, জ্যোৎস্নার মতো দীপ্যমান উত্তরণে। আর 'সূর্যমুখী'-ও শায়িতা এক নারী, উর্ধ্বমুখী। স্বর্ণাভ হলুদ তার রং। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন ফুটন্ত সূর্যমুখীর সৌন্দর্য দেখে তাকে নারীর প্রতিমায় ধরেছেন শিল্পী। এই মাটির পৃথিবীতে স্থিত থেকে শরীরের ভিত্তিতে মানবিক সত্তা অলৌকিকের ধ্যানে আলোকিত হয়ে উঠছে, মানবতার এই মহনীয়তাকেই রূপবদ্ধ করতে পেরেছেন প্রদোষ দাশগুপ্ত।

তাঁর কাজের উৎস থেকে আমাদের আধুনিক ভাস্কর্যে একটি ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে যাকে বলা যায় ভারতীয়তায় অন্বিত প্রজ্ঞাদীপ্ত ধ্রুপদী অন্বেষণ।

চিন্তামণি করের ভাস্কর্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব

এক

'সবিতা ও উষা'

"এক সময়ে লিখেছিলাম যে সত্যি কথা বলাই হলো কবিতার একমাত্র কাজ। যথার্থ কবিতার স্বরূপ বলতে এইটেকেই বুঝি আমি এখনো। কিন্তু সত্যি কথা যে কাকে বলে, সেই নিয়েই মুশকিল। আমাদের একটা ব্যক্তিগত সত্য আছে, সমাজের সত্য আছে, গোটা জীবনেরও কোনো সত্য প্রচ্ছন্ন আছে কোথাও। তিনদিক থেকে এসে কোনো-এক বিন্দুতে এদের সংঘর্ষ হয় একটা, আর সেটাই হয়ে ওঠে কবিতার সত্যের মুহূর্ত।"— কথাগুলো বলেছিলেন এক সাক্ষাৎকারে কবি শঙ্খ ঘোষ। ('ক্ষুধার্ত', নভেম্বর ১৯৮১, 'অনুষ্টুপ' শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সংখ্যায় [১৯৯৪] পুনর্মুদ্রিত) কবিতার সত্য বা স্বরূপ সম্পর্কে যে এক ইঙ্গিত ধরা থাকে এই উচ্চারণে, তাকে কি প্রসারিত করা যায় শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রেও?

আপাতত আমাদের আলোচ্য এই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন প্রবীণ ভাস্করের কাজ। এ পর্যন্ত (এই লেখার সময় পর্যন্ত, ১৯৯৪) সৃষ্ট বা বলা ভালো আমাদের দেখা তাঁর শেষতম ভাস্কর্যটি অনুধাবনের চেষ্টার মধ্য দিয়েই শুরু হতে পারে তাঁর সৃষ্টির সমগ্রতার দিকে পদক্ষেপের সূচনা।

'সবিতা ও উষা' নামে ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যটি শেষ করেছিলেন চিন্তামণি কর ১৯৯৩-তে। এই বছরেরই শেষ দিকে বিড়লা অ্যাকাডেমি এটি দেখানোর ব্যবস্থা করে। অ্যাকাডেমির মূল ভবনের পাশের মুক্ত অঙ্গনে দিন দশেকের জন্য আয়োজিত হয় এই একটি কাজ নিয়েই একটি প্রদর্শনী। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন শিল্পী স্বয়ং।

সবিতা ও উষা এক পুরুষ ও এক নারী মূর্তির সমাহার। নৃত্যের বা সাংগীতিক ছন্দে সমাহৃত এই দুই পূর্ণাবয়ব মূর্তি তাদের দৃশ্যমান স্থিরতার মধ্যে আলোকিত জঙ্গমতার দ্যোতনা আনছে। সবিতা বা পুরুষ মূর্তিটি উপবিষ্ট ভঙ্গিতে তার দুটি হাত তীর্যকভাবে দুদিকে প্রসারিত করে সামনে অনন্ত শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি স্বভাবতই বলে দেয় এ শূন্যতা শূন্য নয় মোটেই, বরং হিরণ্যগর্ভ এক দ্যুতিতে স্পন্দমান। সেই দ্যুতির আভা লেগেছে যেন তার মুখে, শরীরে। সমগ্র ভাস্কর্যটিকেই যেন বাঙ্ময় করেছে তা।

তার প্রসারিত দক্ষিণ বাহুর করপল্লব উত্তোলিত ও বিস্তারিত ডান পায়ের আঙুল স্পর্শ করেছে। ফলে এই অংশে একটি ত্রিভুজ-প্রতিম শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই ত্রিকোণিক শূন্যতা সাযুজ্য রচনা করে ঊর্ধ্বাংশের অনুরূপ এক শূন্যতার ক্ষেত্রের সঙ্গে, উষার উত্তোলিত দুই হাত, করধৃত আলোকরশ্মিরূপী বৃত্ত ও মস্তকশীর্ষের অন্তর্বর্তী অংশ অনেকটা চতুষ্কোণিক যে ক্ষেত্র রচনা করে।

সবিতাকে সামনে রেখে পেছনে দণ্ডায়মানা উষা। নগ্নিকা এই নারী মূর্তির ডান পা-টি তীর্যকভাবে প্রসারিত হয়ে পুরুষের দক্ষিণ বাহুর সমান্তরালে অবস্থান করছে। বাঁ পা জানু-সন্ধি থেকে ভেঙে গিয়ে নিম্নাংশ অনুভূমিকভাবে বিন্যস্ত হয়ে ডান পায়ের মধ্যবর্তী অংশে এসে মিলেছে। ফলে সেখানেও সৃষ্টি হয়েছে একটি ত্রিভুজ। এই নারীর দেহ ঊর্ধ্বে প্রসারিত। প্রদীপ্ত এক গতিভঙ্গিতে হাতদুটিও আলম্বভাবে উঠে গেছে মাথা ছাড়িয়ে। ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত সেই দুই করপল্লবে ধরা আছে স্বর্ণাভ একটি বৃত্ত, উষার হিরণ্যপ্রভার প্রতীকস্বরূপ যেন, তার প্রান্তরেখা ঘিরে সমান দূরত্বে অগ্নিশিখার প্রতিরূপ আভাসিত ধাতুপুঞ্জের বিন্যাসে।

১০২· *চিন্তামণি কর। সবিতা ও উষা। ব্রোঞ্জ। ১৯৯৩।*

সম্পূর্ণ মূর্তিটির রচনাবিন্যাসে কয়েকটি কল্পনাঋদ্ধ ত্রিভুজ যেমন তৈরি হয়েছে যার মধ্য দিয়ে শূন্যতা বা বাতাসের সঞ্চরমানতায় অবয়বের বস্তুপুঞ্জ ছন্দে স্পন্দিত হয়, তেমনি গড়ে উঠেছে অনুপম কয়েকটি বক্রতলও। উষার শরীরের বিন্যাস উত্তোলিত হাতের উর্ধ্ব-বিন্দু থেকে পায়ের নিম্নতম বিন্দু পর্যন্ত এক সুঠাম বৃত্তাংশ রচনা করে। সেটাই ভিন্ন এক তলে মিশে যায় সবিতার প্রসারিত দক্ষিণ বাহুর সঙ্গেও। এপাশে বক্রতার যে সাবলীল ছন্দ, এর যে কৌণিক ব্যাপ্তি, অন্য প্রান্তে দুটি রেখার সংযুক্তির কৌণিকতা, সবিতার বাম বাহু ও উষার বাম জানুর দুই ভিন্নমুখী সঞ্চলন সৃষ্টি করে যে কোণ, তার তীক্ষ্ণতা, পারস্পরিক বৈপরীত্যে পরস্পরকে উদ্ভাসিত করে তোলে। আবার আর একটি বৃত্তীয় বক্রতল রচিত হয় ভূমি স্পর্শ করে সবিতার শরীরের নিম্নাংশে আবর্তিত হয়েছে যে উত্তরীয় বা বস্ত্রখণ্ডের প্রতিরূপময় বস্তুপুঞ্জ তার গতিময়তায়। অন্যপ্রান্তে একেবারে উপরে উষার দুটি হাতে ধরা থাকে একটি পূর্ণ বৃত্ত।

এভাবে রচনাবিন্যাসের জ্যামিতির দিকে তাকালে আমরা সুষমায় সংস্থিত বিচ্ছুরিত কিছু সরলরেখার কৌণিক সংহতি যেমন দেখি, তেমনি সেই সংহতি থেকেই সৃষ্টি হতে দেখি কিছু ত্রিভুজ যাদের কৌণিকতা বৃত্ত বা বৃত্তাংশের সঙ্গে এক বিপ্রতীপ ছন্দে স্পন্দিত হয়। আবার সম্পূর্ণ অবয়ব উপর থেকে যেভাবে নীচে নেমে আসছে তাতে থাকে

যেন খানিকটা পিরামিডীয় বিন্যাসের আদল। অথচ উৎক্ষিপ্ত সরলরেখা ধরে এগোলে পাচ দিকে বিকীর্ণ আলোকরাশি নিয়ে সমাহৃত এক তারার সাযুজ্যই যেন পেয়ে যেতে চায়। পুরুষ ও নারী দুটি শরীরেই সংহত থাকে আয়তনিক পূর্ণতা। সে পূর্ণতা আলোক-আভাতেই স্ফুরিত হয়। পুরুষ মাধ্যাকর্ষণে স্থিত, প্রোথিত যেন পৃথিবীপৃষ্ঠে আর নারী সেই পার্থিবতায় সংলগ্ন থেকেও বিচ্ছুরিত হতে চাইছে আলোর অমেয় বিভায়।

এর মধ্যে অনেকটাই অলৌকিকতা আছে। মূর্তিদ্বয়ের অবয়ব বিন্যাস যেভাবে গতির দ্যোতনা আনছে, সেই গতি এক বিমূর্ত প্রত্যয়। প্রবাহিত সময়ের মধ্য দিয়ে অন্ধকার আলোকের দিকে উত্তীর্ণ হয়। সেই আলোর আগমনবার্তা সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিতে ধ্যান-গম্ভীর এক সুরের অনুরণন তোলে। জঙ্গমতায় ধৃত এই বিমূর্ত অনুরণনকেই যেন রূপ দিতে চাইছেন শিল্পী। এই রূপায়ণের আধার হিশেবে যে প্রতিমা-বিন্যাস এখানে, তা অনুপুঙ্খ স্বাভাবিকতায় সংস্থিত। উষা বা সবিতার মধ্যে এক প্রাকৃত পুরুষ ও নারীর অবয়ব দেখি আমরা। কেবল বিন্যাসের জ্যামিতি তাদের মূর্তির স্থবিরতা থেকে ভাবগত জঙ্গমতার দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। তাদের শরীরী অস্তিত্বকে বিমূর্ত প্রত্যয়ে রূপান্তরিত করতে চাইছে। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়াটা খুব দুরূহ। এর সফলতার উপরই যে কোনো শিল্পের নান্দনিক উত্তরণ নির্ভর করে। এই ভাস্কর্যটিতে সেই উত্তরণ কতটা সফল, সেটা ভাবা যেতে পারে।

পাশ্চাত্য ভাস্কর্যের স্বর্ণযুগে বিশেষত গ্রিক ভাস্কর্যে আমরা দেখি মানুষের শরীরের শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্যের নিপুণ উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই তাঁরা গড়ে তুলতেন দেবতার প্রতিরূপ। অ্যাপোলো বা ভেনাস মানুষেরই আদর্শায়িত সৌন্দর্যের সংহত রূপ। সনাতন ভারতীয় ভাস্কর্যেও মানুষের অবয়বের মধ্য দিয়েই ঘটে দেবতার উপস্থাপনা। কিন্তু সেখানে শরীরের পার্থিবতা দ্রবীভূত হয়ে যায় বিশেষ এক ছন্দের বিন্যাসে। গ্রিক ভাস্কর্যে পার্থিবতাই আদর্শায়িত হয়ে স্বর্গের প্রতিরূপ গড়ে তোলে। ভারতীয় ভাস্কর এই পার্থিবতাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েও একেই জীবনের বা সত্তার একমাত্র বা শেষ সত্য বলে গ্রহণ করেন না। বরং পার্থিবতাই তাঁদের কাছে এক প্রকৃষ্ট প্রস্থান-বিন্দু, যাকে তাঁরা অলৌকিকে উত্তীর্ণ করে নেন।

২৮
৩০
১

আমাদের আলোচ্য শিল্পী চিন্তামণি কর নিজেই এই সত্যটিকে খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'ইন্ডিয়ান মেটাল স্কাল্পচার' নামে ১৯৫২-তে প্রকাশিত বইটিতে। সেখানে তিনি বলছেন: ভারতীয় ভাস্কর্যে মানুষী রূপের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির এই যে ছন্দিত প্রকাশের আদর্শ এটা মানুষের অবয়বের বা রক্ত-মাংসের স্বাভাবিক সংবেদনময় আবেদনের প্রতি বিরূপতা থেকে সৃষ্টি হয় নি। পার্থিব রূপাবয়বের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও মহাজাগতিক সত্যের সমন্বয় প্রয়াস থেকেই স্বতোপ্রণোদিতভাবে এর উদ্ভব। তাঁর নিজের ভাষায়: "This ideal of the harmonious embodiment of nature in human form did not result from an aversion of the sculptor from flesh or from the natural sensuous appeal in human figure. It was adopted deliberately in an attempt to fuse the material form with the spiritual and cosmic world." কাজেই ভারতীয় ভাস্কর তাৎক্ষণিক বাস্তবতাকে অলৌকিকের দিকে নিয়ে যান। আধ্যাত্মিক ও মহাজাগতিক সত্যের প্রতিফলন ঘটান এই বাস্তব শরীরে এক অপার্থিব ছন্দের দ্যোতনা এনে।

চিন্তামণি কর 'সবিতা ও উষা' ভাস্কর্যটিতে সেরকমই এক উত্তরণ আনতে চেয়েছিলেন। মূর্তিটির উপস্থাপনা, এর ছন্দ ও জ্যামিতি আমাদের সেরকমই ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু এই প্রত্যাশা নিয়ে দেখতে গেলে আমরা কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হই। এখানে নগ্ন ও নগ্নিকা যে মানব ও মানবীর উপস্থাপনা তাদের শরীর বিন্যাস ও অভিব্যক্তি এতই পার্থিব, এতই স্বাভাবিকতায় সংলগ্ন, যে রচনার দীপ্ত জ্যামিতিও সেই পার্থিবতাকে অলৌকিকে অভিষিক্ত করতে পারে না। ফলে এখানে আমরা পরস্পর বিপরীতমুখী এক দ্বৈতের সংঘাত অনুভব করি। ছন্দের বিন্যাস যখন অলৌকিকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাচ্ছে, শারীরিকতার ভার তখন ব্যাহত করছে সেই অপার্থিবতাকে। ফলে এই ভাস্কর্য সমস্ত দক্ষতা, করণকৌশল ও বোধের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেও প্রার্থিত অভিঘাত আনতে পারে না আমাদের নন্দন চেতনায়।

শুরুতে উদ্ধৃত কবিতার তিন সত্যের সংঘর্ষের প্রসঙ্গটিকে মনে রেখে এই ভাস্কর্যটির দিকে তাকালে আমরা অনুমান করতে পারি হয়তো সেরকম এক সংঘর্ষের মুহূর্তই শিল্পীর মনে জাগিয়ে তুলেছিল এই ভাস্কর্যটিরও বীজ। শিল্পের ক্ষেত্রে ফর্ম বা রূপাবয়বই ধরে রাখে সেই সত্যের স্বরূপ। ব্যক্তিগত, সমাজগত ও চিরন্তনতার রূপবিন্যাস মিলেও যেতে দেখি অনেক সফল সৃষ্টিতে। কিন্তু এই কাজটিতে সেই সংঘাত যেন সমীকৃত হয় না, বরং পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে যায়।

অনেকটা একই বিষয় নিয়ে অনেক আগে আরো একটি ভাস্কর্য করেছিলেন চিন্তামণি কর। ১৯৫২-তে ভিট্রিফায়েড ১০৩ টেরাকোটায় করা সেই কাজটির নাম 'উষা ও সবিতার'। আয়তনে অনেক ছোট (৪৫ সেমি দৈর্ঘ্য) কাজটিতে কিন্তু অনেক সংবেদনময় পার্থিবতারই প্রাধান্য। রচনাবিন্যাস এখানে অনুভূমিক। শরীরের সম্মুখভাগ নীচের দিকে রেখে ভাসন্ত বা উড়ন্ত ভঙ্গিতে অবস্থান করছে সবিতা। আর তার পিঠের উপর পিঠ রেখে উর্ধ্বমুখে শায়িতা উষা। সবিতার দুই পায়ের অন্তর্বর্তী চতুষ্কোণিক শূন্যতা এবং উষার ভাজ করা বাঁ পা থেকে সৃষ্ট ত্রিকোণিক শূন্যতা মধ্যবর্তী দুটি দেহের বস্তুপুঞ্জে নির্ভারতা ও উড়ন্ত গতির দ্যোতনা আনে। উষার শরীরের উত্তল বক্রতায় বিন্যস্ত সংবেদনময়তা সবিতার কোটরস্থিত চক্ষুর ফ্যান্টাসি বা কল্পরূপের সঙ্গে ভারসাম্যের সৃষ্টি করে। এখানে গতি ও জ্যামিতি পার্থিবতাকেই এত মহনীয় করে তোলে যে তাতে কোনো অলৌকিকের অভীপ্সা এর রস গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে না। এর ফলে কাজটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নান্দনিকতায় উত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

শারীরিকভাবে প্রগাঢ় সংবেদনও যে প্রতীকী তাৎপর্যে শিল্প-সুষমায় মহনীয় হয়ে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্ত এই শিল্পীরই চারটি ঋতু বিষয়ক ভাস্কর্য। 'সবিতা ও উষা'-র উদ্বোধনের দিনই জানিয়েছিলেন শিল্পী— 'সবিতা ও উষা'-কে মাঝখানে রেখে রেণুকূটে একটি বাগানে চারপাশে অবস্থান করবে 'গ্রীষ্ম', 'বর্ষা', 'শীত' ও 'বসন্ত' এই চারটি ঋতুর রূপায়ণ। সেদিক থেকে এই পাঁচটি ভাস্কর্য পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

১০৮ এই চারটি ঋতুর যে কোনো একটিকে একটু নিবিষ্টভাবে দেখলেই এর মূল বৈশিষ্ট্য আমরা কিছুটা অনুধাবন করতে পারি। 'গ্রীষ্ম'-টি প্রথম তৈরি হয়েছিল ১৯৮৫ সালে প্লাস্টারে। এর উচ্চতা ছিল ১২৭ সেমি। পরে এটি ব্রোঞ্জে রূপান্তরিত হয়। 'গ্রীষ্ম' আসলে এক উপবিষ্টা নিরাভরণ নগ্নিকা যুবতীর প্রতীকী উপস্থাপনা। তার বাম করপল্লব মাথার উপর স্থাপিত। ডান হাতে সে ধরে আছে কেশগুচ্ছ। এই নারীর বসার ভঙ্গিতে সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলি জ্যামিতিক শূন্যতা। শরীরের বস্তুপুঞ্জের সংবেদনময় উত্তলতায় তাদের যে নিবিড় আততি তাকে শিল্পী ব্যবহার করতে পেরেছেন খুবই কল্পনাদীপ্তভাবে যেমন তিনি করেন তাঁর অন্যান্য ভাস্কর্যে। এই গ্রীষ্মরূপী নারীতে সংবেদনের প্রগাঢ়তা পার্থিবতাকে ছাড়িয়ে গভীরতর কোনো অলৌকিকের তাৎপর্যে অন্বিত হয় না. প্রাথমিকভাবে এই অতৃপ্তি কাজ করলেও ক্রমে ক্রমে আমরা মেনে নিতে পারি অনুপুঙ্খ স্বাভাবিকতা-সঞ্জাত পার্থিবতাও নান্দনিক তাৎপর্যে উত্তীর্ণ হতে পারে লৌকিকের গণ্ডিতে অবস্থান করেই। এই চারটি ঋতু-ভাস্কর্য সেই সফলতারই দৃষ্টান্ত।

'সবিতা ও উষা'-য় আমরা দেখেছি অলৌকিক ও লৌকিকের দ্বন্দ্ব। আবার চারটি ঋতু-ভাস্কর্যে পার্থিবতারই জয় ঘোষণা। আবার পার্থিবতাকে সম্পূর্ণভাবে দ্রবীভূত করে ধ্যানের বিমূর্ততায় অলৌকিককে রূপ দেওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে ১১০ চিন্তামণি করের ভাস্কর্যে— ১৯৬২-তে করা অ্যালুমিনিয়ামের 'বুদ্ধ' রূপায়ণটি (৯১ সেমি উচ্চতা) যেমন।

এটি কোনো বিমূর্ত ভাস্কর্য নয়। মানবিক শরীরই এর বিষয়। কিন্তু শরীরের অনুপুঙ্খ বর্ণনা এখানে নেই। এমনকী, নাক মুখ চোখের বিন্যাসে ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিচয়ও লুপ্ত। কিন্তু সমগ্র অবয়ব-সংস্থান, তার জ্যামিতি, বস্তুপুঞ্জের জমাট পূর্ণতার মধ্যেও অভিকর্ষকে অতিক্রম করে আকাশের ব্যাপ্তিতে উড্ডীন হওয়ার প্রবণতা এর মধ্যে এক অলৌকিকের আলোকশিখাকে দীপ্যমান রাখে। পদ্মাসনে বসে আছেন বুদ্ধ। কতকগুলি রেখা সাবলীল ছন্দে ঋজুতায় ও বক্রতায় দেহকাণ্ডকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে গেছে। শুধু দেহ-ঘেরের রেখাই নয়। শরীরের মধ্যবর্তী অংশেও রেখা সৃষ্টি করেছে বিশিষ্ট জ্যামিতি. যেমন গলার কাছে বৃত্ত. বুকের কাছে সমকোণে অবস্থিত দুটি রেখা ছেদ করেছে কোলের কাছের বৃত্তাংশকে। সমগ্র পূর্ণতাময় বস্তুপুঞ্জের মধ্যে একটিই মাত্র শূন্যস্থান খুবই শিল্পিতভাবে সৃষ্ট হয়েছে ডান বাহুর সঙ্গে শরীর-সংস্থানের মধ্যবর্তী অংশে। সব মিলে শরীরকে দ্রবীভূত করে জেগে থাকে এক আধ্যাত্মিক প্রশান্তির বিভা।

এই আধ্যাত্মিকতা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ধ্রুপদী চেতনার প্রকাশ। কিন্তু রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য এখানে এমনই যে তা এক আধুনিকতার মূল্যমানে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

চিন্তামণি করের ভাস্কর্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই উপরের আলোচনা থেকে। প্রথমটি ধ্রুপদী বা লৌকিক ভারতীয়তাকে সাম্প্রতিকের মূল্যমানে আধুনিকতায় অন্বিত করে নেওয়ার প্রয়াস, 'বুদ্ধ' মূর্তিটিতে রয়েছে যার দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়টি পাশ্চাত্য ধ্রুপদী রীতি অনুসারী অনুপুঙ্খ স্বাভাবিকতার রূপায়ণ, ঋতু ভাস্কর্যগুলিতে রয়েছে যার পরিচয়। এই ধ্রুপদী বোধ রদাঁ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে তারও পরে যেভাবে মানুষী অবয়বকে দ্রবীভূত করে এক সাংগীতিক ছন্দে উত্তীর্ণ হয়েছে রূপাবয়বের মধ্য দিয়ে জীবনের অন্তর্লীন সেই ছন্দটিকে নানাভাবে ধরার চেষ্টাও তাঁর অজস্র ভাস্কর্যে ফিরে ফিরে

১০৩· চিন্তামণি কর। উষা ও সবিতার। ভিট্রিফায়েড টেরাকোটা। ১৯৫২।

আসে। একদিকে ভারতীয় উত্তরাধিকারকে আত্মস্থ করার প্রয়াস, অন্যদিকে পাশ্চাত্য আধুনিকতা আত্তীকরণ, এই দুই প্রবণতার সংঘাত থেকেই আমরা পাই তাঁর ভাস্কর্যে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য যেখানে এই দুটি প্রকাশভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় চলে বা এক সংঘাত সৃষ্টি হয়। 'সবিতা ও উষা'-য় আমরা অনুভব করি সেরকমই এক সংঘাত।

এই ত্রিমুখী বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি সাধারণ ঐক্য লক্ষ করা যায় তাঁর কাজের সামগ্রিকতায়। এক প্রশান্ত ধ্রুপদী চেতনারই প্রাধান্য সেখানে। এক পূর্ণতার বোধ, এক সাংগীতিক সুষমার মধ্য দিয়ে জীবনের ধ্রুবত্বের দিকটিকেই তিনি প্রধানত রূপ দিয়েছেন। আধুনিকতার যে অন্য একটি মাত্রা যেখানে জীবনের ক্ষয়, ক্লিন্নতা, অন্ধকার প্রগাঢ় ছায়া বিস্তার করে, সেদিকটা তাঁর ভাস্কর্যে ধরা পড়ে খুব কমই। তবু ধরা পড়ে না একেবারে, তা নয়।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই মূল্যবোধের যে টানাপোড়েন চলছিল আমাদের ভাস্কর্যের আধুনিকতার সূচনা পর্ব থেকে সেই দোলাচলই আমরা দেখতে পাই তাঁর সামগ্রিক ভাস্কর্যে। 'সবিতা ও উষা' সেই সংঘাতেরই দৃষ্টান্ত। সেদিক থেকে তাঁর সন্ধানের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতার সারাৎসারটি যেন ধরা থাকে এই কাজটিতে।

ব্যক্তি, সমাজ ও গোটা জীবন, সত্যের এই তিনটি স্বরূপ একটি বিন্দুতে মিলে যেতে চায় কবিতার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি অন্যান্য শিল্পেও। কিন্তু শিল্পের স্বরূপ অনুযায়ী সত্যের এক একটি দিক গুরুত্ব পেতে পারে এক একটি শিল্পের ক্ষেত্রে। ভাস্কর্যে তাৎক্ষণিক সমাজ সত্য যে অপাংক্তেয় থেকে যায় তা কখনোই নয়। রামকিঙ্কর, মীরা মুখার্জি বা সোমনাথ হোরের মতো ভাস্করের দৃষ্টান্তে আমরা জানি সমাজ সত্যের প্রগাঢ় প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে সত্যের তিনটি স্বরূপই কেমন করে মিলেও যায়। চিন্তামণি করের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও চিরন্তন মানেরই প্রাধান্য, সাম্প্রতিক বাস্তবতার প্রতিফলন তত প্রত্যক্ষ নয়। তাঁর জীবনের বিবর্তনের মধ্যেই হয়তো নিহিত থাকে এর কারণ।

১০৪· চিন্তামণি কর। গ্রীষ্ম। প্লাস্টার। ১৯৮৫।
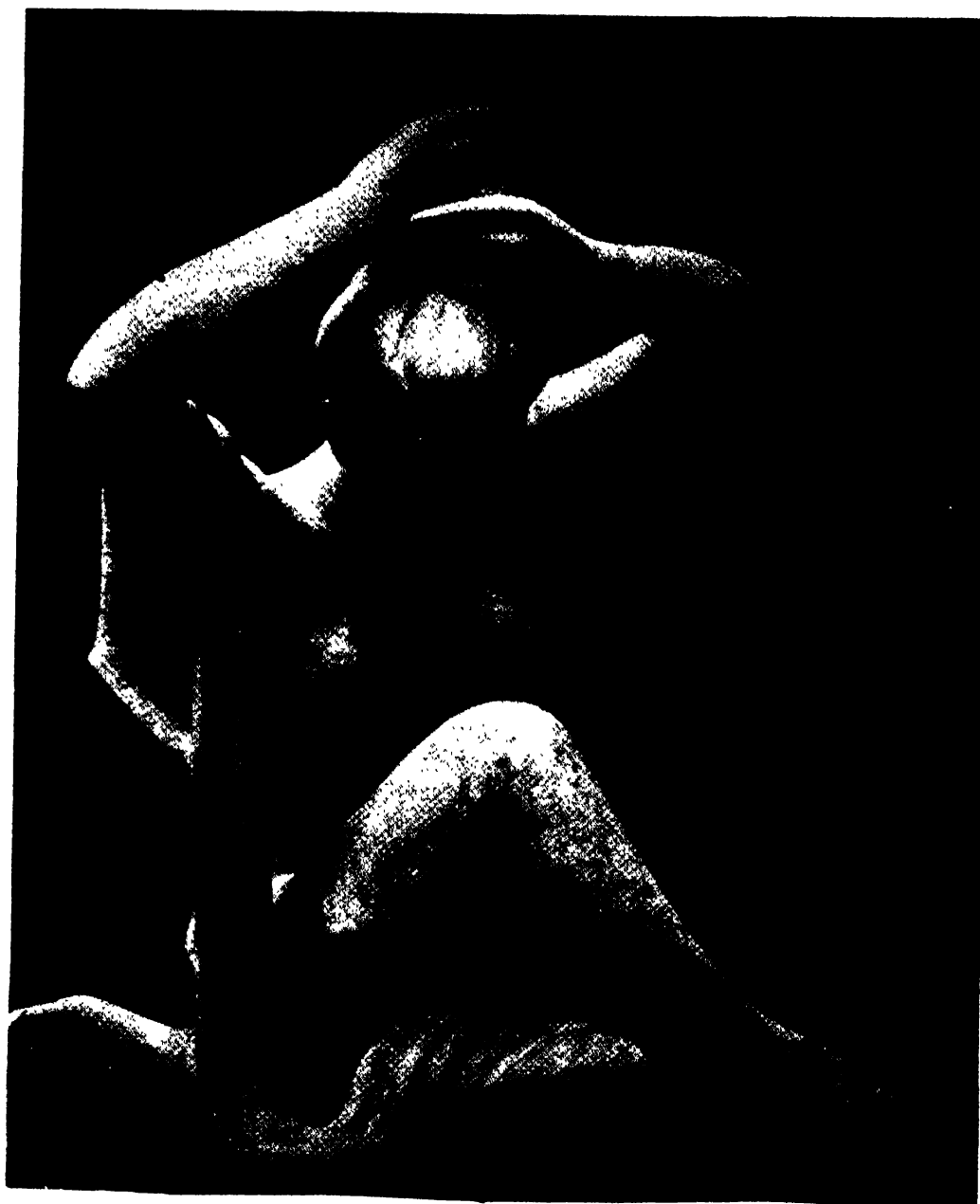
১০৫· চিন্তামণি কর। বর্ষা।

দুই

প্রাচ্য

১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় বার একটানা দশ বছর ইওরোপ প্রবাসের পর যখন পাকাপাকিভাবে দেশে ফেরা সাব্যস্ত করলেন চিন্তামণি কর, তখন বিদায় নেওয়ার জন্য হেনরি ম্যুরের কাছে গিয়েছিলেন। বরাবরের জন্য ফিরে যাচ্ছেন শুনে হেনরি ম্যুর নাকি বলেছিলেন তাঁকে :

"ভাস্কর হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্তির দরজায় পৌঁছে এ সময়ে তোমার দেশে ফেরা সুবিবেচনার কাজ হচ্ছে না। দেশের কাজে আত্মনিয়োগ তোমার কাছে মহৎ প্রেরণা হয়ে থাকলেও একটু ভেবে দেখো আমার উপদেশ। বর্তমান ভারত বিশাল দেশ কিন্তু জাতির পর্যায়ে এখনও দুর্বল। বিশাল জাতির পর্যায়ে উন্নীত হতে যে সময় লাগবে তার মধ্যে নামকরা ভাস্কর না হয়ে তুমি চিরতরের জন্য অন্তর্হিত হয়ে যাবে।" (চিন্তমণি কর। 'জীবনের অপরাহ্নে'। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা। ১৩৯৯)

আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্য সম্পর্কে ইওরোপের শ্রেষ্ঠতম একজন ভাস্করের এই উক্তি মনে রাখার মতো। ১৯৫৬ সালে ইওরোপীয় ভাস্কর্যের তুলনায় ভারতীয় ভাস্কর্যের ধারাটি তখন সত্যিই খুব ক্ষীণ। তবু কেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন চিন্তামণি কর? একটা বাস্তব কারণ ছিল এর। ১৯৫৫-তে কলকাতা গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস এর অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর ওই শূন্য পদে যোগদানের জন্য অনুরোধ আসে তাঁর কাছে। সেই পদে যোগ দিয়ে ভারতেই স্থায়ীভাবে কাজ করবেন এরকম একটা উদ্দেশ্য তাঁর ছিল। বলেছেন, "মনে হল যে গত দশ বছর ইওরোপে একটানা থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাকে যদি দেশের শিল্প জগতে কাজে লাগানো যায়, তাহলে ভালই হয়।" (পূর্বোক্ত উৎস) এই প্রাথমিক কারণ ছাড়াও দেশে ফেরার সিদ্ধান্তের মধ্যে তাঁর এক স্বদেশ চেতনার পরিচয়ও আমরা পাই, যে স্বদেশ চেতনার পেছনে তাঁর শৈশব জীবন ও শিল্প শিক্ষার পরিমণ্ডলের প্রভাব ছিল। তাঁর শিল্পী-চেতনার মধ্যে স্বদেশ ও ইওরোপের একটা টানাপোড়েন সব সময়ই থেকেছে।

চিন্তামণি করের জন্ম ১৯১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের খড়্গপুরে। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর বয়সে খড়্গপুর থেকে তাঁরা চলে আসেন কলকাতার সন্নিকটে কসবায়। এখানেই তাঁর শৈশব কাটে। তাঁর প্রথম শিল্পচেতনার সূত্রপাতও এখানেই। সাত বছর বয়স তখন। পাড়ার সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে দেখছেন সেই মূর্তিগড়া। তার উৎসাহ দেখে প্রতিমা-শিল্পী সুযোগ দিলেন হাত লাগাবার। মূর্তি গড়ার কাজে সেই প্রথম হাতে খড়ি। বলেছেন তিনি, "হয়ত সেই সুযোগেই মূর্তি বানাবার বাসনা সর্বপ্রথম মনে স্থান করে নিয়েছিল।" (পূর্বোক্ত উৎস)

তখনকার স্বাদেশিকতার আবহাওয়া স্পর্শ করেছিল তাঁকেও। স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ কিছু মানুষকে দেখেছেন কাছ থেকে। স্বদেশ চেতনার প্রেরণা মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে পল্লবিত হয়েছে সেই সূত্র থেকেই।

তাঁর মা ছিলেন বিদুষী। বাবার ছিল ছবি আঁকায় আগ্রহ। রেলে চাকরি করতেন। অবসর সময় ছবি আঁকতেন। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে ছেলেকেও উৎসাহিত করতেন ছবি আঁকায়। কিন্তু শিল্পচর্চাকেই জীবনের ব্রত হিশেবে গ্রহণ করাতে তীব্র আপত্তি ছিল তাঁর। ফলে ১৯২৯ সালে স্কুলের শেষ পরীক্ষা পেরোনোর পর যখন ছবি আঁকার দিকেই যাবেন স্থির করলেন তখন বাধা এল তাঁর পিতার কাছ থেকেই। কিন্তু শৈশব থেকেই চিন্তামণি ছিলেন জেদি ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। ফলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য তখন থেকেই ঘর ছাড়লেন। নিজের আয়ের পথ খুঁজে বের করলেন। শেষে বাবার সঙ্গে রফা হল—আর্ট কলেজে পড়তে পারেন তিনি, কিন্তু পড়াশুনোর খরচ চালাতে হবে নিজেকে।

১৯৩১-এ 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস'-এ ভর্তি হওয়াও খানিকটা আপতিক ঘটনা। ইচ্ছে ছিল গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলেই ভর্তি হওয়ার। কিন্তু সেখানে তখন চলছে ছাত্র-ধর্মঘট। ফলে তাঁকে যেতে হল অবনীন্দ্রনাথের সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টসেই। তাঁর শিল্পে স্বদেশ-চেতনার বীজ অঙ্কুরিত হল এভাবে হয়তো কিছুটা ঘটনাচক্রেই। নব্য-বঙ্গীয় ঘরানার সঙ্গে একটা সংযোগ ঘটল তাঁর এভাবেই। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হলে হয়তো একেবারেই অন্যরকম হত তাঁর শিল্পের বিকাশ।
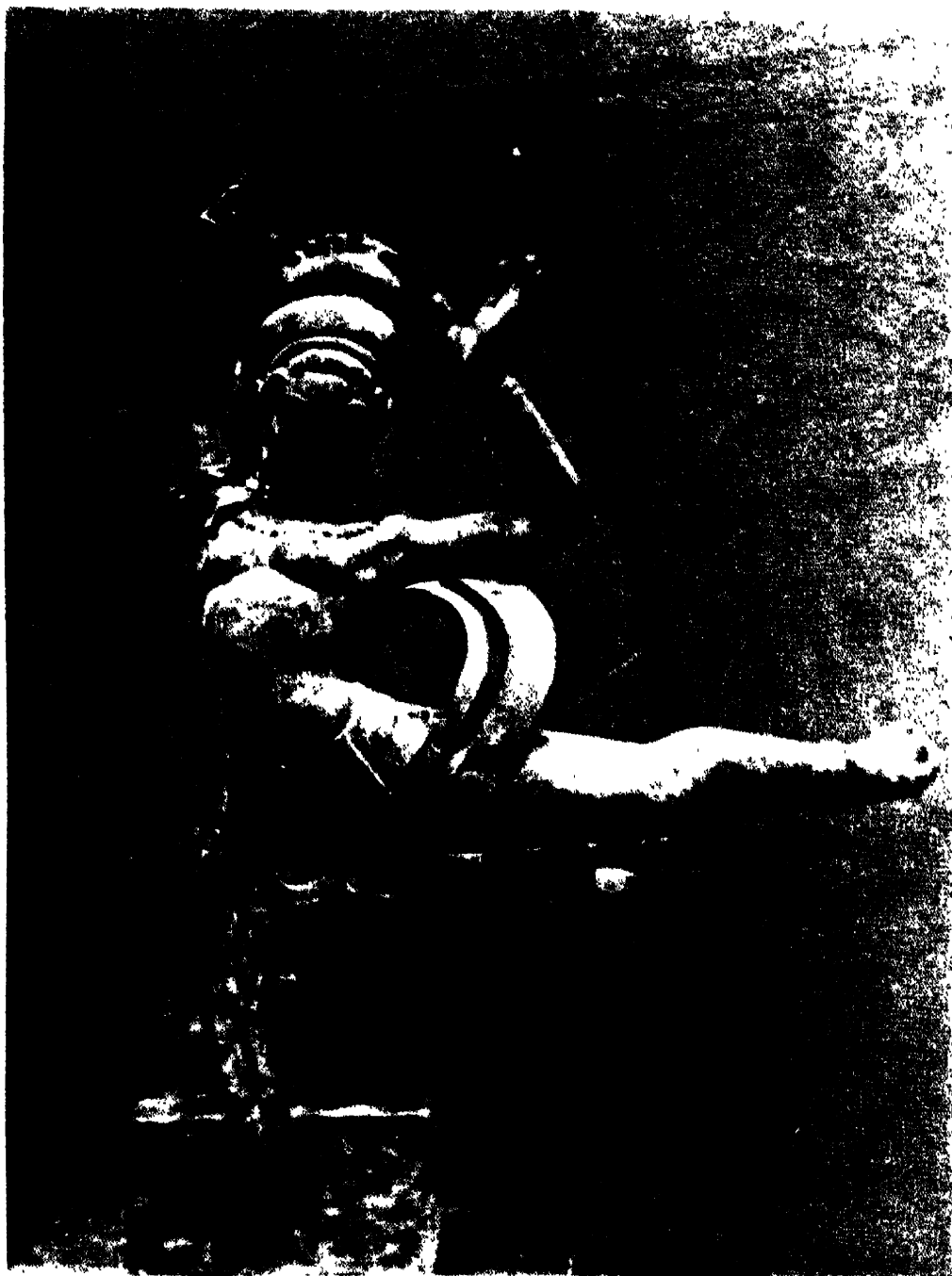
১০৬· চিন্তামণি কর। ক্লাউড মেসেঞ্জার। ব্রোঞ্জ। ১৯৪৯।

ভাস্কর্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল গোড়া থেকেই। ফলে সোসাইটিতেও ভাস্কর্য শিখতেই শুরু করেন প্রথমে। ওড়িশার পরম্পরাগত ভাস্কর গিরিধারী মহাপাত্র তখন শেখাচ্ছেন সোসাইটিতে। তাঁর অধীনেই কাজ শুরু করলেন। এ প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা বলেছেন চিন্তামণি কর তাঁর 'স্মৃতিচিহ্নিত' বইতে।

শিক্ষার সূচনায় একদিন শিক্ষক গিরিধারী তাঁকে একটি কাঠ দিয়ে সেটিকে কাটতে নির্দেশ দিলেন। কেটে কী তৈরি করতে হবে জিজ্ঞেস করায় বললেন, "কিছু না শুধু ইহারে কাটিয়া শেষ করঅ।" কাটতে কাটতে একেবারেই শেষ হয়ে গেল কাঠ। পায়ে চেপে ধরে আর কাটা যায় না। জিজ্ঞেস করলেন—এবার কিভাবে কাটতে হবে। উত্তরে বললেন শিক্ষক, "তুমি তো মোর বপ অছি তুম্হারে কি দেখাইব।" এ কথা শুনে বিমূঢ় ছাত্রটি। পরে জেনেছিলেন এই রহস্যের নিহিতার্থ। গিরিধারীর পিতার নামও ছিল চিন্তামণি।

কিন্তু এতে তাঁর ভাস্কর্য শেখার সমস্যার কোনো সুরাহা হল না। জানলেন অন্তত ১৪-১৫ বছর লাগবে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হতে। আসলে ওড়িশার পরম্পরাগত ভাস্কর্যে একেবারে শৈশব থেকেই শুরু হয় শিক্ষানবিশি। তারপর যৌবনে পৌঁছনো পর্যন্ত শিক্ষার শেষে তাঁরা অধিকার লাভ করেন স্বাধীনভাবে কাজ করার। চিন্তামণি কর বুঝলেন এই পদ্ধতিতে কাজ শিখে কোনো লাভ নেই তাঁর। ফলে ভাস্কর্য ছেড়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে ছবি আঁকা শিখতে শুরু করলেন। তবে গিরিধারী মহাপাত্রের কাছে অল্পকালের শিক্ষানবিশির সময়ে তিনি তৈরি করেছিলেন কাঁঠাল কাঠে একটি গণপতির মূর্তি। বা আরো কয়েকটি কাজ। ভারতীয় পরম্পরাগত ভাস্কর্যের সঙ্গে তাঁর সংযোগের সূত্রপাত সেখানে।

কিন্তু ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে শিক্ষা তাঁর শিল্পীসত্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ক্ষিতীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল গভীর। 'স্মৃতিচিহ্নিত' বইতে লিখেছেন : "...ক্ষিতীন্দ্রনাথকে এদেশের ফ্রা আঞ্জেলিকো বলে চিহ্নিত করলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। ফ্রা আঞ্জেলিকোর জীবনে যেমন চিত্রকরণ তাঁর ধর্ম চিন্তা ও প্রার্থনার একাঙ্গীভূত রূপ প্রকাশ, ক্ষিতীন্দ্রনাথের চিত্ররচনার মূল প্রেরণা ও বিকাশের উৎসে ছিল তাঁর বৈষ্ণবীয় ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তির রূপায়ণে উৎসর্গীকৃত চিত্রভাবনা।"
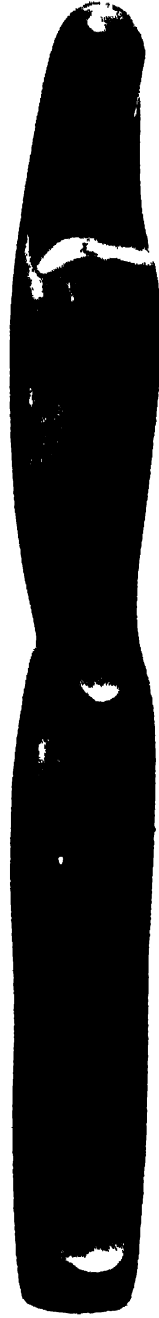
১০৭· *চিন্তামণি কর। ভিজিটেশন। কাঠ। ১৯৬৪।*

ক্ষিতীন্দ্রনাথের প্রভাবে ছবির মধ্য দিয়েই শিল্পের ক্ষেত্রে স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন তিনি। কিন্তু তাঁর স্বদেশ ভাবনার মধ্যে কোনো দেশীয় সংকীর্ণতা প্রশ্রয় পায় নি। অবনীন্দ্রনাথ ও নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতি সম্পর্কেও খুব যুক্তিযুক্ত ও স্বচ্ছ ধারণা ছিল তাঁর। নিছক পুনরুজ্জীবনবাদী বলে ভাবতেন না একে। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা আপাতদৃষ্টে মনে হয়, প্রাচ্যশিল্পের একটা পুনর্গঠন। কিন্তু তাঁর টেকনিক ও স্টাইল আদপেই প্রাচ্য নয়। ইওরোপীয় রীতির পাঠ নেওয়া ছিল তাঁর। ইংলিশ ওয়াটারকালার এবং জাপানী ওয়াশিং টেকনিকের অন্বয় ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ তথা বিষয়বস্তুর নির্বাচনে তিনি প্রাচ্যমনস্ক। তখন আমাদের নবজাগরণের যুগ; শিল্পে সাহিত্যে একটা ন্যাশনাল আইডেনটিটির জন্য ব্যাকুলতা তখন সর্বব্যাপী।" (দেশ। ২১ জুন ১৯৮৬)

এই 'ন্যাশনাল আইডেনটিটি' ছবির ক্ষেত্রে চিন্তামণি করেরও অন্বিষ্ট ছিল। কিন্তু ভাস্কর্যে তাঁর প্রকৃত শিক্ষার সূচনা যেহেতু ইওরোপে, তাই সেখানে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দ্বন্দ্বটাই প্রাধান্য পেয়েছে। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে যাওয়ার আগে আমরা এখানে প্রথমে তাঁর ছবির বিবর্তনটা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

১৯৮৫-র নভেম্বরে তাঁর একটি পূর্বাপর

প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়মের আশুতোষ শতবার্ষিকী হলে। সেখানে ১৯৩০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত ৫০ বছরের বিস্তৃত সময়ে করা মোট ৫০টি ছবি দেখার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। সেই প্রদর্শনী অনুসরণেই আমরা তাঁর ছবি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করার চেষ্টা করব।

সেখানে প্রথম ছবিটি ছিল ১৯৩০ সালে করা একটি শিশুর মুখাবয়ব। মাত্র ১৫ বছর বয়সের কাজ। তখনো ছবি আঁকা শেখেন নি কারুর কাছে। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে নিজের মনেই আঁকতেন। এরকম প্রায় স্বশিক্ষায় রং ও রূপবন্ধের উপর যে দখল অর্জন করেছিলেন তিনি, এই ছবিটিতে তার পরিচয় রয়েছে। পরবর্তী জীবনে ছবি ও ভাস্কর্যে মুখাবয়ব রচনায় তাঁর অপরিসীম দক্ষতার সুপ্ত অঙ্কুরের সন্ধান পাওয়া যায় এই ছবিটিতে।

প্রথম জীবনে ক্ষিতীন্দ্রনাথের প্রভাব ও ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছবিতে এসেছে দৈনন্দিন জীবনধারা থেকে উঠে আসা গৃহাভ্যন্তরের স্নিগ্ধ প্রশান্তিও। ১৯৩৫-এ 'অন্তঃপুরিকা' নামে জলরঙের ছবিটিতে এই স্নিগ্ধতার পরিচয় রয়েছে। ঘরের ভিতর হলুদ মেঝেতে আসন বিছিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে এক যুবতী। তার হাতে ধরা একটি টিয়াপাখি। প্রেক্ষাপট ও রচনাবিন্যাসে রাজপুত অনুচিত্রের কিছুটা অনুষঙ্গ অনুভব করা যায়। এই ছবিটিতে বা একই বছরে আঁকা (১৯৩৫) 'দিবাস্বপ্ন' নামের চিন্তানিমগ্না উপবিষ্টা নারী মূর্তিতে নব্য-বাঙ্গীয় ঘরানার সাহিত্যধর্মী বৈদগ্ধ্যের সমস্ত গুণাবলীই বর্তমান। যেটুকু তাঁর নিজস্ব তা হল, রং ও রূপবন্ধের স্নিগ্ধ আলোকময়তা, আদর্শায়িত সৌন্দর্যচেতনা, ভারতীয় ধ্রুপদী, রাজপুত ও পাহাড়ি অনুচিত্রের সারাৎসারের সুষম ব্যবহার।

এর পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ড্রইংয়ে ক্রমান্বয়ে এসেছে পাশ্চাত্য বাস্তবতাজাত

১০৮ চিন্তামণি কর। ক্যারিয়াটিড। কাঠ। ১৯৫৯।

স্বাভাবিকতা। ১৯৩৯-এর তিনটি ড্রয়িং 'গুলন্দাজ নারী', 'স্পেনীয় বাস্তুহারা' ও একটি শায়িতা নগ্নিকার রূপারোপে এর সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। শেষোক্ত চারকোলের ড্রয়িংটিতে এই বাস্তবধর্মী স্বাভাবিকতার সঙ্গে মিশেছে তার শরীরী স্পর্শময়তা, যা তাঁর পরবর্তী সময়ের বাস্তবতা-আশ্রিত ভাস্কর্যেরও এক অনবদ্য বৈশিষ্ট্য। এই বাস্তবতাই ক্রমশ বিকশিত হয়ে চলেছে। ১৯৪৬-এর 'উপবিষ্টা নগ্নিকা' য় এর পরিচয় রয়েছে। পাশ্চাত্য চিত্রকলার আঙ্গিকগত অর্জনের কিছু প্রভাবও এসে যাচ্ছে এর পরের ছবিতে। এবং সেই প্রভাব এসে ভেঙে দিচ্ছে পূর্বোক্ত বাস্তবতার নিটোলতাকে।

এর পরে দুটি স্তরে ঘটেছে তাঁর ছবির বিস্তার একটি ধারা তাঁর এতদিনের অনুশীলিত পথের পরম সম্পূর্ণতা। বাস্তবতা বা প্রাকৃতিকতাকে ছুঁয়ে থেকেও আদর্শায়িত ধ্রুপদী সৌন্দর্যের উন্মীলন। প্রথম পর্বের ভারতীয়তার সঙ্গে পাশ্চাত্য রূপবন্ধের সুষম সমন্বয়ে এক প্রশান্ত প্রাণময়তা এল। এমনকী, কিউবিজমের নানা ছায়াও মিলেমিশে স্বাতন্ত্র্যে রূপ পেল সেই প্রশান্তিতে। ১৯৭৯-তে করা 'ইরানের স্মৃতি', 'সিটাডেল' ও 'ইলিউশন' এই তিনটি ছবিতে পরিচয় রয়েছে সেই সমন্বিত সংহতির।

দ্বিতীয় স্তরটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৭৮-এর 'ডেসপেয়ার' শীর্ষক চারকোল ড্রইংটিতে হতাশার রূপায়ণে যে অভিব্যক্তিময় নঞর্থকতার আভাস দেখা গিয়েছিল, তাই সংহত প্রতিবাদের প্রতিমায় রূপান্তরিত হল ১৯৭৯-র 'কল্কি' ও 'মিসঅ্যানথ্রপ' ছবি দুটিতে। এরকম সোচ্চার প্রতিবাদের তীব্রতা তাঁর ছবির ধারাবাহিকতায় এবং ভাস্কর্যেও বিরল।

ছবিতে তিনি নানারকম আঙ্গিক নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে একটি সাধারণ ঐক্য রয়ে গেছে—তা হল ধ্রুপদী

চেতনার প্রকাশ। যে বিরাট সংঘাতময় সময়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তাঁর জীবন, তার কালো ছায়া খুব একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে নি তাঁর কাজে। সেই কালিমাকে আত্মস্থ করে তাঁর ধ্রুপদী অনুভবকে বরং আরো বলিষ্ঠ আরো মাত্রাময় করেছেন। অর্থাৎ আলো ও অন্ধকারের দ্বৈত সমন্বিত হয়ে সংহত রূপাবয়বে রূপান্তরিত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা অনুধাবন করতে চেষ্টা করব তাঁর ভাস্কর্য।

তিন

পাশ্চাত্য

'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস'-এর শিক্ষা শেষ করে স্বাধীন জীবিকার সন্ধানে ব্যাপৃত হতে হয় তাঁকে। ১৯৩৫ থেকে ৩৭ পর্যন্ত একটা স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু মনের মধ্যে ইচ্ছা ইওরোপ গিয়ে ভাস্কর্য শিখবেন। অথচ আর্থিক সংগতি নেই। কোনো উপায়ও দেখতে পাচ্ছেন না সামনে। সেই সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় ডাঃ পিটার বোয়াকি নামে এক হাঙ্গেরীয় চিকিৎসকের। সেবাই ছিল তাঁর জীবনের ধর্ম। ১৯৩৮-এ অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়ে পৌঁছলেন লন্ডনে। সেখানে তখন আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়া। ১৯৩৮-এর ১ অক্টোবর লন্ডন থেকে যাত্রা করলেন প্যারিসের দিকে। সেখানে এক নতুন অধ্যায় শুরু হল তাঁর জীবনের।

ভাস্কর্য শিখতে প্রথমে ভর্তি হলেন 'অ্যাকাডেমি দ্য ল্য গ্রাঁদ শমিয়ের'-এ। এই গ্রাঁদ শমিয়ের প্রতিষ্ঠা করেন রদাঁর ছাত্র বুর্দেল। সেখানে তখন শেখাতেন তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য অধ্যাপক ভেলরিক। রদাঁ ও বুর্দেল-এর ঘরানার সঙ্গে চিন্তামণি করের একটা সংযোগ ঘটল এখান থেকে। কিন্তু বুর্দেল-এর প্রভাব তাঁর কাজে হয়তো তেমন প্রগাঢ় নয়। বুর্দেল-এর রূপবন্ধের কৌণিকতায় অনেকটা আদিমতাসঞ্জাত যে প্রতিবাদী অনুষঙ্গ থাকে তার সমান্তরাল অনেকে হয়তো দেখতে পান রামকিঙ্করের কোনো কোনো কাজে। চিন্তামণি করের ভাস্কর্যে যে সমন্বয়ধর্মী ধ্রুপদী ভাবের প্রকাশ তার সঙ্গে বরং রদাঁর কিছুটা সাযুজ্য অনুভব করা যায়।

> রদাঁর কাজে মুগ্ধতা সত্ত্বেও চিন্তামণি কর তাঁর ভাস্কর্যের কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেছেন 'স্মৃতিচিহ্নিত' বইতে। ভাস্কর্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তা অনুধাবন করতে সেই অংশটি উদ্ধৃত করা যায়। তিনি লিখেছেন, "ভাস্কর্যে আলোছায়ার সমাবেশ, বিভিন্ন বর্ণাভাস ও ত্বকের সজীবতার রূপ রোদ্যাঁর অপূর্ব সৃষ্টি। কিন্তু স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধকে উপেক্ষা করায় রোঁদ্যার ভাস্কর্যের ত্রুটি থেকে গিয়েছে। তাঁর কৃত মূর্তিগুলির অধিকাংশই নির্মাণস্থান থেকে স্থানান্তরিত করে মুক্ত উদ্যানে বা অন্যত্র রাখলে সকল সৌন্দর্য লুপ্ত হয়ে সেগুলি প্লাস্টার-স্তূপ বা প্রস্তরখণ্ডের মতো দেখাবে। বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের ওপর একটি মুখ খোদিত করে বাকিটা বন্ধুর অসমাপ্ত রেখে রোদ্যাঁ বস্তুটির স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, বিরাট পর্বতশৃঙ্গের ভাবকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করলেও প্রস্তরখণ্ডের আসল পরিমাণের চেয়ে বিরাটের কল্পনা দর্শকের চোখে ভেসে ওঠে না। তা হলেও রোদ্যাঁ একটি নতুন শিল্পান্দোলনের জনক; তিনি ভাস্কর্যের গতানুগতিক ঐতিহ্যকে ভেঙে নতুন রূপ, নতুন রস দিয়ে পরিবর্ধিত ও জীবনময় রূপাভিব্যক্তির সৃষ্টি করেছেন।" (পৃ ১২৪)

শিক্ষক হিশেবে অধ্যাপক ভেলরিকের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা মুগ্ধ করত তাঁকে। এই ভেলরিকের কাছেই তিনি জানলেন ভারতীয় ভাস্কর্য সম্পর্কে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধার কথা। বলেছেন—"শিব, বুদ্ধ, নটরাজ স্রষ্টাদের ছেড়ে শিখতে এসেছ আমাদের কাছে।" উত্তরে বলেছেন চিন্তামণি কর ভারতে ভাস্কর্যের সে যুগ আর নেই। মাঝখানে রয়েছে বিরাট অন্ধকার। মানেন নি ভেলরিক। বলেছেন, "তাতে কি হয়েছে? আমরা হয়তো আধুনিক শিল্পের ব্যাখ্যা করতে পারব, কিন্তু বর্ণ পরিচয়ের সন্ধান মেলে প্রাচীন ভারত, মিশর ও গ্রীসের শিল্পভাণ্ডারে।" একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলন ও নব্য-বঙ্গীয় চিত্ররীতির সঙ্গে সংযোগ, অন্যদিকে ইওরোপীয় শিল্পীদের ভারতীয় ভাস্কর্যের মহত্ত্ব সম্পর্কে স্বীকৃতি তাঁর মধ্যে শিল্পের স্বদেশ সম্পর্কে যে চেতনা জাগিয়েছিল, সেই বোধই সারাজীবন তাঁর ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

ভেলরিক তাঁকে আরো শেখালেন যে একরঙা ভাস্কর্যের মধ্যেও প্রকাশ করা যায় বিভিন্ন বর্ণের তারতম্য। "মূর্তির

রঙিন ছবি ১০· চিন্তামণি কর। বুদ্ধ। পাথর।

রঙিন ছবি ১১· চিন্তামণি কর। মিসঅ্যানথ্রোপ। জলরং। ১৯৭৯। (ছবি)।

গায়ে গঠন-কৌশলে, আলোকের আচ্ছাদনে, শোষণে ও বিচ্ছুরণে, ছায়ার সঙ্গে কানামাছি খেলিয়ে ভাস্কর ধরে ফেলে সব কটা রঙ। এই রঙের খেলা দেখাতে জানত গ্রীসের ভাস্কররা।" (পৃ ১৯৯)

প্যারিসেই ভেলরিক ছাড়া অধ্যাপক জিওভানেল্লির কাছেও তিনি শেখেন। জিওভানেল্লির কাছে শেখেন পাথর কাটা।

১৯৩৮-৩৯ এই দুবছর প্যারিস ও ফ্রান্সে তাঁর অবস্থান ও শিক্ষানবিশি শুধু ভাস্কর্যেই নয় সমগ্র জীবনবোধেই গভীর অভিঘাত এনেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিমণ্ডলে তিনি বুঝতে শিখেছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি। শিল্পের অন্যান্য শাখা সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বিশেষত সংগীত সম্বন্ধে পেয়েছেন গভীর অনুভব।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যেই মাস দেড়েক কাটিয়েছেন প্যারিসে। তারপর এক কামানের গোলা বোঝাই জাহাজে পাড়ি দিলেন। প্রথমে কলম্বো। সেখান থেকে ফিরে এলেন কলকাতা।

যোগ দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচারস ট্রেনিং-এর নতুন বিভাগে শিক্ষক হিশেবে। ভাস্কর্যকে পেশা হিশেবে গ্রহণ করার পরিস্থিতি তখন কলকাতায় ছিল না। ১৯৪০ থেকে ৪২ দুবছর শিক্ষকতার পর চলে গেলেন দিল্লি। কনট প্লেসে একটি ঘর ভাড়া করে ভাস্কর্যের স্টুডিও করলেন। পেশাদার ভাস্কর হিশেবে কিছু সাফল্যও অর্জন করলেন। সেই সঙ্গে সমসাময়িক শিল্পীদের ঈর্ষা। ১৯৪৩ থেকে ৪৫ দিল্লি পলিটেকনিকের শিল্পকলা বিভাগে অধ্যাপনা করলেন।

১৯৪৬-এ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আবার পাড়ি দিলেন ইওরোপে। এপ্রিল মাসে পৌঁছলেন মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত লন্ডনে। সেখানে স্টুডিও করে ভাস্কর হিশেবে পেলেন খ্যাতি প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৭-এ রয়্যাল সোসাইটি অব ব্রিটিশ স্কাল্পটার্স-এর সদস্য নির্বাচিত হলেন। ভারতীয় ভাস্কর্য সম্বন্ধে ইংরেজিতে লিখলেন দুটি বই। ১৯৫০-এ প্রকাশিত হল তাঁর বই 'ক্ল্যাসিকাল ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার'। ১৯৫২-তে 'ইন্ডিয়ান মেটাল স্কাল্পচার'। দশ বছর ইওরোপে কাটিয়ে ১৯৫৬-তে আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। যোগ দিলেন কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট-এর অধ্যক্ষ হিশেবে।

চার

সমন্বিত ও অসমন্বিত দ্বন্দ্ব

চিন্তামণি করের ভাস্কর্য সম্বন্ধে 'ইউরো-এশিয়ান সিনথেসিস'-এর কথা লিখেছেন মুলকরাজ আনন্দ। পাশ্চাত্য প্রকরণের সঙ্গে ভারতীয় রূপানুভূতিকে মেলানোর প্রকৃষ্ট উপায়ের সন্ধান তাঁর ছিল, একথা বলেছেন। (ললিতকলা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত মনোগ্রাফ) এটা শুধু চিন্তামণি করের নয়, তাঁর প্রজন্মের ভাস্করদের অনেকেরই বৈশিষ্ট্য। তাঁরা যখন শুরু করেছিলেন তখন সনাতন ভারতীয় ভাস্কর্যের উত্তরাধিকার কেবল অবশিষ্ট আছে কিছু পরম্পরাগত ভাস্করদের চর্চায়, চিন্তামণি করের প্রথম শিক্ষক গিরিধারী মহাপাত্র যার অন্যতম দৃষ্টান্ত। সমকালীনতা বলতে তখন গুরুত্ব পাচ্ছে পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতির চর্চা। এর বাইরে আধুনিক কোনো মূল্যবোধের প্রকাশ ভাস্কর্যে ছিল না। এখানেই রামকিঙ্কর, প্রদোষ দাশগুপ্ত, চিন্তামণি কর বা শঙ্খ চৌধুরী প্রমুখ ভাস্করের গুরুত্ব।

তাঁদের সকলের মধ্যেই এই 'ইউরো-এশিয়ান সিনথেসিস'-এর বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। রামকিঙ্কর যেমন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আদিমতাসঞ্জাত প্রত্ন-প্রতিমার সংহতিকে বুর্দেলের অভিব্যক্তিময় বলিষ্ঠ গাঠনিকতার সঙ্গে মিলিয়ে একটা পথ সন্ধান করছিলেন যেখানে আমাদের এই দেশ, এই বাস্তবতা ও এই ঐতিহ্যেরই এক প্রতিফলন ঘটে বা তারই এক প্রকৃষ্ট শিল্পভাষা গড়ে ওঠে। আর এই পথে চলে রামকিঙ্করই প্রথম তৈরি করতে পেরেছিলেন দেশ-কাল সম্পৃক্ত ভারতীয় ভাস্কর্যের আধুনিকতার বিশিষ্ট একটা ভাষা। তাঁর কাজে ঐতিহ্যের যে নিবিড় সঞ্চার ছিল, তাঁর প্রজন্মের খুব কম শিল্পীই এতটা সাফল্যের সঙ্গে সেটা পেরেছেন। অন্যান্যদের কাজে এই 'ইউরো-এশিয়ান সিনথেসিস'-এর প্রত্যয়টিকে আলাদাভাবে চিনে নেওয়া যায় বা কতটুকু 'ইউরো', কতটুকু 'এশিয়ান' সেটা চিহ্নিত করা যায়, অন্তত তাঁদের প্রথম দিকের কাজে। চিন্তামণি করের কাজেও প্রথমদিকে এই দুটো মাত্রা আলাদাভাবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই সংযোগের চিহ্ন ক্রমে অবলুপ্ত হয়েছে।

১০৯· চিন্তামণি কর। স্কেটিং দা স্ট্যাগ। ব্রোঞ্জ। ১৯৪৮।

ভারতীয়তা ও আধুনিকতার মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে ইওরোপীয় মডেলটিই কেন প্রভাবিত করেছিল আমাদের অধিকাংশ ভাস্করকেই, তার একটা তত্ত্বগত কারণও আছে। রদাঁ পরবর্তী ভাস্কর্যের যে আধুনিকতা সেখানে রূপের উপরিস্তরের স্বাভাবিকতাকে ছাড়িয়ে তার সত্তার স্বরূপ উন্মোচনের জন্য যে ছন্দের সঞ্চারের প্রয়োজন হল, সেই ছন্দ অনেকাংশেই প্রাচ্য-চেতনা সম্ভূত। ব্রাঁকুসি বা হেনরি ম্যুর দুই ভিন্ন প্রত্যয় থেকে দুই ভিন্ন উৎসের প্রাচ্য-চেতনা থেকেই তাঁদের আধুনিকতাকে সঞ্জীবিত করেছেন। ফলে আমাদের ভাস্কররা ওই সব ভাস্করদের কাজে নিজেদের ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন দেখেছেন। প্রদোষ দাশগুপ্তের যে ডিম্বাকৃতির জ্যামিতিকতায় ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণতার প্রত্যয়, যা থেকে তিনি তাঁর ভাস্কর্যের একটা স্বতন্ত্র দর্শন-প্রস্থান তৈরি করেছেন, তার সঙ্গে সাযুজ্য আছে ব্রাঁকুসির দর্শনের। যদিও সেটা ঠিক প্রভাব নয়, অনেকটা সমান্তরাল পথে একই প্রত্যয়ের আবিষ্কার।

এই 'সিনথেসিস' বা সমন্বয়ের পাশ্চাত্য-নিরপেক্ষ একটা প্রকাশও অবশ্য আছে। যে-সব শিল্পী সম্পূর্ণভাবে প্রাচ্যরূপানুভবে উন্মীলিত করতে পেরেছেন তাঁদের প্রকাশ, তাঁরা অনেক সময় ভারতীয় লৌকিক চেতনা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন। চিন্তামণি করের প্রায় সমসাময়িক ভাস্কর ধনরাজ ভগত (জন্ম : ১৯১৭) যেমন। লৌকিক সারল্য তাঁর কাজে ভীষণভাবে উপস্থিত। এই লৌকিক ছন্দেই ভারতীয়তার একটা স্বরূপ উন্মোচিত হয় তাঁর ভাস্কর্যে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক মীরা মুখার্জির ভাস্কর্য। লৌকিক ভারতীয়তাকে আধুনিকতায় সঞ্জীবিত করেছেন তিনি সময়ের সমস্ত দায়কে আত্মস্থ করেই।

চিন্তামণি করের কাজেও এই 'ইউরো-এশিয়ান সিনথেসিস'-এর একটা বিকাশ ও বিবর্তন আছে। নব্যবঙ্গীয় ঘরানায় তাঁর যে চিত্রচর্চার ভিত, তাঁর ভাস্কর্যে প্রথম পর্যায়ে তা যে খুব কাজে এসেছে তা মনে হয় না। গিরিধারী মহাপাত্রের কাছে কয়েকটি ঐতিহ্য-আশ্রিত মূর্তি তিনি তৈরি করেছিলেন, এই পর্যন্ত। তাঁর ভাস্কর্য শিক্ষার সূচনা সম্পূর্ণই ইওরোপে। ফলে অ্যাকাডেমিক রিয়ালিজমের কিছু কিছু প্রকাশ তাঁর একেবারে গোড়ার দিকের কাজে লক্ষ করা যায়, যদিও সেগুলো প্রায়ই স্টাডি ধরণের কাজ।

১৯৪০-এর 'মাই সিস্টার' বা ১৯৪৪-এর 'স্যার আকবর হায়দরি' শীর্ষক মুখাবয়বগুলিতে (প্লাস্টার) যে স্বাভাবিকতার প্রকাশ তাতে অবশ্য বাইরের রূপের মধ্যে ভিতরের চরিত্রেরও প্রতিফলন থাকে, আর সেই প্রতিফলনেই সমৃদ্ধ হয় কাজগুলো। এর মধ্যে অ্যাকাডেমিক ন্যাচারালিজমের যে প্রকাশ, যেটা খুবই আয়ত্তে ছিল তাঁর শিক্ষানবিশির সময় থেকেই, এর পরিচয় ধরা আছে ১৯৪৪-এর মার্বলের 'টরসো' শীর্ষক নারী দেহকাণ্ডের উপস্থাপনায়। মাথা ও হাতবিহীন এই দণ্ডায়মান নারী মূর্তিটিতে এক ধরণের শীতল প্রশান্তি আছে, যা শিল্পীর আবেগের সংযত প্রকাশের সাক্ষ্য। এরকম শীতলতাই আমরা অনুভব করি 'ফ্রেডা' শীর্ষক মার্বল মুখাবয়বটিতে। একেবারে প্রথম পর্বের স্টাডি-ধর্মী এসব কাজ থেকে একটি জিনিশ পরিস্ফুট হয় যে তাঁর ভাস্কর্য চেতনার ভিত্তিতে রয়েছে উচ্ছ্বাসহীন এক ধ্রুপদী স্থৈর্যের বোধ।

১১০· চিন্তামণি কর। বুদ্ধ। অ্যালুমিনিয়াম। ১৯৬২।

এই স্থৈর্যের মধ্যেই অনেক সময় তিনি ছন্দের সঞ্চার ঘটিয়ে বিষয়টিকে জঙ্গমতায় উন্মীলিত করে তোলেন। ১৯৪৮-এর 'স্কেটিং দ্য স্ট্যাগ' নামে ব্রোঞ্জটিতে এই ছন্দিত জঙ্গমতারই প্রকাশ। অলিম্পিক উপলক্ষে লন্ডনে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে তাঁর এই কাজটি রৌপ্যপদক পেয়েছিল। ব্যালে নৃত্যের ভঙ্গিতে রূপায়িত এক নারী-মূর্তির উপস্থাপনায় পাশ্চাত্য সংগীতের ছন্দই যেন ওই শরীরে স্তব্ধ হয়ে আছে।

১০৯

১৯৪৪ থেকে ৪৮ পর্যায়ে তাঁর কাজে রদাঁর ভাস্কর্যের অনুষঙ্গের আত্তীকরণও অনুভব করা যায়। ১৯৪৪-এর মার্বেল-এর 'রিক্লাইনিং ন্যুড' দুহাতের মধ্যে মুখ গুঁজে অর্ধশায়িতা নগ্নিকায় রদাঁর ভাস্কর্যের স্নিগ্ধ করুণারই অনুরণন শোনা যায়। ১৯৪৮-এর 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড' টেরাকোটাটিতেও মমতার যে শাশ্বত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় তাতেও নির্মাণের জ্যামিতির সুষ্ঠু প্রকাশে রদাঁর ঘরানাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে।

এই ছাড়িয়ে গিয়ে নিজস্ব রূপভঙ্গি খোঁজার যে প্রয়াস এরই প্রথম দিকের (১৯৪৮) একটি দৃষ্টান্ত 'স্কেটিং দ্য স্ট্যাগ'। শিল্পীর নিজের লেখা থেকে জানি পাশ্চাত্য রূপানুসারী এই মূর্তিটিতেও ও দেশের কেউ কেউ ভারতীয়তার অনুরণন অনুভব করেছেন। বলেছেন, "এই মূর্তির রচয়িতা যে নটরাজ নির্মাতাদের দেশের লোক তা এর অভিনব সংস্থানই নির্দেশ করছে।" (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৯) এই প্রশংসা শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করেছে 'ভারতীয় বিষয়ক একটি ভাস্কর্য করতে। এর ফলে তৈরি হয়েছিল ১৯৪৯-এর ব্রোঞ্জের 'ক্লাউড মেসেঞ্জার' বা মেঘদূত। এ প্রসঙ্গে শিল্পীর নিজের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "আমার স্টুডিও সংলগ্ন বাড়িটি ছিল একটি ব্যালে নৃত্যের শিক্ষায়তন। সেখানে মাঝে মাঝে দেখতাম শিক্ষার্থীদের নৃত্যাভ্যাস। একটি তরুণী নৃত্যাঙ্গনাকে মডেল করে ব্যালে নৃত্যের এক বিশিষ্ট ভঙ্গীর মূর্তি বানিয়ে তাকে ভারতীয় ভাস্কর্য আভাসিত বেশভূষা মণ্ডিত করে রয়াল অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীতে পাঠালাম। সকল দর্শকেরা এই মূর্তি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যবাহী ভাস্কর্যের স্বীকৃতি দিলেন। কিন্তু মূলত এটি ছিল একটি ব্যালে নৃত্যভঙ্গির প্রতিরূপ।" (পূর্বোক্ত উৎস)

১০৬

এ থেকে তাঁর ভাস্কর্যের একটি সাধারণ সমস্যা বেরিয়ে আসে। পাশ্চাত্য রূপাবয়বে ভারতীয় আদর্শ আরোপ করলে এই দুটি প্রত্যয় অনেক সময় অসমন্বিত থেকে যায়। এই অসমন্বিত দ্বন্দ্ব ভাস্কর্যে সম্পূর্ণ নান্দনিক সংহতি আনে না। 'স্কেটিং দ্য স্ট্যাগ'-এ এ সমস্যা তত প্রকট ছিল না। কেননা, এটি সম্পূর্ণভাবেই পাশ্চাত্য প্রত্যয় থেকে করা। 'ক্লাউড মেসেঞ্জার'-এ এটা সীমাবদ্ধতা হয়ে উঠল, ওই অসমন্বিত দ্বন্দ্বের জন্য।

১০২

চিন্তামণি করের ভাস্কর্যে এই সমস্যাটি পর্যায়ক্রমে মাঝে মাঝেই এসেছে। ১৯৯৩-এর 'সবিতা ও উষা'-তেও কেন্দ্রীয় সমস্যা এই অসমন্বিত দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে শিল্পী যখন প্রকৃষ্ট সমন্বয়ে পৌঁছতে পারেন তখনই তাঁর কাজে এক স্বতন্ত্র মাধুর্য উদ্ভাসিত হয়।

পঞ্চাশ দশকে করা তাঁর ভাস্কর্যে আমরা দেখি পাশ্চাত্য সংগীতের অন্তর্নিহিত ছন্দকেই যেন তিনি মানবিক শরীরী রূপের ত্রিমাত্রায় উদ্ভাসিত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। ১৯৪৯-এর 'পার্ক ফিগার' (৩৬ সেমি) নামে ভিট্রিফায়েড টেরাকোটার মূর্তিটিতে দেখি উপবিষ্টা এক নগ্নিকার দীর্ঘ শরীরের বিন্যাস। তিনটি বা চারটি সংযোগের ক্ষেত্রে নেগেটিভ ভল্যুম বা শূন্য ক্ষেত্রের সৃজন ছাড়া, সম্পূর্ণ শরীরটি সদর্থক আয়তন ও উত্তল বৃত্তাংশের মসৃণ সঞ্চরণের মধ্য দিয়ে উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে। মুখাবয়বে ব্যক্তি-পরিচয়ের সমস্ত ইঙ্গিত অবলুপ্ত। কেননা, শরীরে সংবেদনের তীব্র উত্তাপকে উদ্ভাসিত করে তোলাই মনে হয় এখানে শিল্পীর উদ্দেশ্য।

আবার ১৯৫৩-র 'আইকারাস' কাজটিতে (ভিট্রিফায়েড টেরাকোটা, ৬০ সেমি) এই শরীরী সংবেদনই নৃত্যের ভঙ্গির মধ্য দিয়ে পার্থিবতার ভরকে ছাড়িয়ে আকাশের ব্যাপ্তি পেতে চাইছে। শরীরের তল বৃত্তীয় ঘূর্ণনের মধ্য দিয়ে সীমাহীনতায় বিন্যস্ত হচ্ছে। সদর্থক (পজিটিভ) ও নঞর্থক (নেগেটিভ) আয়তনের ও বৃত্তাংশের (কার্ভ) সুস্থিত সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে রচনাটিতে এক ধরণের উড্ডীয়মানতার উচ্ছ্বাস আসছে।

১০৮

এর পাশাপাশি আমরা যদি ১৯৫৯-এর কাঠের 'ক্যারিয়াটিড' (Caryatid) নামে মূর্তিটি (১৫০ সেমি) দেখি, তাহলে অনুভব করা যায় শরীরী সংবেদনের ভিন্নধর্মী এক তীব্র প্রকাশ। কাঠ কেটে বের করে আনা হয়েছে দণ্ডায়মানা এক নারীমূর্তি। দুহাত মাথার উপরে তুলে আনত মুখে সে দাঁড়িয়ে আছে। সবটাই সদর্থক আয়তন (পজিটিভ ভল্যুম)। কোথাও কোনো শূন্য ক্ষেত্র (নেগেটিভ স্পেস) নেই। বক্রতলগুলি উত্তলতা ও অবতলতায় ছন্দিত হতে হতে উপর থেকে নীচের দিকে নেমে এসেছে। পার্থিবতায় সম্পৃক্ত তীব্র সংরাগ ও করুণা যেন স্তব্ধ হয়ে আছে।

চল্লিশের দশকের রদাঁর অনুষঙ্গের শারীরিকতা ও পার্থিব করুণার আবহমণ্ডলকে পেরিয়ে বা তাকেই আত্মস্থ করে পঞ্চাশের দশকে শিল্পী একেই আরো বিমূর্ত সাংগীতিক ছন্দে উত্তীর্ণ করলেন। পাশ্চাত্য আধুনিকতার এই আত্তীকরণের পরে ষাটের দশকে তিনি এর সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য-আশ্রিত রূপচেতনার সমন্বয় ঘটাতে শুরু করলেন।

সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে তাঁর প্রিয় একটি মাধ্যম সম্পর্কে উল্লেখ করে নেওয়া যায়। চল্লিশের দশক থেকেই তিনি ভিট্রিফায়েড টেরাকোটায় নিয়মিত কাজ করছেন। আয়ত্ত করেছিলেন প্যারিসে শিক্ষানবিশির সময়ই। টেরাকোটা মাধ্যমটি অতি প্রাচীন এবং বহুল প্রচলিত। ইটালির ভাষায় 'টেরাকোটা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল পোড়ামাটি। যে-কোনো মাটির তৈরি জিনিশকে যদি আগুনে পোড়ানো হয় কিন্তু গ্লেজিং না করা হয়, তাহলেই সেটা টেরাকোটা। নব্য-প্রস্তর যুগ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্রই এই মাধ্যমটির ব্যবহার চলে আসছে। 'ভিট্রিয়াস' কথাটির অর্থ হল কাচ-সংক্রান্ত। আর 'ভিট্রিফাই' কথার অর্থ কাচে পরিণত করা। মাটির সঙ্গে যদি সিলিকন বা বালি জাতীয় পদার্থ মিশিয়ে তাকে উচ্চ তাপ দেওয়া যায় তাহলে বালির কণাগুলি কাচে পরিণত হয়। বালি বা চিনামাটির গুঁড়ো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বেশি তাপে তাকে অনেকটা কাচের মতো কঠিন করে তুলে ভিট্রিফায়েড টেরাকোটায় পরিণত করা হয়। এই মাধ্যমটি চিন্তামণি কর প্রভূত ব্যবহার করে থাকেন।

এই ভিট্রিফায়েড টেরাকোটাতেই ১৯৬০-এর সিটেড ফিগার (৪০ সেমি) নামে একটি কাজে আমরা সুন্দর এক সারল্যের উপস্থাপনা দেখি। এক নারী পা গুটিয়ে বসে আছে, শান্ত সমাহিত। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবটাই সদর্থক আয়তন। ভাঁজ করা পা-দুটিতে স্ফীত, স্ফুরিত গোলাকের আভাস। শরীর সেই তুলনায় কৃশ। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তল-মিশ্রণে যে রেখার সৃষ্টি হয়েছে সেই রেখার জ্যামিতি উপস্থাপনায় সারল্য এনেছে। বাংলার লৌকিক উত্তরাধিকার এই মূর্তিটিতে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯৬৪-র টেরাকোটাতে 'ডান্সার' কাজটিতেও (৬৯ সেমি) এই নির্ভার সারল্য অনুভব করা যায়। এখানে তিনি সদর্থক আয়তনের বিন্যাসের মধ্যেও যেভাবে দেহরেখায় উত্তল-অবতল মসৃণ গতির মধ্যে হাত ও পায়ের ভাঁজের তিনটি বা চারটি বিন্দুতে কৌণিক তীক্ষ্ণতা এনেছেন, তা সাবলীলতা ও সংঘাতের এক বিষম ছন্দ তৈরি করেছে। এভাবে লৌকিক উৎস আত্তীকরণে তিনি চূড়ান্ত সফলতার পরিচয় দিয়েছেন যে-সব কাজে, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৯৮৪-র টেরাকোটার 'আহ্লাদী' (৪৮ সেমি)। এখানে এক বা একাধিক রেখাই ক্রমিক ঘূর্ণনে দেহঘেরকে বিন্যস্ত করেছে। অবতলতা ও একটি চোখের বৃত্তাকার কোটরের নঞর্থক আয়তনে (নেগেটিভ ভল্যুম) সারল্য ও রহস্যের সুন্দর এক সমাহার ঘটে এখানে যা সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় লৌকিক চেতনার অন্তর্গত। ১৯৬৩-র ভিট্রিফায়েড টেরাকোটায় 'কাপল' (৪২ সেমি), ১৯৬৪-র কাঠের 'ওডালিস্ক' (৯০ সেমি) শীর্ষক কাজগুলিতে এই লৌকিক সারল্যের মধ্যে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের ছন্দের সংমিশ্রণ দেখি। এভাবেই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আরো বিস্তৃত হচ্ছে তাঁর ভাস্কর্যের বিশ্ব।

১০৭
১১১

একদিকে যেমন এই লৌকিক উত্তরাধিকার আত্তীকৃত হতে দেখি তেমনিভাবে ষাটের দশকে ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্যের প্রশান্তিকেও আনছেন তাঁর এতদিনকার পাশ্চাত্য রূপচেতনার অনুশীলনের পশ্চাৎপটে। ১৯৬২-র উপবিষ্ট বুদ্ধ বা ১৯৬৩-র দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তিতে থাকে এই স্থৈর্য ও প্রশান্তির প্রকাশ। এভাবেই ষাটের দশক পর্যন্ত দুই ভিন্ন উৎসের ছন্দের যে সমন্বয় তিনি আয়ত্ত করেছেন সেটাই বিকশিত হয়েছে তাঁর পরবর্তী ভাস্কর্যে।

১১০
৭-১০

সেই বিকাশের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এ লেখায় শুরু থেকেই আমরা কিছুটা দেখার চেষ্টা করেছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সামগ্রিক অবদান বিশ্লেষণের আগে কলকাতায় শিল্পের সংগঠক হিশেবে চিন্তামণি করের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা খানিকটা আলোকপাতের চেষ্টা করব।

ব্রিটেন থেকে কলকাতায় ফিরে এসে ১৯৫৬-তে চিন্তামণি কর গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট-এর অধ্যক্ষ হন। এবং ১৯৭৩ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রায় ১৮ বছর অধ্যক্ষ থাকাকালে অনেক ছাত্র তাঁর হাত দিয়ে তৈরি হন যাঁরা আজ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় ভাস্কর্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর এক সুযোগ্য ছাত্র অশেষ মিত্র ১৯৮৫-তে ইন্ডিয়ান মিউজিয়মে অনুষ্ঠিত চিন্তামণি করের পূর্বাপর প্রদর্শনীর স্মারকপত্রে তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন, "দ্য মোস্ট আউটস্ট্যান্ডিং কোয়ালিটি উই ফাউন্ড ইন হিম অ্যাজ আ টিচার ওয়াজ দ্যাট হি হ্যাড আ ন্যাচারাল ইনটিগ্রিটি, হাইলি ফ্লেভারড উইথ আ লভ ফর ম্যান।" শিক্ষক হিশেবে এই সংবেদন ছাড়াও সংঘবদ্ধ

১১১· চিন্তামণি কর। নায়িকা। ব্রোঞ্জ। ১৯৬০।

শিল্পপ্রয়াসের উদ্যোক্তা ও সংগঠক হিশেবেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

ষাটের দশকের শুরুতে তাঁরই উৎসাহে গড়ে উঠেছিল 'পেইন্টার্স অ্যান্ড স্কাল্পটার্স অ্যাসোসিয়েশন'। আর্ট কলেজের ছাত্রদের এক জায়গায় করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এই গ্রুপ। একটিই মাত্র প্রদর্শনী হয়েছিল এই সংস্থার ১৯৬২-র ২৩ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতার আর্টিস্ট্রি হাউজে। এতে চিত্রকর হিশেবে অংশ নিয়েছিলেন গণেশ পাইন, লালুপ্রসাদ সাউ, দেবীপ্রসাদ সাহা, জ্যোতিষ ভট্টাচার্য, সুভাষ সিংহরায়, অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী, ঈশা মহম্মদ, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীথি ঘোষ। এবং ভাস্কর হিশেবে ছিলেন চিন্তামণি কর, সুরজিৎ দাস ও হারাণচন্দ্র ঘোষ।

এরপর তাঁরই নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল স্কাল্পটার্স গিল্ড, বেঙ্গল। পরে এর নাম হয় স্কাল্পটার্স গিল্ড, ক্যালকাটা। কলকাতায় ৩০ জানুয়ারি ১৯৬৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই সংস্থার জন্ম হয়। পরে ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ তারিখের সভায় আগের দিনের সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়। সেই কার্যবিবরণীতে এরকম উল্লেখ ছিল—"আ জেনারেল মিটিং ওয়াজ কনভেনড অ্যাট 24 জওহরলাল নেহরু রোড, ক্যালকাটা অন 30 জানুয়ারি 1967 বাই দ্য আন্ডারসাইনড স্কাল্পটর্স উইথ দ্য অবজেক্ট টু ফর্ম আ স্কাল্পটর্স অ্যাসোসিয়েশন ইন বেঙ্গল বাই দ্য প্রাকটিসিং স্কাল্পটর্স অ্যান্ড স্টুডেন্ট স্কাল্পটর্স অব বেঙ্গল।" এই সভায় সভাপতিত্ব করেন চিন্তামণি কর এবং উপস্থিত ছিলেন—(১) চিন্তামণি কর, (২) দেবব্রত চক্রবর্তী, (৩) অনিট ঘোষ, (৪) মধুসূদন চক্রবর্তী, (৫) যুগলচন্দ্র পাল, (৬) দিলীপ সাহা, (৭) নিরঞ্জন প্রধান, (৮) বিমান দাস, (৯) সঞ্জয় দাস, (১০) মধুসূদন চ্যাটার্জি, (১১) অশেষ মিত্র ও (১২) সুরজিৎ দাস।

এই সংস্থারই দ্বিতীয় মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট-এর উদ্যানে ১৯৬৭-র ২৬ এপ্রিল থেকে ১০ মে। ৩০ এপ্রিল ১৯৬৭ তারিখের হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড কাগজে এই প্রদর্শনী সম্পর্কে লেখা হয়েছিল "উই ইন ক্যালকাটা সেলডম সি সাচ ওয়েল মাউন্টেড আর্ট শো অ্যাজ দ্য সেকন্ড ওপেন এয়ার একজিবিশন অব স্কাল্পচার বাই পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট স্টুডেন্টস অব শ্রী চিন্তামণি কর অ্যান্ড বাই কর হিমসেল্ফ নাউ বিং হেল্ড অ্যাট দ্য গার্ডেন অব গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ ক্যালকাটা।"

১১২· চিন্তামণি কর। এমব্রেস। টেরাকোটা। ১৯৫০।

১১৩· চিন্তামণি কর। ড্রয়িং।
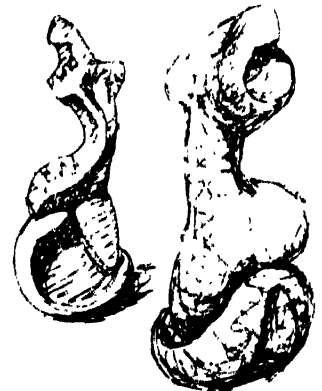
কিন্তু এই সংস্থারই সপ্তম প্রদর্শনী বলে যে প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭২-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত, দিল্লির 'আইফ্যাকস'-এর সেই প্রদর্শনীর স্মারকপত্রে এই সংস্থার পূর্ববর্তী মোট ছয়টি প্রদর্শনীর তালিকা দেওয়া আছে। সেই তালিকা নিম্নরূপ :

(১) প্রথম মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য প্রদর্শনী, কলকাতা-১৯৬০।

(২) গ্যালারির ভিতর (ইনডোর) ভাস্কর্য প্রদর্শনী, নিউদিল্লি-১৯৬৬।

(৩) দ্বিতীয় মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য প্রদর্শনী, কলকাতা-১৯৬৭।

(৪) তৃতীয় মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য প্রদর্শনী, কলকাতা-১৯৬৮।

(৫) চতুর্থ মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য প্রদর্শনী, কলকাতা-১৯৭০।

(৬) ইনডোর ভাস্কর্য প্রদর্শনী, কলকাতা-১৯৭১।

এই স্মারকপত্রেই আবার লেখা ছিল— "দ্য স্কাল্পটর্স গিল্ড ওয়াজ ফর্মড বাই আ গ্রুপ অব ইয়ং স্কাল্পটর্স অব ক্যালকাটা ইন দ্য ইয়ার 1960 উইথ দ্য অবজেক্ট টু কালটিভেট অ্যান্ড প্রোপাগেট দ্য আর্ট অব স্কাল্পচার ইন ইন্ডিয়া।" দিল্লির এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন দশজন ভাস্কর—দেবব্রত চক্রবর্তী, বিমান দাস, সুরজিৎ দাস, বিকাশ দেবনাথ, অনিট ঘোষ, করবী ঘোষ, চিন্তামণি কর, অশেষ মিত্র, নিরঞ্জন প্রধান ও দিলীপ সাহা। চিন্তামণি কর তখনো এই সংস্থার সভাপতি। এর পরে ১৯৯৪ পর্যন্ত এই সংস্থার আর কোনো প্রদর্শনী হয় নি।

কলকাতায় কেবল ভাস্করদের এই প্রথম একটি যৌথ সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন চিন্তামণি কর। এই তথ্যের কারণেই এখানে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হল বিষয়টি।

শিক্ষক হিশেবে, সংগঠক হিশেবে এবং শিল্পী হিশেবে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় ভাস্কর্যে চিন্তামণি করের অবদান অপরিসীম। ১৯৩০-৩১ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত প্রায় ৬৩ বছরের তাঁর ভাস্কর্যের যে বিকাশ তাকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি :

প্রথম পর্যায় : গিরিধারী মহাপাত্রের অধীনে করা (১৯৩০-৩১) কয়েকটি পরম্পরাগত ভাস্কর্য।

দ্বিতীয় পর্যায় : প্যারিসে শিক্ষালাভের পর (১৯৩৮-৩৯) চল্লিশ দশক পর্যন্ত প্রথাগত পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক রীতির মুখাবয়ব ও স্টাডি-ধর্মী কাজ।

তৃতীয় পর্যায় : চল্লিশ দশকে রদাঁর প্রভাবান্বিত মানবিক করুণার রূপকান্বিত স্বাভাবিকতা-ধর্মী কাজ।

চতুর্থ পর্যায় : চল্লিশের শেষ ও পঞ্চাশের দশকে এই স্বাভাবিকতাকে ভেঙে ব্রাঁকুসি ও বারবারা হেপওয়ার্থ অনুষঙ্গের সাংগীতিক ছন্দের স্ফুরণ।

পঞ্চম পর্যায় : ষাটের দশকের বাংলার লৌকিক সারল্যের সঞ্চার।

ষষ্ঠ পর্যায় : ওই দশকেই পাশ্চাত্য রূপবোধের সঙ্গে ভারতীয় ধ্রুপদী স্থৈর্যের সম্মিলন।

সপ্তম পর্যায় : সত্তর ও আশির দশকে উপরোক্ত পর্যায়গুলির পাশাপাশি এক শরীরী পূর্ণতায় জ্যামিতিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রতীকী উপস্থাপনা, ঋতু-ভাস্কর্য বা 'সবিতা ও উষা' যার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

তাঁর অজস্র কাজের নানামুখী বৈচিত্র্যকে কেবল বোঝার সুবিধার জন্যই আমরা এই কটি পর্যায়ে ভাগ করলাম। যদিও এধরণের বিভাগ কখনোই সম্পূর্ণ নয়। এবং সবসময়ই একাধিক পর্যায় একসঙ্গে মিশে থাকে।

চিন্তামণি করের ভাস্কর্য মূলত অবয়বী। অবয়বকে ভেঙেই তিনি ছন্দের বিন্যাস ঘটিয়েছেন। সম্পূর্ণ বিমূর্ততার দিকে গেছেন খুবই কম। ইওরোপের শিক্ষা থেকে তিনি পেয়েছিলেন স্বতন্ত্র ও স্বরাট শিল্প হিশেবে ভাস্কর্যের নিহিত ছন্দের বোধ এবং ভারতীয় ভাস্কর্য থেকে পেয়েছিলেন ধ্রুপদী প্রশান্তির বোধ। এই দুটি দিককে তিনি মেলাতে চেষ্টা করেছেন। কখনো কখনো তা এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে যে দ্বন্দ্ব সমন্বিত হয় নি, ১৯৯৩-এর 'সবিতা ও উষা'-তে যা আমরা দেখেছি। তাঁর ছাত্রদের মধ্য দিয়ে ভাস্কর্যের অবয়ব-নিরপেক্ষ নিহিত ছন্দটিকেই তিনি পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন।

তাঁর সবসময়ই ছিল এক ধ্রুপদী চেতনা। এক বিস্তীর্ণ বিক্ষোভময় সময়ের মধ্যে ভারত ও পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রে কাটিয়েও এই সভ্যতার ধ্বংস ও ক্ষয়ের দিক তাঁকে খুব একটা স্পর্শ করে নি। সেই ধ্বংসাত্মক দিকের প্রত্যক্ষ কোনো প্রকাশ তাঁর শিল্পে খুব কমই ঘটেছে। তিনি এক শাশ্বত সৌন্দর্যের কেন্দ্র খুঁজেছেন আজীবন।

১১৪· চিন্তামণি কর। মিথুন। কাঠ। ১৯৮৩।
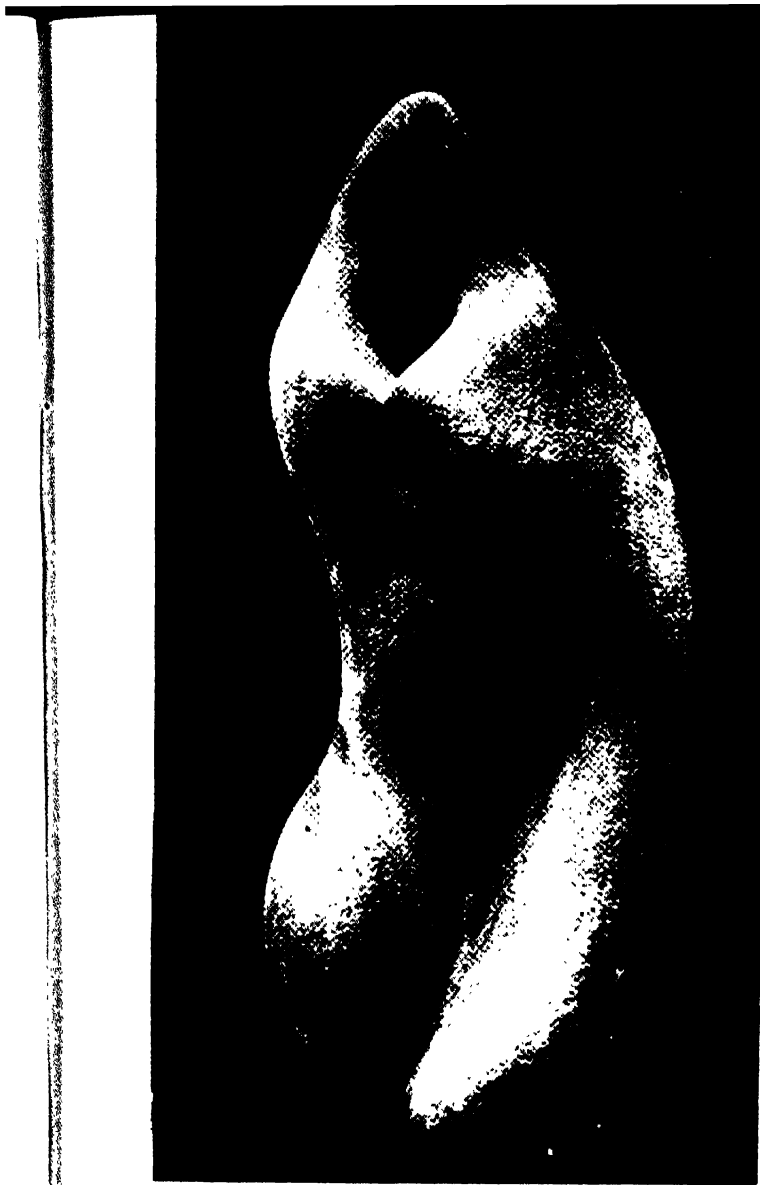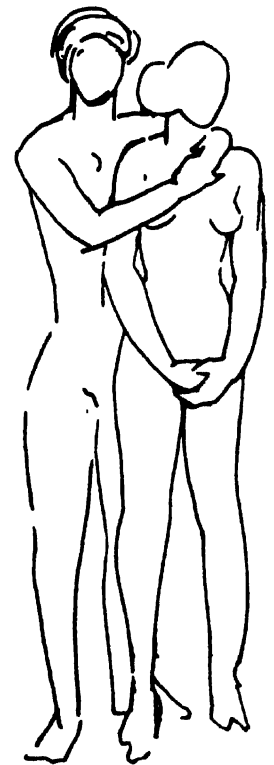
১১৫· চিন্তামণি কর। ড্রয়িং।

তবে শঙ্কা, উদ্বেগ, বিক্ষোভ ইত্যাদি বাস্তবতাসঞ্জাত নেতি-র দিক তাঁর কাজে যে একেবারে প্রতিফলিত হয় নি, তা নয়। কখনো কখনো তা এসেছে। যেমন দৃষ্টান্ত হিশেবে উল্লেখ করা যায় ১৯৬৯-এ করা অ্যালুমিনিয়ামের 'নকটার্ন' শীর্ষক ভাস্কর্যটি। ১৯৭০-এ গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের উদ্যানে অনুষ্ঠিত (১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ) 'স্কাল্পটার্স গিল্ড'-এর চতুর্থ মুক্তাঙ্গন প্রদর্শনীতে এটি দেখানো হয়েছিল। যথেষ্ট প্রশংসাও অর্জন করেছিল এই কাজ। স্টেটসম্যান পত্রিকায় (১০ মার্চ, ১৯৭০) আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল— "মিঃ চিন্তামণি করস অ্যালুমিনিয়াম ওয়র্ক 'নকটার্ন' বেসিক্যালি অ্যান এক্সপেরিমেন্ট অব এনক্লোজিং অ্যান এম্পটি স্পেস উইথ আ পেয়ার অব কার্ভড শেপস, জয়েনড

টুগেদার অ্যাট দ্য বটম, ইজ অ্যাট্রাকটিভ।” কিন্তু এটি নিছক দুটি ‘কার্ভড সেপ’-এর সমাহারই শুধু ছিল না। দুটি মুখের অভিব্যক্তির আদলে ধরা ছিল অশুভ এক অন্ধকারের ইঙ্গিত। এভাবে অশুভের পদসঞ্চার মাঝে মাঝে ঘটলেও, এক ধ্রুপদী সমন্বয়ের সন্ধানই তাঁর মূল সুর।

ব্যক্তিগত সত্যকে তিনি শাশ্বত সত্যের সঙ্গে অন্বিত করে নিতে পেরেছেন, সেখানে প্রবহমান সময়ের সত্য বা সামাজিক সত্য এতই অন্তর্লীন থাকে বা প্রচ্ছন্ন থাকে যে সব সময় তাকে উপর থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু সময়ের সেই সারাৎসার রূপাবয়বের ভিতর কোথাও মিশে থাকে নিশ্চয়ই। আর থাকে বলেই কোনো কোনো কাজ চিরন্তনতায় উদ্ভাসিত হয়। সব কাজে তা হয় না।

শঙ্খ চৌধুরীর ভাস্কর্য: ঐতিহ্য ও আধুনিকতা

এক

'গোটা-মানুষের অনেকটা আদল'

"এই একজন মানুষের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল গোটা-মানুষের অনেকটা আদল, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে কী ধরণের মানুষ হবার কথা ছিল তার একটা নমুনা যেন।" —ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরী সম্পর্কে কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন এ-কথা তাঁর 'জার্নাল'-এর এক স্মৃতিচারণায়। ভাস্কর হিশেবে শঙ্খ চৌধুরীর সৃজনশীলতার গুরুত্বের পাশাপাশি সমকালীন ভারতবর্ষে শিল্পকলার একজন সংগঠক, কর্মী ও সর্বোপরি শিক্ষক হিশেবে তাঁর অবদানকে যদি মনে রাখি, তাহলে এই 'গোটা-মানুষের অনেকটা আদল' কথাটির তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হয় না আমাদের। আর এর পরের কয়েকটি লাইনেই কবি শঙ্খ এঁকেছেন এই ভাস্করের বাইরের আদলের খানিকটা রূপরেখা, ব্যক্তি-মানুষটিকে জানতে কিছুটা সাহায্য করে তা। "মন কেড়ে নেয় এঁর প্রাণখোলা সহজ হাসি, আক্ষরিক অর্থেই ফোয়ারার মতো উথলে ওঠা, আর সবচেয়ে মজা এই যে, হাসিটা প্রবলভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে ওঁর শারীরিক দাপাদাপিতে। শান্তিনিকেতনকে আবাল্য ভালোবেসেছেন বলে, একে বকাবকি করেন সব সময়, কিন্তু সেসব বচন গায়ে লাগবে এমন কেউ আর নেই বড়ো।" 'ফোয়ারার মতো উথলে ওঠা' এই 'প্রাণখোলা সহজ হাসি' আমাদের মনে পড়াতে পারে তাঁর গুরু রামকিঙ্করের সঙ্গে এক সাযুজ্যের কথাও। তাঁরও ছিল ভিন্ন ধরণের হলেও এরকমই উদাত্ত এক হাসি যা ঢেকে দিতে পারত মানুষের যে কোনো কলুষ ও মালিন্য। হাসির এই উদাত্ততার মধ্য দিয়ে গুরু-শিষ্যের এই যে যোগ, এর মধ্যে এক মহৎ প্রাণের ইঙ্গিত থাকে, যে মানবিক মহত্ত্ব শিল্পী হিশেবেও তাঁদের মহত্ত্বের ভিত্তি, গুরু-শিষ্য উভয়েরই।

এই লেখাটিরই প্রস্তুতি-পর্বে শঙ্খ চৌধুরীর সঙ্গে একদিন কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। ঘন্টাখানেকের নিবিষ্ট সেই আলাপচারিতার মধ্যে একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম এরকম: "ছাত্র হিশেবে রামকিঙ্করের কাছ থেকে আপনি কী পেয়েছেন বলে আপনার মনে হয়।" উত্তরে সেরকমই উদাত্ত হেসেছিলেন ভাস্কর শঙ্খ—

> "কী পাই নি জানি না··· হাঃ হাঃ হাঃ (হাসি) ··· মানে পেয়েছি ওঁর অদম্য উৎসাহ, কাজ করার শক্তি, আর ট্যালেন্ট পাই নি কিছু··· আর কি বলব··· একটা জিনিশ ছিল ওঁর··· he was completely .... ওই যে দুঃখে দুর্দশায় রয়েছেন, কিন্তু ওর হাবভাব কিছুতেই ওটা কিন্তু প্রকট হয় নি··· he looked very... অত্যন্ত সংযত, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত··· কখনো রাগেন নি, কক্ষনো না। আমরা··· খুব চটে যেতাম মাঝে মাঝে··· কি হচ্ছে পাগলামি··· আঃ হাঃ একটু চা খাওয়া যাক··· বোসো বোসো···।"

বলার এই বিষয়ে, উচ্চারণের বিন্যাস ও ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে দুই শিল্পীরই চেতনার সারাৎসার। আর এটাও হয়তো আর একটা মিল দুজনের— কথা বলার এই অগোছালো ভঙ্গি। কোনো একটি বাক্যও নিপুণতায় শেষ করা হয় না। চিন্তার গতি উচ্চারণের গতিকে ছাপিয়ে যায়। শব্দবন্ধ হয়ে ওঠে অসংবদ্ধ। আর ওই অসংবদ্ধতায়, শব্দ থেকে শব্দান্তর বা বাক্য থেকে বাক্যান্তরের মধ্যবর্তী শূন্যতায়, হাসির গমকে কখনো-বা ভরে থাকে যা, পরিস্ফুট হয় সেই বাক্যবন্ধেরই স্বতন্ত্র এক মাত্রা। অবশ্য তুলনায় শঙ্খ চৌধরীকে আপাতভাবে মনে হতে পারে অনেকটা পরিশীলিত, ব্যবহারিক দিক থেকে বাস্তববোধসম্পন্ন। সেই পার্থক্য ধরা থাকে দুজনের শিল্পের প্রকাশেও। ঘনীভূত আবেগ ও মননের ভারসাম্যে

১১৬· শঙ্খ চৌধুরী। আহ্লাদী। টেরাকোটা। ১৯৫২।

অনির্বচনীয় রামকিঙ্কর। জীবনস্রোতের উজ্জ্বলতা সফেন দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে থাকে তাঁর ভাস্কর্যে। আর শঙ্খ চৌধুরীর কাজে আবেগকে ছাপিয়ে থাকে মেধা। যুক্তিনির্ভর যন্ত্রযুগের প্রযুক্তিগত চেতনার জয় ঘোষণা থাকে সেখানে।

শান্তিনিকেতনই সৃষ্টি করেছিল এই দুই মানুষকে, এই দুই শিল্পীকে। আর গোটা-মানুষের অনেকটা 'আদল' কথাটির একটি তাৎপর্য হয়তো এরকম যে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মানবতাবোধের নির্যাসটিকে আত্মস্থ করেও শিল্পের নন্দনে তাঁরা আবিশ্ব চেতনাকে আত্মস্থ করতে পেরেছেন। বিশ্বদৃষ্টির কোনো বিশেষ মডেলে আটকে থাকেন নি, এমনকী শান্তিনিকেতনেরও নয়।

কয়েক বছর আগে কোনো এক সাপ্তাহিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন শঙ্খ চৌধুরী— "আমার কাজের মধ্যে শিক্ষকদের আপাতপ্রভাব খুঁজে পাবে না। যদি বল শ্রদ্ধা, অ্যাটিটুড টুওয়ার্ডস ওয়ার্ক, অ্যাজ আ ম্যান ট্রিমেন্ডাস রেসপেক্ট আছে মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু সম্বন্ধে।" এই 'অ্যাটিটুড টুওয়ার্ডস ওয়ার্ক'টাই তিনি পেয়েছেন শান্তিনিকেতন থেকে। নন্দলাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন— "বাস্তব অথচ বিমূর্ত— নন্দলালের কাজ ও শিক্ষার স্পিরিটটাই ছিল এখানে।" আর তাঁর মতে এটাই ছিল পার্থক্য তৎকালীন তথাকথিত ভারতীয়তা থেকে শান্তিনিকেতনের শিক্ষাধারার। তাঁর ভাষায় "সোসাইটির (অব ওরিয়েন্টাল আর্টস) সঙ্গে কলাভবনের কাজের প্রধান পার্থক্য হল যে দুটি প্রতিষ্ঠানই পুরাতনী শিল্পকলার রত্নভাণ্ডার মহামূল্য উত্তরাধিকার এটা স্বীকার করলেও, কলাভবনে সেই ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যকে ব্যবহার করার বাবুয়ানী শেখানো হত না।" এইসব উক্তি থেকে আর কিছু না হোক শিল্পের স্বরূপ ও ভারতীয়তার নন্দন সম্পর্কে তাঁর ধারণার একটা ইঙ্গিত উঠে আসে। আধুনিকতার যে স্পিরিটটাকে তিনি সারাজীবন ধরে আয়ত্ত করেছিলেন তার মধ্যে শান্তিনিকেতন, নন্দলাল বসু, ভারতীয়তার ঐতিহ্য, রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার এ সমস্তই ছিল, আবার এ সমস্তকে সমন্বিত করে এবং ছাপিয়ে আন্তর্জাতিকতায় অন্বিত এক বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচেতনাও ছিল। এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে শঙ্খ চৌধুরীর ভাস্কর্যের স্বরূপ।

কিন্তু ঐতিহ্যের দিকটা তাঁর ব্যক্তিত্ব বা তাঁর শিল্পের নন্দনে সবসময়ই খুব প্রচ্ছন্ন। ১৯৩৬-এ যখন তিনি প্রথম বিশ্বভারতীতে ছাত্র হিশেবে যোগ দেন, তখন সেখানে স্বাদেশিকতার প্রাধান্য ছিল, যেমন সারা দেশেই ছিল। তিনি

নিজেও এই রাজনৈতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ছাত্রজীবনে একবার জেলেও গিয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য। নন্দলালের নেতৃত্বে কলাভবন তখন স্বাদেশিকতাকে শিল্পের প্রধানতম একটি মাত্রা হিশেবে গণ্য করত। সেই আদর্শে বিশ্বাসী হয়েও শঙ্খ চৌধুরী রামকিঙ্করের মতো, হয়তো তাঁরই প্রেরণায়, শিল্পের এই সীমিত গণ্ডিকে মেনে নিতে পারেন নি। বাইরের বা আন্তর্জাতিকতার আলো হাওয়াকে আহ্বান করেছেন শিল্পের বিকাশের জন্য। ফলে আমাদের ভাস্কর্যে ঐতিহ্যের প্রভাব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি স্পষ্টতই জবাব দেন— সেটা আমাদের ভাবনার বিষয় হবে কেন? —"Why should we bother about it?—আমাদের ঐতিহ্য তো কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। সে তো থাকবেই।"

একদিকে দেশীয়তার অনুকরণ, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের অনুকরণ, এই দুই সীমাবদ্ধতার বাইরে তৃতীয় কোনো পথের উদ্ভাবন এটাই ছিল তাঁর সময়ে তাঁর সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ। রামকিঙ্কর পরবর্তী ভারতীয় ভাস্কর্য এই সমস্যারই সমাধান খুঁজেছে। রামকিঙ্করের পর যাঁরা এই তৃতীয় পথের সন্ধান করেছেন শঙ্খ চৌধুরী তাঁদের অন্যতম প্রধান। স্পষ্ট করেই তিনি বলেছেন বর্তমান লেখকের সঙ্গে সেই আলাপচারিতায়—

"আমাদের সময়… দুই শ্রেণীর লোক ছিল, এক দলকে বলত এরা রিভাইভালিস্ট, ওই যে ধরুন যত ইন্ডিয়ান ধারা, এই আমাদের সুধীর খাস্তগীরের কাজ, এগুলো সব এরা বলত রিভাইভালিস্ট। (এর বাইরে আর একটা যে পথ তাকে বলা হত) প্ল্যাজিয়ারিস্ট (plagiarist) বা যাই হোক। নিজের কিছু নেই। হয় এই করছো, নইলে ওই করছো। নিজের কিছু একটা যে হতে পারে থার্ড জিনিশ, সেই জিনিশটা কেউ ধরেই নি। আমরা সেইখানেই আরম্ভ করেছি। I think, this or that, I know what they are. আমি দুটোই জানি। আমাদের ট্রাডিশন আমি

১১৭· শঙ্খ চৌধুরী। মাই ফাদার। ১৯৪৫।

জানি, ইওরোপও আমি জানি। Independant of that একটা হতে পারে। That has been established that there is a thing as Indian Sculpture apart from all these things."

এই যে তৃতীয় পথ, এর মধ্যেও তাঁর অবদানের একটি বিশেষ ক্ষেত্র আছে বলে তিনি মনে করেন। কী সেটা? তাঁর কথায়—

"I have tried to exploit the spirit of Industrial age into my work... I have broken the barrier between art and technology."

কলকাতায় শঙ্খ চৌধুরীর ভাস্কর্য কোনো একক প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আমরা খুব বেশি দেখি নি এর আগে। এবার (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩) সেই সুযোগ হল তাঁর নিজেরই প্রচেষ্টায় আয়োজিত তথ্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত তাঁর প্রদর্শনীটিতে। এই প্রদর্শনীটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিশেষ করে সেই সব কাজ যাকে তিনি বলেছেন "spirit of industrial age", যার ভিতর দিয়ে শিল্প-নন্দন ও প্রযুক্তির সীমারেখাকে তিনি ভেঙেছেন। আবার দেখতে দেখতে এও আমরা বুঝেছি, যাকে তিনি যন্ত্র ও প্রযুক্তির প্রকাশ বলছেন, তা মোটেই যান্ত্রিক বা গাণিতিক নয়। এর মধ্য দিয়ে এক সুষম ছন্দের বিকাশ ঘটছে। যে ছন্দের মধ্যে আধুনিকতা যেমন, তেমনি এক ঐতিহ্যেরও অনুরণন আসছে। এক সমন্বয়ের প্রক্রিয়ারই ফল সেগুলো। কাজেই এই টেকনোলজি উদ্বুদ্ধ প্রকাশের মধ্যেও কেমন করে একটা রোমান্টিক চেতনা, সুষমাময় ছন্দের চেতনা, প্রকারান্তরে যেটা ঐতিহ্যচেতনারই বিশেষ এক স্ফুরণ, প্রকাশিত হয় সেটাই আমাদের আকৃষ্ট করে এবং মুগ্ধ করে। এর মধ্য দিয়েই আমরা পেয়ে যাই আমাদের সমকালীন ভাস্কর্যের বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য।

এই প্রদর্শনী উপলক্ষে শিল্পীও কিছুদিন কাটিয়ে গেলেন কলকাতায়। প্রদর্শনী শুরু হওয়ার আগে কেয়াতলায় ললিতকলা অ্যাকাডেমির কেন্দ্রে কয়েক দিন তিনি এসেছেন। তাঁর কাজগুলোকে যখন ফিনিশিং টাচ দিচ্ছেন তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। তিনি তাঁদের সামান্য নির্দেশ দিচ্ছেন। কখনো-বা গল্পগুজব করছেন। পরে প্রদর্শনীতেও নিয়মিত এসেছেন বিকেলে। এখানেই একদিন স্থির করে নেওয়া যায়—একদিন সকালে তাঁর সঙ্গে বসা যেতে পারে—নিবিষ্ট কিছু কথাবার্তার জন্য। ২৬ জানুয়ারি সকালে দক্ষিণ কলকাতার একটি ফ্ল্যাটে, যেখানে তিনি উঠেছেন, সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া যায়। নানা প্রসঙ্গে প্রায় ঘন্টাদেড়েক কথাবার্তা হতে পারে। এই সাক্ষাৎকারই হবে এই লেখার তথ্যের অন্যতম উৎস।

শঙ্খ চৌধুরীর জন্ম ১৯১৬-তে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দেওঘরে। বয়স এখন ৭৬ ছাড়িয়েছে (১৯৯৩ সালে)। কিন্তু কথাবার্তা, চলা-ফেরায় এখনও তারুণ্যের দীপ্ত উচ্ছলতা। চা বা কফি খেতে ভালোবাসেন খুব। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বলে উঠতে শুনেছি— 'নাউ ইট ইজ হাই টাইম ফর আ কাপ অব টি'। আর হয়তো একটু কড়াই পছন্দ করেন। মনে পড়বে শঙ্খ ঘোষ 'জার্নাল'-এ রহস্য করে লিখেছেন, "এখানে চা খেতে খেতে শঙ্খ চৌধুরী যেমন বলেছিলেন: আমার একটু কড়া দরকার, আমরা তো ভাস্কর, আমাদের একটু 'বডি' চাই।" এই কথাটিকেও টেনে নিয়ে যাওয়া যায় তাঁর ভাস্কর্যের অ্যাপ্রিসিয়েশনে। এই 'বডি', সলিডিটি ও ম্যাস, ভর ও আয়তন সমন্বিত ভাস্কর্যের যে মাত্রা, সেই ঋজুতার মধ্যেও শঙ্খ চৌধুরী কিন্তু তাঁর কাজে এক ধরণের লিরিসিজম বা গীতলতাকে মিলিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দিকটা খুব অনুভব করা যায়।

এখন এই ৭৬ বছর বয়সে তাঁর শরীর হয়তো মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে কিন্তু তাঁর মনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা এতই অদম্য যে তা তাঁকে কাহিল করতে পারে না। সাম্প্রতিক কলকাতায় যে প্রদর্শনীটির কথা বললাম, সেটাই তার প্রমাণ। এই কাজগুলোর আলোচনায় আমরা একটু পরে আসব। এখন এটুকু বলা যায়, শারীরিক এক সীমাবদ্ধতাই এই নির্দিষ্ট প্রকরণ ও আঙ্গিকটির দিকে তাঁকে নিয়ে গেছে। অসুস্থ ছিলেন কিছুদিন। বরোদায় গিয়েছিলেন বিশ্রামের জন্য। আর্থারাইটিসে কষ্ট পাচ্ছিলেন। দাঁড়িয়ে কাজ করা বা ভারী কাজ করা বারণ ছিল। তাই বসে বসে প্রথমে কাগজ পরে অ্যালুমিনিয়াম পাত ভাঁজ করে নতুন এক ধরণের কাজের উদ্ভাবন করলেন। পরে সেগুলিকেই রূপান্তরিত করলেন স্টেইনলেস স্টিলের পাতে।

এই উৎসাহ, নতুন উদ্ভাবনী ক্ষমতা তাঁর চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের একটি বৈশিষ্ট্য। সারা জীবন তিনি শুধু শিল্পসৃষ্টিই করেন নি, পাশাপাশি অনেক সংগঠনমূলক কাজেও ব্যাপৃত থেকেছেন। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কুড়ি বছর। ওখানকার ভাস্কর্য বিভাগটি গড়েছেন নিজ হাতে, যেটিকে এখন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান ভাস্কর্য শিক্ষাকেন্দ্র

বলা যায়। ললিতকলা অ্যাকাডেমির সভাপতি হিশেবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। দিল্লির কাছে গারহিতে ভাস্কর্যের একটি স্টুডিও করেছেন সরকারি সহযোগিতায়। তাঁর ছাত্ররা বলে থাকেন শিক্ষক হিশেবে তিনি অত্যন্ত কঠোর। রামকিঙ্করের সঙ্গে এ-ব্যাপারে তাঁর মিল আছে। শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তা ও সৃজনশীলতার স্ফূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া মুশকিল। এ জন্য, অনেকে বলেন, ছাত্র হিশেবে তাঁর কাছে টিকে থাকা কঠিন।

সারা জীবন ভাস্কর্য নিয়ে কাটিয়েও তাঁর সন্ধানের কোনো শেষ নেই। কোনো তৃপ্তিও নেই। ভাস্কর্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি আজও। বলেন, যদি কথাতেই বলা যেত, তাহলে তো এত পরিশ্রমের দরকারই হত না। আশা করেন এখনো, "হয়ত এর পরে আবো একটা কিছু বেরিয়ে যেতে পারে। এর পরে আমার খুব ইচ্ছে আছে একবার ট্রাইবাল এরিয়াতে গিয়ে, ওরা যেমন লোহা পিটিয়ে কাজ করে, ওদের সঙ্গে কাজ করা।" কিন্তু আবার সমস্যার কথাও ভাবেন— "আমাদের এনডোমেন্ট নেই, কিছু নেই, নিজে ইচ্ছে করলেই ত যাওয়া যায় না।"

এখানে উল্লেখ করা যায় ট্রাইবাল আর্ট বা আদিবাসী শিল্পকলারও একজন অনুরাগী সংগ্রাহক শঙ্খ চৌধুরী। আদিবাসী সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ তাঁর আছে দিল্লিতে নিজের বাড়িতে। দিল্লির প্রগতি ময়দানে গড়ে তুলেছেন ট্রাইবাল আর্টের একটি সংগ্রহালয়। তাঁর প্রতিভার বহুমুখিনতার এটাও একটা দিক।

এরকম তৃপ্তি ও অতৃপ্তি নিয়ে নিরলস সাধনায় গড়ে উঠেছে যে শিল্পীব্যক্তিত্ব তারই স্বরূপ বোঝাতে কবি শঙ্খ ঘোষ হয়তো ব্যবহার করেছিলেন 'গোটা-মানুষের অনেকটা আদল' এই শব্দবন্ধ।

দুই

শান্তিনিকেতন, রামকিঙ্কর

স্বভাবতই এই শৈল্পিক ও মানবিক সম্পূর্ণতার দিকে যেতে শান্তিনিকেতনের গভীর ভূমিকা আছে তাঁর জীবনে। শান্তিনিকেতনের সামগ্রিক পরিবেশ, নন্দলাল ও রামকিঙ্করের মতো ব্যক্তিত্ব তাঁকে প্রভাবিত করেছে গভীরভাবে। তাঁর স্মৃতিচারণায় রামকিঙ্কর প্রসঙ্গ, সমকালীন ভাস্কর্য সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহকে সব সময়ই উদ্দীপিত করে। যেমন তিনি বলেছেন আমাদের নেওয়া পূর্বোক্ত সেই সাক্ষাৎকারে, তার কিছু অংশ এখানে আমরা উদ্ধৃত করব। তথ্যের কারণেই এটা প্রয়োজনীয়। তার আগে আমরা সংক্ষেপে জানার চেষ্টা করব, তাঁর শৈশব ও কৈশোরের কোন পরিবেশ তাঁকে শিল্পের দিকে, বিশেষত ভাস্কর্যের দিকে ও শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসে।

তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি হিশেবে কমল সরকারের 'ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধটি খুবই প্রাসঙ্গিক। কয়েকটি তথ্য আমরা সেখান থেকেই নিচ্ছি। তাঁর জন্ম ১৯১৬-তে আমরা জেনেছি আগেই। তাঁর জন্ম যদিও দেওঘরে, কিন্তু তাঁর পিতৃপুরুষের আদি নিবাস ছিল পাবনা জেলার ভারেঙ্গায়। তাঁর পিতা—নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। মা—কিরণময়ী দেবী। পিতা ছিলেন ঢাকা শহরে অ্যাডভোকেট এবং সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। তাঁর মা প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর কন্যা। তাঁর অগ্রজ শচীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীও (১৯০৪-৬৬) একজন স্বনামখ্যাত মানুষ। তিনি ছিলেন একজন অর্থনীতিবিদ। বোম্বের ইকনমিক উইকলির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। জেনে রাখা ভালো শঙ্খ চৌধুরীরও এরকম একটি পোশাকি নাম আছে—নরনারায়ণ চৌধুরী। শঙ্খ ছিল তাঁর ডাক নাম, এটিই যে হয়ে উঠল তাঁর শিল্পী-নাম, কোনো কি তাৎপর্য আছে এর? তাঁর এক ছাত্র, ভাস্কর বিপুল সাহা রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন একবার—তাঁব নামের সঙ্গে তাঁর কাজের যেন একটা মিল আছে কোথায়। শঙ্খিলতার ছন্দের একটা অনুরণন তাঁর ভাস্কর্যে যেন অনুরণিত হয়।

এই ছন্দোময়তার সঙ্গে কি তাঁর রোম্যান্টিক চেতনার কোনো সম্পর্ক আছে? একটু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যায়। উদ্ধৃত করা যায় রামকিঙ্কর সম্পর্কে তাঁর একটি লেখার কিছু অংশ। যেখানে এই রোমান্টিকতার কথা তিনি স্বীকার করেছেন। আর বলেছেন শিল্পের প্রকাশে অনুকরণ ও উদ্ভাবনের যে পারস্পরিক সম্পর্ক সে সম্বন্ধে। প্রকাশ দাস সম্পাদিত 'রামকিঙ্কর' সংকলনে 'কিঙ্করদাকে যেমন দেখেছি' শীর্ষক এক লেখায় বলেছেন তিনি—

"ছেলেবেলায় দাদার দেওয়া অনেকগুলো বিলিতি ছবির বই দেখে বড়ো হয়েছি। মনে প্রাণে ওই যাকে বলা যায়

১১৮· শঙ্খ চৌধুরী। বার্ড। এবনি কাঠ। ১৯৫৫।
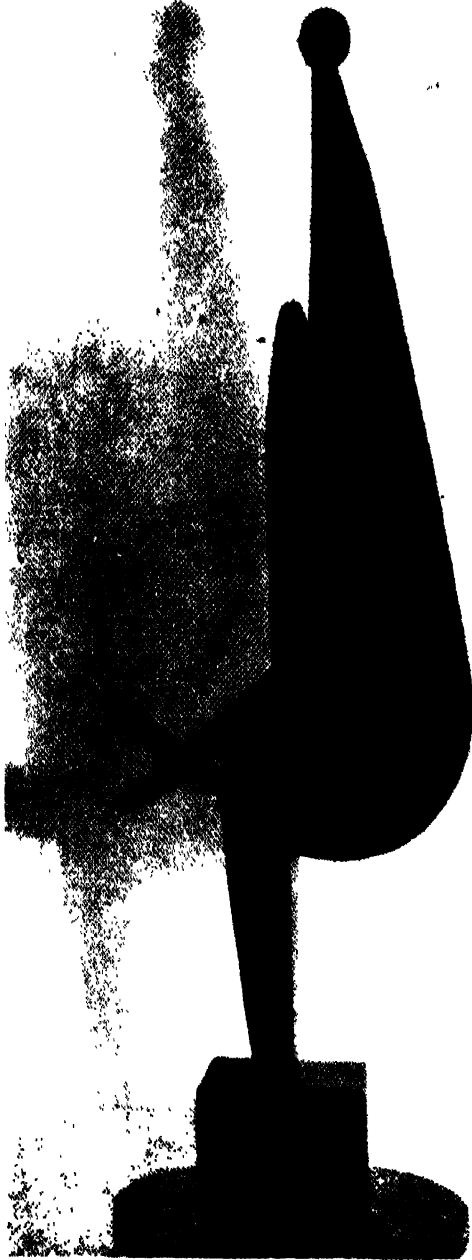
রোম্যান্টিক। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের রুচিবোধ তাতেই আকৃষ্ট। মসৃণ মুখকে এতো কাটাকুটি করে চেনা লোককে অচেনা করে দেওয়া বা মুখের আদল থেকেও মুখকে ডিজাইনে পরিণত করার মাহাত্ম্য মনে ধরতে চাইত না। ঐ সময়টায় এদিকে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের জের তখনও বর্তমান। স্বদেশী ছবি আর স্বদেশী মনোভাব গড়ে তোলার আদর্শ, খদ্দর পরা, খালি পায়ে চলা, বিদেশী সাবান তেল বর্জন করা—এসবের মধ্যে মানুষ। কিন্তু চোখে দেখা জিনিসের পুনরাবৃত্তির চেষ্টা যে অনুকরণ করা আর তাতে কৃতিত্ব নেই, ওটাও বিদেশী মনোভাবের পরিচয় দেয়, সেটা বুঝতে সময় লাগল।"

শিল্পের সত্তায় পৌঁছবার দিকে এই যাত্রায় রামকিঙ্কর তাঁর প্রধান পথপ্রদর্শক।

এই রামকিঙ্কর সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিচারণার কিছু অংশ এখানে আমরা শুনব, কেননা তথ্য হিশেবে সেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তার আগে আমরা জেনে নিতে চাই শৈশবে বা কৈশোরে কোন প্রেরণায় তিনি শিল্পের জগতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মুখেই আমরা বরং শুনি সে কথা—

"ছেলেবেলায় সবাই যেমন খেলেটেলে বেড়ায়, দু-চারটে কিছু করেটরে, সেরকমই একটু করেছি আর কি। তবে একটা জিনিশ, আমি অনেক বয়সে পড়াশুনো আরম্ভ করেছি। ছেলেবেলায় রুগ্ণ ছিলাম। আমার দিদিমার এক দিদি ছিলেন, বড় দিদিমা বলতাম। তিনি আমাকে একটা পাখি দিয়েছিলেন। আমি পাখিটাকে খাঁচার মধ্যে পুরে দানাটানা দিয়ে দেখতাম—খাচ্ছে নাকি। তারপরে বোধহয় তার দেখাদেখি আমিও একটা পাখিটাখি করেছিলাম।··· পরের দিকে স্কুলে ভরতি হওয়ার পরেও, অনেকদিন left to myself ছিলাম বলে, যা পেরেছি তাই করেছি। ইন ফ্যাক্ট আমার দুবার স্কুলে ভরতি হওয়ার সময় ডাক্তাররা বলেছে আনফিট. পড়াশুনা করা উচিত না। সেজন্য বোধহয় টু হোয়াইল অ্যাওয়ে মাই টাইম এই সব বিষয়ে ইনডালজ করেছি। আমার বাড়ি থেকে কখনো এ নিয়ে কেউ কিছু বলেন নি। আমার দাদা দেখেশুনে মনে করলেন, এ ছবি আঁকছে, আঁকুক। তিনি আমাকে আর্টের অনেক বই দিয়েছিলেন, রং-টং ইত্যাদি। প্লাস্টিসিন, টেরাস্টিসিন দিয়ে তখন আমি দুর্গাটুর্গা এসব করেছি আর কি—পজিটিভ কিছু নয়। পজিটিভ হল যখন আমার ম্যাট্রিকের পরে কি করব

ঠিক করতে হল। তখন আমি ঠিক করেছিলাম যে শান্তিনিকেতনে যাব।"

যদিও ছবি আঁকা শিখতেই তাঁর শান্তিনিকেতনে যাওয়া, কিন্তু ওখানে গিয়ে তিনি প্রথমে কলাভবনে না গিয়ে কলেজেই ভরতি হলেন। রবীন্দ্রনাথের নাতজামাই কৃষ্ণ কৃপালনী ছিলেন ওখানে তাঁর 'local guardian'। তাঁর দাদার পরে তিনিই ছিলেন তাঁর জীবনের স্তম্ভস্বরূপ। তাঁরই প্রেরণায় হয়তো খানিকটা, এসেছিল গ্রাজুয়েট হওয়ার দিকে ঝোঁক। ওখানে পড়তে পড়তেই রামকিঙ্করের কাজ দেখতেন নিয়মিত। আর সেই টানেই তাঁরও ভাস্কর্যের দিকে যাওয়া—

"ওখানে গিয়ে সামহাউ অর আদার আই ওয়াজ গোইং টুওয়ার্ডস স্কাল্পচার মেইনলি বিকজ অব কিঙ্করদা। আমাদের যেখানে ক্লাশ ছিল তার কাছেই মডেলিং শেখানো হত। কাজেই ইন বিটুইন ফ্রি পেরিয়ড উই ইউজড টু গো দেয়ার। এই সমস্ত করে বোধহয় আস্তে আস্তে ইনভলভমেন্টটা বেড়েছে। তারপরে তো যখন আমি ফাইনালি কলাভবনে ভরতি হলাম, তখন তো আবার নতুন করে সব জিনিশ শিখতে হল। তার আগে কিঙ্করদা যেসব কাজ করেছেন মোর অর লেস আই হেল্পড। তখনকার, আমি আর প্রভাস সেন।"

শঙ্খ চৌধুরী যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯৩৫-এ, তখন তাঁর বয়স ১৯। রামকিঙ্করের বয়স তখন ২৯। সে বছরই তিনি দিল্লির মডেল স্কুলের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছেন। সেই সময় শঙ্খ চৌধুরীকে মুগ্ধ করত তাঁর বড় বড় তেলরঙের ছবি। সিল্ক-এর উপর বড় বড় পেইন্টিং করতেন। সুধীর খাস্তগীরের একটা বড় পোর্ট্রেট করেছিলেন—গোল্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে ড্রেসিং গাউন পরে। অসামান্য ছবি বলে মনে হয়েছিল। এরকম আরো দুটি ছবি ছিল— 'কোনার্কের পথে', আর একটি সাঁওতালের ছবি। সাঁওতালের ছবিটি বম্বের এক ভদ্রলোক কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখনো আছে। কিন্তু কারুর দেখার সুযোগ নেই। এই সব ছবি মুগ্ধ করত তাঁকে।

কিন্তু ভাস্কর্যে কিসের জোরে এতটা অভিঘাত আনতে পেরেছিলেন রামকিঙ্কর? এর উত্তর আমরা শুনে নিতে পারি শঙ্খ চৌধুরীর মুখে—

"কিসের জোরে মানে··· আমরা যে ধরণের মাটির কাজ দেখেছি উনি তার চেয়ে অন্য ধরণের কাজ করতেন। যেমন উনি··· হি উড ওয়র্ক উইদাউট অ্যান আর্মেচার।

১১৯· শঙ্খ চৌধুরী। সিস্টারস। কাঠ। ১৯৫২।

১২০· শঙ্খ চৌধুরী। পিকক। ধাতব পাত। ১৯৯২।

প্রথম স্টেজে উনি কোনোদিন আর্মেচার দিয়ে ম্যাকেট করা ইত্যাদি করেন নি। উনি মাটির একটা ব্লক করে, খুব ঠেসে ঠেসে মাটির একটা ব্লক করে তার থেকে মোর অর লেস স্প্যাচুলা দিয়ে কেটে কেটে করতেন। তাই ক্লিন একটা ক্রিস্টাল টাইপ একটা স্ট্রাকচার হত। সেই কোয়ালিটিটা আর কোথাও আমি দেখি নি। পরে দেখলাম ওই বুর্দেল-টুর্দেল ধরণের বোধহয়। যাই হোক ফ্রম হুএভার হি মাইট হ্যাভ লার্ন্ট, বাট হি মাস্টার্ড দ্যাট। আর পোর্ট্রেট-ট্রোর্ট্রেটও খুব ফস করে করতে পারতেন। করছেন আবার ভাঙছেন। একটা পোর্ট্রেট দু-ঘন্টার সিটিং-এ হয়ে যায় উনি দেড়মাস লাগাচ্ছেন তাতে। আমরা খালি ভাবতাম, করছেন কি? ডিস্টর্শন জিনিশটা যে··· ওঁর কাজে··· আনলেস ইউ ক্রিয়েট আ থিং, ডিস্টর্ট তো হতে পারে না···· ডিস্টর্শন ইজ নট আ সুইফ্‌ট সট ডেসক্রিপশন অব দ্য থিং। সেদিকটায় ওঁর অদ্ভুত পাওয়ার ছিল কাজে।··· তারপর উনি বলতেন, দেখ এই যে মেজারমেন্ট তার লিমিটেশন কি, কতগুলো স্কিন কোয়ালিটি আছে তাতে আলো পড়লে মুখের ভল্যুম বড় দেখায়। এই যে সমস্ত সাটল সব জিনিশ।··· তারপর ওই যে আউটডোর কাজ জিনিশটা তার যে বেনিফিট··· ডিরেক্ট সানলাইট পড়ে ব্লাইন্ডিং হয়ে যায়, আরো ফ্ল্যাট হয়ে যায়, সেজন্য আরো ডিপ ফ্ল্যাট করতে হয়। এই যে সব জিনিশগুলো··· টেকনিক্যাল দিক, ভেরি ভাইটাল থিং, কে বুঝবে আমি জানি না।··· তবে কাজ করতে করতে···।”

রামকিঙ্করকে এভাবে কাজ করতে দেখাটাই ছিল তাঁর কাছে একটা বড় শিক্ষা। তিনি নিজে অবশ্য হাতে ধরে শেখাতেন না বিশেষ কিছু। কেবল বলতেন, ‘করে যাও, করে যাও’ আর মাঝে মাঝে এসে ভেঙে দিতেন। আসলে উনি দেখতে চাইতেন, যেটা হয়েছে সেটা কি হঠাৎ হয়ে গেছে, না এর পেছনে সচেষ্ট প্রয়াস কাজ করেছে।

কিন্তু রামকিঙ্করের কাজের মূল যে শক্তি, তার উৎস কী? আমাদের অনেক সময়ই মনে হয় ভারতীয় জীবনধারায় আদিমতার যে অভিব্যক্তি, তা থেকেই তিনি তা আহরণ করেছেন। শঙ্খ চৌধুরী অবশ্য নির্দ্বিধায় বলেন, এর উৎস বুর্দেল। — “আমার তো ধারণা।··· জিনিশটা··· মেইন স্ট্রেংথ··· আই অ্যাম কনভিনসড নাউ··· দিস স্টার্টেড ফ্রম বুর্দেল।” কিন্তু ভারতীয়তার গুণাবলী বা প্রভাব কি কিছুই নেই তাঁর কাজে? কোনার্কের প্রভাবের কথা অবশ্য স্বীকার করেন শঙ্খ চৌধুরী। “কোনার্ক ওঁকে খুব ইনফ্লুয়েন্স

করেছে··· কোনার্কে উপরে যে মিউজিসিয়ান গ্রুপ আছে, তাদের সমস্ত ট্রিটমেন্ট, ভল্যুম—ওঁকে খুব ইমপ্রেস করেছে।"

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কলাভবনে রামকিঙ্করের সান্নিধ্যে থাকতে থাকতেই চলেছে তাঁর নিজেরও শেখা। নিজের কাজ বলতে তখন কিছু পোর্ট্রেট করেছেন। রচনাধর্মী কাজ কমই করেছেন তখন। শেষের দিকে করেছিলেন একটা। রামকিঙ্করের কাছ থেকে এটাও তাঁর শিক্ষা—যে কত বৈচিত্র্যময় বিষয় নিয়ে ভাস্কর্য করা যায়, সেটা রামকিঙ্কর দেখিয়েছেন। সেটা তিনি তাঁর ছাত্রদেরও বলতেন। বলতেন, যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে অন্তত দশ রকমভাবে মূর্তি করতে।

কলাভবনে শিক্ষানবিশির মধ্য দিয়ে কেমন করে তিনি আয়ত্ত করছেন ভাস্কর্যের মূলগত বৈশিষ্ট্য এর দৃষ্টান্ত হিশেবে উল্লেখ করা যায় দুটি কাজের কথা। দুটিই ১৯৪৫-এ করা। 'মাই ফাদার' শীর্ষক মুখাবয়ব ভাস্কর্যটির ১১৭ ব্রোঞ্জ করেছিলেন পরে। স্বাভাবিকতার মধ্যেও সামান্য ডিস্টর্শন বা ভাঙনে অভিব্যক্তির মোচড় এনেছিলেন। তলবিন্যাসের ঋজুতা, তলসংযুক্তির কৌণিকতা, আলোর প্রক্ষেপকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তাতে রূপায়িত চরিত্রের ব্যক্তিত্বের নির্যাস উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রামকিঙ্করের পর আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যে শঙ্খ চৌধুরী বিমূর্ততার সফলতম রূপকার বলে প্রখ্যাত। কিন্তু পোর্ট্রেট স্কাল্পচারেও তাঁর সফলতা যে অসামান্য এর পরিচয় রয়েছে ১৯৬৬-র খান আব্দুল গফ্ফর খানের মুখাবয়বে বা নাইজিরিয়ায় করা গান্ধীজির মূর্তিতে। 'মাই ফাদার; মুখাবয়বটিতে সেই সফলতারই প্রস্তুতিপর্ব ধরা আছে। দ্বিতীয় কাজটির নাম 'উওম্যান উইথ পিচার'। সিমেন্টে করা। আলম্ব দণ্ডায়মান এক নারীমূর্তি। মাথার উপরে কলসি। স্তিমিত শীতল প্রশান্তি ছড়ানো শরীরে। ধ্রুপদী স্থৈর্যের দিকে যাওয়ার প্রবণতা এখানে।

১৯৪৯-এ বম্বেতে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। মোট ২০টি ভাস্কর্য ছিল। মূলত মাটি ও সিমেন্টের কাজই ছিল এখানে। অন্য কোনো মাধ্যম নিয়ে তখনো বিশেষ কাজ করছেন না। ইতিমধ্যে অবশ্য নেপাল গিয়েছিলেন রামকিঙ্কর ওখানে গিয়েছিলেন 'ওয়ার মেমোরিয়াল' বিষয়ক একটি ভাস্কর্যের অর্ডার নিয়ে। তাঁকে সেখানে সাহায্য করেছেন শঙ্খ। ব্রোঞ্জে ঢালাই-এর পদ্ধতিও অনেকটা রপ্ত হয় সেখানে।

১২১ শঙ্খ চৌধুরী। মোরগ। ধাতব পাত। ১৯৯২

১৯৪৮-এ শঙ্খ চৌধুরী আরো পাঁচ জন তরুণ শিল্পীর সঙ্গে একটা সরকারি স্কলারশিপ পান। শর্ত ছিল, যে কাজ করবেন সরকারের প্রথম সুযোগ থাকবে তা কেনাব। তখনো মাটিতেই কাজ করেছিলেন। ব্রোঞ্জ করার জন্য মোমেও ছাঁচ করেছিলেন, কিন্তু ব্রোঞ্জ করা হয় নি। চ্যানেল করাব ব্যাপারগুলো তখনো আয়ত্ত হয় নি।

বম্বের প্রদর্শনী খুব সাড়া জাগিয়েছিল। 'রেনেসাঁস ইন ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার' বলে প্রশংসা হয়েছিল কোনো কোনো মহলে। কিন্তু সেই সঙ্গে উঠেছিল পাশ্চাত্য প্রভাবের কথাও। জাডকিন বা ব্রাঁকুসির প্রভাবের কথা বলা হয়েছিল খুব। শুনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদ করাব উপায় ছিল না। কেননা তখনো তো পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাস্কর্যের সঙ্গে তেমন পরিচয়ই হয় নি। যদিও শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আগেই বই-এর মধ্য দিয়ে তিনি জেনেছিলেন আধুনিক ভাস্কর্যের নানা তথ্য। তবু বম্বের সমালোচনা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে—ইওরোপ গিয়ে সেখানকার শিল্পীদের মূল কাজ দেখে আসার জন্য। আধুনিক পৃথিবীর করণকৌশল সম্পর্কে জানারও প্রয়োজন অনুভব করেছেন। এই সব মিলিয়েই যাওয়ার তাগিদ। বম্বের প্রদর্শনীতে বিক্রি হয়েছিল ৬০০ টাকা। আপাতত সেটাই ছিল পাথেয়। তা দিয়েই জাহাজের ডরমিটরি ক্লাশের টিকিট কাটলেন। বাড়ি থেকে কোনো সাহায্য নেন নি। ৩০ বছর বয়স হয়ে গেছে তখন। সংকোচ এসে গেছে কিরকম। আর কিছু টাকা অবশ্য পেয়েছিলেন পরিচিত অন্য সূত্র থেকে। এই সম্বল নিয়েই ইওরোপ পাড়ি দিলেন ১৯৪৯-এ।

তিন

ভাস্কর্যের বিশ্ব

প্রথমে পৌঁছেছিলেন লন্ডনে। দশ মাস ছিলেন ওখানে। হেনরি ম্যুরের প্রথম যে কাজটি দেখেছিলেন, সেটি অবশ্য তাঁকে ততটা উদ্দীপিত করে নি। কাজটি ছিল ছোট আয়তনের। আর মনে হয়েছিল শেষ করা হয় নি যেন। ভেবেছিলেন, বিশাল মনুমেন্টাল সব কাজ দেখবেন। যাই হোক, পরে পরিচয় হল হেনরি ম্যুরের সঙ্গে। চিঠি লিখে যখন জানালেন, তাঁর কাছে যেতে চান একদিন, হেনরি ম্যুর উত্তরে জানিয়েছিলেন কবে তিনি থাকবেন। তারপর নিজে স্টেশনে এসেছেন। আবার ফেরার সময় পৌঁছেও দিয়েছেন। এই মহানুভবতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

হেনরি ম্যুর জিজ্ঞাসা করলেন একদিন পাথর কাটতে পারেন কিনা। পারেন না, জানালেন। ম্যুর বলেছিলেন, 'কাটো পাথর, দেখো কি হয়।' বলেছিলেন, 'যদি থেকে যেতে পার এখানে, কাজের ব্যবস্থা করতে পারি আমরা।' ফ্র্যাঙ্ক ডবশনও বলেছেন এরকম। কিন্তু পাকাপাকিভাবে থাকার চিন্তা মাথায় ছিল না। স্টোন কার্ভিং শুরু করলেন, রয়াল কলেজে একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। পরে এক বন্ধুর সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা হয়। ওখানে থেকে পাথর কাটার তালিম নিতেন, কখনো কোনো বন্ধস-হাইডে, কখনো-বা শুভানুধ্যায়ী এক চিকিৎসকের বাড়িতে।

অদম্য উৎসাহ ছিল তখন। ভাবতেন সুযোগ পেয়েছেন যখন ছাড়বেন না। হেনরি ম্যুরের কাজ খুবই অনুপ্রাণিত করত তাঁকে। পরে যখন প্যারিসে গেলেন, তখন মুগ্ধ করলেন ব্রাঁকুসি। আরো একজন ভাস্করের কাজ তাঁর খুব পছন্দ। তিনি হচ্ছেন বেওতি। বেওতির জন্ম হাঙ্গেরিতে। বাস করতেন প্যারিসে। তাঁর কাঠের কাজ খুবই আকৃষ্ট করত শঙ্খ চৌধুরীকে। পাতলা কাঠ কেটে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নানারকম কাজ করতেন তিনি। এই শিল্পীর কথা তিনি খুবই বলেন। রামকিঙ্করের সঙ্গে তাঁর সংযোগের কথা লিখেছিলেন এক প্রবন্ধে ('রামকিঙ্করের ভাস্কর্য' —দেশ ৩ জানুয়ারি ১৯৮৭)। সেই অংশটি এখানে আমরা দেখে নিতে পারি, যাতে রামকিঙ্করের মহত্ত্বও অনুধাবন করা যায়।

> "১৯৫০ সালে Realite Nouvelle বলে এক শিল্পীগোষ্ঠীর আমন্ত্রণে রামকিঙ্করের কয়েকটা ছবি ওঁদের প্রদর্শনীতে দেখান হয়। তখন প্যারিসে যাঁরা শিল্প নিয়ে নতুন রাস্তা ও তত্ত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁদের কাছে এই অজানা ভারতীয় শিল্পী অসাধারণ কৌতূহল সৃষ্টি করে। গোষ্ঠীর প্রধান উদ্যোক্তা মঁশিয়ে বেওতি।... এরা সবাই ওদেশের প্রচলিত প্যারিসের ঘরানা বা Ecole d'Paris-এর অন্তর্ভুক্ত। মঁশিয়ে বেওতি Realite Nouvelle-এর তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানিয়ে রামকিঙ্করকে এক চিঠি লেখেন। কিঙ্করদার বিষয় আশয় যেমন থাকত, হয়ত বা কোনো আবর্জনার সঙ্গে সে চিঠি চলে গেছে। চিঠির বিষয়বস্তুই তখনকার ওঁর কাজের সব চাইতে

রঙিন ছবি ১২· শঙ্খ চৌধুরী। ফিগার। কাঠ। ১৯৫৬।
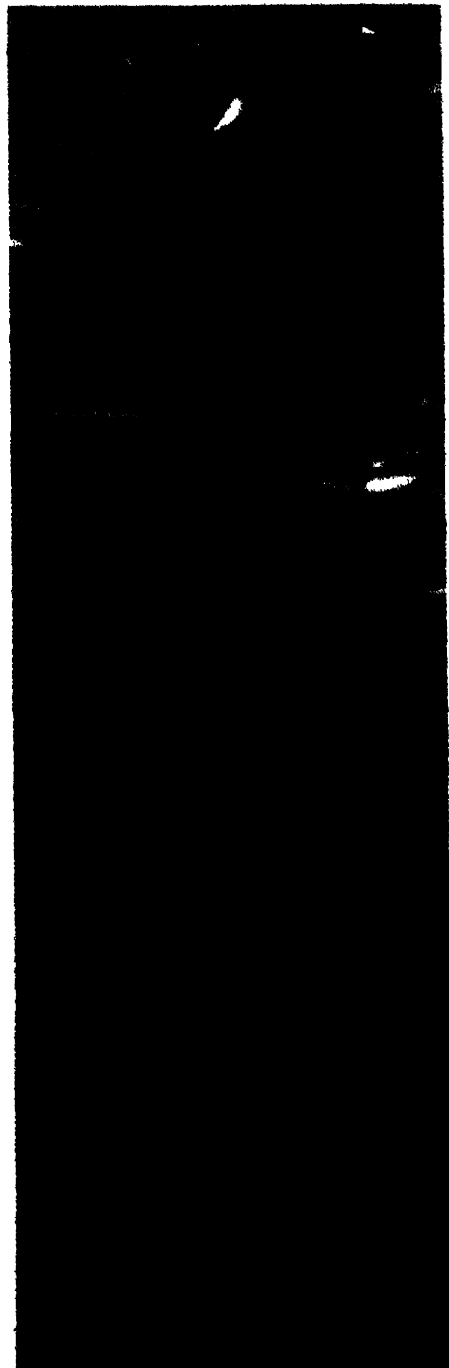
রঙিন ছবি ১৩· শঙ্খ চৌধুরী। কেমিস্ট। ব্রাস। ১৯৬১।

উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি। ওঁদের মতে আর্ট-এর ক্ষেত্রে নতুন মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যে যাঁরা সমাজের প্রাচীনপন্থীদের ও শিল্পকর্তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন, তাঁরা জানেন ইউরোপ ও প্যারিসের মতো জায়গাতে এ-কাজ কত কঠিন।"

শঙ্খ চৌধুরী ভাস্কর্যের নান্দনিকতা সম্পর্কে যখন কথা বলেন, তখন বিষয় বা দর্শন নয়, ফর্ম বা রূপবন্ধই তাঁর আলোচনায় গুরুত্ব পায়। ফলে তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা যায়, ব্রাকুসির ভাস্কর্যের কোন গুণাবলী তাঁকে অনুপ্রাণিত করে, তখন তিনি 'পালিশড়, স্মুথ, ট্রিটমেন্ট অব অ্যাবস্ট্রাকশন'-এর কথাই শুধু বলেন।

কিন্তু ইওরোপের ভাস্করদের মূল কাজ দেখা তাঁকে একটা সিদ্ধান্তে নিয়ে এল যে আমাদের সনাতন ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিকতার একটা নিকট সম্পর্ক আছে। বিরোধ নেই তেমন। ইংলিশ রিয়ালিজম বা রিয়ালিস্টিক অ্যাকাডেমিজম থেকে হেনরি ম্যুর যখন বেরিয়ে এলেন, তখন টানাগ্রা ও পরে ইট্রাসকান ভাস্কর্য তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। শঙ্খ চৌধুরী মনে করেন, এই ইট্রাসকান, টানাগ্রার সঙ্গে আমাদের মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার সাযুজ্য আছে। হেনরি ম্যুর যেমন রিয়ালিজম ছাড়িয়ে খানিকটা অ্যাবস্ট্রাকশন বা বিমূর্ততার দিকে গেলেন, আমাদের ভারতীয় ভাস্কর্যও তাই।

আধুনিকতার এই কনসেপ্ট বা প্রত্যয়কেই শঙ্খ চৌধুরীর প্রজন্মের ভাস্কররা গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই এর মধ্যে প্যারিসের প্রভাব যখন কেউ দেখেন, তা মানতে পারেন না তিনি। তিনি বলেন—

"আমাদের ট্র্যাডিশন এরকমই ছিল। ইংরেজদের অ্যাকাডেমিক রিয়ালিজম আমাদের উপর চাপানো হয়েছিল। ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স থেকে আমরা যেমন শাহেবদের টাই পরা দেখেছি, সেইরকম ছবি আঁকাও শিখেছি। সেটা যখন উইয়ার অফ (wear off) করল, ইট ইজ ভেরি ন্যাচারাল টু রিটার্ন ব্যাক টু আওয়ার ওউন এলিমেন্টস। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এবং সে জন্যই আমার এত অ্যাফিনিটি লেগেছে হেনরি ম্যুরের কাজের সাথে।"

ইওরোপ থেকে ফিরে এসে তাঁর ভাস্কর্য সম্বন্ধে ধারণার যেমন পরিবর্তন হল, তেমনি পরিবর্তন এল নিজের কাজেও। ভাস্কর্যের মাধ্যম সম্পর্কে সচেতনতা এল। নতুন নতুন মাধ্যমের ব্যবহার শুরু হল। পাথর কাটা এবং কাঠ কাটা শুরু করলেন। ধাতুর পাত দিয়ে কাজ করেছেন। কাঠের তক্তা জুড়ে ভাস্কর্য গড়েছেন। ওদের দেশে দেখলেন ভাস্কর্যের সংজ্ঞা ও সম্ভাবনা এত বিস্তৃত হয়েছে যে কেবল মাটি আর প্লাস্টারের মডেলিং-এ সীমাবদ্ধ নেই। তাঁর নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও এই বিস্তীর্ণতা এল।

ইওরোপ প্রবাসের সময় আঁকা তাঁর কিছু ছবি দেখার সুযোগ হয়েছিল আমাদের কয়েক বছর আগে। ১৯৫০-এ প্যারিস ভ্রমণের সময় ওখানকার জীবন ও নিসর্গের টুকরো-টুকরো বিষয় নিয়ে আঁকা ২৩টি ছবি নিয়ে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল কলকাতার চিত্রকূট আর্ট গ্যালারিতে ১৯৮৭-র সেপ্টেম্বরে। এই ছবিগুলো থেকেই আমরা শিল্পীর সেই সময়ের চেতনার কিছু প্রতিফলন পেতে পারি। অধিকাংশ ছবিই জলরঙে আঁকা। স্কেচ বা স্টাডি ধরণের। বেশির ভাগই ইওরোপের বিভিন্ন পরিবেশের নিসর্গ। যেখানে যেমনটি দেখেছেন,তার প্রতিলিপি। কিন্তু বাস্তবতার অবিকল রূপারোপ নয়। শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন রয়েছে স্বভাবতই। আর তাতেই ছবি হয়ে উঠেছে অনেকটা যেন লিরিক্যাল, গীতল বা কাব্যধর্মী। ছবির রং উজ্জ্বল। উজ্জ্বল নয় শুধু, উজ্জ্বল ও দীপ্ত। এক সদর্থক বিশ্বাসের জগতের আনন্দ ও দীপ্তি রয়েছে সেখানে। অথচ তথাকথিত ভারতীয়তাধর্মী যে বিশ্বাসের জগৎ তার সমান্তরাল নয় তা। বরং আঙ্গিকের দিক থেকে পাশ্চাত্যেরই অনেকটা নিকটবর্তী যেন। রেখা ও রং ব্যবহার যথেষ্ট পরিমিত। আত্মবিশ্বাসের নিশ্চয়তায় স্থির। বর্ণপ্রলেপে কোথাও ওয়াশ-পদ্ধতির সজল সংগীতময়তা। কোথাও তা দৃঢ়বদ্ধ, স্থাপত্যধর্মী। এভাবেই আমরা দেখি অপেক্ষাকৃত তরুণ শিল্পীর দৃষ্টিতে প্যারিসের বিভিন্ন দৃশ্যাবলী। সার্কাস, লেফট ব্যাঙ্কে পুরনো বই-এর দোকান, খবরের কাগজের স্টল, চুল কাটার সেলুন, শ্যেন নদীর শীত ও বসন্তের নানা দৃশ্য, শীতের লেফট ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

ছবিগুলো দেখতে-দেখতে আমরা অনুভব করি, একজন ভারতীয় শিল্পী, ভাস্কর হিশেবে সেই সময়েই যিনি অনেকটা প্রতিষ্ঠিত, শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যাঁর শিক্ষা, তাঁর ইওরোপের শিক্ষানবিশির শেষে কেমন করে আত্তীকৃত করছেন পাশ্চাত্যের আঙ্গিকগত অর্জনকে, কেমন করে মেলাচ্ছেন সেই অর্জনকে তাঁর ভারতীয়তার বোধের সঙ্গে। একদিকে আমরা দেখছি প্রকৃতির আলোর বিন্যাস চিত্রপটের বর্ণক্রমের বিন্যাসে রূপান্তরিত, অনেকটা যেন ইম্প্রেশনিস্ট রীতির অনুসরণে। আবার সেই সঙ্গে রয়েছে রঙের মাত্রার বিশ্লেষণে তরলতার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদও।

১২২· শঙ্খ চৌধুরী। মিউজিক। শাদা মার্বল। ১৯৫২।

প্রকৃতির গাঠনিক বৈচিত্র্যকে স্পষ্ট করে বুঝতে চেয়েছেন যেখানে, তার ত্রিমাত্রিক উপস্থিতিকে অনুধাবন করছেন যেখানে, সেখানেই অন্য এক মাত্রা আসে ছবিতে। অনুভব করা যায় এই ছবির পেছনে রয়েছে একজন ভাস্করের চেতনা। পরবর্তীকালের একজন প্রখ্যাত ভাস্কর্যের প্রস্তুতিপর্বের কিছু পরিচয় মেলে এই ছবিগুলো থেকে।

এই ছবিগুলোরই সামান্তরালে আমরা দেখে নিতে পারি ১৯৪৯-এ লন্ডনে করা একটি ভাস্কর্য। লাইম স্টোন বা চুনাপাথরে করা। এটিই তাঁর প্রথম পাথর কেটে করা কাজ। শিরোনাম— 'ফিগার'। এক নারীর আলুলায়িত বসে থাকার ভঙ্গি। হাত দুটি মাথার পেছনে নিয়ে যেন আলস্য ভাঙছে। আয়তনময়তার মধ্যেও সরলীকরণের দিকে ঝোক। হাঁটু ও কনুই-এর বাঁকগুলি গোলক বা ডিম্বাকৃতির পূর্ণতায় বিন্যস্ত। বুকের কাছ থেকে উদর পর্যন্ত একটি সমতল টুকরো যেন কেটে বের করে নিয়েছেন। দেহের অন্য অংশের বর্তুলতার সঙ্গে এখানকার সমতলতা একটা সংঘাতও আনছে, আবার সুষমায়ও বিন্যস্ত হচ্ছে। মূর্তির সিমপ্লিফিকেশন বা সরলীকরণে আমরা অনুভব করি রদাঁ পরবর্তী পাশ্চাত্য আধুনিকতার অনুষঙ্গ। আবার এর মধ্যে রয়েছে যে পূর্ণতাবোধের প্রকাশ, অনুরণিত হচ্ছে সদর্থক বিশ্বাসের সুর, তাতে প্রস্ফুটিত হয় ভারতীয়তাবোধের সুষমা। এই দুটি বৈশিষ্ট্যই তাঁর ভাস্কর্যে বিবর্তিত হয়েছে।

এই দুটি বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র প্রকাশ হিশেবে আরো দুটি কাজ আমরা অনুধাবনের চেষ্টা করতে পারি এখানে। ১৯৫১-র 'বাথার' শীর্ষক কাজটি প্লাস্টারে করা। স্নানরতা এক নারী। নগ্নিকা। চুলগুলো সামনের দিকে এনে ধোয়ার ভঙ্গি। এখানে প্রকটভাবে ফর্ম ভেঙেছেন। চোখের জায়গাটায় গোলাকার একটি গর্ত রেখেছেন। কান দুটি পরিণত হয়েছে

ত্রিকোণাকার বুকে। গলা দীর্ঘায়ত হয়ে চুলের নেমে যাওয়ার সঙ্গে মাথাকে শীর্ষবিন্দু করে একটি আর্চ তৈরি করেছে। পশ্চাদ্দেশের হাড়গুলো প্রকট হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। শিল্পী স্বীকার করেন এই ভাঙনের মধ্যে রয়েছে খানিকটা রামকিঙ্করের প্রভাব। হয়তো সেজন্যই এত ভাঙনের মধ্যেও কিন্তু একটা সুষমা ও সদর্থকতার অনুষঙ্গই প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

রূপারোপের দিক থেকে ১৯৫২-র 'আহ্লাদী' অনেকটাই বিপরীত ধারার কাজ। টেরাকোটায় করা। বাংলার লৌকিক রূপচেতনার সুষমাময় প্রকাশ এখানে। এটাও চুল নিয়ে প্রসাধনরতা এক নারীর রূপারোপ। শরীরের প্রতিটি অংশের সুডৌল বর্তুলতা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে পূর্ণ প্রাণের ঝঙ্কার তুলছে এখানে। লৌকিক ও ধ্রুপদী রূপবোধের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ভারতীয়তার ঐতিহ্য আধুনিকতায় অন্বিত হয়েছে।

শিক্ষা জীবনের শেষে, ইওরোপ থেকে ফিরে আসার পরে, শান্তিনিকেতন ও ইওরোপ, এই দুই ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে ভাস্কর্য সম্পর্কে যে প্রত্যয়ে পৌঁছলেন শিল্পী তারই পরিচয় ধরা রয়েছে উপরোক্ত তিনটি কাজে। পরবর্তী কালে তাঁর ভাস্কর্য অনেক বিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এই মূল প্রত্যয়টির কোনো পরিবর্তন হয় নি। প্রকৃতি-নিরপেক্ষ রূপের শুদ্ধতাই তাঁর প্রধান অন্বিষ্ট থেকেছে, কিন্তু এই শুদ্ধতার মধ্য দিয়েও তিনি এক ছন্দিত সুষমাকেই রূপ দিয়েছেন, যাতে সদর্থকতা ও ধ্রুপদী বিশ্বাসের অনুরণনই ঝঙ্কৃত হয়।

১২৩· শঙ্খ চৌধুরী। শৃঙ্গার। কালো জেব্রা মার্বল। ১৯৬৫।

চার

ঐতিহ্য, প্রযুক্তি, আধুনিকতা

শঙ্খ চৌধুরীর ভাস্কর্যের ভূমিকায় ললিতকলা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত ছোট পুস্তিকাটিতে কার্ল খাণ্ডালাভালা লিখেছিলেন "Sankho is an experimenter, a traditionalist and a modern, all in one" কথাটি সত্যি। এর পরিচয় আমরা যেমন উপরোক্ত কাজগুলিতে দেখলাম, তেমনি তাঁর পরবর্তী বিবর্তনেও দেখব। একটি বিষয় লক্ষণীয় রামকিঙ্করের সান্নিধ্যে যদিও তিনি কাজ করেছেন, কিন্তু রামকিঙ্করের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর কাজে খুব বেশি নেই, দু-একটি দৃষ্টান্ত দেখেছি আমরা। তিনি অবশ্য বলেছেন, আমরা আগেই জেনেছি, রামকিঙ্করের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন 'অদম্য উৎসাহ, কাজ করার শক্তি'। সুখে-দুঃখে রামকিঙ্করের নিস্পৃহতার কথা বলেছেন তিনি, ব্যক্তিজীবনে তা তাঁকে কতটা স্পর্শ করেছে তা আমাদের ততটা ভাবার বিষয় নয়, কিন্তু তাঁর ভাস্কর্যের কেন্দ্রে এই নিস্পৃহতাকে আমরা অনুরণিত হতে দেখি। নিস্পৃহতা কথাটি এখানে হয়তো সুপ্রযুক্ত নয়, বলা ভালো, মঙ্গল, অমঙ্গলবোধ ইত্যাদি সমস্তকে ছাপিয়ে এক শাশ্বত সৌন্দর্যের দ্যুতি।

রামকিঙ্করের আধুনিকতাতে তিনি বুর্দেলের অনুপ্রেরণা দেখেছেন। এখানে কেউ হয়তো তাঁর সঙ্গে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করতেও পারেন। রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের অভিব্যক্তিতে যে সংক্ষুব্ধতার প্রকাশ আছে, তা বুর্দেলের রূপভঙ্গির কিছুটা সমান্তরাল হতে পারে, কিন্তু উভয়েরই উৎস আদিমতার এক পুনরুজ্জীবনে, আধুনিকতার যা প্রধানতম এক মাত্রা। রামকিঙ্কর সেই উৎসের সঙ্গে একাত্ম থেকেও ভারতীয় আদিম জীবনধারার সঙ্গে তাঁর অভিব্যক্তিকে যে অন্বিত করতে পেরেছেন, এটাই তাঁর স্বাতন্ত্র্যের উৎস। শঙ্খ চৌধুরীর প্রকাশের জগৎ এর থেকে একেবারেই আলাদা। আগেই আমরা বলেছি রূপের বিশুদ্ধতায় লগ্ন থেকে তিনি এক সদর্থক সুষমার সন্ধান করেছেন।

অথচ শঙ্খ চৌধুরী তাঁর নিজের ভাস্কর্য সম্বন্ধে বলেছেন 'I have tried to exploit the spirit of industrial age into my work' বা 'I have broken the barrier between art and technology'. বিশ্বাসের সেই সুষমাময় সদর্থকতার সঙ্গে যন্ত্র ও প্রযুক্তিগত আধুনিকতার কি কোনো সম্পর্ক আছে? কী সেই সম্পর্ক? কেমন করেই-বা এই দুই-এর মধ্যে তিনি সেতু রচনা করেছেন?

পাশ্চাত্য ভাস্কর্যে আধুনিকতার শুরু যদি আমরা রদাঁ থেকে ধরি, তাহলে সেই আধুনিকতার মূল নিহিত আছে এই প্রত্যয়ে যে এতদিন ভাস্করের সন্ধানের কেন্দ্র ছিল সুন্দরের অভিমুখী, রদাঁ সেই অভিমুখ পালটে সত্যকেই করলেন তাঁর অন্বিষ্ট। সেই সত্য গাণিতিক বা জ্যামিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রদাঁ বুঝেছিলেন গাণিতিক সত্যে স্থিত না হলে সুন্দরও নানা মিথ্যা ও আবর্জনায় আবিল হতে থাকে। তিনি বলতেন, "আমি স্বপ্নদ্রষ্টা নই, বরং একজন গণিতজ্ঞ। আমার ভাস্কর্যের যে উত্তরণ, তা জ্যামিতিকতার জন্যই।... সব কিছুর মধ্যেই ঘনকের একটি মাত্রা দেখতে পাই আমি। তল ও আয়তনের যে নিয়মের শৃঙ্খলা, সেটাই আমার কাছে হয়ে ওঠে জীবন ও সৌন্দর্যের রূপায়ণেরও নীতি।" জীবনের প্রতি অনুরক্ত থেকেও, অবয়বের সীমায় নিষ্ঠাভরে লগ্ন থেকেও রদাঁ জ্যামিতিক শুদ্ধতার প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর ভাস্কর্যে। চিত্রশিল্পে সেজানের যে অবদান, ভাস্কর্যে রদাঁরও অনেকটা তাই।

রদাঁ পরবর্তী ভাস্কর্যকে যদি দুটি ধারায় ভাগ করে দেখি, তাহলে একটি ধারায় প্রাধান্য পেয়েছে এই জ্যামিতিকতা, নির্মাণের গণিতে লগ্ন থেকে বিমূর্ত সত্যের সন্ধান; আর একটি ধারায় প্রাধান্য পেয়েছে জীবন্ময়তা, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দনকে রূপায়িত করার চেষ্টা। এর প্রথমটিকে বলা যায় ফর্মালিস্টিক, দ্বিতীয়টিকে—ভাইটালিস্টিক। ব্রাকুসি ও হেনরি ম্যুর যথাক্রমে এই দুটি ধারার প্রধানতম প্রতিভূ। ব্রাকুসিও খুঁজেছেন রূপের এক বিশুদ্ধতা। প্রকৃতির প্রতিরূপতায় লগ্ন থাকতে থাকতে ভাস্কর্যে আবিল হয়ে উঠছিল রূপের স্বরাটত্ব। ব্রাকুসি প্রকৃতির অন্তর্লীন বিবর্তনের নিয়মকে অনুসরণ করে সেই স্বরাটত্ব ফিরিয়ে আনতে চাইছিলেন। ব্রাকুসির এই চেষ্টার মধ্যে হয়তো কনস্ট্রাক্টিভিজমের বীজ নিহিত ছিল। নউম জাবো, আন্তন পেভসনার, ভ্লাদিমির টাটলিন, কাসিমির ম্যালেভিচ প্রমুখ ভাস্কররা প্রকৃতি-নিরপেক্ষ সচেতন নির্মাণের যে রীতির প্রবর্তন করলেন, কনস্ট্রাক্টিভিজম নামে যা সুপরিচিত, ব্রাকুসির মধ্যে তার বীজ থাকলেও, তাঁদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে ব্রাকুসিতে নির্মাণ ও জ্যামিতির প্রাধান্য থাকলেও এই বিশ্বপ্রবাহের

শঙ্খ চৌধুরী।

জঙ্গমতা, বিবর্তন ও রূপান্তরণের নিগূঢ় নিয়মকে তিনি অনুসরণ করেছেন। সেই নিয়মেরই নন্দনময় রূপায়ণ তাঁর ভাস্কর্য। এজন্য ব্রাকুসিকে বলা যায় ভাস্কর্যের এক দার্শনিক। কনস্ট্রাক্টিভিস্টদের লক্ষ্যও নির্মাণ ও জ্যামিতির স্বরাটত্ব। এই স্বরাটত্বের সন্ধানে তাঁরা বিশ্বপ্রবাহের হাত ছেড়ে দিয়ে আত্মচেতনাকেই প্রধান অবলম্বন করেছিলেন। ব্রাকুসি তা করেন নি। তিনি হয়তো বুঝেছিলেন বিশ্বের সাথে ব্যক্তির যোগেই সৃষ্টির পূর্ণতা। সে যোগ ছিন্ন হলে, বিচ্ছিন্নতা গ্রাস করে ব্যক্তিসত্তাকে। সেই বিচ্ছিন্নতায় শিল্পের কোনো মুক্তি নেই। এখানেই ব্রাকুসির মধ্যে আমরা প্রাচ্য চেতনার উপস্থিতি অনুভব করি।

শঙ্খ চৌধুরী নিজের ভাস্কর্য সম্বন্ধে যখন আর্ট ও টেকনোলজির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের কথা বলেন, তখন আমাদের কনস্ট্রাক্টিভিস্টদের কথা প্রাথমিকভাবে মনে আসতে পারে। মনে হয়, প্রকৃতি-নিরপেক্ষভাবে যন্ত্র ও প্রযুক্তির গাণিতিকতাই কি তাঁর অন্বিষ্ট? একটু নিবিড়ভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায় প্রযুক্তির কথা বললেও কনস্ট্রাক্টিভিস্টদের সঙ্গে রয়েছে তাঁর দুস্তর ব্যবধান। বরং ব্রাকুসির দর্শনের সঙ্গে অনুভব করা যায় তাঁর অনেকটা সাযুজ্য। ক্রমান্বয়ে তিনি রূপের শুদ্ধতার দিকে গেছেন। প্রকৃতির প্রতিরূপতাকে অতিক্রম করেছেন, কিন্তু তার নিগূঢ় নিয়মকে অস্বীকার করেন নি।

প্রথম দিকে তাঁর ভাস্কর্যে আমরা দেখেছি ছন্দিত সুষমা ও ধ্রুপদী প্রশান্তি। ক্রমান্বয়ে রূপায়ণের সরলতার দিকে গেছেন। বিশদ পরিহার করে নির্ভার হয়েছে রূপ। এই বিবর্তনের পথে পৌঁছেছেন এক বিমূর্ত ছন্দে। কিন্তু সেই বিমূর্ততা কখনোই প্রকৃতি-নিরপেক্ষ হয় নি। রূপের নির্যাসই ছন্দে রূপান্তরিত হয়েছে। এরই অনন্য দৃষ্টান্ত কলকাতায় তাঁর সাম্প্রতিক প্রদর্শনীটি (জানুয়ারি ১৯৯৩)। তাঁর সামগ্রিক কাজকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। যেমন, তাঁর পোর্ট্রেট বা মুখাবয়বের ভাস্কর্য ও রচনাধর্মী ভাস্কর্য। রচনাধর্মী ভাস্কর্যের মধ্যে একটি ধারায় অবয়বের সরলীকৃত রূপায়ণের মধ্যে ছন্দিত সুষমাকে ধরতে চেষ্টা করেছেন। অন্য ধারাটি প্রায় বিমূর্ত, জঙ্গমতার ছন্দকে রূপ দিয়েছেন সেখানে।

শঙ্খ চৌধুরী ভারতবর্ষের একজন প্রধান পোর্ট্রেট স্কাল্পটার বা মুখাবয়বের ভাস্কর। আবদুল গফ্‌ফর খান (১৯৬৬), 'মাই ফাদার' (১৯৪৫) বা মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটি পোর্ট্রেট তিনি করেছিলেন। সেটি দেখলে বোঝা যায় মুখাবয়বে কেমন করে তিনি আত্মার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন। এখানে রামকিঙ্করের যোগ্য উত্তরসূরি তিনি। স্বাভাবিকতা-আশ্রিত তাঁর মুখাবয়বে তলের বিন্যাসে এমন একটা অমসৃণ কর্কশতা আনে যে তা অভিব্যক্তির প্রগাঢ়তাকে ধরে রাখতে পারে। বিনোদবিহারীর পোর্ট্রেটটি সেদিক থেকে খুবই অনবদ্য কাজ। 'রানী' নামে একটি মাটির তৈরি মুখাবয়ব আছে ১৯৫৪-র। শিল্পী বেন্দ্রের মেয়ের মুখটি ধরেছেন। অদ্ভুত বিষণ্ণতাময় সারল্য সেখানে। এটি থেকেই পরে আবার বিযুক্তির পথে সরল রূপবন্ধে পৌঁছেছেন অন্য একটি কাজে। সমস্ত বিশদ বাদ দিয়ে মুখ ও শরীরের অনিবার্য অংশটুকু শুধু রেখেছেন। মুখকে ঘিরে বৃত্তাকার শূন্যতা ও চক্ষুকোটরের ছোট বৃত্ত মুখের বৃত্তের সাযুজ্যে ছন্দ রচনা করে। ১১৭

রচনাধর্মী কাজে বিভিন্ন ধরণের ছন্দ ও রূপারোপ নিয়ে তিনি কাজ করেন। ১৯৫২-র 'সিস্টার্স' নামে একটি কাঠের ভাস্কর্য আছে। সাড়ে চার ফুট উচ্চতা। দীর্ঘায়ত, ক্ষীণতনু নারী দাঁড়িয়ে আছে। দুটি শরীর কোমর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে উঠে গেছে। কোমর থেকে ভাগ হয়ে কাঁধের কাছে আবার মিলেছে। মাঝখানে একটি ইলিপস আকৃতির শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। মাথা দুটি উঠে গেছে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকৃতির। ১৯৫২-তে বিদেশ থেকে ফিরে আসার অল্প কিছু পরে পাশ্চাত্য আধুনিকতার অর্জনকে এভাবেই তিনি আয়ত্ত করছেন। কিন্তু ছন্দোময়তায় এক ধরণের রোমান্টিক অনুভব সেই সময় থেকেই আমবা দেখি। ১১৯

সরলতার মধ্য দিয়ে রূপের নির্ভারতার দিকেও যাচ্ছেন এর কাছাকাছি সময় থেকেই। ১৯৫৫-র পর থেকে এরকম প্রায়-বিমূর্ততার সঞ্চার ঘটতে থাকে। ১৯৫৫-র 'বার্ড' নামে একটি কাজ আছে এবনি কাঠ থেকে তৈরি। পাঁচ বা ছয়টি টুকরো জুড়ে একটি মোরগের আভাস ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৯৫৬-র এবনি কাঠের 'স্ট্যান্ডিং ফিগার' একটি দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ের রূপারোপ। এখানে অবয়বটিকে বোঝা যায়। যদিও তার সমস্ত বিশদ বাদ দিয়ে কেবল ছন্দটিই ধরা পড়েছে। একটি শরীরের বেড়ে ওঠার ছন্দ। এখানে শরীর ধরে আছে ছন্দকে। এ থেকে শরীরটি বাদ দিয়ে শুধু ছন্দটিকে ধরে রাখা যায় কিভাবে। সেটিই শিল্পী করেছেন ১৯৫৬-র 'ফিগার' নামে এবনির (কাঠ) একটি কাজে। চার ফুট উচ্চতার এই ১১৮ র-১২

১২৫ শঙ্খ চৌধুরী। স্ট্যান্ডিং ফিগার। ব্রোঞ্জ। ১৯৮৭।

কাজটি শিল্পীর নিজের সংগ্রহেই আছে। একটি কাঠ ছন্দিত হয়ে উঠে গেছে। তাকে একটি বৃক্ষের বেড়ে ওঠার ছন্দ বলা যায়, অথবা কোনো নারীর শরীরের ছন্দও বলা যায়। রূপের এই সারাৎসারে পৌঁছানোর পথে ব্রাঁকুসির প্রেরণাই হয়তো কাজ করেছে। ১৯৫৫, ৫৬-তে ধাতুতেও আনছেন এই ধরণের বিমূর্ত ছন্দ। বোঝা যাচ্ছে তাঁর একটি সহজাত আকর্ষণ রয়েছে এদিকে।

এর পাশাপাশি অবয়বী কাজও করছেন। ১৯৫৬-তে করা শাদা মার্বল পাথরের 'মিউজিক' বা 'সংগীত' শীর্ষক ১২২ কাজটা তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি ভাস্কর্য। দিল্লির আকাশবাণী ভবনে এটি রয়েছে। সংগীতনিমগ্না উপবিষ্টা এক

নারী। কোলের উপর থেকে তানপুরাটি উঠে গেছে। ডান হাত তানপুরার তারের উপর স্থাপিত। শান্ত সমাহিত এক মূর্তি। অনেকটা সরস্বতীর আদলে গড়া। কিন্তু বিশদ বর্জিত। সারা শরীরের সুডৌল উত্তল আয়তনময়তা বক্ষ ও উদর সংলগ্ন এক অবতলতার সঙ্গে সাযুজ্য রচনা করছে। স্তিমিত প্রশান্তির মধ্যে ধ্রুপদী ভারতীয়তার ধ্যানমগ্নতা, আবার বিশদ বর্জিত সরলতায় আধুনিক আদল। সব মিলে ঐতিহ্য-অন্বিত আধুনিকতার অনবদ্য দৃষ্টান্ত এটি।

১২৩ লৌকিক ও ধ্রুপদী ঐতিহ্যের সমন্বয়ের আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৯৬৫-র 'শৃঙ্গার' শীর্ষক কালো জেব্রা মার্বলের কাজটি। এটি আছে দিল্লির নেহরু মিউজিয়মে। দুই নারী, একজন চুল বাঁধছে আর এক জনের। দুটি শরীর একই পাথর থেকে গড়ে উঠেছে। শুধু মাথার কাছে গিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। শরীরে উর্ধ্বমুখী টানটান বেড়ে ওঠা, আয়তনের উত্তলতার বিন্যাস, মুখে অভিব্যক্তির সুষমাময় সারল্য, সব মিলে শান্তি ও সুষমার অসামান্য জয়ঘোষণা।

একই সঙ্গে চলেছে তাঁর বিমূর্ত কাজও। ১৯৬৬-তে 'মিউজিক' নামে অ্যালুমিনিয়ম ও পিতলের পাত দিয়ে একটি ভাস্কর্য গড়েছেন। সম্পূর্ণই বিমূর্ত। কোনো সংগীত যন্ত্রের কিছুটা আদল রয়েছে। অথবা বাঁকানো একটি হাত থেকে বেরিয়ে এসেছে কতকগুলো তার। টান টান করে বাঁধা রয়েছে বিপরীত প্রান্তের সঙ্গে। মূল অবয়বটির সঙ্গে টান টান তারের আততিতেই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে এই রচনা। যুগল্লাভিয়ায় আছে ওক কাঠের তৈরি একটি বিমূর্ত রচনা। বৃক্ষ ও মানবীব যৌথতা থেকে বিমূর্তায়িত হয়েছে রূপারোপ। এসবের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তির নিঃশব্দ সঞ্চার হয়ত ঘটেছে। কিন্তু এই সব বিমূর্ততাও ঐতিহ্যের অনুরণনেই সঞ্জীবিত।

সারা জীবনের এই সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি তাঁর সাম্প্রতিকের কাজগুলোর দিকে তাকাই তাহলে তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্বের মূল প্রবণতাটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আমাদের সামনে। কলকাতার প্রদর্শনীটির কথা আমরা আগে বলেছি। বলা হয়েছে এই কাজগুলো করবার পরিপ্রেক্ষিতের কথাও। অসুস্থতার জন্য বিশ্রামের সময় দাঁড়িয়ে বা পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ করার সুযোগ ছিল না। তাই বসে বসে দুহাতে কাগজ ভাঁজ করে করে অনেকটা খেলাচ্ছলেই ফুটে উঠছিল এই রূপগুলো। পরে অ্যালুমিনিয়াম পাতের উপর রূপান্তরিত করেছেন। শেষে স্টেইনলেস স্টিলে স্থায়ী রূপ দিয়েছেন।

১২৫ ১৯৯২-তে করা এই কাজগুলোর সঙ্গে ছিল কয়েকটি আগে করা কাজও। তার একটি ১৯৮৭-র 'স্ট্যান্ডিং ফিগার'। ব্রোঞ্জের রচনা। ঝকঝকে মসৃণ ত্বকের একটি অধিবৃত্তাকার অবয়ব আলম্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের, পাখির বা বৃক্ষের দাঁড়িয়ে থাকার ছন্দের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন একটি মিল আছে, এই কাজটিতে তার আভাস পাওয়া যায়। তাই বৃক্ষ, পাখি বা মানবী যাই হোক না কেন, প্রাণের এই ছন্দটিই এখানে ধাতুতে রূপ পেয়েছে। দুপাশে বক্রতলের মসৃণ উত্তলতা। মাঝখানে সেটা অবতলতার দিকে গিয়ে শূন্যে বিলীন হয়েছে। উপরে ও নীচে এরকম দুটি ফোকর বা ঋণাত্মক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে আলো চলাচল করে। সম্পূর্ণ অবতলে আলো প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত ভাস্কর্যটিতে আলো-ছায়ার সঞ্চার ঘটায়। আলোও হয়ে ওঠে এই ভাস্কর্যের একটি মাত্রা।

স্টেইনলেস স্টিলের 'রিক্লাইনিং ফিগার' ১৯৮৯-এর কাজ। একটি ধাতব তল শঙ্খিল গতিতে যেন অন্তহীন ঘুরে যাচ্ছে অথবা গতি বা জঙ্গমতা যেন স্থির হয়ে মূর্তিবদ্ধ হয়ে আছে। সীমার মধ্যে এই যে অন্তহীনতার দ্যোতনা আনা, শিল্পের গৌরব এখানেই।

১২০ ১৯৯২-এর অন্যান্য কাজগুলোতে পাখির উড্ডীয়মানতাই মূল মোটিফ বা বিষয়। কোনো কোনো কাজে স্পষ্ট একটি
১২১ পাখির আদল ফুটে ওঠে। তার শরীর বা ডানার উপরে ওয়েলডিং-এ ছোট ছোট ধাতুর পুঞ্জ জমিয়ে নানা ধরণের টেক্সচার তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও নন্দনসমৃদ্ধ কাজ মনে হয় যেখানে অবয়বের নির্দিষ্টতাকে ছাড়িয়ে জঙ্গমতার স্পন্দনটি রূপায়িত হয়। পাতলা ধাতব চাদরের প্রান্তরেখাটিকে সামান্য মুড়ে দিয়ে যেভাবে আয়তনের দ্যোতনা আনা হয়েছে, তলের উত্তলতা, অবতলতায় যেভাবে আলো-ছায়ার খেলা চলে, ছড়িয়ে যাওয়া তলের বিন্যাস যেভাবে গতির বিমূর্ততাকে ধরে রাখে, সেখানেই এই কাজগুলোর নান্দনিকতা।

শঙ্খ চৌধুরী তাঁর সারা জীবনের ভাস্কর্যের অভিজ্ঞতাকে সংহত করে প্রকাশ করেছেন এই কাজগুলিতে। বিমূর্ত ভাস্কর্যের অসামান্য নিদর্শন এগুলি। এর মধ্যে টেকনোলজির প্রকাশ হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে আছে। কিন্তু এর সঙ্গে মিশে আছে যে ছন্দের অনুরণন ঐতিহ্যেরই সারাৎসার থেকে তা উদ্ভূত। ঐতিহ্য-অন্বিত এই আধুনিকতাতেই সমকালীন ভাস্কর্যে শঙ্খ চৌধুরী স্বাতন্ত্র্যের আসনে অধিষ্ঠিত।

ছবি ও ভাস্কর্যে সোমনাথ হোর

"আমার সমস্ত কাজের একটাই কথা যে—একটা লোকও কেন না খেয়ে থাকবে, আর অন্যদিকে কেন এত অপচয় হবে। এটাই আমার কথা। এর মধ্যে আমি অন্য কিছুই আনছি না। মার্ক্সইজমেরও তাই কথা।"—সোমনাথ হোর

এক

সত্যের তৃতীয় মুখ

শিল্পী সোমনাথ হোর শান্তিনিকেতনে 'লাল বাঁধ' নামে যে গ্রামটিতে থাকেন বিশ্বভারতীর সীমা পেরিয়ে সেখানে পৌঁছতে দিগন্ত বিস্তৃত একটি বড় মাঠের উপর দিয়ে অনেকটা যেতে হয়। লাল-কাঁকুরে মাটির সামান্য চড়াই-উতরাইয়ের কাঁচা রাস্তা। দু-পাশের জমি থেকে অনেকটা উঁচু। কিছুটা যেন চওড়া এক আলপথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে ওই গ্রামের দিকে। প্রথমবার ওই পথটি অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা যে কোনো যাত্রীরই বেশ মনোরম হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষত সেটা যদি বিকেল ও আসন্ন সন্ধ্যার মাঝামাঝি কোনো সময় হয়। রোদের তেজ তখন কমে এসেছে। আকাশের প্রদীপ্ত নীলে তা কিছুটা মায়ার সঞ্চার করে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে বিচ্ছুরিত হতে থাকে রক্তাভ লালিমা। তার মধ্য দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিও যেতে থাকে মাঝে মাঝে। নীচে যে বিস্তীর্ণ ঘাসে মোড়া সবুজ জমি, সর্বত্র নিপাট সবুজ নয় তা। মাঝে মাঝে ছড়িয়ে আছে জলা। রকমারি রঙিন ফুলের মেলা সেখানে। কোথাও দুধের মত শাদা বক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। কোথাও গরু বা মোষ চরে বেড়ায়।

বাংলার এই স্নিগ্ধ, উদাত্ত ও প্রশান্ত নিসর্গটি পেরিয়ে সোমনাথ হোরের কাছে যাওয়া, তাঁর শিল্পের করুণাদীর্ণ গভীর-সঞ্চারী সংক্ষুব্ধতায় মুগ্ধ কোনো অনুরাগীর কাছে, অন্যতর এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় অন্বিত হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য, শুধু সৌন্দর্যের কেন, সম্পদেরও, এবং শুধু বাংলার কেন, সমগ্র ভূমণ্ডলেরও, মানুষের জন্য অনাদিকাল থেকে যে সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি মেলে রেখেছে, মানুষই তাকে নষ্ট, ভ্রষ্ট করেছে। মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী সেই সম্পদকে কুক্ষিগত করেছে। সেই সৌন্দর্যকে মলিন করেছে। আর ব্যক্তিমানুষের মধ্যে, সমগ্র সভ্যতার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে নিরাময়হীন 'ক্ষত'। এই সত্যটি খুবই সহজ। এত সহজ যে শুনতে শুনতে ব্যবহারে ব্যবহারে এর রং ফিকে হয়ে গেছে। বড় ক্লিশে হয়ে এসেছে এর ধ্বনি। আর এই ক্লিশে করে দিতে পারার মধ্যেই নিহিত আছে আধুনিক নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার দর্পিত জয় ঘোষণা।

সোমনাথ হোর এই 'ক্ষতের' দর্শনকে তাঁর শিল্পের নন্দন হিশেবে বরণ করেছেন। এই একটি প্রত্যয়কে ঘিরে তাঁর সমস্ত প্রকাশ। তাঁর সত্তার সমৃদ্ধ প্রস্ফুটন। এই 'ক্ষত' তাঁর প্রতিবাদ। প্রতিবাদ ভোগসর্বস্ব আগ্রাসী এই নগরকেন্দ্রিক আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে। তাঁর শিল্পের মূলগত উৎস কিন্তু শহর। শহর মানুষকে বিরামহীন বিবেকহীন ভোগের দিকে উদ্বুদ্ধ করে। এই ভোগবাদ ক্ষতের জন্ম দেয়। এরই প্রতিবাদে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শহরকে পরিত্যাগ করেছেন। ১৯৮৩-তে কলাভবনের শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণের পর ওই 'লাল বাঁধ' গ্রামেই তিনি গড়েছেন তাঁর স্থায়ী আবাস। অথচ তাঁর শিল্পের মধ্যে কোনো গ্রামীণ স্নিগ্ধতা বা সারল্যের প্রতিফলন নেই। প্রকৃতির উদাত্ত সৌন্দর্যকে নিজের সত্তায় লগ্ন রেখে— সেই সত্তায় প্রতিধ্বনিত চিরায়ত মানুষের ক্ষতের যন্ত্রণাকে তিনি রূপ দিয়ে চলেছেন অবিরত। এই এক

দ্বৈত। শুধু নিসর্গের উদাত্ততাই নয়; শান্তিনিকেতনে শিল্পে ও সাহিত্যে ভাবতীয় লোকায়তিক ও ধ্রুপদী স্বরূপের যে নিবিষ্ট সন্ধানের ধারাবাহিকতা— তার কেন্দ্রে অবস্থান করে সৌন্দর্যের এক বিপ্রতীপ প্রান্তের সত্যে ও আপাত সুষমাহীনতায় নিজেকে নিমগ্ন রাখা— এই দ্বৈতই তাঁর শিল্পের উৎস ভূমি। অথবা এই প্রকাশের মধ্যে হয়তো রয়েছে সেই দ্বৈতেরই এক সমন্বয়ও। দুই বিপ্রতীপের সংঘাতে জাত সত্যের তৃতীয় মুখ। এই সমন্বয় থেকেই জাত তাঁর ক্ষতের দর্শন, ক্ষতের শিল্পরূপ।

কী এই 'ক্ষত', তাঁর ক্ষেত্রে কেমন এই প্রত্যয়ের স্বরূপ, সে প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আমরা পরে আসব। এর আগে 'লাল বাঁধ' গ্রামের বাড়িতে তাঁর নিজস্ব পরিবেশে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলে নেওয়া যায়। সৃষ্টির মধ্যেই ধরা থাকে একজন শিল্পীর সামগ্রিক পরিচয়; একথা ঠিকই। সেই সৃষ্টি তো তাঁর আত্ম-স্বরূপেরই অনিবার্য প্রকাশ। কাজেই ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ উত্তাপ, ব্যক্তি মানুষটিকে অন্তত কিছুটা জানা, তাঁর শিল্পকে আরও উন্মীলিত করে আমাদের সামনে।

কিছুদিন আগে (জানুয়ারি, ১৯৯২) 'সিগাল' সংস্থার উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজিত হল সোমনাথ হোরের একটি বড় প্রদর্শনী। পূর্বাপর চরিত্রের এই প্রদর্শনীতে ১৯৪৩-৪৪ থেকে সম্প্রতি পর্যন্ত (১৯৯০-১৯৯১) তাঁর নানা ধরণের কাজ এবং কাজের বিবর্তনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি আমরা। এর আগে ১৯৮৬-তে 'লেডিজ স্টাডি গ্রুপ'-এর উদ্যোগে 'বিড়লা অ্যাকাডেমি'-তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'ভিসনস' নামে যে প্রদর্শনী, তাতে চারজন শিল্পীর অন্যতম ছিলেন সোমনাথ হোর। সেখানেও তাঁর কাজের সামগ্রিক একটা পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম। তারপরে শরৎ বোস রোডের 'সুখ সাগর' গ্যালারিতে 'সিগাল' আয়োজিত এই প্রদর্শনীটি আরো অনেক বিস্তৃতভাবে তুলে ধরল তাঁর কাজের ধারাবাহিকতা। তাঁর সৃষ্টির স্বরূপ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা উঠে আসে এই প্রদর্শনী থেকে। এই দুটির বাইরে আর কোনো বড় প্রদর্শনী হয় নি তাঁর ইদানীংকালে। আর এখন তিনি খুব একটা আগ্রহীও নন প্রদর্শনী সম্পর্কে। তাঁর নিজের কথায়:

> "আজকাল প্রদর্শনী করায় আমার আগ্রহ কমে গেছে।··· আসলে প্রদর্শনী অনেকটা শহরকেন্দ্রিক, কয়েকশত কিংবা হাজার কয়েক লোক প্রদর্শনী দেখেন। খবরের কাগজে লেখালেখি হলে সেই সংখ্যা বাড়ে কিংবা কমে। বলাবাহুল্য সংবাদপত্রের ভাষ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খেয়ালে চলে। কলকাতার মতো শহর যেখানে লোকসংখ্যা আশি থেকে একশ লক্ষ, সেখানে হাজার লোকের চিত্রদর্শন সংস্কৃতিক্ষেত্রে কতটা রেখাপাত করবে? একটি চলচ্চিত্র একই সঙ্গে দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের দৃষ্টিগোচর হতে পারে। দীর্ঘ সময় চললে কিংবা দূরদর্শনে দেখানো হলে কোটি কোটি লোক তা দেখতে পারে। ললিতকলায় এটা কখনোই সম্ভব নয়; কাজেই জনসাধারণের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশের জন্য কাজ নিয়ে যত্রতত্র ছোটাছুটি করতে আর ভাল লাগে না।"
>
> (—'আমার চিত্রভাবনা' সোমনাথ হোর)

এই উক্তি থেকে বেরিয়ে আসে এরকম এক সত্যের আভাসও যে অর্থবান কিছু শহরের মানুষকে দেখানো বা তাঁদের কাছে বিক্রি করা তাঁর কাজের উদ্দেশ্য নয়। যে বাণিজ্যিকতা ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছে শহরকেন্দ্রিক শিল্পকলায় যেখানে বিক্রয় যোগ্যতা ও অর্থমূল্যই শিল্পের উৎকর্ষেরও প্রধানতম মাপকাঠি হয়ে উঠছে, সেই র‍্যাট-রেস বা ইঁদুর-দৌড় থেকেও নিজেকে ও নিজের শিল্পকে সন্তর্পণে দূরে রাখতে চান তিনি। তার প্রমাণ তো পাওয়া গেছে এবারের এই প্রদর্শনীতেও। দু-একজন কাছের মানুষের সনির্বন্ধ অনুরোধে দু-একটি মাত্র কাজ তাঁদের দেওয়া ছাড়া, বাকি সমস্ত কাজ তিনি ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। বিক্রি করেন নি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থনৈতিক সচ্ছলতা সম্পর্কেও তাঁর অনাগ্রহ-ই বেশি। আদর্শের এই শক্ত শিরদাঁড়া তাঁর ব্যক্তিত্বের যেমন, তেমনি তাঁর শিল্পেরও ভিত্তি।

এবারের প্রদর্শনীতে তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় যখন, কয়েকটি কথাতেই অনুভব করা যায় এক প্রগাঢ় ও উদার হৃদয়ের অধিকারী এই মানুষটি। যে ঔদার্য শহরের ভিড় ও কেজো জীবনে দুর্লভ। যার উপমা হতে পারে 'লাল বাঁধের' সেই দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের উদার ব্যাপ্তি। এই প্রদর্শনী দেখতে দেখতেই এই সুযোগে তাঁর কাজ বিশেষত ভাস্কর্য নিয়ে একটি বড় লেখার পরিকল্পনা জাগে যখন, তাঁকে জানাতে হয় তাঁর নিজস্ব পরিবেশে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু কথা বলে আসার ইচ্ছার কথা। তারপর এক বিকেলে 'লাল বাঁধে' তাঁর বাড়িতে পৌঁছলে তাঁর সহৃদয়তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া

১২৬· *সোমনাথ হোর। মাদার অ্যান্ড চাইল্ড। ব্রোঞ্জ। ১৯৭৫-৭৭।*

যায়। সত্তর-অতিক্রান্ত এই শিল্পী যদিও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন না সেদিন, বেশি কথা বলা নিষেধ ছিল যদিও, তবু ঘন্টাদুয়েক নিবিষ্ট কথা হতে পারে তাঁর সঙ্গে। অপরিকল্পিত সেই আলাপচারিতার মধ্যে কিছু মণিমুক্তার হিরকদ্যুতি ছড়িয়ে থাকে। সেটাই হবে এ লেখায় তথ্যের অন্যতম উৎস।

এছাড়া 'আমার চিত্রভাবনা' নামে একটি ছোট বই বেরিয়েছে তাঁর এ বছরই (১৯৯২) 'সিগাল বুকস'-এর প্রকাশনায়। 'উন্ডস' নামে হয়েছে এরই এক ইংরেজি অনুবাদ। বাংলায় ও ইংরেজিতে তাঁর 'তেভাগার ডায়েরি' বেরিয়েছে যথাক্রমে 'সুবর্ণরেখা' (১৯৯১) ও 'সিগাল' (১৯৯০) থেকে। আর 'ললিতকলা অ্যাকাডেমি'-র বড় মনোগ্রাফটি বেরিয়েছিল বছর কয়েক আগে। তাঁর জীবন ও কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করবে এগুলোও।

'লাল বাঁধ' গ্রামে তাঁর একতলা পাকা বাড়িটি দেখলে মনে হয় যেন একটি শিল্পের আশ্রম। পরিবারে তিনটি মানুষ— তিনি, তাঁর স্ত্রী রেবা হোর ও কন্যা চন্দনা। তিনজনই শিল্পী। সারা বাড়িটাই এই তিন শিল্পীর স্টুডিও। রেবা হোর তেলরঙে ছবি আঁকেন। নিমগ্ন থাকেন টেরাকোটা নিয়েও। চন্দনা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন ছবির জগতে। বাড়ির সামনে, পেছনে ও দুপাশে আছে কিছুটা ফাঁকা জমি। পেছনে রয়েছে মাটির কাজ পোড়ানোর এবং ধাতু গলানোর দুটি চুল্লি। একপাশে একটি পাড় বাঁধানো বড় কুয়ো। গ্রীষ্মে যখন জলের অভাব হয় গ্রামে, এই কুয়োর জল তখন গ্রামের মানুষের তৃষ্ণা মেটায়। সোমনাথ হোর খেদ করেই বলেছিলেন, তাঁর পাশেই কাঁচা বাড়িতে থাকেন যেসব সাধারণ মানুষ তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্লেশ ও দুঃখের অংশীদার তিনি হতে পারেন না। তাঁদের শোষণ করেন না তিনি ঠিকই, সেই অবস্থা তাঁর নেই; কিন্তু জীবনযাপনের এই ব্যবধান তাঁকে পীড়া দেয়। তাঁর জলের কুয়োটি যেন গ্রামের মানুষের দুঃখের সঙ্গে তাঁর সত্তার সংযোগের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাঁর এই নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে তাঁকে দেখলে কিছুটা উপলব্ধি করা যায় কেমন করে নিজের মাটিতে গভীরে শিকড় গ্রোথিত করে এই মাটির মানুষেরই ঘনীভূত দুঃখ ক্রমান্বয়ে শিল্পরূপ পেতে থাকে তাঁর সৃষ্টিতে।

দুই

গতি

১৯২১ সালের ১৩ এপ্রিল সোমনাথ হোর জন্মগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম জেলার বরমা গ্রামে। তাঁর পিতা রেবতীমোহন হোর। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান। তাঁরা পাঁচ ভাইবোন। তাঁদের নিয়ে খুবই অনটনের মধ্যে পড়েন তাঁর মা। যৌথ পরিবার বলে তাঁর বাবার নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ কিছু ছিল না। ছেলেমেয়েদের দুধ খাওয়ানোর জন্য মা গরু পুষতেন। নিজে হাতে ঘাস কেটে আনতেন গরুর জন্য। জলা জায়গা থেকে আনতে হত। তাই দু-পায়ে জড়িয়ে যেত অজস্র জোঁক। কাস্তে দিয়ে সেই জোঁক ছাড়াতেন। সোমনাথ হোর এ কথাগুলো বলেছিলেন তাঁর মা-র কষ্টের কথা বোঝাতে ততটা নয়, যতটা তাঁর আত্মত্যাগের কথা বোঝাতে। এই ক্লেশের মধ্য দিয়ে তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তিনশো টাকা। এখনকার মূল্যমানে যার দাম তিরিশ হাজার। কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়োজনে তাঁর মা সেই সমস্ত টাকা একদিন তুলে দিয়েছিলেন পার্টি ফান্ডে।

এই একটি ঘটনায় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সোমনাথ হোরের আত্মিক সংযোগের প্রাথমিক সূত্র যেমন পাই, সেই সঙ্গে বেরিয়ে আসে সেই সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকদের আদর্শের ভিত্তিটিও। মায়ের এই আত্মত্যাগ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করবে মার্ক্সবাদের দিকে, এটা স্বাভাবিক। পার্টির কাছাকাছি আসার আর একটি প্রত্যক্ষ কারণের কথা তিনি বলেছেন 'আমার চিত্রভাবনা' পুস্তিকায়। ১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে আই এসসি পাশ করে কলকাতায় সিটি কলেজে বি এসসি-তে ভরতি হন। তখন থাকতেন বৌবাজারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ ছাত্রনিবাসে। তাঁর নিজের কথায় "এই সময়ে শিবু নামে এক সঙ্গীর প্রভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসি। পার্টি বে-আইনি ছিল; তাই আকর্ষণও সহজ ছিল।"

আঁকা-আঁকির ঝোঁক ছিল ছেলেবেলা থেকে। গ্রামের স্কুলে দেবেন্দ্র মজুমদার ছিলেন ড্রয়িং শিক্ষক। নানা ছবি দেখে কপি করতেন তাঁরই উৎসাহে। তারপর পার্টির সংস্পর্শে এলেন যখন পার্টির প্রয়োজনে আঁকা শুরু হল পোস্টার। সেই পোস্টারের মধ্য দিয়েই ক্রমান্বয়ে মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁর রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে শিল্পচেতনার। এই বন্ধনে সবচেয়ে বড় প্রেরণা ছিলেন চিত্তপ্রসাদ।

১৯৪৩-এ যে দুর্ভিক্ষ হয়, রেখায় ও লেখায় চিত্তপ্রসাদ তার প্রধানতম একজন ভাষ্যকার। সোমনাথ হোরও সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে চট্টগ্রামে দুর্ভিক্ষের ছবি বা ছবি কপি করে পোস্টার আঁকছেন। সেই সময় চিত্তপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা। দুজনের সংযোগটা তখন কেমন ছিল, তাঁর ভাষাতেই আমরা শুনে নিতে পারি সে কথা, যেমন বলেছিলেন তিনি এই লেখকেরও নেওয়া সাক্ষাৎকারে·

> "তখন উনি আমাকে একটা খাতা দিয়ে বলেন যে দেখ, এইভাবে ড্রয়িং করবে। যেভাবে করতেন, আমাকে সেভাবেই দেখিয়ে দিতেন। একটা পেনসিলে ড্রয়িং করে নিলেন, সারা দিনে হয়ত পনের-কুড়িটা ড্রয়িং করলেন। সন্ধ্যাবেলা বা অবসর সময়ে চায়নিজ ইঙ্ক দিয়ে সেগুলো আবার আঁকলেন, যাতে ছাপা যায়। কাজেই আমার হাতেখড়ি ঐখানটায় শুরু। চিত্তপ্রসাদ অনেক কাজ করেছেন, সে কাজ আপনারা দেখেওছেন। খুবই শক্তিশালী ড্রয়িং ছিল, যদিও তিনি প্রথাগত শিক্ষা পান নি। সেজন্য খুব একটা বিশেষ ক্ষোভও ছিল না। নিজেকে যথেষ্ট ভালভাবে প্রকাশ করতে পারতেন, তার প্রমাণ পরেও অনেক রেখে গেছেন— লিনোকাট উডকাটের মাধ্যমে।"

১৯৪৫-এ কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজে ভরতি হলেন যখন, তখন শিক্ষক হিশেবে পেলেন জয়নুল আবেদিনকে। আবেদিন পার্টির কেউ ছিলেন না। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে পার্টির সমর্থক যাঁরা তাঁদের স্নেহ করতেন খুব। জানতেন, এরা সৎ এবং কাজ করে নিষ্ঠা নিয়ে। সেদিক থেকে স্নেহ পেয়েছেন তাঁর। যত্ন করে শেখাতেন। আর তিনি নিজেও ছিলেন মন্বন্তরের রূপকারদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

মন্বন্তর বাংলার শিল্পকলায় প্রগাঢ় এক ছাপ রেখে গেছে। স্বতন্ত্র এক ধারার সৃষ্টি করেছে। একথা আমরা জানি। মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে চিত্তপ্রসাদ রেখায় ও লেখায় যে বিবরণ দিয়েছিলেন, তাঁর 'হাংরি বেঙ্গল' নামে বিখ্যাত পুস্তিকায় তা ধরা আছে। গোবর্ধন আশ, অতুল বসুও এঁকেছেন দুর্ভিক্ষের ছবি। সোমনাথ হোর জানিয়েছেন,

১৯৫০-৫১ সাল নাগাদ রামকিঙ্কর কয়েকটি ভাস্কর্য করেছিলেন দুর্ভিক্ষ নিয়ে। তাঁর মতে দুর্ভিক্ষ নিয়ে এত ভালো কাজ আর হয় নি।

১৯৪৩-এ সোমনাথ হোর ২২ বছরের তরুণ। দুর্ভিক্ষের তীব্র ক্ষয়ের বাস্তবতা, চিত্তপ্রসাদ ও জয়নুল আবেদিনের ছবিতে সেই বাস্তবতার দীর্ণ প্রকাশ এবং কমিউনিস্ট পার্টির দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আদর্শ তাঁর চেতনায় সমন্বিত হয়ে তাঁর বিশ্বদৃষ্টিকে যেমন রূপ দিচ্ছে, তেমনি শিল্পের নিজস্ব ভাষা আবিষ্কারের দিকেও তাঁকে প্রভাবিত করছে। ১৯৪৪-এর দু-একটি ড্রয়িং এখনও আমাদের দেখার সুযোগ হয়। যেমন তাঁর 'উন্ডস' নামে ইংরেজি পুস্তিকায় ছাপা হয়েছে সেরকম দুটি ড্রয়িং। চট্টগ্রামের রাস্তায় অনটন-পীড়িত শীর্ণকায় মানুষ থালা থেকে ভাত খাচ্ছে। ১৮-৮-৪৪ তারিখের কাজ। আর একটিতে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রুগ্‌ণ এক বালক। চিত্তপ্রসাদের বাস্তববাদী রেখারূপের ছায়া আছে এখানে। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই এখনও রেখাবিন্যাসে দক্ষতা বা নিজস্বতা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্যায়ে

১২৭· সোমনাথ হোর। তেভাগার ডায়রির স্কেচ। ২০ ডিসেম্বর ১৯৪৬।

১২৮· সোমনাথ হোর। তেভাগার ডায়রির স্কেচ। ২০ ডিসেম্বর ১৯৪৬।

১২৯· *সোমনাথ হোর। তেভাগার ডায়রির ছবি। উড এনগ্রেভিং।*

রূপভঙ্গির প্রাথমিক আদল ধরা আছে এখানে।

পরবর্তী বিকাশের প্রথম ও পরিণত ধাপ তেভাগা পর্যায়। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গিয়েছিলেন রংপুর জেলায় 'তেভাগা' নামে কৃষক আন্দোলনের একটি কেন্দ্রে। 'সুবর্ণরেখা' প্রকাশিত 'তেভাগার ডায়েরি'র ভূমিকায় এই যাত্রার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> "আমি তখন কমিউনিস্ট পার্টির আনুকূল্যে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের ছাত্র এবং স্বাধীনতা দৈনিকে কিছু কিছু কাজ করি। থাকি ৭নং ধর্মতলা স্ট্রিটের কমিউনে কমঃ মুজফ্ফর আহমেদের আশ্রয়ে। সোমনাথ লাহিড়ী এবং নৃপেন চক্রবর্তী অকৃপণ স্নেহ করতেন। তাঁদেরই আগ্রহে যাই রঙপুরে তেভাগা আন্দোলন দেখতে।"

১৮ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর— এই ১১ দিনের সেখানে অবস্থানে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা একটি খাতায় ডায়েরি আকারে লিখেছিলেন। সঙ্গে ছিল বেশ কিছু স্কেচ। এখন বই আকারে প্রকাশের পর আমরা দেখছি— এটি সেই আন্দোলনের ইতিহাসের যেমন, তেমনি তাঁর ছবির বিকাশেরও একটি পর্যায়ের অসামান্য দলিল।

১২৭ তেভাগার ড্রয়িংগুলোব সময় সোমনাথ হোর আর্ট স্কুলে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। রেখার সঞ্চলন তখন বেশ কিছুটা ১২৮ আয়ত্তের মধ্যে এসেছে। চিত্তপ্রসাদ ও জয়নুল আবেদিনের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করে তাকে অনেকটা নিজের মতো ১২৯ করে প্রকাশ কবার ক্ষমতাও অর্জন করছেন। দৃশ্যের বাস্তবতা তখন তাঁর রেখারূপের প্রকৃষ্ট প্রস্থান বিন্দু। কিন্তু তা ১৩১ কখনোই প্রাকৃতিকতা বা ন্যাচারালিজম নয়। তেভাগার আন্দোলনের মধ্যে তখন তিনি দেখছেন কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে দুর্দমনীয় অঙ্গীকার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের সমবেত জেগে ওঠার মধ্যে দেখছেন যে আশার আলো, তারই প্রতিফলন ঘটছে তখন তাঁর রেখাতেও। পরবর্তী পরিণত পর্যায়ে তাঁর গ্রাফিকসে, এমনকী ভাস্কর্যেও রূপারোপে বা ফর্মে দৃশ্যগত বাস্তবতা বা রিয়ালিজমের কোনো প্রতিফলন আমরা দেখি না, যদিও ইতিহাস ও সময়ের বাস্তবতা বা রিয়ালিটিই তাঁর সমস্ত কাজেব প্রধান এবং একমাত্র প্রেরণা। তেভাগা পর্যায়ে রূপারোপে যথাযথতার খানিকটা আদল ছিল। কিন্তু তাঁর রেখা তখন থেকেই ভেঙে ভেঙে গিয়ে বস্তুর বা জীবনের গতির ছন্দটিকে ধবতে চাইছে। কোথাও কোথাও সূক্ষ্ম রেখার জাল বুনে তিনি ছায়াতপ এনেছেন। তাতে আয়তন ও দূরত্বের আভাস এসেছে। ব্যক্তির রূপাবোপে এসেছে ভরের দ্যোতনা। কখনো বা দৃশ্যের মধ্যে ছায়ার প্রশান্তি সঞ্চার করেছে। যেমন ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৬ তারিখে আঁকা একটি গ্রামের দৃশ্যের ছবিতে কয়েকটি কুঁড়েঘর, সামনে বিস্তৃত ফসল কাটা হয়ে যাওয়ার পরে শূন্য যে জমি তার রূপায়ণে আলো ছায়া দিয়ে আয়তন ও দূরত্বের সঞ্চার ঘটিয়েছেন।

১৩০· সোমনাথ হোর। দুর্ভিক্ষের দিনলিপি। ১৮·৮·১৯৪৪।

এই আয়তন পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ছবিতে বা ভাস্কর্যে কখনোই তেমন প্রাধান্য পায় নি। রেখা বা শূন্যস্থানের বিন্যাসই (spatial void) হয়ে উঠেছে তাঁর রূপায়ণের প্রধান মাধ্যম। আমরা পরে দেখব তাঁর ভাস্কর্যেও তাই। এদিক থেকে তাঁর ভাস্কর্যও ভাস্কর্যের ব্যাকরণের দিক থেকে এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। চল্লিশের দশকে আমাদের চিত্রকলার বিশেষ ধারা মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতর থেকে জেগে উঠেছিল। যেসব শিল্পী এই দায়বদ্ধতায় স্থিত থেকে পরবর্তীকালেও বিরামহীন কাজ করে গেছেন চিত্তপ্রসাদ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও সোমনাথ হোর—এই তিনজন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়। দেশ-কালগত বাস্তবতা তিনজনেরই সৃষ্টির মূলগত প্রেরণা। চিত্তপ্রসাদ পরবর্তী পর্যায়ে বাংলার লৌকিক শিল্পের রূপের সবলতা ও মাধুর্যে অভিষিক্ত করে নিয়েছেন তাঁর ছবির একটি ধারাকে। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় রেখারূপের দ্বিমাত্রিকতাতেই সঞ্চারিত করেছেন মানুষের প্রতিবাদের ও আন্দোলনের সচলতা। সোমনাথ হোর প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য দুটি ধারারই প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে দূরে সরে গিয়ে রৈখিক জঙ্গমতা ও আগে যাকে বলেছি স্পেশিয়াল ভয়েড তার স্বতন্ত্র ব্যবহারে খুঁজেছেন বাস্তবতার দীর্ণ করুণার রূপারোপ।

চট্টগ্রামের রাস্তায়

চট্টগ্রামের রাস্তায় লোকটির সঙ্গে দেখা। বহুদিন পর ভাতের আস্বাদ পাইয়াছে। সংকটে তাহার আত্মীয় পরিজন সকলেই মরিয়াছে। লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে ভিক্ষাই আজ উহার একমাত্র সম্বল। শিল্পী ঃ সোমনাথ হোড়

১৩১· সোমনাথ হোর। তেভাগার ডায়রির ছবি। উড এনগ্রেভিং।

তেভাগার কিছু কিছু ছবি তিনি পরবর্তীকালে ১৯৫০-৫৩ নাগাদ কাঠ খোদাইয়ে রূপান্তরিত করেন। তার মধ্যে কয়েকটি ছবি গ্রামীণ জীবন ও আন্দোলনের বাস্তবতার আশায় দীপ্ত আদর্শায়িত স্বপ্নের সমন্বয়ের অসামান্য দৃষ্টান্ত। 'কৃষকদের সভা' (১৯৫১) বা 'দলবদ্ধ সভা' (গ্রুপ মিটিং) (১৯৫৩) নামে ছবি দুটিতে অন্ধকার ভেদ করে আলোর উদ্ভাসে জেগে উঠছে যে মানুষের অবয়ব, শাদা-কালোর তীব্র ও দীপ্ত বিভাজনে জাগছে যে রূপের দীপ্র আততি,
১২৯ মানুষের চোখে-মুখে শপথ ও আশার যে স্তব্ধ আবেগ, তা এই ছবি দুটিকে বিষয়ে ও আঙ্গিকে চল্লিশ দশকের দায়বদ্ধতার চিত্রকলার ধারায় স্মরণীয় করে রাখে। চল্লিশের দশকে বিশেষত তেভাগা পর্যায়ে সহস্র ক্ষয় ও পরাধীনতার
১৩১ অবমাননার মধ্যেও জীবনের যে জেগে ওঠাকে রূপ দিতে পেরেছিলেন শিল্পী—পরবর্তীকালে বিশ্বাসের সেই সদর্থকতা স্বভাবতই স্তিমিত হয়েছে তাঁর কাজে। বাস্তবতার বিমর্ষ ভাঙন, মানবতার দুর্মর পরাভবই নন্দিত হয়ে স্বতন্ত্র এক বিশ্বদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তেভাগায় অন্যতর এক গতির উপলব্ধি জেগেছিল। সেই গতির উদ্ভাসে তিনি জীবনকে দেখেছেন, শিল্পকেও দেখেছেন। এই উৎস থেকে তাঁর পরবর্তী জীবনের নন্দনচেতনাও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। 'তেভাগার ডায়েরি'-তে শেষ দিনটিতে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন:

> "রাতের শেষ, দিনের শুরু। এমনি সময় পুবের আকাশ, যাকে পেছনে ফেলে চলেচি, অপরূপ রূপে সজ্জিত হয়েচে। অবাক হয়ে ভেবেচি, কেন এমন হয়, কেন এমনটি হয়! বিস্তৃত দুনিয়ার প্রতি অণু-পরমাণু যেন এক অবিরাম গতির আকর্ষণে তীব্র বেগে একদিকে ছুটে চলেচে। এই গতির বন্ধনের বাইরে কেউ নেই। মনে হয়, এই গতি, অবিচ্ছিন্ন অবিরাম গতি, ছবির প্রাণ, ছবি—সে ধরণীর বুকেই হোক, আর কাগজের বুকেই হোক, গতিহীন হতে পারে না।"

আপাতভাবে দেখতে গেলে সোমনাথ হোরের জীবনে গতির কোনো চঞ্চলতা নেই। সহজ করে বলতে গেলে ছটফটানি নেই কোনো। জীবনে তিনি অল্পই ভ্রমণ করেছেন। কয়েকবার বিদেশে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেছেন। দেশের মধ্যেও খুব কম জায়গায়ই তিনি গেছেন। এমনকী কোনারক, এলিফেন্টাও দেখা হয় নি তাঁর। তাঁর শিল্পেও একটি জায়গাতেই তিনি স্থিত থেকেছেন। যেটুকু তাঁর ক্ষমতা বলে মনে করেন, তারই সবটা তিনি প্রয়োগ করতে চান। নিজের সীমার বাইরে যেতে চান না। তিনি বলেন, পাঁচ ফুট যদি লাফানোর ক্ষমতা হয় তাঁর, সেটাকে দশ ফুট করার কোনো ইচ্ছা বা চেষ্টা তাঁর থাকে না। এই আপাত গতিহীনতার মধ্যে কোথায় তাঁর গতির উৎস, কোথায়ই-বা গতির অভিব্যক্তি—এই সন্ধানই আমাদের নিয়ে যেতে পারে তাঁর শিল্প ও শিল্পনন্দনের কেন্দ্রে। স্তব্ধতার মধ্যেও গতি আছে। অন্ধকারই অনেক সময় উজ্জীবনের উৎস। বাস্তবতায় আলগ্ন যে স্তব্ধতা ও অন্ধকার, তার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই তিনি খুঁজেছেন শিল্পের জঙ্গমতা, শিল্পের আলো।

তিন

ক

চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে সোমনাথ হোর যখন আর্ট কলেজে শিখছেন একই সঙ্গে পার্টির প্রয়োজনে এঁকে যাচ্ছেন ছবি ও পোস্টার। রাজনৈতিক ছবি বা পোস্টার হলেও তাতে বিন্দুমাত্র অনুৎসাহ বোধ করছেন না। প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি হচ্ছে না বলে বিব্রতও হচ্ছেন না। বরং বলেছেন, "তখন মাও সেতুঙের একটি কথা খুব অর্থপূর্ণ মনে হত—যুদ্ধকালে সমগ্র প্রচেষ্টা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে নিয়োজিত কর; সূচীশিল্প শান্তিপর্বের জন্য মুলতুবি থাক।" ('আমার চিত্রভাবনা') সেই সময় বেঙ্গল স্কুলের উত্তাল ঢেউ কলকাতায় বা বৃহত্তর বাংলায় আগের তুলনায় অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। আধুনিকতার অন্য একটা দিগন্তের দিকে নিজেদের উন্মীলিত করছেন সেই সময়ের তরুণ শিল্পীরা। ১৯৪৩-এ 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র সূচনায় পাই যার অন্যতম প্রকাশ। সোমনাথ হোরও বেঙ্গল স্কুলের প্রতি ততটা আকৃষ্ট ছিলেন না তখন।

এখন পরিণত বয়সে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্করকে যদিও ভারতীয় আধুনিকতার চারটি স্তম্ভ স্বরূপ মনে করেন তিনি, তবু কোনো সাধারণ ঐক্য পান না তাঁদের কাজে যাকে একটা বিশেষ কোনো স্কুল বা ধারার

অন্তর্গত করে ভাবা যায়। বরং তিনি মনে করেন:

"(অবনীন্দ্র পরম্পরার) এমন অনেক শিল্পী ছিলেন যাঁরা বাইরে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় হয়ত কলেজে অধ্যক্ষ হয়েছেন, শিক্ষকতা করেছেন··· তাঁদের সৃজনশীল কর্ম ততটা ছিল না, যতটা দাপট ছিল। তাঁরাই আসলে বেঙ্গল স্কুলের একটা ধারণা বাইরে তৈরি করেছেন। ঐ ধারণাটা এখানকার, বাঙলা দেশের যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি বাঙলার বাইরের, ভারতের অন্য অংশের।··· এরা খুব দাপটে সেই সময় চালিয়েছেন। কারণ বাঙলা থেকে গেছেন, তাঁদের অন্যরা মনে করত বেঙ্গল স্কুলের লোক। তার সুবিধা যেটুকু, সেটাও নিয়েছেন ওঁরা। তার ফলে ওই যে রিভাইভালিস্ট কিংবা ওই যে অজন্তা ইলোরা মুঘল পেইন্টিং, রাজস্থানী পেইন্টিং, কাংড়া ইত্যাদি—এগুলোর কপি করা, অনুকরণ করা, তাই দিয়ে স্কুল মতো একটা চিন্তাধারা তাঁদের গড়ে উঠল। সেটা এখনো আছে।"

আর্ট কলেজের প্রথম দিকের জীবনে তাঁকে বরং মুগ্ধ করত হেমেন মজুমদার। যামিনী গাঙ্গুলির স্বাভাবিকতার রীতিও দেখছেন তখন। পাশাপাশি দেখছেন নন্দলাল বা বিনোদবিহারীর ছবি। এই দুইয়ের মধ্যেও এত পার্থক্য কেন ভেবে অবাক হচ্ছেন। তবু বাস্তবতা ও সমাজচেতনাকেই যখন তিনি বরণ করেছেন, বা আরো বেশি করে করবেন, তাঁর জীবনের পথ বলে, তখন ভালো ড্রয়িং শেখাটা যে খুব জরুরি, এই উপলব্ধিটা এসেছিল। আর্ট কলেজে পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সেই চেষ্টাটাই চালিয়ে গেছেন।

১৩২· সোমনাথ হোর। ইকলিপস: রঙিন এচিং। ১৯৬৬।
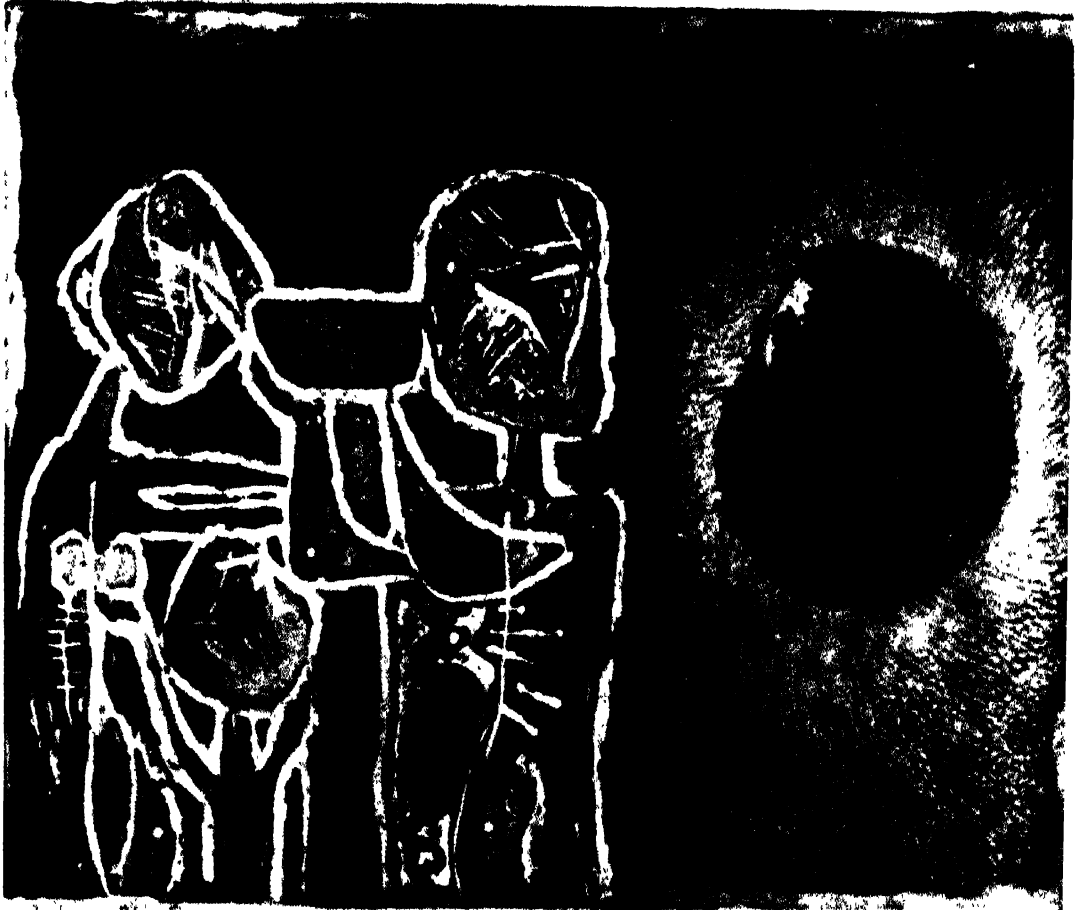
কিন্তু রাজনীতির টানে আর্ট কলেজের কোর্স আর শেষ করা হয় নি তখন। ১৯৪৯-এ আত্মগোপন করেন। আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকার সময়ই গ্রাফিকস বা ছাপাই ছবির দিকে ঝোঁকেন। তখন উদ্দেশ্য ছিল একই ছবিব বেশি করে কপি করে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। সেই চেষ্টাটা থেকে যায় তাঁর। পরবর্তী জীবনে একটা পর্যায়ে ছাপাই ছবিকেই তিনি তাঁর প্রধান প্রকাশ মাধ্যম করে নেন।

১৯৫৩-তে বছরখানেকের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরি করেন। বস্তীবাসী ছেলেদের পড়ানো ও আঁকা শেখানো ছিল তখন তাঁর কাজের অঙ্গ। তারপর ১৯৫৪-তে অতুল বসুর আহ্বানে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষকতায় যোগ দেন। ছাপাই ছবি শেখানোর দায়িত্ব পড়ে তাঁর উপরে। সেই তাগিদেই তখন বেশি করে ছাপাই ছবির চর্চায় নিমগ্ন হন। ১৯৫৭-তে সরকারি আর্ট কলেজে শেষ পরীক্ষা দিয়ে সেখানকার ডিগ্রিটি নেন। ১৯৫৮-তে দিল্লি পলিটেকনিকে (আর্ট কলেজে) অধ্যাপক হিশেবে যোগদান করেন, গ্রাফিক আর্টের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে। ভবেশ সান্যাল, দিনকর কৌশিক, শৈলজ মুখার্জি, ধনরাজ ভগৎ, জয়া আপ্পাসামি প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসেন তখন।

ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ ও দিল্লি পলিটেকনিকে (পরে দিল্লি আর্ট কলেজ) শিক্ষকতার সময় তিনি নিমগ্ন ছিলেন গ্রাফিক আর্টের নানা পদ্ধতি ও প্রকরণ নিয়ে নিবিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। রাজনৈতিক চেতনাই তাঁর গ্রাফিক আর্টের প্রতি আকর্ষণের প্রাথমিক উৎস একথা আগে বলেছি। ১৯৪৬-এ চীনের উড-কাট প্রিন্টের অজস্র ছবি আসত কলকাতায়। সেগুলো দেখে অনুপ্রাণিত হতেন। প্রণবরঞ্জন রায়ের লেখা থেকে (ললিতকলা অ্যাকাডেমির মনোগ্রাফের ভূমিকা) জানি যে সফিউদ্দিন আহমেদের কাছে কাঠখোদাই ছবির প্রথম শিক্ষা নেন সোমনাথ। তারপর ১৯৪৭-এ রচনা করেন তাঁর প্রথম কাঠখোদাই।

ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে যান যখন, তখন সেখানে ধাতু-তক্ষণ বা এচিং-এর যন্ত্রপাতি ও উপকরণ প্রায় কিছুই ছিল না। তিনি বলেছেন, তিনি ও তাঁর স্ত্রী বহুদিন বিভিন্ন দোকানে দোকানে ঘুরে ও বইপত্র পড়ে কখনো সংগ্রহ করেছেন, কখনো তৈরি করে নিয়েছেন উপকরণ। দিল্লিতে ১৯৫৮-র ডিসেম্বরে 'কুমার গ্যালারি'-তে কৃষ্ণ রেড্ডির একটি এচিং বা ইন্তালিও ছাপাই ছবির প্রদর্শনী দেখলেন। সেগুলো ডিফারেনসিয়াল ভিসকসিটি পদ্ধতিতে একই প্লেট থেকে একবারে একাধিক রঙে ছাপ তোলা ছবি। তাঁর কথায়, "কাজ দেখে আমি অবাক। এচিং-এ এরকম হয় কি করে?" কৃষ্ণ রেড্ডির কাছে জানতে চাইলেন পদ্ধতি সম্পর্কে। কিন্তু "উনি সেগুলো এড়িয়ে গেলেন।" এচিং-এর পদ্ধতিগুলো তখন হয়ে উঠছিল এক একজন শিল্পীর নিজস্ব ট্রেড সিক্রেটের মতো। সোমনাথ হোর ভাবলেন—এরকম হলে তো ছাপাই ছবির কোনো বিকাশ সম্ভব নয়। তখন তিনি নিজেই চেষ্টা করতে লাগলেন পদ্ধতি উদ্ভাবনের এবং সেগুলো ছাত্রছাত্রীদের শিখিয়ে দেওয়ার। "প্রভাস সেন মশাই একটা বই আমাদের দেখতে দিয়েছিলেন। তার থেকে আমি কিছু কিছু মডার্ন টেকনিকস জানতে চেষ্টা করি। করতে গিয়ে দেখলাম যে ওদের জিনিশ আর আমাদের জিনিশ এক হয় না। তখন আমি ভাবলাম, যাক গে ওদের জিনিশ, আমরা যেটুকু পারি···"। সেই থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু। দু-বছরের মধ্যে অনেকটা আয়ত্ত করলেন একই প্লেটে বিভিন্ন রঙে ছাপা তোলার এচিং-এর প্রকরণ। ১৯৬০-এ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল সেসব এচিং-এর ছবি নিয়ে প্রদর্শনী। সে বছরই এচিং-এর জন্য পেলেন 'ললিতকলা অ্যাকাডেমি'-র জাতীয় পুরস্কার। এর পরেও দুবার পেয়েছিলেন। ১৯৬২-তে 'বার্থ অব আ হোয়াইট রোজ' নামে এচিং-এর জন্য। ১৯৬৩-তে 'ড্রিম' নামে ছবির জন্য।

'বার্থ অব আ হোয়াইট রোজ' প্যাট্রিস লুলুম্বার অমানবিক হত্যা নিয়ে আঁকা। অন্ধকারের কালো শক্তি চারপাশ থেকে আগ্রাসী হয়ে আসছে। তার মধ্যে মাথা তুলে জেগে উঠছে উন্মুখ শুভ্র গোলাপ। এ ছবিতে এনেছেন কতকগুলো বিমূর্ত টেক্সচার অনেকটা ফরাসি শিল্পী উইলিয়াম হেটারের পদ্ধতিতে। টেক্সচারের প্রেরণা আসছে আরো অন্য উৎস থেকে। দিল্লিতে যেখানে থাকতেন সেই হাউজ খাস-এ ছিল একটা পুরোনো কেল্লা। তার পাথরের দেয়ালে দেখতেন নানা মূর্ত বা বিমূর্ত রূপাবয়ব। কাজের মধ্যে ছায়া ফেলছে সেই সব। দিল্লিতে থাকতে লিথোগ্রাফ নিয়েও শুরু করেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কেমন করে সমান উৎকর্ষের বহু ছাপ তোলা যায়; সেজন্য তৈরি করিয়ে নেন ছাপাইয়ের যন্ত্র।

১৯৬০-এ কলকাতায় 'সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস' নামে শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে সদস্য হিশেবে যোগ দেন কিছু পরে। ছাপাই ছবিতে সোসাইটির কিছু শিল্পী তখন সক্রিয় হচ্ছেন। সোমনাথ হোরের কাজ যুক্ত হয়ে ছাপাই ছবিতে কলকাতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। দিল্লি, কলকাতা এবং পরে শান্তিনিকেতনে কাজের

রঙিন ছবি ১৪· সোমনাথ হোর। ফুটপাথ ১৯৪৩ বা পথের পাঁচালি। ব্রোঞ্জ। ১৯৮৯-৯১।
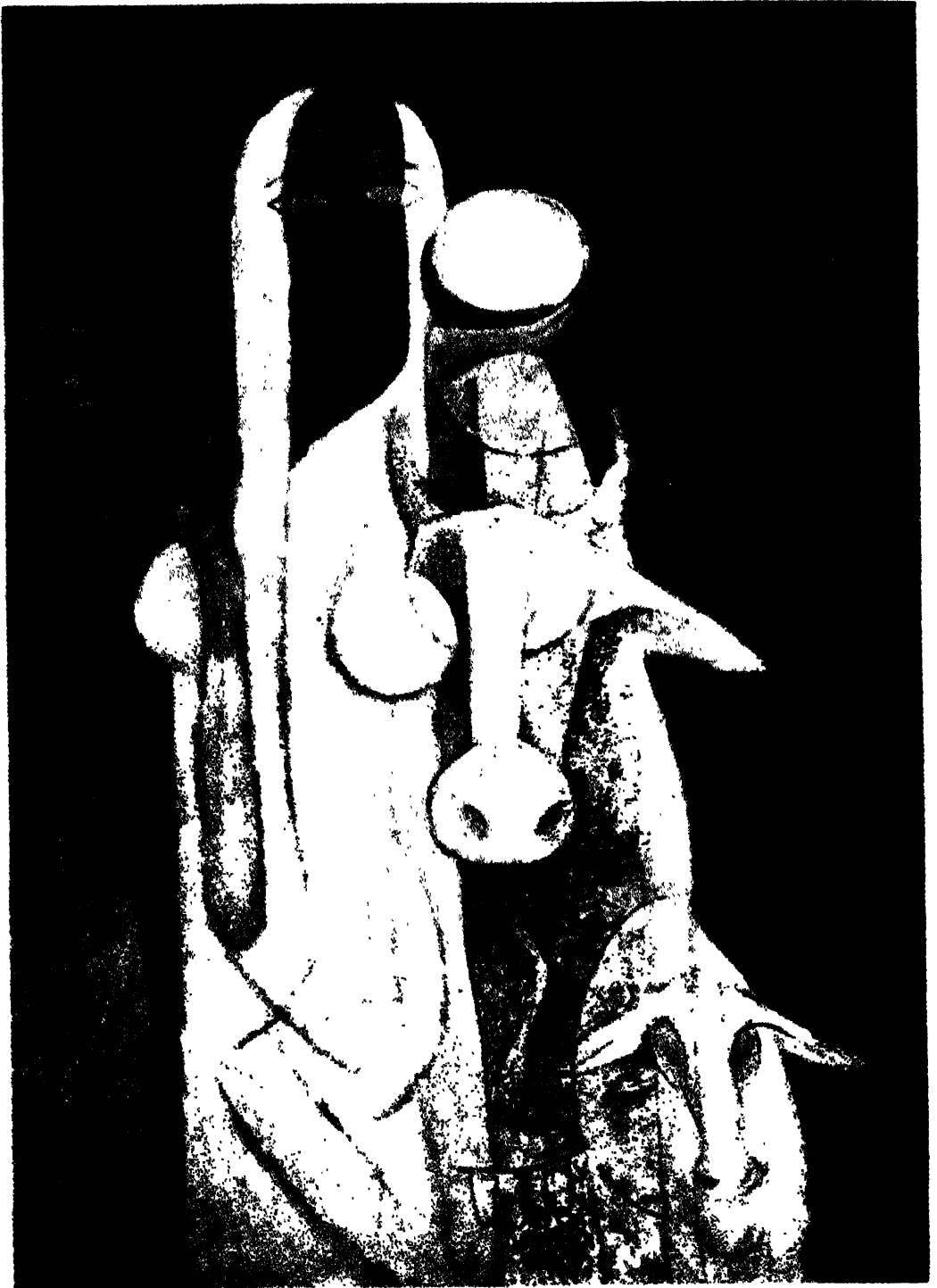
রঙিন ছবি ১৫· সোমনাথ হোর। কম্পোজিশন। ১৯৬০। (ছবি)।

মধ্য দিয়ে তিনি ছাপাই ছবিতে সচলতা ও নান্দনিক উৎকর্ষ আনলেন। কাইকোমোতি, কৃষ্ণ রেড্ডি, কানওয়াল কৃষ্ণ প্রমুখ শিল্পীর এই ক্ষেত্রে অবদান সত্ত্বেও প্রণবরঞ্জন রায় লিখেছেন "সোমনাথই গ্রাফিক মাধ্যমের প্রথম বহুমুখী (ভ্যারসাটাইল) শিল্পী যাকে নিয়ে ভারতবর্ষ গর্ব করতে পারে।" (পূর্বোক্ত উৎস)

দিল্লি ভালো লাগছিল না বলে দিল্লির চাকরি ছেড়ে চলে আসেন ১৯৬৭-তে। ১৯৬৯-এ দিনকর কৌশিকের আহ্বানে শান্তিনিকেতন কলাভবনে যোগ দেন। প্রথমে একটু সংশয় ছিল। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে তা কাটিয়ে উঠতে পারেন। তাঁর বইতে লিখেছেন :

"... বিনোদ-দা সস্নেহে বলেছিলেন—'চলে এসো। এখানে যারা কাজ করতে চায়, তাদের সময় সুযোগ অসীম। আবার যারা না কাজে, অ-কাজে সময় কাটাতে চায়, তার সুযোগও অপার। তবে কাজ করতে গেলে বহু বিপত্তি আসবে। স্বধর্মে স্থির থাকলে, সেগুলি গায়ে লাগবে না।' ২৪ বছর বাদে অক্লেশে বলতে পারি—এই পরামর্শ আমার ক্ষেত্রে পরম প্রাপ্তির কারণ হয়েছে। এসেই তাঁর এবং রামকিঙ্করের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাই। আমার সাধ্য ছিল না—এই দুজন প্রতিভাধরের শিল্পক্ষেত্রে গভীরতার কোনো পরিমাপ করা।" ('আমার চিত্রভাবনা')

শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্কর ও বিনোদবিহারীর সান্নিধ্য তাঁকে শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এখানে তিনি গ্র্যাফিকস ও অন্যান্য মাধ্যমে কাজ করে গেছেন অবিরল। ১৯৭০ থেকে শুরু করেছেন এক নতুন মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা—শাদার উপর শাদায় বিমূর্ত ছাপের ছবি। তাঁর একান্ত নিজস্ব অভিনব মাধ্যম এটি। তারপর ১৯৭৪ থেকে শুরু হয়েছে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব। এক নতুন রীতির ভাস্করের উত্থান। এই দুটি মাধ্যম বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আমরা পরে আসব। তার আগে একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি তার 'ক্ষত'-এর দর্শন।

১৩৫

দিল্লিতে এচিং করার সময় ধাতব প্লেটকে অ্যাসিডে ডোবাতেন যখন, দেখতেন বেগুনি রঙের বুদ্‌বুদ্ উঠছে। অ্যাসিড ক্রমে ক্রমে খেয়ে নিচ্ছে ধাতু। ক্ষতের জন্ম হচ্ছে। আবার যখন প্রিন্ট নিচ্ছেন কাগজে ক্ষত সঞ্চারিত হচ্ছে কাগজের উপরিতলেও। ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে ক্ষতের প্রত্যয়। কাঠ-খোদাইয়ে নরুন দিয়ে কাটছেন কাঠ, সৃষ্টি হচ্ছে ক্ষত। কুঠারাঘাতে গাছ কাটা হচ্ছে, রাস্তার পিচের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে গাড়ি—পড়ে থাকছে গভীর দাগ। মানুষ মানুষকে মারছে, অস্ত্রাঘাত করছে শরীরে বা বুকে, ক্ষত জীবনকে ধ্বংস করছে। মৃত্যুকে টেনে আনছে জীবনে। আততায়ী, সমাজবিরোধী বা বিদেশী শত্রুর বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে শত সহস্র মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চট্টগ্রামে বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে দেখেছিলেন এক বালিকাকে। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে! ভিয়েতনামে মার্কিনি বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে শতশত অসহায় নিরস্ত্র নারী পুরুষ শিশু। ১৯৬৮-৬৯-৭০-এ আমাদের এই বাংলাতেও নকশাল আন্দোলনের অছিলায় দেখেছেন সমাজবিরোধী দৌরাত্ম্য। নির্দোষ একজন মানুষ চলে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে—কয়েকটি মস্তান তাকে ধরে তারপর ছেড়ে দিয়ে আর একজন লোককে দেখিয়ে বলল, 'চলে যান, তবে যাওয়ার সময় লাথি মেরে যান ঐ লোকটিকে।' এই যে অমানবিকতা, মানবতার এই যে করুণ ও সর্বগ্রাসী ধ্বংস ও ক্ষয়—এ থেকেই জন্ম নেয় তাঁর ক্ষতের প্রত্যয়। কেন একে 'ক্ষত' বলছেন, 'উন্ড' বলছেন কেন, কেন বলছেন না সাফারিং বা পেইন? ১৯৮৫-র ৯ নভেম্বর সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন.

"না সাফারিং কিংবা পেইন বলছি না। উন্ডস। আমি উন্ডস বলছি। সাফারিং বা পেইন বড্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে যায়। একটা মানসিক ব্যাপার চলে আসে। কষ্টের অনুভূতি।... মাটির রাস্তার ওপর সাইকেলের চাকার দাগ, আমি এটাকে উন্ড বলি। এখানে ঠিক কষ্টটা নেই। ...গাছে একটা কোপ মারা হয়েছে, একটা ক্ষত হল। এই যে ক্ষত, এটা রিয়েল। বা বোমা লেগে সেই মেয়েটির নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসা—এটা উন্ড। উন্ডস এক্সিস্ট করছে।"

তেতাল্লিশের মন্বন্তরে আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যে ক্ষত-চিন্তা দানা বেঁধেছে তাঁর মনে, তা-ই ক্রমে প্রসারিত হয়ে গেছে তাঁর সমগ্র চেতনায়। এক প্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছে। যে প্রত্যয় নিয়ন্ত্রণ করে তাঁর সামগ্রিক বিশ্ববীক্ষা ও শিল্পের নন্দন।

দুর্ভিক্ষের থিমটাই বারবার আসে তাঁর কাজে। যে কোনো মাধ্যমের সঙ্গে সেই থিমটাই জড়িয়ে যায়। কিন্তু এটাই যে ছবি বা ভাস্কর্যের সীমা, তা তিনি কখনোই মনে করেন না। যামিনী রায়ের ছবি দেখলে তাঁর ভালো লাগে। মুগ্ধ হন রামকিঙ্করের কাজে। প্রগাঢ় আকর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথের ছবিও। কিন্তু তাঁদের মতো কাজ তাঁর আসে না। বলেন:

১৩৩· সোমনাথ হোর। খেঁকি। ব্রোঞ্জ।
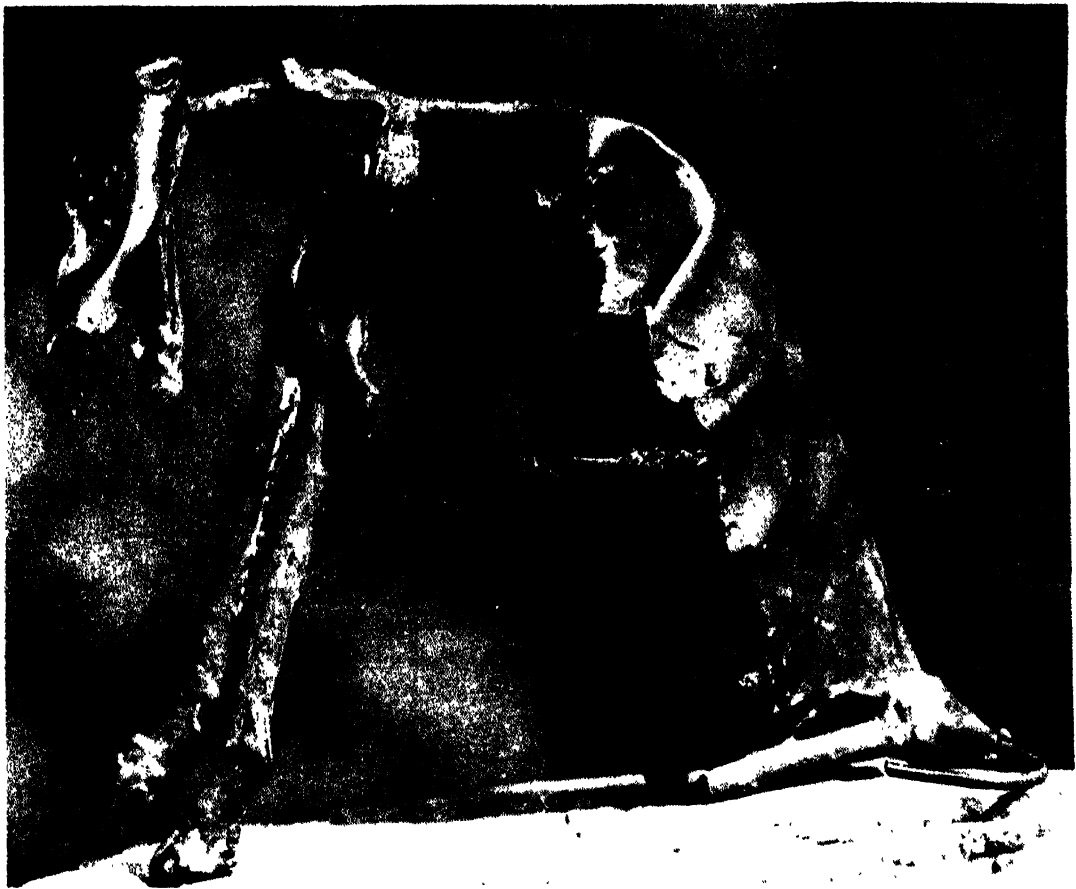
"একটা ফর্ম এনে তার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা, সেটা আমি পেরে উঠি না। সেটা আমার অক্ষমতা। কাজেই ঐ স্বল্প পরিসরের মধ্যেই কাজ করে যাচ্ছি।"

এই চিন্তা ও এই বিশ্ববীক্ষাই গড়ে তোলে তাঁর রূপাবয়ব বা ফর্ম। যে কোনো মাধ্যমেই কাজ করেন না কেন ঐ ফর্মটাই এসে যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান তিনি:

"ধরুন আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি·· বিলিতি কুকুর যাচ্ছে সুন্দর, অ্যালসেসিয়ান যাচ্ছে, লেগহর্ন যাচ্ছে··· একটা নেড়ি কুকুর পড়ে আছে। চামড়া উঠে গেছে। আমার চোখ প্রথম ঐদিকে যাবে। কারণ ওর মধ্যে আমি এমন একটা, কি বলব, নান্দনিক জিনিস পাই। ওর bones-গুলো, ওর ভঙ্গিটা, স্ট্রাকচারটা, এগুলো আমার কাছে অনেক বেশি জরুরি হয়ে ওঠে একটা সুন্দর কুকুরের চেয়ে। সেখানে আমি অসহায়। আর সেটা নিয়েই নানানভাবে খেলা করি।"

এই সীমার মধ্যে খেলা করে তাঁর ক্ষত-চিন্তা। মানুষ ও প্রকৃতি মানুষকে যে অসীম দুঃখে, অসীম অসহায়তায় ঠেলে দেয়, তার মধ্যে মানবিক প্রাণের যে সীমাহীন বেঁচে ওঠার ও জেগে ওঠার তীব্র স্পৃহা তাকেই তিনি রূপ দিয়ে চলেন তাঁর সীমাবদ্ধ রূপাবয়বে, সীমাবদ্ধ অভিব্যক্তিতে।

১৩৪· সোমনাথ হোর। রঙিন ড্রয়িং। ৩০·৪·১৯৮১।

এই 'ক্ষত'-ই এক সময় অবয়বের আধার ছাড়িয়ে নিরবয়বে অভিব্যক্ত হতে চেয়েছে। তারই পরিণতি তাঁর শাদার উপর শাদার গ্র্যাফিকসগুলি। অত্যাচারিতের, যন্ত্রণাক্ত প্রাণের যে যন্ত্রণার অনুভূতি, স্তব্ধ বা মুখর ঘনীভূত যন্ত্রণা যেটুকু, তাকে কি দৃশ্যতার সীমায় ধরা যায়? খুবই দুরূহ কাজ ছিল সেটা। প্রচলিত বিমূর্ত ছবির রেখা ও রঙের ঝংকার বা হার্দ্য পরিমণ্ডলকে পরিহার করেছেন তিনি। এমন একটা পথে গেছেন, যার কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না। প্রকৃত ক্ষত যেভাবে তৈরি হয় সেভাবেই মাটি বা মোমের পাতে ক্ষত তৈরি করে নিয়েছেন। কখনো অস্ত্রের আঘাতে, কখনো আগুনে ঝলসে নিয়ে। সিমেন্টের ছাঁচ তৈরি করে, তাতে স্থানান্তরিত করেছেন সেই ক্ষত। সেই মোল্ড বা ছাঁচ থেকে কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি হাতে গড়া কাগজে ছাপ তুলেছেন। কাগজের মণ্ডকে ছাঁচের উপর বিছিয়ে দিয়েছেন। তারপর প্রচণ্ড চাপে সেই মণ্ড ছাঁচের উপর ছড়িয়ে গিয়ে ক্ষতের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। তুলে এনেছে ক্ষতের স্মৃতি ও সত্তা। কাগজের মণ্ড বিস্তৃত হতে হতে যখন বিশুষ্ক হতে থেকেছে, তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে সুতীব্র এক আততি, যারও রয়েছে স্বতন্ত্র এক নন্দন-মূল্য। কখনো শাদার মধ্যেই শাদায় সৃষ্ট হচ্ছে অবিন্যস্ত অবতল খাদ। কখনো তার পাশে সামান্য উত্তলতা সংঘাতে অবস্থান করছে। কখনো ঝরে পড়ছে যেন রক্তবিন্দু বা অশ্রুজল। কোথাও একটু লালের ছোঁয়া লাগিয়ে দিয়েছেন। যেন চাপ চাপ রক্ত লেগে আছে। আর বিস্তীর্ণ সেই শাদার মধ্যে ঐটুকু লাল সহসা ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। ক্ষতকে আলোড়িত করে সমগ্র অস্তিত্বের স্তব্ধ ও হিমায়িত হাহাকার যেন তীব্র ঝংকারে বেজে উঠছে।

এই কাজগুলো গ্র্যাফিকসে যেমন এক নতুন ধারার সৃষ্টি করল, তেমনি বিমূর্ত চিত্রের ধারাতেও আনল এক

১৩৫

সংযোজন। আবিশ্ব সামাজিক, রাজনৈতিক শোষণ মানুষের মধ্যে যে ক্ষত ও ক্ষয় জাগাচ্ছে, কোনো গল্প, বা সচিত্রকরণের সেন্টিমেন্টালিটির মধ্যে না গিয়ে বিশুদ্ধ চিত্রের ভাষায় তাকে কিভাবে প্রকাশ করা যায়, তার অসামান্য দৃষ্টান্ত উন্ড সিরিজের এই গ্র্যাফিকসগুলি। সমগ্র বিশ্বেরও গ্র্যাফিকসের ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এর তুলনা বিরল। ১৯৬৮-তে শুরু হয়েছিল এই কাজগুলি। প্রায় ১৯৮৩ পর্যন্ত অবিরত করে গেছেন। তারপর ছেদ পড়েছে। যে প্রচণ্ড শারীরিক শক্তি প্রয়োজন এই কাজে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা তাঁর কমেছে।

১৯৭৪ থেকে এর সঙ্গেই মেতেছেন এক নতুন খেলায়। 'ক্ষত' প্রসারিত হয়েছে ভাস্কর্যে।

চার

পথের পাঁচালি

অবশ্য একে ভাস্কর্য বলেন না সোমনাথ হোর। তিনি বলেন 'ব্রোঞ্জ'। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ—এই ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট আয়তন বা ভলিউমকে ভাস্কর্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে গণ্য করা যায়। আধুনিক ভাস্কর্য যদিও এই সংজ্ঞায় সীমিত থাকে নি, স্পেস বা শূন্যতা, ঋণাত্মক আয়তন বলা যায় যাকে, তা যদিও আয়তনের সঙ্গেই অন্বিত হয়ে, সেই সংজ্ঞাকে প্রসারিত করেছে অনেক, তবু ধনাত্মক আয়তন, ভর ও মাধ্যাকর্ষণের টান এই সমস্ত মাত্রাগুলোই ভাস্কর্য বিচারের মাপকাঠি থেকে গেছে অনেকদিন। বিশেষত আমাদের ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণতার বোধ স্ফীত গোলকাকৃতির প্রাধান্যের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত, সমস্ত শক্তি সেখানে এমনভাবে কেন্দ্রাভিমুখী হতে থাকে এবং আবার কেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হয়ে বিচ্ছুরিত হতে থাকে উপরিতলের বিস্ফারিত লাবণ্যে, যে সেই উত্তরাধিকারকে পরিপ্রেক্ষিতে রাখলে আয়তনের তথাকথিত প্রকাশহীন কোনো কাজকে ভাস্কর্যের সনাতন সংজ্ঞার মধ্যে আনতে দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক। আমরা জানি না একারণেই কিনা সোমনাথ হোর তাঁর ব্রোঞ্জের এই ত্রিমাত্রিক প্রতিমাকল্পগুলিকে ভাস্কর্য অভিধায় অভিহিত করতে চান না। যেমন তাঁর শাদার উপর শাদা গ্র্যাফিকসগুলো শিল্পের ধারাবাহিকতায় এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, তেমনি তাঁর ব্রোঞ্জও। কিন্তু এগুলোকে আমরা ভাস্কর্যই বলব। ভাস্কর্যের একটি নতুন দিক উন্মীলিত হল তাঁর হাতে।

খেলা হিশেবেই শুরু হয়েছিল এই সৃষ্টি। কলাভবনে ভাস্কর্য-বিভাগের ছাত্ররা অপ্রয়োজনীয় বা অব্যবহৃত মোমের পাত ফেলে দেয়। কখনো অবসরে সেই টুকরোগুলো তুলে নিয়ে দুহাতের আঙুলের চাপে তাতে ফুটিয়ে তুলতেন রূপ। এভাবেই খেলার মতো চলছিল। ভাস্কর্যবিভাগের এক ছাত্র চন্দ্রবিনোদ পাণ্ডে, তাঁর ভালো লেগে যায় এরকম কিছু কাজ। তিনি এগুলিকে ব্রোঞ্জে ঢালাই করতে চাইলেন। প্রথা বহির্ভূত রীতিতে ঢালাই করা হল। পাওয়া গেল এক নতুন ধরণের ভাস্কর্য। আর তারপর থেকে এই কাজ নিয়েই মেতে উঠলেন তিনি।

তবে একদিক থেকে দেখতে গেলে এই ত্রিমাত্রিকতায় পৌঁছনো যেন অবধারিতই ছিল তাঁর পক্ষে। গ্র্যাফিকসে কাজ করেছেন তিনি দীর্ঘদিন। কাঠ কেটে বের করেছেন রূপ। একাধিক তলে সঞ্চালিত হয়েছে অস্ত্র। এচিং করেছেন যখন, অ্যাসিড খেয়েছে ধাতু, তলের বিস্তার হয়েছে সেখানেও। শাদার উপর শাদাতেও উত্তলতা অবতলতাই সৃষ্টি করেছে রূপাভাস। ছবির সমতল থেকে গ্র্যাফিকসের একাধিক তলে এই যে তাঁর যাতায়াত, এরই অনিবার্য পরিণতি যেন এই মোমের তল নিয়ে খেলা।

এখানে একটি তলই সংকুচিত প্রসারিত হয়ে আকৃতি পাচ্ছে। যেহেতু একটিই তল, তাই এক প্রান্তে যতটুকু উত্তল হল সে, বিপরীত প্রান্তে সৃষ্ট হল ততটুকুই অবতলতা। কোনো কার্ভ বা বৃত্তচাপে যেমন হয়, সে যেমন একটি মাত্রাতেই সংস্থিত থাকে, দ্বিমাত্রিক কোনো ক্ষেত্র তৈরি করে না, এখানে দ্বিমাত্রিক নমনীয় মোম যেন দুটি মাত্রাতেই স্থিত থাকতে চাইছে, কেননা যদিও সে মোমের পাত, যত অল্পই হোক, তার তো আছেই বেধের একটি তৃতীয় মাত্রা, কিন্তু অপর দুটি মাত্রার তুলনায় তা এতই ক্ষীণ যে গণনার মধ্যে আসতে চায় না। আবার সে যখন বক্রতলে বিন্যস্ত হচ্ছে তখন তার মধ্যে আয়তনের আদল অবশ্যই আসছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে যে ঋণাত্মক আয়তন তা সেই আয়তনের ভর বা ওজনকে প্রশমিত করছে। এভাবে আয়তন হয়েও সে আযতনময় হতে পারছে না, ত্রিমাত্রিক হয়েও ত্রিমাত্রিকতার সমস্ত বৈশিষ্ট্যে সঞ্জীবিত হচ্ছে না। আর এই অভাবের মধ্য দিয়ে সে এক স্বতন্ত্র সত্তার বিকাশ ঘটাচ্ছে। ত্রিমাত্রিকতার মধ্যেও

১৩৫ সোমনাথ হোর। উন্ড ৪৯ · পাল্প প্রিন্ট · ১৯৭৯।

১৩৬ সোমনাথ হোর। তৃষ্ণা। ব্রোঞ্জ।
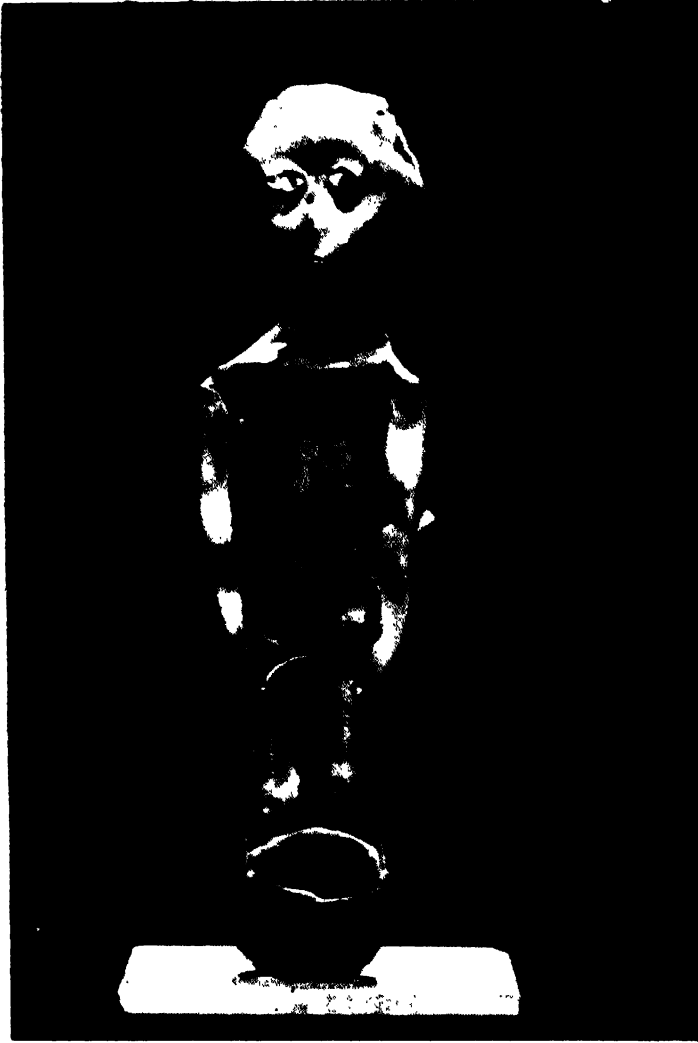
১৩৭· *সোমনাথ হোর। ক্ষুধা। ব্রোঞ্জ।*

রেখারূপের প্রাবল্য তাঁর ভাস্কর্যে। হাত বা পায়ের সরলরেখা, বুকের পাঁজরের হাড়ের ঋজু রেখা, পরস্পরের সাথে কখনো সমান্তরালে কখনো তীর্যক বা আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত হয়ে এক জটিল জ্যামিতির সৃষ্টি করে। এই জটিলতার মধ্য দিয়ে দুর্মর অস্তিত্বের বিশুষ্ক এক ক্ষয় আভাসিত হয়। চিরায়ত ক্ষতের স্পন্দন ধ্বনিত হয়।

এই স্পন্দন কখনো জয়ের বা আশার মহনীয় আবেগেও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যেমন হয়েছিল একবার ১৯৭৫ সালে, যখন মার্কিন আগ্রাসনের অসম যুদ্ধে ভিয়েতনামের জয় ঘোষিত হয়েছিল। অত্যাচারিত সংগ্রামী মানবতার জয়ে সেদিন নিষ্কলুষ আনন্দিত হয়েছিলেন শিল্পী। সেই আনন্দ ব্রোঞ্জে রূপ পেয়েছিল 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড' নামে একটি কাজে। এক নারী দাঁড়িয়ে আছে তাঁর বুক পেট মনে হয় ছিন্নভিন্ন বোমার আঘাতে। কিন্তু তাঁর মুখে জয়ের আলোকিত উদ্ভাসটি লেগে আছে। তাঁর বুকের কাছে দুহাতে আঁকড়ে ধরা তাঁর সন্তান। আকাশের দিকে, জয়-উদ্ভাসিত মায়ের মুখের দিকে হাতটি তুলে আছে সে। পুরো কাজটি একবারের ঢালাইয়ে করা। টুকরো টুকরো করে ঢালাই করা সম্ভব ছিল না। চল্লিশ ইঞ্চি উচ্চতা। ওজন ছিল চল্লিশ কেজি। ১২৬

১৯৭৫-এ শুরু হয়েছিল। শেষ হল ১৯৭৭-এর নভেম্বরে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, যেদিন শেষ হল, সেদিনই চুরি হয়ে গেল কাজটি কলাভবন থেকে। সম্ভবত এই একবারই ভাস্কর্যে মানুষের জয়ের কথা ঘোষণা করেছিলেন। আর সেটাই মানুষের কুটিল চক্রান্তে চিরতরে হারিয়ে গেল। গভীর আঘাত পেয়েছিলেন শিল্পী। বুঝেছিলেন এটা সাধারণ মূর্তি-চোরের কাজ নয়। কিন্তু কিছু করার উপায় ছিল না। ১৯৮৫-তে 'দেশ' পত্রিকার সেই সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন:

"এই চুরিটাকে সাধারণ চুরি বলে যাতে চালিয়ে দেওয়া যায় সেজন্য শান্তিনিকেতনের কয়েকটি ঘরের তালা ভাঙা হল। ডায়রি করা হল। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত ৪০-কেজি ওজনের ঘন্টা চুরি করানো হল। পুলিশের কুকুর এসে দু-তিন জনের আভাস দিল। তবু চোর ধরা হয় নি।"

সি বি আই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে তদন্ত কখনো হয় নি। পুরোটাই ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল।

তারপর থেকে অবশ্য ভাস্কর্য করে গেছেন অবিরত। ১৯৮৩-তে 'কলাভবন' থেকে অবসর নিয়ে 'লাল বাঁধে' নিজের বাড়িতেই ভাস্কর্য গড়ার ও ঢালাইয়ের সমস্ত সাজসরঞ্জাম তৈরি করে কাজ করছেন সেখানে। নানারকম কাজ করেছেন। করেছেন ফর্ম নিয়েও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় তার। হিন্দু-মুসলমান দুটি মানুষ আলিঙ্গনে

১৩৩ আবদ্ধ, নাম দিয়েছেন 'দ্বৈত'। একটি নেড়ি কুকুর বসে আছে মুখ হাঁ করে—নাম 'খেঁকি'। ১৯৮৪-র একটি কাজ—রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে হাড়-সর্বস্ব কুকুর, গায়ের চামড়াতেও ভেঙে ভেঙে গর্ত করে দিয়েছেন। তিনটি বাচ্চা দুধ খাচ্ছে সেই মা-কুকুরের। কুকুরটি মুখ ফিরিয়ে চাটছে একটিকে। নাম—'ফেমিলি' বা পরিবার।

দুটি সিলিন্ডার পাশাপাশি দাঁড় করানো, উপরে রাখা একটি নারীর মাথা। নাম—'নারী'। কৌটো হাতে রাস্তার পাশে

১৩৯ দাঁড়িয়ে আছে শিশু। নাম হয়েছে 'ক্ষুধা'। দুটি হাত আড়াআড়িভাবে ভূমিতে দাঁড় করানো, উপরে পাশাপাশি শূন্যে

১৩৭ অবস্থিত দুটি মাথা। দেখে বোঝা যায় হিন্দু ও মুসলমান। নামের মধ্যে আভাসিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্মৃতি—'ডেথ

১৩৮ ইউনাইটস'। এভাবেই উঠে আসে কিছু কিছু মানবিক সৌহার্দ্য, কিছু কিছু সুখের রূপকল্পও। যেমন 'দিদির সঙ্গে' নামে একটি কাজ—চারটি ছোট ছেলেমেয়ে ও একটি বড় মেয়ের যুগল। আবার 'সাশ্রু বুদ্ধ' নামে কাজটিতে বুদ্ধের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া জলের রেখায় থাকে যে করুণা তাতে আভাসিত হয় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে 'ক্ষত'-এর বিস্তারে বুদ্ধ যেন কাঁদছেন। বুদ্ধ যদি আজকে জন্মাতেন, তাহলে এই হত তাঁর প্রতিক্রিয়া।

প্রকাশের এই সমস্ত বৈচিত্র্যের অন্তরালে থাকে ক্ষতের একটি আদি রূপ। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের স্মৃতি তার সঙ্গে জড়ানো। সেই স্মৃতি শিল্পী কখনো ভুলতে পারেন নি। সেই স্মৃতি নিয়েই একটি বড় কাজ হয়েছিল সম্প্রতি। ১৯৯১-তে

র-১৪ সেটি শেষ হয়েছে আড়াই বছরের পরিশ্রমে। নাম 'পথের পাঁচালি'। ইংরেজিতে নাম দিয়েছেন 'ফুটপাথ, ১৯৪৩'। সেই ফুটপাথে মৃত্যুর স্মৃতি কাজটির মূল বিষয়। 'সিগাল'-এর প্রদর্শনীতে খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল একেবারে প্রদর্শনী কক্ষের মাঝখানে।

ইঁট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল পথের আদলে। তার উপর করা হয়েছিল কালো রং। চারটি মূর্তি নিয়ে সম্পূর্ণ কাজটি। দুপাশে বসে আছে দুজন—পুরুষ ও নারী। বসে আছে নিঃসহায়ের মতো। ওপাশে একটি মেয়ে কিশোরী মনে হয়। দাঁড়িয়ে আছে ভিক্ষাপাত্র হাতে। মাঝখানে শায়িত একটি বালকের অবয়ব। তাকে মৃত মনে হয়। আর মৃতকে ঘিরে তিনটি প্রাণী দিনের আলোর অন্ধকারে কিসের প্রতীক্ষা করছে? প্রতিটি মূর্তিই ছেঁড়াখোঁড়া। ব্রোঞ্জের বস্তুপুঞ্জের মধ্য দিয়ে চার পাশের শূন্যতার বাতাস খেলে যায়। মূর্তিগুলিতে অশরীরী কঙ্কালেব আদল আনে। জীবন ও মৃত্যু অভিন্ন হয়ে জড়িয়ে থাকে। জীবিতের মধ্যে মৃত সঞ্চারিত হয়ে যায়। আর এই মৃত্যুকে প্রগাঢ় করতেই কি মূর্তির হাত-পাগুলো স্বাভাবিক হাত পায়ের বদলে বাঁশের তৈরি হয়? বাঁশ থেকে সরাসরি প্লাস্টারে কাস্ট তুলে তারপর মোমে ছাঁচ তৈরি করে ব্রোঞ্জে ঢালাই করা হয়েছে এগুলি। তারপর শরীরের সঙ্গে ওয়েলডিং করে লাগানো হয়েছে। পেশী ও চামড়া ছাড়া মানুষের হাড়ের যে বিশুষ্ক অস্তিত্ব সেটাই প্রকট হয়ে ওঠে সরাসরি বাঁশের ব্যবহারে। তাছাড়া শহরের সঙ্গে গ্রামেরও কি একটা সংযোগ ঘটে যায়। এই যে মানুষগুলি, এরা তো গ্রামেরই মানুষ শহরে এসে অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। তাঁদের গ্রামীণ সত্তা প্রকট হয়ে ওঠে বাঁশের ব্যবহারে। তাছাড়া মৃত্যুর সঙ্গে তো সংযোগ আছে বাঁশের। বাঁশের খাটিয়ায় মৃত শ্মশানে যায়। বাঁশেই তার দাহও হতে পারে। প্রথমে গাছের ডাল ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলেন। তারপর বাঁশ দিয়ে গড়া ঠিক করেছেন শিল্পী। আমাদের শিল্প-ষড়ঙ্গে যে 'সাদৃশ্যে'র কথা আছে, তারই প্রয়োগ ঘটেছে এই বাঁশের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। মন্বন্তর থেকে আসা ক্ষয় ও মৃত্যুর এই ক্ষত অনির্বাণ হয়ে শিল্পীর বিশ্ববীক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ

করেছে।

একটা প্রগাঢ় বিশ্বাস নিয়ে শিল্পী জীবন শুরু করেছিলেন। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের সেই বীভৎস মৃত্যুর স্মৃতি পেরিয়েও সেই বিশ্বাস তাঁর অটুট ছিল। ১৯৪৬-এ 'তেভাগার ডায়েরি'-তে এর পরিচয় আমরা পেয়েছি। সেই বিশ্বাস নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি কাজ করে গেছেন। ১৯৪৯-এ আত্মগোপনের সময়ও করে গেছেন অজস্র পোস্টার ও লিনোকাটের ছবি। মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, সচেতনতা জাগানো তখন ছিল উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধ ছবি হয় নি বলে কোনো আক্ষেপ ছিল না। তারপর একটা অতৃপ্তি জেগেছে ক্রমে—রাজনীতি ও শিল্পের নন্দনের বিরোধ তাঁকে ভাবিয়েছে। ১৯৫২-সালে কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে সোভিয়েত শিল্পের যে বিপুল সম্ভার এসেছিল, তা দেখে একটু থমকে গেছেন। শিল্পবোধহীন রাজনীতি ও সমাজনীতি শিল্পকে কেমন অবনমিত করে তা দেখে আহত হয়েছেন। ভ্যান গঘের কথা ভেবেছেন। জীবনের আবেগ কেমন করে শিল্পে নন্দিত হয়, শত অবক্ষয়ের মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত হিশেবে। শিল্পকেই তাঁর জীবনের একমাত্র পথ ভেবেছেন যখন, তখন তারই সাধনায় নিরত হওয়ার জন্য সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন। ১৯৫৬-তে পার্টির সম্মতিতেই তিনি পার্টির সদস্যপদ ছেড়ে দেন। কিন্তু মার্কসবাদের উপর ক্ষণকালের জন্যও বিশ্বাস হারান নি। সেই আদর্শকে ধ্রুবতারার মতো সামনে রেখে কাজ করে গেছেন। ১৯৭৫-এ

১৩৮· সোমনাথ হোর। ডেথ ইউনাইটস। ব্রোঞ্জ।

১৩৯· সোমনাথ হোর। দা উওম্যান। ব্রোঞ্জ।

১৪০· সোমনাথ হোর। তেভাগার ড্রয়িং। ২৭·১২·১৯৪৬।

১২৬ ভিয়েতনামের যখন জয় হল, সেই জয়কে নন্দিত করেছেন 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড' মূর্তিতে।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখেছেন মার্কসবাদের আদর্শ ও মার্কসবাদী পার্টির মধ্যে ব্যবধান দুস্তর হয়েছে। আজ বুঝতে পারেন পার্টির নীতিতে তখনও ভুল ছিল। বলেন:

"এখন তো মনে হয় সেই সময়ের রাজনীতি প্রায় আগাগোড়াই ভুল ছিল।··· আমরা কী না করেছি। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের বিরোধিতা করেছি। রাতারাতি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলেছি। দুর্ভিক্ষের সময় আমরা শুধুমাত্র রিলিফ দিয়ে কাজ সেরেছি। অথচ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কৃষকশ্রেণীর উপর যে এত বড় আক্রমণ করল, সেটা আমরা বুঝতেই পারলাম না।··· নেতাজি সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত··· যার জন্য আজকে জ্যোতিবাবুকে দিয়ে ফুলের মালা দিতে হচ্ছে।" (লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলা)

এ সমস্ত সত্ত্বেও তখন পার্টি টিকে ছিল একদল নিবেদিত প্রাণ কর্মী ও সমর্থকের জোরে। আজ আর সেই মানুষ নেই। সারা পৃথিবীতেই পালটে যাচ্ছে হাওয়া।

"সেই দিনগুলো তো এখন নেই··· এখন এরা বুঝতে পারে না··· যার জন্য সোভিয়েত রাশিয়াই বলুন··· এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল··· আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না।" (পূর্বোক্ত উৎস)

তবু এখনও শেষ পর্যন্ত এক গভীর বিশ্বাসে স্থিত আছেন শিল্পী সোমনাথ হোর। বলেছিলাম সে কথা: "এ সমস্ত সত্ত্বেও আপনার বিশ্বাসে কিন্তু আপনি স্থির আছেন একটা জায়গায়। মার্কসবাদের উপর আপনার আস্থাটা কিন্তু কোনোভাবে টলে নি।" উত্তর দিয়েছেন দ্বিধাহীন কণ্ঠে:

"না টলে নি। কথা হচ্ছে টলিয়ে লাভ কী? এখন আমি আর দুবছর দশ বছরই না ম্যাক্সিমাম বাঁচলাম, কিন্তু ওইটুকু বিশ্বাস নিয়ে যদি আমি পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে থাকি, সত্তর বছরের জীবনে, তাহলে এখন আমি ওটা ছাড়ব কেন? কেননা ওটার তো একটা দৃঢ় ভিত্তি আছে।··· আমার সমস্ত প্রদর্শনীর (বা কাজের) একটাই কথা, যে—একটা লোকও কেন না খেয়ে থাকবে, একটা লোকও কেন নিরাশ্রয় হয়ে থাকবে, আর অন্যদিকে কেন এত অপচয় হবে? এটাই আমার কথা। এর মধ্যে আমি অন্য কিছুই আনছি না। মার্কসইজমেরও তাই কথা।" (পূর্বোক্ত উৎস)

এই বিশ্বাসের ধ্রুবতায় নিজের চেতনাকে অনির্বাণ সংলগ্ন রেখে এখনও সৃষ্টি করে চলেছেন শিল্পী সোমনাথ হোর। মার্কসবাদের দর্শনের সঙ্গে শিল্পের আবিশ্ব আধুনিকতার এক স্মরণীয় সংযোগ ঘটিয়েছেন তিনি। আমাদের দেশের ও আমাদের এই সময়ের যে বাস্তবতা শিল্পের নন্দনে তাকে মহনীয় করে চিরায়তের দিকে প্রসারিত করেছেন। আধুনিক শিল্পের ধারায় অসামান্য তাঁর এই অবদান।

মীরা মুখার্জির ভাস্কর্য: পার্থিবতায় অলৌকিক

'ধাতু দিয়েই গান গেয়েছি আমি' —মীরা মুখার্জি

এক

কেন মীরা মুখার্জি

এই লেখাটির জন্য একটি বিষয় নির্দিষ্ট ছিল। 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার দশ বছর পূর্ণ হল (১৯৮৩-১৯৯৩)। সে উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাটিতে বিগত দশকে বা সম্প্রতিকালে আমাদের সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর পর্যালোচনা হবে, এরকম পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন সম্পাদকমণ্ডলী। সমকালীন চিত্র ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এরকমই একটি বিষয় নিয়ে লেখার নির্দেশ ছিল। আমরা মীরা মুখার্জির ভাস্কর্য নিয়ে লেখার কথা ভাবলাম। কেন—সে সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া যায় মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে। হয়তো সেটাও, মূল আলোচনারই একটা অংশ।

বিগত এক দশকে আমাদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে, ছবির ক্ষেত্রেই বিশেষ করে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কী, এ প্রশ্ন করলে, প্রথমেই যে কথা মনে আসে, তা হল, এক ধরণের কমার্শিয়ালাইজেশন বা বাণিজ্যিকীকরণ। ছবির একটা বাজার তৈরি হয়েছে, যেটা ষাট বা সত্তরের দশক পর্যন্তও বিশেষ ছিল না। আশির দশকে শিল্পবিপণি বা আর্ট গ্যালারির বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে কলকাতায়। ছবির সঙ্গে দর্শকের সংযোগের ক্ষেত্র যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে ক্রেতার সঙ্গে শিল্পীর সংযোগও। এই সংযোগ মূলত গ্যালারির মাধ্যমে। তাতে ছবির জগতে যে রুদ্ধতা ছিল ষাট ও সত্তর দশকে সেটা অনেকটা কেটেছে। কিন্তু পাশাপাশি এই বাণিজ্যিকতা শিল্পের নান্দনিকতাকে আবৃত করেছে। ছবি অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে বাজার-নির্ভর বা ক্রেতার চাহিদা-নির্ভর। বাজার বা ক্রেতার রুচি শিল্পীর রচনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যে সমাজচেতনা, প্রতিবাদী চেতনা, ও আঙ্গিকগত অভিনবত্ব নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা এ অঞ্চলের চিত্রকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, সেটা অনেক কমে এসেছে। ছবি এখন একটা পণ্যে পরিণত হয়েছে, যেখানে মূলধন লগ্নি করা যায়। এই পরিবর্তনের একটা সর্বভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও আছে। এ নিয়ে অনেক কথা ইতিমধ্যে বলা হয়ে গেছে। নতুন কিছু তেমন আর বলার নেই। তাছাড়া এই ঘটনায় এমন কোনো গৌরবও নেই যা আমাদের বর্তমান এই আলোচনাটির বিষয় হতে পারে। তখন মনে হল এরকম কয়েক জন শিল্পী তো এখনো কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের ছবি ও ভাস্কর্যে, যাঁরা তাঁদের কাজের মধ্য দিয়েই এই গতানুগতিকতার বাইরে থাকতে পেরেছেন বা তাঁদের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া হয়ে উঠতে পেরেছে এই সহজ বাণিজ্যিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তাঁরা কোনোভাবেই কোনো আপোস করেন নি। অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিরন্তর কাজের মধ্য দিয়ে এই সময়কে উন্মোচিত করেছেন। তাঁদের এই বিরতিহীন কাজ করে যাওয়ার মধ্যে যে গৌরব আছে, সেটাই বরং হয়ে উঠতে পারে আমাদের বর্তমান আলোচনার একটি বিষয়।

এই প্রসঙ্গে দুজন শিল্পীর কথা বিশেষভাবে মনে আসে—একজন সোমনাথ হোর, অন্য জন মীরা মুখার্জি। কোনো বিস্তৃত ব্যাখায় না গিয়ে শুধু এই দুটি নামের উচ্চারণই আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারে আমরা সম্প্রতিকালে শিল্পের ক্ষেত্রে কোন গৌরব ও সফলতার কথা মনে রেখে একথা বলছি। সোমনাথ হোর সম্পর্কে কিছুদিন আগে এই 'প্রতিক্ষণে'ই

আমরা একটা লেখা লিখেছিলাম। বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম তাঁর মহত্ত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের জায়গাটা। (সেই লেখাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই বই-এর পূর্ববর্তী অধ্যায়ে) এবাবের আলোচনায় তাই আমরা বিষয় করে নিতে চাইছি 'মীরা মুখার্জির ভাস্কর্য'।

চিত্রকলার তুলনায় আমাদের ভাস্কর্যের ক্ষেত্রটি একটু জনবিরল। হয়তো-বা একটু অবহেলিতই। ভাস্কর্য এমন একটি শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ মাধ্যম যে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এর বিকাশ সম্ভব নয়। বিগত প্রায় এক শতকে আমাদের চিত্রকলায় আধুনিকতা যেভাবে বিবর্তিত ও বিকশিত হতে পেরেছে, ভাস্কর্যের বিকাশ সেই সমান্তরালে ঘটতে পারে নি। চিত্রকলায় আধুনিকতার সূচনা যে হতে পেরেছিল নব্যবঙ্গীয় ঘরানার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, আর সেই ধারা যে পরিপুষ্ট হতে পেরেছিল তৎকালীন স্বাদেশিকতার আবহাওয়ার মধ্যে, সেখান থেকেই যে সে প্রাণশক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছিল, এর একটা গভীর অভিঘাত রয়ে গেছে পরবর্তী বিবর্তনেও। ইওরোপীয় আধুনিকতার বাইরে দেশজ ঐতিহ্যের মধ্যে সে যে সঞ্জীবিত হয়েছিল, এটা কিন্তু তাকে একটা স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। চল্লিশ দশক পরবর্তী যে আধুনিকতার বিকাশ সেখানে ইওরোপের প্রভাব ছিল প্রগাঢ়। কিন্তু ইওরোপীয় আধুনিকতার অর্জনকে যখন আত্তীকৃত করার চেষ্টা করলেন আমাদের শিল্পীরা, তখনো পশ্চাৎপটে ছিল যে ধ্রুপদী ও লোকায়ত ভারতীয়তা চর্চার অভিজ্ঞতা, সেটা তাঁদের কখনোই শিকড়হীন হতে দেয় নি। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই তাঁরা তাঁদের শিল্পের আত্মপরিচয় খুঁজেছেন। যে কারণে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যেও, আমাদের এই পূর্বাঞ্চলের চিত্রকলায় বিশেষত, একটা ঐতিহ্যবিধৃত সমন্বয়চেতনা এখনো রয়ে গেছে। ষাট ও সত্তর দশকের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আশির দশকে এসে তা আরো প্রগাঢ়তর রূপ পেয়েছে।

এই বিষয়টি এখানে একটু বুঝে নিতে চেষ্টা করি। ষাটের দশকে আমাদের চিত্রকলার আধুনিকতায় একটা নতুন জোয়ার এসেছিল। এই শতকের প্রথম তিনটি দশকে নব্যবঙ্গীয় ঘরানার যে জয়যাত্রা, চল্লিশ দশকে এসে সেটা খানিকটা স্তিমিত হয়েছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তা হয়ে উঠেছে আধুনিকতার ইতিহাসের এক গৌরবময় অতীত মাত্র। চল্লিশ দশকে ইওরোপকে আত্তীকরণের যে প্রয়াস, ষাটের দশক পর্যন্ত তার মধ্যেও এমন কিছু সমন্বয়ের শক্তি অবশিষ্ট ছিল না যা ষাটের শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করতে পারে। ষাটের দশকের শিল্পীদের সামনে তাই একটা শূন্যতা ছিল, যার মধ্যে নিজেদের পথ তাঁদের নিজেদেরই তৈরি করে নিতে হচ্ছিল। পঞ্চাশের শেষ ও ষাটের দশকে ভারতীয় বাস্তবতাতেও আসছিল বড় রকমের পরিবর্তন। স্বাধীন ভারতের স্বাধিকার অর্জনের চেষ্টার মধ্যে, আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার চেষ্টার মধ্যে, এক ধরণের প্রচ্ছন্ন গৌরববোধ যেমন জাগছিল, তেমনি দেখা দিচ্ছিল মোহভঙ্গের স্তিমিত বিষাদ। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে স্বাধীনতা আন্দোলন ও নব-অর্জিত স্বাধীনতায় যে স্বপ্ন ছিল, একদিকে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব, অন্যদিকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা শিল্পায়নের পথ ধরে বিদেশী পুঁজির ক্রমিক সঞ্চরণ আমাদের স্বাধীনতাকেও যেভাবে আবৃত করতে চাইছিল, তাতে সেই স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছিল। ষাটের দশক আমাদের শিল্পে সাহিত্যে সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে এক বিচ্ছিন্নতার বোধকেও আলোড়িত করছিল। এই দ্বৈতের মধ্যেই ষাটের দশকের চিত্রশিল্পীরা তাঁদের শিল্পের স্বরূপ খুঁজছিলেন। আধুনিকতার এই সংঘাতময় দ্বৈতে স্বভাবতই চিত্রভাষা আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে চায়। দেশের গণ্ডি বা ঐতিহ্যের গণ্ডিতে তাকে অবরুদ্ধ রাখা যায় না। ষাটের শিল্পীরা তাই কোনো অবরোধকে মানেন নি। বাস্তবতার গভীর তমিস্রাকে রূপ দিতে তাঁরা আন্তর্জাতিক হয়েছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরই অনিবার্য নিয়মে নিজেদের ভাষা নিজের মতো করে গড়েও নিয়েছেন। কিন্তু প্রতিবাদী চেতনারই প্রাধান্য ছিল বলে, তাঁদের চিত্রভাষায় ছিল তীব্রতা ও ভাঙনেরই প্রাবল্য। ছিল অভিব্যক্তিবাদী ও আদিমতা অনুপ্রাণিত এক ধরণের বিমূর্তায়ন। ঐতিহ্যচেতনার একটা মাত্রাও হয়তো তার মধ্যে ছিল, কিন্তু তা ছিল এত প্রচ্ছন্ন, যে তাকে আলাদা করে চিনে নেওয়া সহজ ছিল না. এই চিত্রভাষা নিয়ে ষাটের দশকের শেষ পর্বে ও সত্তর দশকে তাঁদের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ফসল তাঁরা আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। আমাদের সংস্কৃতিতে এটা তাঁদের অনন্য অবদান। বিশ্বশিল্পের পরিপ্রেক্ষিতেও এর মূল্য কিন্তু খুব একটা নিষ্প্রভ নয়, একথা বললে হয়তো খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। ষাটের দশকের এই শিল্পীরা যখন আশির দশকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁদের প্রদীপ্ত, অগ্নিভ চেতনায় পড়ন্ত সূর্যের বর্ণিল রশ্মিছটার প্রতিফলন পড়ছিল যেন। যে তীব্রতা, যে প্রতিবাদ ও প্রতিবোধ তাঁদের চিত্রভাষার অঙ্গ ছিল, সেটা কখনো লুপ্ত হয় নি, কিন্তু ক্রমান্বয়ে পরিশীলিত হতে হতে সংহত হয়েছে। তার প্রগলভ বিস্ফোরণ শমিত হয়ে শুধু দীপ্ত আলোক প্রভাটুকু রয়ে গেছে। সেই

১৪১· মীরা মুখার্জি। অশোক। অংশ। ব্রোঞ্জ। সত্তর দশক।

নির্যাসের সঙ্গে মিলেছে চিরন্তন এক সৌন্দর্যের প্রত্যয়, যেন তাঁদের ক্রোধ ও প্রতিবাদ এক ক্ষমাসুন্দর বোধের মধ্যে নিষিক্ত হয়ে এক স্বতন্ত্র সত্যে উদ্বোধিত হচ্ছে, যা দ্বন্দ্বাকীর্ণ বলেই গভীরপ্রসারী, যার মধ্যে সাম্প্রতিকের তাপ যেমন আছে তেমনি আছে চিরন্তনের আলো। এখানে এর বিশদ বিশ্লেষণের মধ্যে যাওয়ার অবকাশ নেই। আমরা যদি প্রকাশ কর্মকার, সনৎ কর, গণেশ হালুই, গণেশ পাইন, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন চৌধুরী, লালুপ্রসাদ সাউ, শ্যামল দত্তরায় প্রমুখ শিল্পীর অতীত থেকে সাম্প্রতিক পর্যন্ত বিবর্তনের দিকে তাকাই, তাহলে এই সত্য উপলব্ধি করতে পারব। এই উত্তরণ যে সম্ভব হয়েছে তার অন্যতম কারণ আমাদের শিল্পের অতীত নিয়ে প্রগাঢ় চর্চা, লোকায়তের প্রাণস্পন্দনকে অনুভবের প্রয়াস, নব্য-বঙ্গীয় ঘরানার মধ্যে যে চর্চার সূচনা ও প্রসার, তা আরো বিবর্তিত হয়েছে পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে। বস্তুত এই যে উন্মীলন, আমাদের সাম্প্রতিক চিত্রকলায় বিশেষ একটি মাত্রা যোগ করেছে যা, সেটাই হতে পারত শিল্পের সেই বিশিষ্ট ঘটনা, যা নিয়েই আমাদের এখনকার প্রয়োজনের সেই লেখাটি গড়ে তোলা যেত। তা না করে আমরা ভাস্কর্যের একটি বিশেষ অধ্যায়কেই যে বাছলাম তার কারণ হয়তো অনেকটা এরকম যে, ষাটের দশকের সেইসব শিল্পীর প্রেক্ষাপটে এই শতকের শুরু থেকে চিত্রচর্চার একটা ক্রমিক ধারাবাহিকতা ছিল, সেই ধারাতেই তাঁরা যোগ করেছেন তাঁদের নিজস্ব উদ্ভাবন, কিন্তু মীরা মুখার্জির মতো একজন ভাস্করকে শুরু করতে হয়েছিল আরো প্রগাঢ় শূন্যতার মধ্যে।

ভাস্কর্যের তো কোনো 'বেঙ্গল স্কুল' ছিল না। কেন ছিল না, এটা আমাদের ভাবায়। এত আলোকিত আমাদের ভাস্কর্যের ঐতিহ্য যে সারা বিশ্বের কাছে তা আমাদের মাথা উঁচু করে রাখে। এমন ক্রমিক ধারাবাহিকতায় ধরা আছে এর বিবর্তন, যে আমাদের সভ্যতার সমস্ত বাঁকগুলোকে আমরা চিনে নিতে পারি এর মধ্য দিয়ে। সে তুলনায় আমাদের চিত্রকলার তো কোনো সম্পূর্ণ ইতিহাস নেই। মুছে যেতে যেতে এখন তার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাতে এর পূর্ণ পরিচয় গড়ে নেওয়া যায় না। তবু ছবিরই চর্চার মধ্য দিয়ে উজ্জীবন ঘটল আমাদের শিল্পচেতনার, ভাস্কর্যের যে কোনো ভূমিকা রইল না সেখানে, তা কি শুধু এজন্য যে একজন অবনীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন, আর তাঁর ছিল কেবল ছবি লেখাতেই

১৪২· মীরা মুখার্জি। নৃত্যরতা। ব্রোঞ্জ।

ঝোঁক? আর তখন আবির্ভাব ঘটে নি কোনো রামকিঙ্করের। সে আবির্ভাবের জন্য আরো প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। শুধু কি ব্যক্তিপ্রতিভার বিকাশের সমস্যাটাই এখানে প্রধান? না কি অন্য কোনো কারণ আছে এর? ব্রিটিশ রয়্যাল অ্যাকাডেমি প্রভাবিত অনুপুঙ্খ স্বাভাবিকতার একটি ধারার চর্চা কিন্তু শুরু হয়েছিল এই শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকেই। মহারাষ্ট্রে ম্হাত্রে বা কারমাকারের মতো শিল্পী, বা আমাদের দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর মতো শিল্পীর দক্ষতা ও উদ্যমের কোনো ঘাটতি ছিল না। তবু ভাস্কর্যের কোনো মুক্তির ইঙ্গিত তাঁদের মধ্য দিয়ে আসে নি। দেবীপ্রসাদ চিত্রকলায় নব্য-বঙ্গীয় ঘরানাকে প্রসারিত করেছেন। কিন্তু ভাস্কর্যে ভারতীয়তা নিয়ে তিনি ভাবেন নি কেন? চর্চা বা শিক্ষার কোনো পরিমণ্ডল বা ধারাবাহিকতা তৈরি হয় নি তখনো, সেটা হতে পারে একটা কারণ।

তখনো গিরিধারী মহাপাত্রের মতো ওড়িশার প্রথাগত ভাস্কর্যের উত্তরাধিকারী শিল্পী কাজ করেছেন ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস-এ। চিন্তামণি করের মতো শিল্পী তাঁর কাছে প্রাথমিক শিক্ষাও পেয়েছেন। বা মীরা মুখার্জিও সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস-এ শেখার সময় তাঁর কাজ হয়তো দেখেছেন। কিন্তু সেসব প্রভাব ভাস্কর্যে ভারতীয়তার কোনো উজ্জীবন যে ঘটাতে পারল না তার কারণ আধুনিকতার যে কোনো শিল্পীই তো অনুভব করেন যে অনুকরণে কোনো মুক্তি নেই। যতই সমৃদ্ধ হোক ভাস্কর্যে ভারতের উত্তরাধিকার, আধুনিক মননের কাছে তা অনেকটা

১৪৩· মীরা মুখার্জি। দ্য উইনোইং গার্ল। ব্রোঞ্জ। সত্তর দশক।

১৪৪· মীরা মুখার্জি। দ্য উইনোইং গার্ল। (অংশ)। ব্রোঞ্জ। সত্তর দশক।
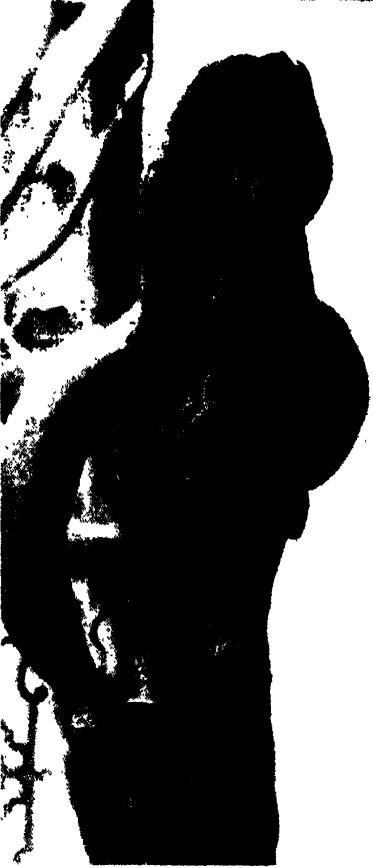
কারাগারেরই মতো, নিজের সৃষ্টির জন্য যেখানে প্রবেশ করলে বন্দীত্বেরই সম্ভাবনা, যদি না সেই প্রভাবকে নিজের সময়ের মাপে ও তাপে রূপান্তরিত করে নেওয়া যায়।

তাই রামকিঙ্করের হাতে খুলল যখন ভাস্কর্যের মুক্তির দরজা, ধ্রুপদী ভারতীয়তার দিকে তিনি গেলেন না। এতই সুউচ্চ সেই শীর্ষ, নান্দনিক উৎকর্ষ এতই দেশকাল-অতীত যে আধুনিকের পক্ষে সেখানে কিছু আর সংযোজনের নেই। তিনি শুধু প্রাণিত হতে পারেন সেই মহৎ উত্তরাধিকার থেকে, সেই আবিষ্কারের কিছু সত্য ব্যবহার করতে পারেন তাঁর প্রয়োজনের মাপে ছেঁটে নিয়ে। রামকিঙ্কর তাই প্রথমে পাশ্চাত্য আধুনিকতার সংক্ষুব্ধতাজনিত রূপাবয়বের ভাঙন থেকেই সংগ্রহ করলেন তাঁর রসদ। কেউ কেউ বলেন, যেমন বলেছিলেন শঙ্খ চৌধুরী এই লেখকের নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, যেকথা আমরা লিখেছিও শঙ্খ চৌধুরী সম্পর্কিত পূর্ববর্তী এক আলোচনায়, যে বুর্দেল থেকেই রামকিঙ্কর অর্জন করেছিলেন তাঁর ভাস্কর্যের শক্তি। এ কথাকে সর্বাংশে মেনে নেওয়া যায় না এ কারণে যে এরকম প্রভাবের নির্দ্বিধ অনুসরণে একজন রামকিঙ্কর গড়ে উঠতে পারেন না। রামকিঙ্কর তাঁর ভাস্কর্যের কেন্দ্রস্থ শক্তি সংগ্রহ করেছিলেন ভারতেরই আদিম জীবনপ্রবাহ থেকে যে জীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ ছিল। আর তাঁর মধ্যে ছিল যে প্রগাঢ় ছন্দের বোধ, তা তিনি অর্জন করেছিলেন আদিমতার অভিব্যক্তি থেকে যেমন, তেমনি শান্তিনিকেতনে রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার থেকেও। আর সেই সূত্রেই তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল ভারতীয় শিল্পের অন্তর্লীন ছন্দ যার পূর্ণস্ফুরণ আমরা অনুভব করি 'যক্ষ-যক্ষী' ভাস্কর্যে। সেখানে ধ্রুপদী প্রশান্তি নেই, আছে আদিমতার সংহত সংক্ষুব্ধতা কিন্তু যে ছন্দে সেটা বিন্যস্ত তা ভারতীয়তারই উত্তরাধিকার।

ধ্রুপদী ভারতীয়তার সারাৎসারকে রূপান্তরিত করে ইওরোপীয় আধুনিকতার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত করে অন্যভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন প্রদোষ দাশগুপ্ত। সে প্রসঙ্গও আমরা তাঁর ভাস্কর্য সম্পর্কে এক লেখায় আগে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে আর পুনরাবৃত্তির দরকার নেই। মূল কথা হচ্ছে ভাস্কর্যে আমাদের আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল তিরিশের দশকের মাঝামাঝি এমন একটা সময়ে যখন বিশুদ্ধ ভারতীয়তা তার অভিঘাত হারিয়েছে। চল্লিশের আধুনিকতায় ভাঙনের রূপকল্প-নির্মাণে পাশ্চাত্য আধুনিকতার অর্জন থেকে গ্রহণ ছিল অপরিহার্য। ফলে আমাদের ভাস্কর্যের আধুনিকতা সর্বাংশেই পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে অনুসরণ করেছে। কেউ কেউ তার মধ্যে ভারতীয়তার সারাৎসার কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন, পাশ্চাত্যের শিল্পীরাও আধুনিকতার প্রয়োজনে প্রাচ্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রয়োগ করেছিলেন তাঁদের কাজে।

কিন্তু ষাটের দশকের আগে পর্যন্তও সম্ভাবনাময় একটা বিরাট উৎসের দিকে কেউ চোখ ফেরান নি। সেটা হল আমাদের লৌকিক উত্তরাধিকার। ধ্রুপদী বা উচ্চকোটির ভাস্কর্যের পাশাপাশি অতি প্রাচীন কাল থেকেই লৌকিক স্তরে ধাতব ভাস্কর্যের একটা ধারা ছিল। তার আলাদা বিজ্ঞান ছিল, আলাদা ব্যাকরণ ছিল। নান্দনিকতাও ছিল স্বতন্ত্র। যে নান্দনিকতা থেকে আমাদের ধ্রুপদী ভাস্কর্যও তার শক্তি ও সৌন্দর্য সংগ্রহ করেছে। যতদিন এই আদানপ্রদানটা ছিল ততদিন ভারতীয় ভাস্কর্যও অত্যন্ত জীবন্ময় ও সংবেদনময় ছিল। ভারহুত বা সাঁচীর ভাস্কর্যে যে সুষমা তার মূলে রয়েছে লোকায়তের সঙ্গে এই আদানপ্রদান।

মীরা মুখার্জিই প্রথম আমাদের আধুনিক ভাস্কর্যের এই অভাবটা উপলব্ধি করেছিলেন। দেখেছিলেন সাম্প্রতিকের সঙ্গে এবং চিরায়ত ভারতীয় জীবনধারার যোগ স্থাপন করা যায়, যদি ওই লৌকিক প্রকরণ ও নন্দনকে আধুনিকতায় অভিষিক্ত করে নেওয়া যায়। চিত্রকলার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই এই কাজটা অনেকে করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের পরিণত পর্বের ছবিতে আমরা দেখেছি এই লৌকিকের উদ্বোধন। ঠাকুরবাড়ির অভ্যন্তরে বসে কাজ করেছিলেন সুনয়নী দেবী। পরে যামিনী রায় স্বতন্ত্র এক দর্শনই গড়ে তুলেছিলেন লৌকিক রূপবন্ধ নিয়ে, যা চল্লিশ দশক পরবর্তী চিত্রকলায় মুক্তির নতুন দিগন্ত খুলেছিল। কিন্তু ভাস্কর্যে এই কাজটি মীরা মুখার্জির আগে তেমন গুরুত্ব দিয়ে কেউ করেন নি। মীরা মুখার্জিই প্রথম ভাস্কর্যে লৌকিক ভারতীয়তার উজ্জীবন ঘটালেন। শুধু এটুকুই নয়, আমরা পরে দেখব সমকালীন ভাস্কর্যে তাঁর অবদান আরো কত গভীর-প্রসারী।

আজ দীর্ঘ প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর একই প্রকরণ নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন সাধনার পর সাধারণ দর্শকের কাছ থেকে মীরা মুখার্জি হয়তো যথেষ্ট স্বীকৃতি পাচ্ছেন। তাঁদের মুগ্ধতাকে স্পর্শ করতে পেরেছেন। কিন্তু তাত্ত্বিক স্তরে এখনো তাঁকে অনেকেই একটি লৌকিক প্রকরণের দক্ষ অনুসরণকারীর বেশি মর্যাদা দিতে চান না। ১৯৭০-এ প্রকাশিত 'অ্যান

ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার' গ্রন্থে জয়া আপ্পাসামি মীরা মুখার্জি সম্পর্কে শুধু এটুকুই উল্লেখ করেছিলেন : Mira Mukherjee is a Calcutta Sculptor who has done important work in the Dokhra technique. Her pieces owe much in style to folk antecedents but are of considerble interest."

এর পরে আজ পর্যন্ত আরো ২৩ বছরে তাঁর কাজ আরো বিচিত্র পথে গেছে কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমাদের প্রতিষ্ঠিত ভাস্করদের ধারণার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। এ কারণেই এই সময়ের ছবি ও ভাস্কর্যের সবচেয়ে গুরুত্বময় ঘটনা বলতে মীরা মুখার্জির ভাস্কর্যের কথাই মনে হয়েছে আমাদের।

দুই

'যার সাথে জীবনের যোগ রয়েছে তাই সুন্দর'

মীরা মুখার্জির জন্ম ১৯২৩-এর ১২মে। এই ১৯৯৩-এ তিনি সত্তর অতিক্রম করলেন। কিন্তু তাঁর কাজের মধ্যে যে যৌবনের অনিঃশেষ দীপ্তি সেই দীপ্তি তাঁর চেতনাতেও উদ্ভাসিত। বছর চারেক আগে হার্টের একটা ছোট অসুস্থতা কাটিয়ে উঠেছিলেন। তাতে তাঁর গতিময় জীবনে একটু হয়তো টান পড়েছে। তাই কি মাঝে মাঝে ক্লান্তির কথা, অবসন্নতার কথা বলেন? গত বছর 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় (১৯৯২) 'স্পন্দন' নামে তাঁর লেখাটির শুরুতেই যেমন বলেছিলেন,

"প্রচণ্ড বেগে ঘোড়ায় চড়ে সারা জীবনের পথ ধেয়ে এসে ঘোড়া আমার ক্লান্ত। আমি অবসন্ন—কোনো এক পাহাড়ে বসে ঝিরিঝিরি পাতা, তারা তারা ফুল দুলছে, অতি আস্তে ধীরে ধীরে। রৌদ্র উঠেছে, সে আমারই ঘর।"

কিন্তু এটা ঠিক অবসন্নতাও নয়। তাঁর মধ্যে একটা দার্শনিক মগ্নতা আছে। যে কোনো সাধারণ কথাও সেই মগ্নতার স্পর্শে কবিতা হয়ে ওঠে। পূর্বোক্ত সেই কথাটিতেও যেমন সেই রৌদ্রাভা ছড়িয়ে আছে। আর একটু বরং শুনি তাঁর কথা, তাঁর শিল্পীসত্তার অনুরণনটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে যা থেকে। ওই লেখাতেই আর একটি স্তবক বাদ দিয়ে তৃতীয় স্তবকে বলছেন :

"এখন দেখতে পাই আমার ত্রুটি আর আমার ভালো। স্কেচগুলি টেনে এনেছে আমার সত্তাকে, যেখানে ভালোটা এনেছে, ভালো লাগছে, আর ত্রুটি? গেল না আমার। সারা জীবন আপ্রাণ চেষ্টা করলাম একটি ভালো মেয়ে হবার, একটি ভালো ভাস্কর হবার। কিন্তু আমার সত্তার ভালো মন্দ সবটা নিয়ে আমার কাজ। ভালো হওয়া ওইটুকু হল যেটুকু হল।"

তাঁর এই মগ্নতাকে, আনন্দ উদ্বেলিত অথচ বিষাদমথিত, বাস্তবতালগ্ন অথচ দার্শনিকতায় উদ্ভাসিত আলাপচারিতা বা কথা বলার ধরণটিকে বুঝলে তাঁর সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্রটিকেও সহজে স্পর্শ করতে পারি আমরা।

এই সত্তর বছর বয়সেও কাজের বাইরে তাঁর কোনো জীবন নেই, অথচ তাঁর কাজ কখনো জীবনকে ছাড়িয়ে যায় না। জীবনের বাইরে তাঁর কোনো সৃষ্টিও নেই। জীবনকে, আশেপাশের সমস্ত মানুষকে জড়িয়ে নিয়ে তাকেই এই যে শিল্প করে তোলা, এরকম শিল্পীও খুব বেশি দেখা যায় না। তিনি যখন নিজের শিল্প সম্বন্ধেও কিছু বলতে বসেন, তখন তাঁর আশেপাশের অজস্র মানুষের কথা এসে যায়। মনে আছে ১৯৮৬-তে সিগাল সংস্থা আয়োজিত তাঁর এক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রায় আট-ন পৃষ্ঠা একটি লেখা লিখেছিলেন তিনি ইংরেজিতে। সেখানে তাঁর কাজ করে যাওয়ার দৈনন্দিনতায় সমস্যা ও সফলতার কথা বলছেন যখন, তখন কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে তাঁর একান্ত কাছের অজস্র মানুষের কথাও আসছে! আসছে নিমাই-এর কথা ষোলো বছর ধরে যে তাঁর সহকারী, আসছে কিশোর আসমাতের কথা, ঢালাই করেন যে গ্রামে, সেখানে যে থাকে। বলছেন রেবা ও বংশীর কথা, নিমাইয়ের অসুস্থতার কথা। লিলি নামে তাঁর পরিচিত একটি মেয়ের মৃত্যু, তাঁর শ্রদ্ধেয় দেবীদার মৃত্যু, ঊর্মিলার অসুস্থতা, তাঁর ধানখেত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা··· এই সব জীবনপ্রবাহ। মমতায় লগ্ন এই সব মানুষের কথা বলতে বলতেই তিনি তাঁর ভাস্কর্যের কথা বলেন। এদের বাদ দিয়ে যেন তাঁর ভাস্কর্যের সত্তাও আলোকিত হয় না। এই জীবনসংলগ্নতা তাঁর ভাস্কর্যের এক অনিবার্য মাত্রা। এরকম একজন শিল্পীর সত্তর বছর পূর্তির গৌরবকে উদ্‌যাপন করাও তাই হয়ে ওঠে এই লেখাটির অন্যতম এক

১৪৫· মীরা মুখার্জি। ভায়োলেন্স। ব্রোঞ্জ। ১৯৭২।

উদ্দেশ্য। 'প্রতিক্ষণ' এর দশ বছর পূর্তির সঙ্গে সেটা আজ মিলেও গেল। 'প্রতিক্ষণ'-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ একটা সংযোগও ছিল। 'প্রতিক্ষণ' দফতরেই ১৯৮৫-তে আয়োজিত হয়েছিল তাঁর একটি প্রদর্শনী। সে বছরই 'প্রতিক্ষণ'-এর কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল 'টোকিও, হিরোসিমা, কিয়োতো' শীর্ষক জাপান ভ্রমণের স্মৃতিচারণামূলক রচনাটি। এই সম্পর্কের সূত্রেও এই লেখাটি হয়তো অন্য এক তাৎপর্য পেতে পারে। সব শিল্পীরই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সৃষ্টির একটা নিবিড় সম্পর্ক থাকে। কেউ কেউ ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন ও শিল্পীজীবনের মধ্যে ব্যবধান রেখে চলতে পারেন। কিন্তু স্বভাবশিল্পী যাঁরা তাঁদের মধ্যে এই ব্যবধান থাকে না। রামকিঙ্কর যেমন। মীরা মুখার্জির মধ্যেও ব্যক্তিত্বের এই দ্বৈত একাকার হয়ে যেতে পেরেছে ক্রমান্বয়ে। তাই তাঁর জীবনচর্যা দিয়েই আমরা তাঁর শিল্পকেও বুঝতে পারি।

ওই 'টোকিও, হিরোসিমা, কিয়োতো' রচনাটির কথাই যখন এল, ওর মধ্যেই নানা ছোটখাটো মন্তব্যে আলোকিত হয়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিত্বের নানা নিভৃত প্রকোষ্ঠ। যেমন, যাত্রার সূচনায় এক সহযাত্রী প্রসঙ্গে কথা ওঠায় বলছেন,

> "সহজেই বোঝা যায়, উনি আমার মতো ইনকমি ক্লাশের যাত্রী নন। মার্জিত বেশ, মার্জিত ব্যবহার। সাথে স্যুটকেসটাও বেশ দামি। ওদিকে আমার মালটা বোঁচকা জাতীয়। আমার পছন্দও তাই। এত সাধারণ অথচ অন্যরকম—আমার মতোই বুড়োসুড়ো। গড়ন যেটা আছে, সেটা গড়ন নেই বলেই।"

'সাধারণ অথচ অন্যরকম' নিজের পছন্দের এই আদলটি যখন এত সহজে তিনি বলতে পারেন, তখন তাঁর এই অকপট
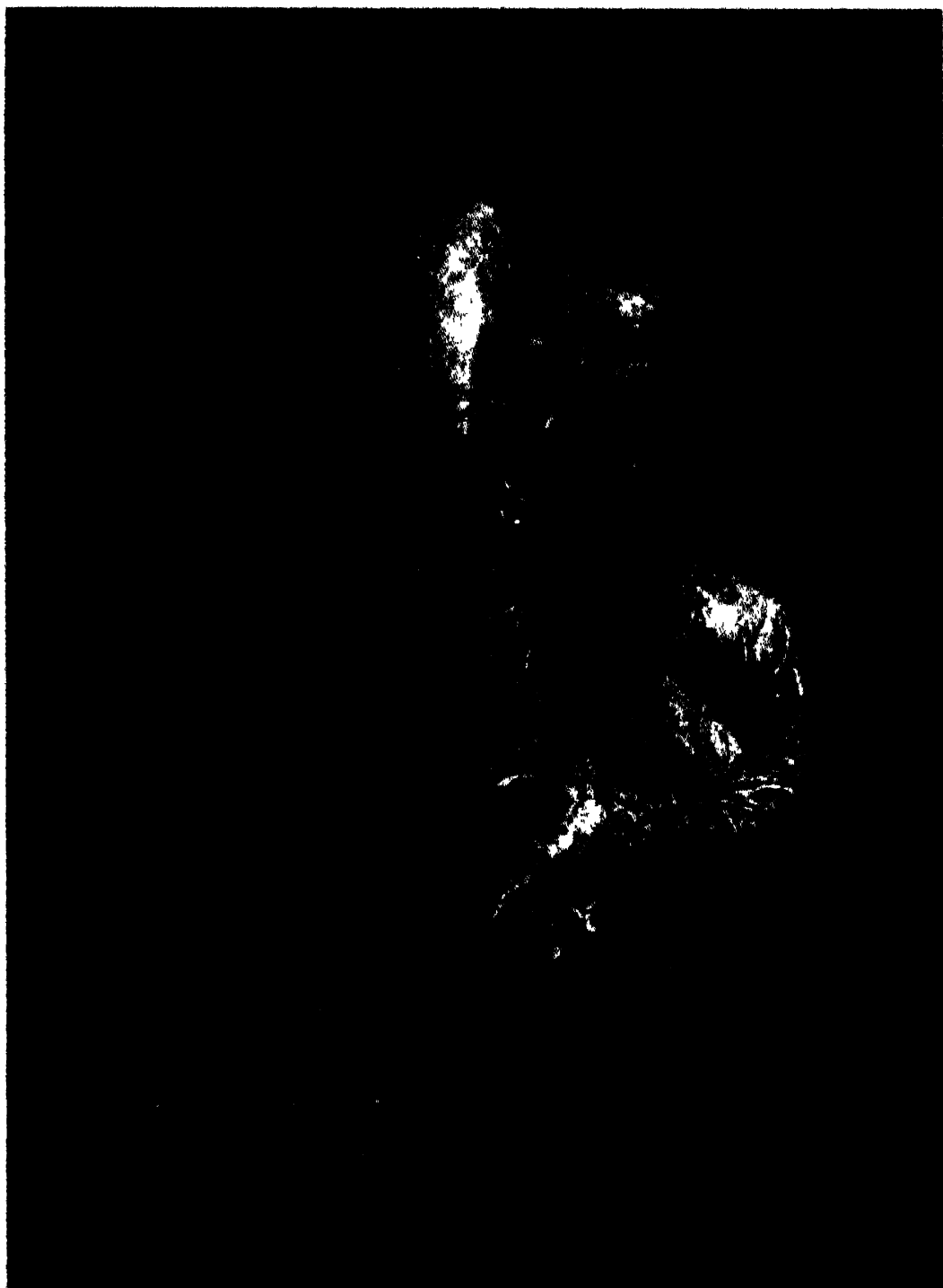
রঙিন ছবি ১৬· মীরা মুখার্জি। শ্রুতি। ব্রোঞ্জ।

রঙিন ছবি ১৭· মীরা মুখার্জি। শিশু। রঙিন স্কেচ। (ছবি)।

মন্তব্যের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রকাশভঙ্গিরও একটা ধরণ অনুভব করা যায়। এর সঙ্গে তাঁর ছবি মিলিয়ে দেখলে যোগটা আরো বেশি করে নজরে আসে। অজস্র স্কেচ করেন তিনি. ছবিও এঁকে যান খুবই স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাঁর রেখা খুবই জঙ্গম, দ্রুত সঞ্চালিত। তাঁর ছবিতে অনুপুঙ্খ স্বাভাবিকতার অনুকরণ যেমন নেই, তেমনি নেই লৌকিকের অমলিন সারল্যও। অথচ খুবই সহজ তাঁর রেখার চলন। বিশদবর্জিতভাবে তা রূপের সারাৎসারটিকে ফুটিয়ে তোলে। তাতে প্রয়োজনে জীবনের আর্তি ও তমিস্রার সুরও যে প্রতিধ্বনিত হয় না, তা নয়। রেখার সংকেতের মধ্য দিয়েই তিনি অভিব্যক্তির দিকেও যান। তাঁর ছবিতে কোনো বাহুল্য নেই, আড়ম্বর নেই। অথচ এক লাবণ্য আছে। যা তাঁর ভাস্কর্যের থেকে একটু আলাদা। সহজ খেলার মতো। কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। সহজের মধ্য দিয়ে গহনের ইঙ্গিত আছে। 'সাধারণ অথচ অন্যরকম'—এই যেন হতে পারে তাঁর ছবিরও দর্শন।

ট্রেনে টোকিও থেকে হিরোসিমা চলেছেন। সেখানে পৌঁছনোর আতঙ্ক ও উদ্বেলতার কথা লিখছেন :

"প্রায় আসছে হিরোসিমা। কেমন যেন ভার হয়ে যাচ্ছে সমস্ত মন। উঠে জানালার কাছে দাঁড়ালাম। অজানা দুঃখ ভিড় করে আসে সমস্ত মনের ভেতর। যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাতে চাইছিলাম—সেই অ্যাটম বোমা পড়বার ঘটনা তো সেই কোনকালের। এখন তো আবার নতুন করে জমে উঠছে হিরোসিমা, লোকজন হয়তো ভুলেই গিয়েছে সব।

কিন্তু পরে বুঝলাম, আসলে হিরোসিমার প্রতিটি রন্ধ্রে অ্যাটম বোমায় আক্রান্তের চিৎকার আর অসহ্য বেদনা লুকিয়ে রয়েছে। বর্তমানের এই সুসভ্য জেল্লার ভেতরেও বাতাসে তারই তীব্র হাহাকার ছড়ানো। আমার সমস্ত মন সেই হাহাকারে আক্রান্ত।"

হিরোসিমা নিয়ে তাঁর ভাস্কর্যটি দেখেছি পরে। উড্ডীয়মান নিবিড়, নিঃসীম এক ধোঁয়ার কুণ্ডলী যেন প্রস্তরীভূত হয়ে আছে। যেন বিশুষ্ক পোড়ো এক পৃথিবী। ব্রোঞ্জের সেই জমাট বাঁধা কুণ্ডলীর উপরে মাঝে মাঝে গভীর কোটর। আর রেখার বিস্তারে আঁকা শিশুর আর্ত চিৎকার, মরুভূমির যোজনব্যাপ্ত শূন্যতায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানুষের আশ্রয়হীনতার হাহাকার।

মানুষ মানুষের জন্য যে সর্বনাশ ডেকে আনে, আধুনিক সভ্যতার মধ্যেই নিহিত যে সর্বনাশ, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মীরা মুখার্জির ভাস্কর্যের এক অবিচ্ছেদ্য মাত্রা। মানবতার এই পরাভবের জন্য তাঁর বেদনা, একে উত্তীর্ণ হয়ে জীবনের 'সাধারণ অথচ অন্যরকম' অমলিন এক সৌন্দর্য সন্ধান এবং তাকেও অতিক্রম করে সাংগীতিক নিমগ্নতায় অলৌকিক এক আধ্যাত্মিকতার উজ্জীবন, তাঁর ভাস্কর্যের এই তিনটি স্বতন্ত্র উৎস বা প্রবাহ। তাই তিনি ওই ভ্রমণবৃত্তান্তের একেবারে শেষে এসে লেখেন, "আসলে যার সাথে জীবনের যোগ রয়েছে তা-ই সুন্দর।" সৌন্দর্যের এই স্বাতন্ত্র্যময় সংজ্ঞায় তিনি মানবতা ও ভারতীয়তার মূল সুরটিকেও তুলে আনতে পারেন।

এখানে তিনি একাত্ম বোধ করেন বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে। তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে—যা প্রগাঢ়ভাবে শিল্পের প্রেরণা জাগাতে পারে। সেই জিজ্ঞাসার টানেই তিনি জাপান গিয়েছিলেন। দেখেছেন, ধ্যানের তন্ময়তা ও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্ম এক সৌন্দর্যের বোধ জাগায়, হয়তো সেটাই শিল্পেরও প্রেরণার উৎস। এই সন্ধান থেকেই বৌদ্ধশিল্প সম্পর্কে তিনি লিখেছেন একটি বই, যেটি এখন প্রকাশের অপেক্ষায়।

তাঁর নিজের শিল্পচেতনার মধ্যেও রয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে এই একাত্মতা ও ধ্যানমগ্নতা, যে ধ্যানমগ্নতা তিনি অর্জন করেছেন সংগীতসাধনার মধ্য থেকে। কাজেই তাঁর শিল্পের প্রেরণায় রয়েছে তিনটি উৎস : প্রকৃতি, চলমান জীবন ও সংগীতের ধ্যান। তাঁর তত্ত্ববিশ্ব সম্পর্কিত এই কথা তিনি অনুপম মাধুর্যে বলেছেন 'দেশ' পত্রিকার পূর্বোক্ত সেই লেখার শেষ অংশে :

"কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে যখন বসেছি সমুদ্রতটে, নদীর ধারে, পাহাড়ে, পর্বতে উঠেছি যখন, বলেছি, প্রকৃতি তুমি কি সুন্দরী। যখন ঢালাই করবার দিনে, বসেছি পুকুরপাড়ে, দেখেছি পুকুরপাড়ের গাছের পাতাগুলোর ঘন ছায়াকে কাঁপতে, সারা জীবন সূর্য উঠতে দেখেছি আর ডুবতে দেখেছি। দেখেছি হিমেল কুয়াশায় ঢাকা ধরাকে। যখন পশ্চিম দিগন্ত রঙিন গেরুয়া হয়ে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে, মনকে বলেছি, আমি যত নগণ্যই হই এই কথাটা বলে যাই,

তোমার রূপে আমার জন্ম সার্থক। ধানখেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পান্নায় মোড়া মাঠ দেখে আবার মাটির পরে মাথা রাখতে ইচ্ছে হয়েছে। আজ মনে হচ্ছে, যদি দিনগুলি আরো লম্বা হত, ছবি আঁকতাম, পাথর কাটতাম। ছবি আঁকার সময় পেলাম না। তবু যতটুকু পারলাম দিয়ে গেলাম, আমার জন্মের মানে 'কাজ'।"

প্রকৃতির এই উদাত্ততায় জীবনের সঙ্গে গভীর সংযোগে মীরা মুখার্জি আবিষ্কার করেছেন যে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা তা তাঁকে এই সত্তর বছর বয়সেও নিরন্তর আবিষ্ট রাখে সৃষ্টির মধ্যে। তাঁর চারপাশের যে পৃথিবী, যে জীবন, সেই পার্থিবতাকেই তিনি উত্তীর্ণ করেন অলৌকিকে।

তিন

উৎস

আজকের ভারতবর্ষের প্রধানতম একজন ভাস্কর হয়ে উঠতে পারার গৌরব মীরা মুখার্জির ক্ষেত্রে অনেক বেশি তার কারণ একজন নারী হিশেবে যে প্রতিকূলতা তাঁকে অতিক্রম করে আসতে হয়েছে, তার কোনো তুলনা নেই। তিরিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকে যখন তাঁর প্রস্তুতির সময়, তখন বাংলার একটি মেয়ের পক্ষে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে শিল্পে নিয়োজিত করা যে কি কঠিন কাজ, আজকের দিনে আমরা হয়তো তা সম্পূর্ণ কল্পনাও করতে পারি না। জীবনের সঙ্গে এই সংগ্রামটা মীরা মুখার্জির শিল্পী হয়ে ওঠার এক অনিবার্য মাত্রা।

তাঁর শৈশব কেটেছিল উত্তর কলকাতার এক রক্ষণশীল পরিবেশে। তবু তাঁর বাড়িতে শিল্প ও সাহিত্যের একটা পরিমণ্ডল ছিল। ১৪ বছর বয়সে অবনীন্দ্রনাথের 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস'-এ ছবি আঁকা শিখতে ভর্তি হন। ১৯৩৭ থেকে ৪১ পর্যন্ত শিখেছিলেন সেখানে ভারতীয় রীতির অঙ্কনশৈলী। ওয়াশের কাজ করতেন। কিন্তু ওখানে যে জোর দেওয়া হত অজন্তা আর বাঘের ধরণের ছবি আয়ত্ত করার দিকে, এটা পছন্দ ছিল না তাঁর। চলমান জীবনের সঙ্গে কোনো যোগ খুঁজে পেতেন না। (সূত্র : 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সাক্ষাৎকার ১৬ নভেম্বর ১৯৮৫)

তারপর হঠাৎ তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। আজকের দৃষ্টিতে সে ঘটনাও খুব কৌতুককর। তাঁর সেজদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল এক যুবকের। তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও ছিল তাঁর সৌহার্দ। কিন্তু সেজদি ছিলেন সেই যুবকের থেকে বেশি শিক্ষিতা। পারিবারিক রক্ষণশীলতায় এরকম ক্ষেত্রে বিয়ে হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সেই যুবকের একটা সম্পর্ক বজায় থাক, এটা সকলে চাইতেন। তাই অগত্যা মীরার সঙ্গে বিয়ে হল তাঁর। বিয়ের পর তাঁকে চলে যেতে হল দিল্লি। কিন্তু তথাকথিত গৃহবধূর দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য মেনে নিতে পারেন নি মীরা। তাঁর শিল্পের সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো আপোস সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। বিরোধের শুরু সেখান থেকে। শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল ১৯৫২ সালে। তাঁর ভবিতব্য তাঁকে সম্পূর্ণভাবে শিল্পে সমর্পিত করল। (সূত্র : দ্য স্যাটারডে স্টেটসম্যান, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জির আলোচনা : 'স্কাল্পটিং ফর লিবারেশন')

দিল্লি পলিটেকনিকে ছবি আঁকা শিখতে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯৪৭-এ। ১৯৫১-তে শেষ করেছিলেন ওখানকার কোর্স। কেমন করে ভর্তি হওয়া হল ওখানে সে সম্পর্কে নিজেই একবার গল্প করেছিলেন এক সাক্ষাৎকারে (সানন্দা, ২৬ জুন ১৯৯১)। তাঁর নিজের কথাতেই শুনি সেই ঘটনা :

"তখন দিল্লিতে ছিলাম, দিদির বাড়িতে। সেখানে আমার ছোটবেলার আঁকা কিছু ছবিও ছিল। দিল্লি পলিটেকনিকের একজন, পুতুল রায়চৌধুরী সেই ছবি দেখে বললেন কে এঁকেছে। দিদি আমার কথা বললেও তিনি বিশ্বাস করলেন না। বললেন, এঁকে দেখালে বিশ্বাস করব। অগত্যা দিদির চাপে আমাকে এঁকে দেখাতে হল। উনি কনভিনসড্ হয়ে বললেন, যেমন করেই হোক একে শেখানোর ব্যবস্থা করা দরকার। সেই সূত্রেই দিল্লি পলিটেকনিকের চারুকলা বিভাগে ভর্তি হয়ে গেলাম। সেখানে কল্যাণ সেন, সুশীল সেন, রমেন চক্রবর্তী—নন্দলাল বসুর একজন ছাত্র এরাই শেখাতেন।" (সানন্দা, ২৬ জুন ১৯৯১)

ছবির সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্যেরও কিছু শিক্ষা হয় দিল্লি পলিটেকনিকে।

ওখানকার কোর্স শেষ করে ১৯৫১-তেই যান শান্তিনিকেতন। ওখানে তখন ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার শিল্পী আফান্দি।

১৪৬· মীরা মুখার্জি। বাল্মীকি। ব্রোঞ্জ।

আফান্দির কাছে শিখলেন কিছুদিন। সেই শেখা তাঁর নন্দনবোধে আনল আমূল পরিবর্তন। তাঁর কাছেই শিখলেন কেমন করে শিল্পের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সমস্ত কিছুতে জীবন সঞ্চারিত করা যায়। লৌকিককে করে তোলা যায় অলৌকিক। তখন পৃথ্বীশ নিয়োগী ছিলেন ওখানে। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের মধ্য দিয়েও উন্মোচিত হয়েছিল শিল্পের অনেক রহস্য। ইটালিতে যেতে চেয়েছিলেন ভাস্কর্য শিখতে। জানতেন ইটালিই ভাস্করের স্বর্গ। কিন্তু ১৯৫২-র নভেম্বর মাসে ইন্দোজার্মান কোঅপারেশন স্কিমের একটা স্কলারশিপ নিয়ে গেলেন জার্মানিতে। হুমায়ুন কবীর ও সুনীতি চ্যাটার্জির ঐকান্তিক সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল এটা। ১৯৫৩ থেকে ৫৬ পর্যন্ত মিউনিখের 'আকাডেমি ডি বিলদেনদেন কুনস্টেম'-এ পেইন্টিং শেখেন অধ্যাপক গ্রেথে-র কাছে, ভাস্কর্য শেখেন অভিব্যক্তিবাদী ভাস্কর অধ্যাপক স্টোনি স্টাউলার ও অধ্যাপক হেইরিক কির্চনারের অধীনে। এচিং বা ধাতুতক্ষণ শেখেন অধ্যাপক থিয়েরমল এবং লিথোগ্রাফি মি· লোয়াসার-এর কাছে। (সূত্র : বিড়লা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত ক্যাটালগ, ১৯৯৩)

১৪৭· মীরা মুখার্জি। উইনোইং দ্য প্যাডি। ব্রোঞ্জ। ১৯৮৪-৮৫।

ধাতু ভাস্কর্যে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল দিল্লি পলিটেকনিকেই। সেখানে শেষ বছরে বিষয় ছিল ভাস্কর্য। মাটির আর প্লাস্টারেও কাজ করেছিলেন সেখানে। কিন্তু স্টোনি স্টাউলারের সঙ্গে কাজ করতে করতে তাঁর এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটল। স্টাউলার ছিলেন খুব কঠিন শিক্ষক। কোনো তৃপ্তিকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। কোনো ছবি শেষ হলেই, সেটি ছিঁড়ে ফেলতেন তিনি। এখানেই গোপনে একদিন একটি ধাতু-ভাস্কর্য করেছিলেন মীরা। এটাই হয়তো তাঁর প্রথম সৃজনশীল ধাতুভাস্কর্য। অধ্যাপককে দেখালে তিনি উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সতর্কও করেছিলেন। বিদেশে ইওরোপীয় শিল্পীদের কাজ দেখতে দেখতে ওটাই হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে আদর্শ। নিজের পথ আবিল হয়ে গিয়েছিল সেই আলোকিত প্রভাবের মধ্যে। স্টাউলার তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর নিজের দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষে ভাস্কর্যের মহান ঐতিহ্যের কথা। সেই "ঐতিহ্যের গভীরতার ভেতর শিকড় চারিয়ে দিয়েই নিজের পথ নিজেকে খুঁজে নিতে হবে।" (সূত্র: পরিচয়, শারদীয় ১৯৮৩, মীরা মুখার্জির প্রবন্ধ: 'ভাস্কর্যের নানা প্রকরণ প্রসঙ্গে'। অনুবাদ: শুভ বসু) একদিন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ঘুরতে ঘুরতে প্রাচীন গ্রিসের কিছু আর্কাযিক ভাস্কর্য দেখে অভিভূত হন। তাঁর নিজের কথাতেই বরং শুনি সেই অভিজ্ঞতা, 'পরিচয়'-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে যেমন লিখেছেন তিনি:

> "এক মুহূর্তের বিদ্যুচ্চমকে যেন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, পিকাসোর মতো আধুনিক যুগের মহাশিল্পীদের সাথে সেই শিল্পের সংযোগ কী আশ্চর্যরকম নিবিড় এবং গভীর। ভাসাভাসা ভাবে আমার মনে হল, একজন ভারতীয় শিল্পীও এভাবেই প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন। ভারতে ফিরেও এই ভাবনাটাই আমাকে তাড়া করে ফিরছিল। আরো বড় কথা এই যে, আমার মনে

হল, ভারতের ক্ষেত্রে এই ঐতিহ্যটি সম্পূর্ণভাবে মৃত না হতে পারে। তার কিছু অবশেষ—সজীব অবশেষ—হয়তো আজও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে কোনো এক গভীর অজ্ঞাত নির্জন কোণে।"

কিন্তু সেই উৎসের সন্ধান পেতে তাঁব সময় লেগেছিল আরো কয়েক বছর। দেশে ফিরলেন ১৯৫৬-তে। পরের চার বছর কাটল নানা বৃত্তির সন্ধানে। কার্শিয়াং-এর ডাউহিল স্কুলে শিক্ষকতা করলেন। তারপর কলকাতার প্র্যাট মেমোবিয়াল স্কুলে। গোটে ইনস্টিট্যুটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিছুদিন। তারপর সবকিছু ছেড়ে শিল্পকেই জীবনের একমাত্র পথ বলে বেছে নিলেন।

আমাদের ধাতুশিল্পের যাঁরা লৌকিক কারিগর তাঁরা সুপ্রাচীন কাল থেকে পুরুষানুক্রমে গলিত ধাতু দিয়ে ভাস্কর্য রচনা করে চলেছেন। যদিও মানুষ হিশেবে সম্ভ্রান্ত সমাজের কাছে চিবদিনই তাঁরা অবহেলিত, কিন্তু তাঁদের প্রকরণজ্ঞান ও নান্দনিক শুদ্ধি এতই অবিসংবাদিত যে যুগ যুগ ধরে তাঁদের শিল্পে লোকায়ত ভারতীয় জীবনধারার প্রাণস্পন্দনটি প্রতিফলিত হচ্ছে। মীরা মুখার্জির তখন চেষ্টা তাঁদের খুঁজে বের করা এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা ও কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা। হুমায়ুন কবীর তখন কেন্দ্রের মন্ত্রী। তাঁকে বললেন তাঁর ইচ্ছার কথা। কিন্তু তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন নি। হয়তো ভেবেছিলেন এ পথের দুরূহতার কথা। ১৯৬০ সালে শেষে নিজের চেষ্টাতেই গিয়ে পৌঁছলেন বস্তারে ঘারুয়া কারিগরদের কাছে। এক বছর শিক্ষানবিশ ছিলেন সেখানে। পরে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে জোগাড় করেছিলেন আড়াইশো টাকার একটা স্টাইফেন্ড। সেটা নিয়ে ঘুরলেন দক্ষিণ ভারতের বাঙ্গালোর ও তামিলনাড়ুর ধ্রুপদী ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের কেন্দ্রগুলিতে। এরপর ১৯৬১-৬২-তে কলকাতায় এসে কয়েকটি কর্মশিবিরে প্রথমে ধ্রুপদী ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করলেন। এর পরে কাজ করলেন তিন ধরণের লোককারিগরদের সান্নিধ্যে—এঁরা হলেন মাড়াল সম্প্রদায়, ময়ূরভঞ্জের রানা ও হাজারিবাগের মালহোর। এরপরে আবার গেলেন বস্তারে।

১৯৬৫-তে অধ্যাপক নির্মলকুমার বোসের তত্ত্বাবধানে অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে দেশজ ধাতুকারিগরদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক জরিপের কাজ করলেন। এই অধ্যাপক নির্মলকুমার বোস তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন। লিখেছেন, "নির্মলবাবুর প্রভাব আমাকে সারা

১৪৮· মীরা মুখার্জি। বাসকেট উইভার। ব্রোঞ্জ।

১৪৯· মীরা মুখার্জি। হিরোসিমা। ব্রোঞ্জ।

জীবন সমস্ত জিনিসের প্রতি ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে গেছে।" এইসব কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখলেন কয়েকটি বই। ১৯৬৪-তে 'ফোক মেটাল আর্টিজানস', ৭৫-এ বেরিয়েছে 'ঘারুয়াজ অব বাস্তার', ৮০-তে মেটাল ক্রাফটসমেন অব ইন্ডিয়া। ১৯৬৭ পর্যন্ত চলল তাঁর এই শিক্ষানবিশি। সঙ্গে অবশ্য নিজের কাজও চলছে তখন। দক্ষিণ ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্করদের সঙ্গে কাজ করার সময় তৈরি করেছিলেন 'পার্বতী' ও দুর্গা' মূর্তি। এই দুর্গা মূর্তির কল্পনায় কাজে লাগিয়েছিলেন বাংলার রূপকল্পনাকেও। বস্তারে থাকতে দেখেছিলেন চারজন লোক একটি ডোবায় চৌ-কোনা জাল ফেলে মাছ ধরছে। এই দৃশ্য থেকে তৈরি হয়েছিল একটি ভাস্কর্য। স্টেলা ক্রামরিশ পরে এটা নিয়ে গিয়েছিলেন। আর উৎসাহিত করেছিলেন বড় কাজ করার জন্য। এরপর বস্তারেই দাঁড়িয়ে থাকা নিঃসঙ্গ একটি বড় গাছকে দেখে একটি মূর্তি কল্পনা করেছিলেন। ঘারুয়া পদ্ধতিতেই খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে তৈরি করেছিলেন এই মূর্তি। এটিই লোকায়ত পদ্ধতিতে করা তাঁর প্রথম বড় মূর্তি।

এই লৌকিক ও ধ্রুপদী কারিগরদের সঙ্গে কাজ করার সময় তাঁদের একাত্মতা, তাঁদের আধ্যাত্মিকতা দেখে মুগ্ধ হতেন। তাঁদের মূর্তিতে ফুটে উঠত যে আত্মোৎসর্গের ভাব তা দেখে তাঁর মনেও প্রশ্ন জাগত,

> "আমরা আধুনিক শিল্পীরাও কি আমাদের কাজের ভেতর দিয়ে এই একই মনোভাব ফুটিয়ে তুলতে পারি না? দেবতার মূর্তি নয় হয়তো, কিন্তু কোনো পার্থিব মূর্তি রচনার সময়ও কি আমরা ওই রকম আত্মিক স্ফূর্তি অনুভব করতে পারি না?" (পরিচয়—পূর্বোক্ত সূত্র)

এই প্রশ্নই তাঁকে নিয়ে এল নিজের ভাস্কর্যের দিকে যেখানে পার্থিবতাতেই তিনি আনবেন অলৌকিকের বিভা। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হল যে যাত্রা এখন সত্তর বছর অতিক্রম করেও তা অনির্বাণ চলছে।

চার

প্রকরণ

ভাস্কর্য ত্রিমাত্রিক রূপাবয়বের শিল্প। এর মূল পদ্ধতি প্রধানত দুরকম। একটি বিয়োজন প্রক্রিয়া। আর একটি সংযোজন প্রক্রিয়া। বিয়োজন প্রক্রিয়ায় পূর্ণ আয়তনেব কোনো কঠিন বস্তু, যেমন পাথর বা কাঠ থেকে কেটে কেটে অর্থাৎ বিযুক্ত করতে করতে অভীষ্ট রূপে পৌছনো হয়। একে বলে খোদাই বা ইংরাজিতে কার্ভিং। আর সংযোজন প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত নরম পদার্থ, যেমন মাটি বা প্লাস্টার জমিয়ে বা যোগ করে রূপের আদলটি আনা হয়। যে কোনো পদ্ধতিতে করা ভাস্কর্যকেই ধাতুতে রূপান্তরিত করা যায়। ধাতব ভাস্কর্যেরও দুটি পদ্ধতি হতে পারে। ধাতব পাতকে

বলপ্রয়োগে বা পিটিয়ে তাতে একটি বিশেষ রূপ আনা যায়। আজকাল বিভিন্ন ধাতব অংশ জুড়ে জুড়েও ভাস্কর্য হচ্ছে। কিন্তু ধাতু ভাস্কর্যের প্রধান ও সুপ্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে তরল গলিত ধাতুকে ছাঁচে ফেলে ঠাণ্ডায় কাঠিন ধাতুতে রূপান্তরিত করে মূর্তির অবয়বকে ফুটিয়ে তোলা। সহজে গলে, সহজে কঠিন হয় এবং বেশ নমনীয় ধাতু এ কাজে উপযুক্ত। ব্রোঞ্জ, তামা, পেতল ও কাঁসা এদিক থেকে প্রয়োজনীয় গুণসম্পন্ন ধাতু। এর মধ্যে ভাস্কর্যে ব্রোঞ্জের ব্যবহারই বেশি।

ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। প্রায় ছ-হাজার বছর আগে থেকেই মানুষ ধাতু গলিয়ে ঢালাই করতে শিখেছে। নব্যপ্রস্তর যুগে মানুষ সৃষ্টি করেছে মৃৎশিল্প। তাম্রপ্রস্তর যুগে এসে ধাতুর ব্যবহার শিখেছে। ব্যাবিলনীয় ও সুমেরীয় সভ্যতায় পাওয়া গেছে ব্রোঞ্জের শিল্প। আমাদের মহেঞ্জোদারোতে (২৫০০ থেকে ১৭০০ খ্রিঃ পূঃ) পাওয়া ব্রোঞ্জের নৃত্যরতা নারী মূর্তিটি আমাদের দেশে ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের প্রাচীনতার নিদর্শন। এই যে ধাতু গলিয়ে তৈরি মূর্তি পদ্ধতির কারণেই এতে আসে এক স্বতন্ত্র চরিত্র, যা অন্য ভাস্কর্যের থেকে আলাদা। গলিত ধাতু প্রচণ্ড তাপে ছুটে চলে ছাঁচের শূন্য পথ ধরে। এই স্বতঃস্ফূর্ত গতিয়তা এই ভাস্কর্যে অবয়বের প্রবহমানতায় জড়িয়ে থেকে আনে ভিন্নধর্মী এক নান্দনিক বিভা।

কোনো একটি ছাঁচের মধ্যে গলিত ধাতু প্রবাহিত করে কাস্টিং বা ঢালাই-এরও আবার দুটি পদ্ধতি আছে। একটিতে ছাঁচ তৈরি করা হয় বালি দিয়ে কিন্তু ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে লস্ট ওয়াক্স বা মোম গলানো পদ্ধতি। ফরাসিতে একে বলা হয় 'সিয়ার পারদু' (Cire perdu)। ভারতীয় সংস্কৃত শিল্পশাস্ত্র বা আগম শাস্ত্রে এরই নাম 'মধু চিন্তম্'।

এই মোম গলানো পদ্ধতিরও নানা প্রকরণ আছে। আমাদের দক্ষিণ ভারতে এখনো ধ্রুপদী পদ্ধতিটি চলে আসছে। প্রথমে মূল মূর্তিটি তৈরি করে নেওয়া হয় মোম দিয়ে। তারপর তাকে খুব নরম ও মিহি মাটির আবরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। প্রথম আবরণটি থাকে প্রায় এক সেন্টিমিটার পুরু। তার ভিতর লোহার শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ইংরেজিতে যাকে বলে রানার, যাতে মোম গলে যাওয়ার পরেও মাটির ছাঁচটি ধাতুর চাপে ভেঙে না যায়। প্রথম স্তরের উপর মাটি ও বালি দিয়ে চাপানো হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর। তারপর তাকে জড়িয়ে নেওয়া হয় লোহার তার দিয়ে। গলিত ধাতু প্রবেশের জন্য ও ভিতরের বায়ু বেরনোর জন্য পথ রাখা হয়। এই ছাঁচটিকে প্রথমে রোদে শুকিয়ে তারপর আগুনে পোড়ানো হয়। তাপে ভিতরের মোমের মূর্তিটি গলে গলিত মোম বেরিয়ে আসে।। একটি পাত্রে সেই গলিত মোম ধরে রাখা হয়। সেই গলিত মোমের যে ওজন তার প্রায় বারো গুণ ব্রোঞ্জের প্রয়োজন। শূন্য ছাঁচটিকে তখন মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। শুধু মুখটি উপরে রাখা হয় যা দিয়ে তরল ধাতু ঢালা হবে। একটি পাত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাপের ধাতু গলিয়ে ঢেলে দেওয়া হয় ছাঁচের মধ্যে। ঠাণ্ডা হলে উপরের মাটির আবরণ ভেঙে বের করে আনা হয় ব্রোঞ্জের মূল মূর্তি।

এই নিরেট মোমের পদ্ধতিতে ছোট মূর্তি করা সম্ভব। কিন্তু বড় মূর্তি হয়ে যায় খুবই ব্যয়সাপেক্ষ, কেননা প্রচুর ধাতুর প্রয়োজন সেখানে। সেজন্য বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হল, মূল মূর্তির উপর ছাঁচটি করা হয় পাতলা, অল্প বেধের মোমের আবরণ দিয়ে। সেই মোমের আবরণের উপর আবার মিহি পাতলা মাটির আবরণ দিয়ে, তাকে আবার আর একটু কঠিন বালি, মাটির আবরণে ঢেকে ফেলা হয়। তরল ধাতু প্রবেশের ও গলিত মোম ও বায়ু নিকাশের ব্যবস্থা অবশ্যই রাখা হয়। ছাঁচটিকে গরম করলে ভিতরের তরল মোম বেরিয়ে যায়। সেই শূন্যস্থানে ঢালা হয় ধাতু। এজন্যই এই পদ্ধতিকে বলে লস্ট ওয়াক্স বা গলানো মোম পদ্ধতি।

আমাদের দেশে লৌকিক ধাতু শিল্পীরা এই মোম গোলানো পদ্ধতিতে কাজ করেন। সারা দেশে কতকগুলো নির্দিষ্ট অঞ্চলে তাঁদের কেন্দ্র। তাঁরা অবশ্য যাযাবর শ্রেণীর, এক জায়গায় বেশিদিন থাকেন না। কেননা তাঁরা যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিশ বা শিল্পসামগ্রী তৈরি করেন, সেগুলো দীর্ঘস্থায়ী। এক অঞ্চলের চাহিদা ফুরলে, তাঁরা নতুন জায়গায় চলে যান। এঁরা ছড়িয়ে আছেন মধ্যপ্রদেশের বস্তার অঞ্চলে, ওড়িশার নানা জেলায়, বিহারের রাঁচী, হাজারিবাগ, দুমকার পাহাড় অঞ্চলে, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া বর্ধমান ও মালদা জেলায়। প্রভাস সেন একটি নিবন্ধে লিখেছেন,

> "করণকৌশলের দিকেও বস্তার অঞ্চলের শিল্পমান উন্নত। মনে হয় এই বস্তার অঞ্চলেরই কোনো আদিবাসী সমাজ ভেঙে সুদূর অতীতে কিছু কিছু নানা জাতের কারিগর ছোট ছোট দলে নানা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।" (ঢোকরা শিল্পীদের কাহিনী: দেশ, ১৬ নভেম্বর ১৯৮৫)

বিভিন্ন অঞ্চলে এদের বিভিন্ন নাম। বস্তারে বলে 'ঘরুয়া', ময়ূরভঞ্জে এদের বলে 'রানা', হাজারিবাগে 'মালহোর', পশ্চিমবঙ্গের কোনো অঞ্চলে এদের বলে 'মাড়াল'।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণভাবে এরা 'ডোকরা' নামে পরিচিত। মীরা মুখার্জির অবশ্য এই নামটি সম্পর্কে আপত্তি। কেননা এই নামের সঙ্গে জড়িয়ে তাঁর কাজকেও 'ডোকরা' বলে থাকেন অনেকে। যেটা খুবই ভুল। এই শব্দটির উৎস সন্ধানে তিনি বলেছেন·

"শব্দকল্পদ্রুমে 'স্যুত .' শব্দটিব অর্থ 'বোনা', 'সূত্ররচিত ভাণ্ডম' বা ধোকরা। উত্তরবঙ্গে এক ধরণের ঘাস পাওয়া যায়। সেই ঘাস থেকে তৈরি সুতো দিয়ে, তাঁতে বোনা শতরঞ্চি জাতীয় জিনিশকে ধোকড়া বলে। আমার মতে তাই প্রচলিত 'ডোকরা' বা 'ধোকড়া' শিল্পের সঙ্গে এর সরাসরি কোনো যোগাযোগ নেই। তথাকথিত 'ধোকড়া' শিল্পে মোমের সুতো জড়িয়ে মাটির-ছাঁচটিকে একটি সমান মাপ দেওয়া হয়। আমার অনুমান যে এই সুতোর ব্যবহারই হয়তো পিতলে ঢালাই কাজকে 'ধোকড়া' বলে পরিচিত হওয়ার কারণ।" (সাক্ষাৎকার: আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ আগস্ট ১৯৯১)

বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলা লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' বইয়ের 'ডোকরা শিল্প ও শিল্পীজীবন' প্রবন্ধে বলেছেন, "ডোকরা কথার অর্থ ইতরজন, অন্ত্যজ, নীচকুলোদ্ভব।" এরপর তিনি ভারতচন্দ্র .থেকে উদাহরণ দিয়েছেন:

"কোথা হইতে বুড়া এক ডোকরা বামন প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ।"

আর সেই সূত্রে বলেছেন,

"এই অবজ্ঞাসূচক অর্থেই বাংলার এই সুপ্রাচীন লোকশিল্পের উত্তরাধিকারীদের 'ডোকরা কামার' বলা হয়।" (পৃষ্ঠা ১০৪)

যাই হোক এইসব লৌকিক শিল্পীদের ঢালাই-এর পদ্ধতি ধ্রুপদী বা অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতি থেকে একেবারেই আলাদা। তাঁরা মোম বা ধুনোসরসের তৈরি বা গালা দিয়ে তৈরি একরকম তার মূল প্রতিমাটির উপর জড়িয়ে জড়িয়ে আস্তরণ তৈরি করেন। তারের ব্যাস সমান হওয়ায় আস্তরণটিও সমান বেধবিশিষ্ট হয়। মোমের এই আস্তরণটিকে মাটি ও বালির আবরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর এটিকে রোদে শুকিয়ে যখন পোড়ানো হয়, ভেতরের মোম বা গালা গলে বেরিয়ে গিয়ে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়। সেখানে তখন গলিত ধাতু ঢালা হয়। প্রকরণটি যত সরলভাবে বলা হল আসলে অবশ্য তত সরল নয়। এর নানা জটিলতা আছে। শিল্পীরা তাঁদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এর সমাধান করেন। কিন্তু এই কাজের মধ্যে অনুপম এক নান্দনিক সারল্য ও সুষমা আছে। এদের মূল চরিত্র মৃৎশিল্পের। কৃষিজীবী সমাজব্যবস্থার মৃত্তিকাব সুস্থিত স্থাণুতার সঙ্গে উষ্ণ তরল ধাতুর গতিময়তা মিশে তৈরি হচ্ছে এর বিশিষ্ট চরিত্র। অতুলনীয় এই নান্দনিক সুষমাই এর বৈশিষ্ট্য।

নন্দন ও প্রকরণ মিলিয়ে এদের যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সেখানেই আমাদের ঐতিহ্যের শিকড়ের সন্ধান পেয়েছিলেন মীরা মুখার্জি। সেই তৃণমূল থেকে তিনি আহরণ করেছেন প্রকরণজ্ঞান। বছরের পর বছর কাজ করেছেন এদের সঙ্গে। তারপর নিজের সম্ভ্রান্ত শিক্ষাকে এর সঙ্গে মিলিয়ে আবিষ্কার করেছেন নিজস্ব পদ্ধতি।

লোককারিগরদের কাজে মোমের তার পর পর যে জড়ানো থাকে তার ফলে মূর্তিটির গায়েও একরকম টেক্সচার বা বুনোট তৈরি হয়। অনেক সময় তাঁরা একরকম জালি বা জাফরিও তৈরি করেন। নান্দনিকতা ছাড়া এর একটা প্রাকরণিক প্রয়োজনীয়তাও আছে। গরমে মোমটা গলে যখন বাষ্প হয়ে যায়, তারা ছাঁচের বালি বা মাটির দেয়ালে চাপের সৃষ্টি করে। ওই বাষ্পকে ঠিক মতো সঞ্চালিত হওয়ার বা বেরিয়ে যাওয়ার অবকাশ করে দেয় ওই জালি বা জাফরি। মীরা মুখার্জির কাজেও এরকম নানা টেক্সচার দেখা যায়। তিনি ধাতু ঢালাইয়ের সমস্তরকম প্রকরণ সম্পর্কে দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। নিজের কাজে প্রয়োজন অনুযায়ী সবরকম প্রকরণই তিনি ব্যবহার করেন। তবু শিল্পের তৃণমূল পর্যন্ত প্রসারিত এক সুষমা ও লাবণ্যের সন্ধান পেলেন তিনি এইসব লোককারিগরদের কাজের মধ্যে। সারল্য ও সুষমার সেই ছন্দটিকে তিনি নিজের কাজেও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সর্বতোভাবেই তিনি আধুনিক। আধুনিক মননের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও জটিলতার প্রতিফলন আছে তাঁর কাজে। লোককারিগরদের কাজে পদ্ধতির কারণেই কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তাঁদের কাজ আয়তনে ছোট। যেমন বস্তারের ঘরুয়াদের কাজ—সাধারণত এক ফুট বা দেড় ফুটের বড় হয় না। মীরা মুখার্জি নিজের কাজকে যখন করতে চাইলেন আয়তনে বড় এবং প্রকাশভঙ্গিতেও জটিল, তখন

১৫০· মীরা মুখার্জি। ফিশারমেন রিটার্নিং। ব্রোঞ্জ।
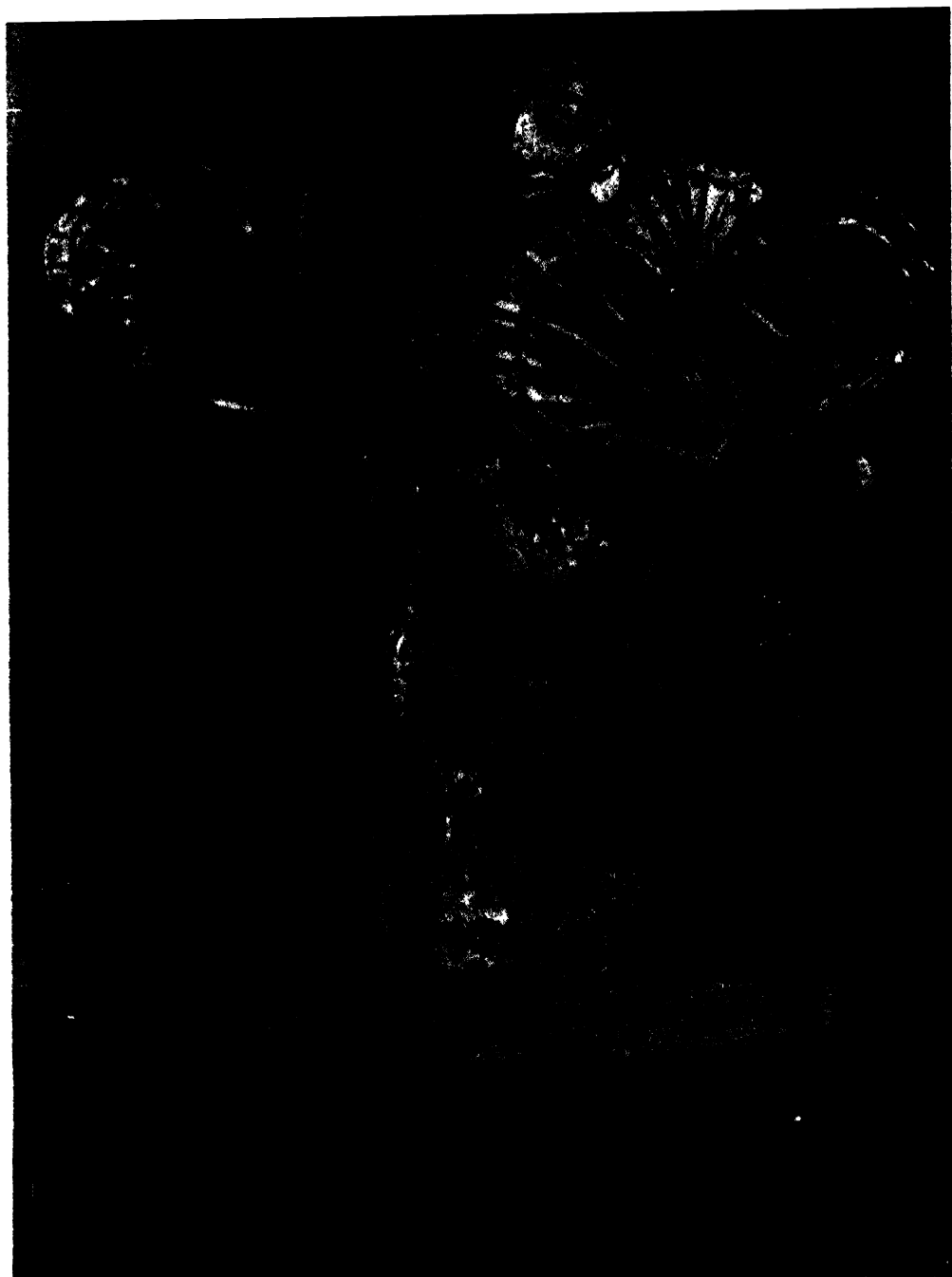
১৫১· মীরা মুখার্জি। পাখাওয়ালা। ব্রোঞ্জ।

লৌকিক পদ্ধতির সঙ্গে তাঁকে আধুনিক পদ্ধতিও মেলাতে হল। লৌকিক, ধ্রুপদী ও ইওরোপীয় সবরকম পদ্ধতিই তিনি ব্যবহার করে থাকেন। লৌকিক পদ্ধতি থেকে তাঁকে সরে আসতে হল মোটামুটি দুটি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে। প্রথমত, তাঁর কাজের বৃহদায়তনতা। দ্বিতীয়ত, প্রকাশভঙ্গির জটিলতার জন্য প্রকরণেও এসে গেল নানা জটিলতা। তাই যতই তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর পরিবর্তনের মাত্রাও বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠল লৌকিক পদ্ধতির ভিত্তির উপর তাঁর একান্ত নিজস্ব এক পদ্ধতি। যেমন অনেক সময়ই তিনি বড় কাজকে ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ করে তৈরি করেন এবং সেই টুকরোগুলোকেই ঢালাই করেন। পরে ওয়েলডিং বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে সেগুলিকে জুড়ে পূর্ণ মূর্তিটি গড়ে তোলেন। যে মূর্তিটি তাঁর কল্পনায় থাকে সেটি বাস্তবে দেখার সুযোগ হয় একমাত্র সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে। তাঁর প্রতিটি কাজই প্রাকরণিক জটিলতার সমাধানে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা। তাই প্রতিটি কাজই তাঁর কাছে নতুন।

মীরা মুখার্জি তাঁর এই গবেষণামূলক পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর এক লেখায় (পরিচয়—পূর্বোক্ত প্রবন্ধ) 'অশোক ইন কলিঙ্গ' ভাস্কর্যটির নির্মাণ প্রসঙ্গে। সেটি অনুসরণ করলেই তাঁর পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি। 'অশোক' এখন দিল্লির অশোক হোটেলে আছে। সত্তর দশকে এটি তৈরি হয়েছিল। তখন চারদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে বহু তরুণ প্রাণ অকারণে বিসর্জিত হচ্ছে। এই বিষাদ তাঁর মনে সম্রাট অশোকের আদর্শের কথা জাগাল, যে অশোক বিশাল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে যুদ্ধ ও হিংসার অর্থহীনতা উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯৭৩-এ শেষ হয়েছিল ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি উঁচু এই মূর্তিটি। প্রাথমিক খশড়াটি করেছিলেন একটি ছোট সিগারেটের প্যাকেটের কাগজের উপর। আড়াই বছর ধরে তৈরি এই মূর্তিটি সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এর বাস্তব রূপ তিনি দেখতে পান নি। কিন্তু পুরোটাই তাঁর কল্পনায় উজ্জ্বল হয়ে ছিল। ছাব্বিশটি অংশে ভাগ করে নিলেন মূর্তিটিকে। এক একটি অংশ মাটি দিয়ে তৈরি শুরু করলেন। প্রথমে গড়লেন পায়ের পাতা ও পায়ের কিছু অংশ। তৈরি করার পর দেখলেন মাটি তার নিজস্ব ওজনে বসে গিয়ে কলস আকৃতির একটু স্ফীত অবয়ব তৈরি করেছে। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক বিকৃতিকরণকে মেনে নিয়ে তিনিও নিয়ন্ত্রণ করলেন তাঁর ভাস্কর্যের রূপ। এভাবে এক-একটি অংশ আলাদা আলাদাভাবে তৈরি হওয়ার সময় পূর্ববর্তী শেষ অংশটি নিয়ন্ত্রণ করল পরবর্তী অংশের শুরু। এরপর মোমের ছাঁচ তুলে ঢালাই করলেন প্রতিটি অংশ। এবার এই অংশগুলোকে জোড়ার পালা। এজন্য কলকাতা থেকে একটু দূরে এক কারখানায় বয়ে নিয়ে যেতে হল এদের। সেখানে ওয়েলডিং-এ সাহায্যে নীচ থেকে ক্রমানুসারে জোড়া হল অংশগুলিকে। সবটা জোড়ার পরে সকলেই বিস্মিত হয়ে দেখলেন, সেই পৌনে বারো ফুট উঁচু মূর্তিটি কোনো সাহায্য ছাড়াই দাঁড়াতে পারল নিজের পায়ে। নন্দন, প্রকরণ ও বিজ্ঞান এই তিনের সমন্বয়ে গড়ে উঠল এক শিল্পরূপ যা সমকালীন এক ঘটনাপ্রবাহের বিষাদকে চিরায়ত এক দর্শনে অভিষিক্ত করতে পারল। এটাই মীরা মুখার্জির ভাস্কর্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

১৪১

পাঁচ

পার্থিবতায় অলৌকিক

মীরা মুখার্জির ভাস্কর্য সমকালীন ভাস্কর্যের প্রচলিত ধারা থেকে এখানেই আলাদা যে জ্যামিতি বা ফর্মের সমস্যার সমাধান ও সেই সমাধানের পথে বিমূর্ত ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টিই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এই জীবন ও এই সময়ের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন থাকে তাঁর কাজে। জীবনের দুঃখ, বিষাদ, আনন্দ, হাসি-কান্নার এত প্রত্যক্ষ ভাস্কর্যরূপ আমরা খুব কম শিল্পীর কাজেই দেখতে পাই। তাঁর কাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে আমরা এভাবে চিহ্নিত করতে পারি। প্রথম—তাঁর প্রতিবাদী চেতনা, দ্বিতীয়—শ্রমজীবী মানুষকে নন্দিত করা, তৃতীয়—ভাস্কর্যকে চিত্রীয় নন্দনে অভিষিক্ত করা, চতুর্থ—বিষয় ও আঙ্গিকের পার্থিবতার মধ্যে অলৌকিক এক অধ্যাত্মচেতনার উদ্বোধন, এবং পঞ্চম—এই অধ্যাত্মচেতনার উন্মীলনে সংগীতের প্রগাঢ় ভূমিকা।

তাঁর প্রতিবাদী চেতনা সবসময়ই এক বিনম্র করুণায় সঞ্জীবিত। যেমন 'অশোক'—সেই সময়ের সামাজিক আলোড়নকে মথিত করে উঠে এসেছে মূর্তি, কিন্তু কোথাও বিক্ষোভ নেই সংক্ষুব্ধতা নেই। যেন এক সায়াহ্নের
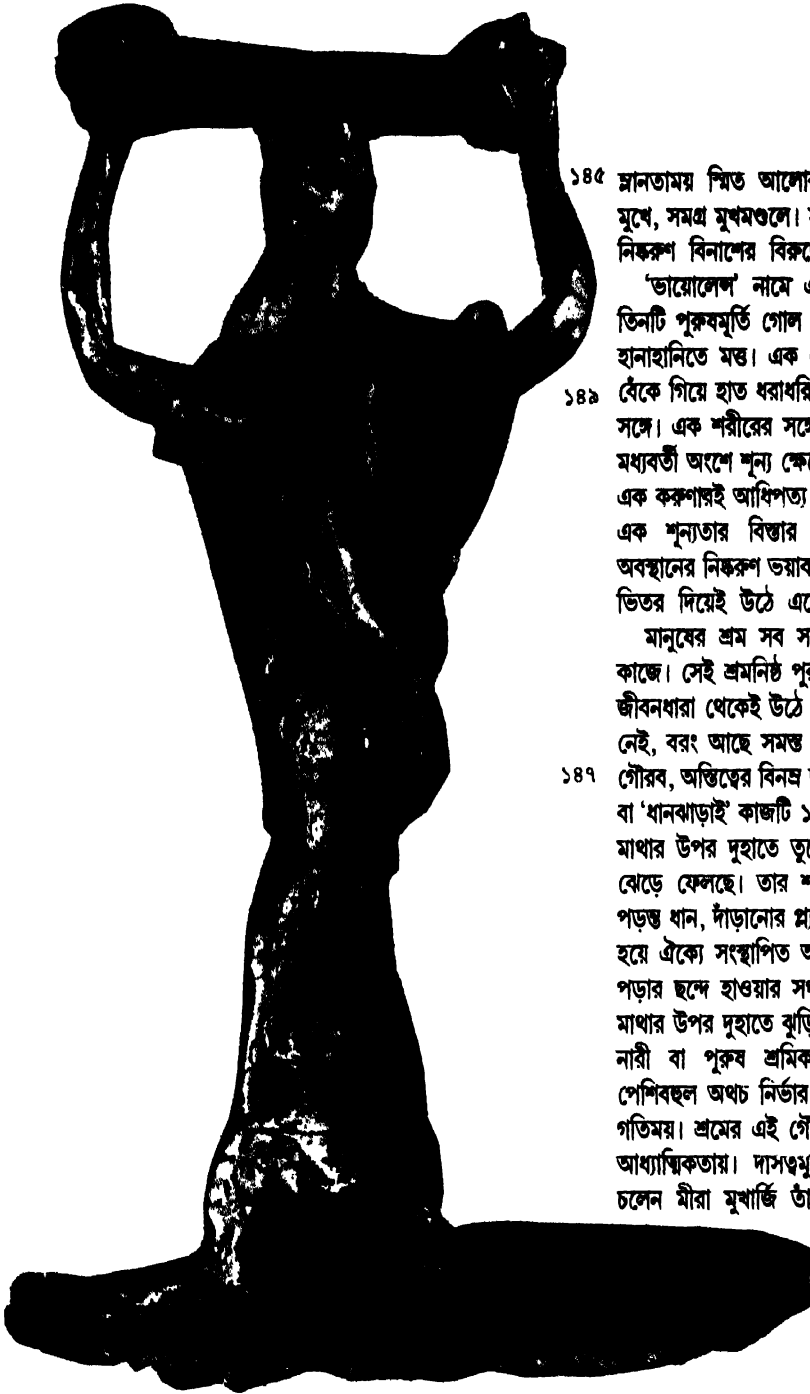
১৫২· মীরা মুখার্জি। লেডি উইথ শালুক ফ্লাওয়ার। ব্রোঞ্জ।

১৪৫ ম্লানতাময় স্মিত আলোর করুণা ছড়িয়ে আছে চোখে, মুখে, সমগ্র মুখমণ্ডলে। সমস্ত ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে, অর্থহীন নিষ্করুণ বিনাশের বিরুদ্ধে এই তাঁর প্রশান্ত প্রতিবাদ।

'ভায়োলেন্স' নামে একটি কাজ আছে ১৯৭২-এর। তিনটি পুরুষমূর্তি গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে পরস্পর হানাহানিতে মত্ত। এক একটি শরীর বৃত্তাংশের বক্রতায় ১৪৯ বেঁকে গিয়ে হাত ধরাধরি করে যুক্ত হয়েছে অন্য শরীরের সঙ্গে। এক শরীরের সঙ্গে অন্য শরীরের রৈখিক সংযোগ মধ্যবর্তী অংশে শূন্য ক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছে। সমগ্র বিন্যাসে এক করুণারই আধিপত্য। 'হিরোসিমা' শীর্ষক কাজটিতেও এক শূন্যতার বিস্তার দেখেছি। এই বিশ্বে মানুষের অবস্থানের নিষ্করুণ ভয়াবহতা অনেকটা বিমূর্ত রূপাবয়বের ভিতর দিয়েই উঠে এসেছে সেখানে।

মানুষের শ্রম সব সময়ই নন্দিত হয় মীরা মুখার্জির কাজে। সেই শ্রমনিষ্ঠ পুরুষ বা নারী গ্রাম ও শহর উভয় জীবনধারা থেকেই উঠে আসে। সেই শ্রমে কোনো দাসত্ব নেই, বরং আছে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি, উজ্জ্বল এক ১৪৭ গৌরব, অস্তিত্বের বিনম্র জয়ঘোষণা। 'উইনোইং দ্য প্যাডি' বা 'ধানঝাড়াই' কাজটি ১৯৮৪-৮৫-র। এক নারী দাঁড়িয়ে, মাথার উপর দুহাতে তুলে ধরা একটি পাত্র থেকে ধান ঝেড়ে ফেলছে। তার শরীর, মাথার উপরে ধরা পাত্র, পড়ন্ত ধান, দাঁড়ানোর প্ল্যাটফর্ম সমস্তটাই পরস্পর সংযুক্ত হয়ে ঐক্যে সংস্থাপিত অথচ দাঁড়ানোর ছন্দে, ধান উড়ে পড়ার ছন্দে হাওয়ার সঞ্চলন অনুভব করা যায়। অথবা মাথার উপর দুহাতে ঝুড়ি ধরার ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে থাকে নারী বা পুরুষ শ্রমিক। তাঁদের দীর্ঘ, ঋজু, বলিষ্ঠ পেশিবহুল অথচ নির্ভার শরীর স্থির অথচ কাজের ছন্দে গতিময়। শ্রমের এই গৌরবও কিন্তু সঞ্জীবিত থাকে এক আধ্যাত্মিকতায়। দাসত্বমুক্ত শ্রমের এক শিল্পরূপ গড়ে চলেন মীরা মুখার্জি তাঁর অজস্র কাজের মধ্য দিয়ে।

১৫৩· মীরা মুখার্জি। বেহুলা। ব্রোঞ্জ।

তাঁর কাছে ভাস্কর্য শুধুমাত্র একটা ফর্ম নয়। সব সময়ই তিনি কিছু বলতে চান যা প্রকৃতি ও জীবনসম্পৃক্ত। সেজন্যই তাঁর ভাস্কর্য অনেক সময়েই চিত্রের বৈশিষ্ট্যের দিকে এগিয়ে যায়। চিত্রলতা তাঁর ভাস্কর্যের একটি বিশেষ গুণ। এজন্য তিনি ভাস্কর্যে আঁকতে পারেন নিসর্গ দৃশ্য, আঁকতে পারেন বিচারসভা বা জেলখানার ভিতরের পরিবেশ, ধানের গোলায় ধান তোলার দৃশ্য বা নদীতে ভেলা ভাসিয়ে বেহুলার যাত্রার দৃশ্য। নিসর্গ, কাহিনী, পুরাণ কথা সমস্তকেই তিনি করে তুলতে পারেন ভাস্কর্যের বিষয়। আধুনিক ভাস্কর্যকে এতটাই প্রসারিত করতে পারেন তিনি।

অনেক সময় কেবল মূর্তি রচনা করেই তিনি তৃপ্ত থাকেন না। সেই মূর্তির সাথে কবিতাও যুক্ত হয়ে যায়। ভাস্কর্যের গায়ে তিনি খোদাই করে লেখেন কবিতা বা লোকগাথার নানা অংশ। যেমন ১৯৮৫-র 'নাগরদোলা' কাজটি। একটি মানুষের মুখ। উপরে তোলা দুটি হাতে একটি বৃত্তাকার চাকা ধরা থাকে। সেই চাকার উপর নতোন্নত পদ্ধতিতে আঁকা থাকে জীবনের নানা প্রতিরূপ। কেন এই কাজটির নাম 'নাগরদোলা' হল, সেটা বুঝতে হলে আমাদের নতজানু হয়ে বসতে হয় মূর্তিটির পাশে। মূল ভিত্তির উপর খোদিত দেখা যায় লৌকিক ছড়ার কয়েকটি লাইন: "ঠিক জানতাম দেখতে পাব/ দেখা হল না/ ঠিক জানতাম বুঝে যাব/ বুঝতে পারলাম না/ চলতে চলতে ছুটতে ছুটতে/ হঠাৎ চেয়ে দেখি—একি!/ জীবন গেছে ঘুরে/ অনেক সরে সরে/ নাগরদোলা একি?" জীবনের অন্তর্লীন গতিছন্দের আধ্যাত্মিকতাকে এভাবেই মূর্ত করে তোলেন তিনি। তেমনি একক প্রতিমাতেও তিনি আবার রূপ দেন সংহত ধ্যানকে। 'জাগরণ' বা 'অ্যাওয়েকেনিং' নামে একটি কাজ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পদ্মাসনে বসে আছে যেন কোনো যোগীপুরুষ। তাঁর শরীরের নিম্নাংশ যেন জলাশয়ের গর্ভে নিহিত। তাতে ঢেউ-এর আলোড়ন, মাছেদের সঞ্চরণ। ভূলোকের দিকে উঠে

গেছে শরীর। শরীর জুড়ে সন্ন্যাসীদের জয়যাত্রা। আর তার মুখমণ্ডলে দ্যুলোকের বিভা। উন্মীলিত আয়ত দুই চোখ দিগন্তে প্রসারিত। এই পার্থিবতা থেকে জাগরণের প্রতীকস্বরূপ এই মূর্তি। ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্যের যে ছন্দ, যে ছন্দের বিন্যাসেই তার ভারতীয়তা, সেই ছন্দে এক ধরণের অলৌকিকতা আছে। তাতে এই জীবনের তীব্র শরীরী সংবেদনময়তাও যখন থাকে, তখনো তাকে মনে হয় পার্থিবতার দৈনন্দিনতা থেকে তা একটু সুদূর। কিন্তু লৌকিক শিল্পে মূল ছন্দটাই এত জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সেখানে আধ্যাত্মিকতাও পার্থিবতার রসে সঞ্জীবিত থাকে। মীরা মুখার্জি হয়তো সেজন্যই লৌকিক শিল্পের ভিত্তির উপর গড়ে তুলেছেন তাঁর সৃষ্টি। এই জীবনের সমস্ত মাধুর্যকে নিষ্কাশিত করে তাতে এনেছেন অলৌকিকের সুর। তিনি যখন 'বাউল' গড়েন বা 'নটরাজ', তখন বোঝা যায় ধ্রুপদী ছন্দকে কেমন করে তিনি পার্থিবতায় অভিষিক্ত করে সুরের সঞ্চারের মধ্য দিয়ে অলৌকিকের দিকে নিয়ে যান।

তাই সুর ও সংগীতেই তাঁর ভাস্কর্যের প্রাণকেন্দ্র। ঘনীভূত সংগীতেরই দৃশ্যরূপ তারা। সংগীতের প্রতি তাঁর আশৈশব আকর্ষণ। গল্প করেছেন দিল্লিতে থাকার সময় মা-র দেওয়া সোনার চুড়ি ১২০ টাকায় বিক্রি করে তানপুরা কিনেছিলেন। ভাস্কর্যে যতই এগিয়েছেন সংগীতের প্রতি আকর্ষণও বেড়েছে। পরিণত বয়সেই বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষার্থীর নিষ্ঠায় ধ্রুপদী সংগীত শিখেছেন। ক্রমান্বয়ে সুর সজীব হয়ে উঠেছে তাঁর হৃদয়ে। একদিকে ধাতুর মধ্যে যেমন ক্রমে আবিষ্কার করেছেন এক জীবন্ত সত্তা, 'যার প্রাণ আছে, যে কথা বলে, সাহায্য করতে চায়, ভালোবাসা চায়', তেমনি সুরের মধ্যেও পেয়েছেন অসীমের অনুরণন। ধাতু ও সুর ক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে গেল তাঁর কাছে। ধাতু হয়ে উঠল যেন সুরেরই এক প্রকাশ। এই অদ্বৈতে একাকার হয়ে গেল তাঁর সংগীত আর ভাস্কর্য। বোধের এই অলৌকিকতায় পৌঁছেই মীরা মুখার্জি বলতে পারেন, "ধাতু দিয়েই গান গেয়েছি আমি।... শরীরটাকে টিউন করে নিলাম, আমিই তানপুরা হয়ে গেলাম, সবটাই গান হয়ে বাজতে লাগল।" (সানন্দা—পূর্বোক্ত সূত্র)

ভাস্কর্যের দ্বিতীয় প্রজন্ম

এক

সমস্যা

"তৃতীয় বিশ্বে প্রাচীন অতীত এখনো সমকালীন অভিজ্ঞতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে। আমাদের দৃষ্টি অনুভব বোধ ও কাজের পদ্ধতির মধ্যে জড়িয়ে থাকে তা। আবার এই দৃষ্টি বোধ কাজ এগুলো খুবই প্রভাবিত ও বিবর্তিত হয় আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে ও তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে।"

আমাদের দেশে শিল্পকলায় আধুনিকতার সমস্যা প্রসঙ্গে এ কথাগুলি বলেছিলেন দক্ষিণ ভারতের সমকালীন ভাস্কর এস. নন্দগোপাল। ১৯৮৩-তে যুগোশ্লাভিয়ায় নির্জোট দেশগুলির শিল্পীদের এক সমাবেশে তাঁর প্রদত্ত ভাষণের শুরুটা ছিল এরকম। 'আর্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' নামে তাঁর লেখাটি পরে ছাপা হয়েছিল 'ললিতকলা কন্টেম্পোরারি'-র ৩৫ সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ১৯৮৭)।

ঐতিহ্য ও প্রযুক্তিগত আধুনিকতার যে দ্বৈতের কথা বলেছেন নন্দগোপাল আমাদের সমকালীন চিত্র-ভাস্কর্যের স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে এই সমস্যাটা খুবই প্রগাঢ়। নন্দগোপাল ওই লেখায় এটাও দেখিয়েছেন ধ্রুপদী সংগীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটটি অনেক স্পষ্ট। ঐতিহ্যেরই প্রসারণ হয়ে সংগীত ও নৃত্যের বিবর্তনে কোনো সমস্যা নেই। কেবল এই সময়েরই ভিতর থেকে বা পৃথিবীর অন্যপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা নানা সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য খুব স্বাভাবিকভাবেই ক্রমান্বয়ে তার মধ্যে মিশে গিয়ে তার রূপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। ধ্রুপদী সংগীত বা নৃত্যে সম-সময়ের কথা বলার দায় নেই তেমন। তার রূপাবয়ব বা ফর্মেরও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিবর্তিত হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। ফলে তার বিবর্তন অনেক ব্যাপ্ত সময় ধরে ধীরে ধীরে হয়। শাশ্বত কথাটার গভীরতর একটা অর্থ থাকে সেখানে।

অন্যদিকে সাহিত্য বা চলচ্চিত্রের মতো শিল্পে সাম্প্রতিক সময়েরই সর্বাধিক গুরুত্ব। দেশীয় ঐতিহ্যের একটা দূরতর প্রেক্ষাপট সেখানে থাকতেও পারে। কিন্তু তার বিচরণের ক্ষেত্র যে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার জগতে সেখানে আন্তর্জাতিকতাই নিয়ন্ত্রণের মাপকাঠি। পাশ্চাত্যের আধুনিকতার অভিজ্ঞতাকে, আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জীবনের সর্বস্তরে যে ব্যাপক পরিবর্তন আনছে প্রতিনিয়ত, সেই জটিলতাকে আত্মস্থ করে গড়ে ওঠে তার রূপ। সমসময়ের কাছে, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কাছে যতটা দায়বদ্ধ সে অতীত ইতিহাসের কাছে ততটা প্রগাঢ় দায় সবসময় না থাকলেও চলে তার।

কিন্তু দৃশ্য-শিল্প বিশেষত চিত্র ও ভাস্কর্যের আধুনিকতার ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরো জটিল। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার মেলবন্ধনের পথে তাঁকে যেমন চলতে হয় তেমনি অতীতের দিকে শিকড় চারিয়ে রস সংগ্রহ করে বর্তমানের আলো হাওয়ায় সঞ্জীবিত হতে হয়। এই সমন্বয় সুষম না হলে যে সমস্যা দেখা দেয় আমাদের সাম্প্রতিক চিত্রভাস্কর্যে আমরা প্রতিনিয়ত তা দেখি। তবু আমাদের আধুনিক চিত্রকলা বিগত প্রায় এক শতাব্দী ধরে অনেক বিদগ্ধ প্রতিভার নিবিড় অন্বেষণের মধ্য দিয়ে বিশিষ্ট এক পাদপীঠ অর্জন করতে পেরেছে। কতকগুলো ক্ষেত্রে এমন কিছু
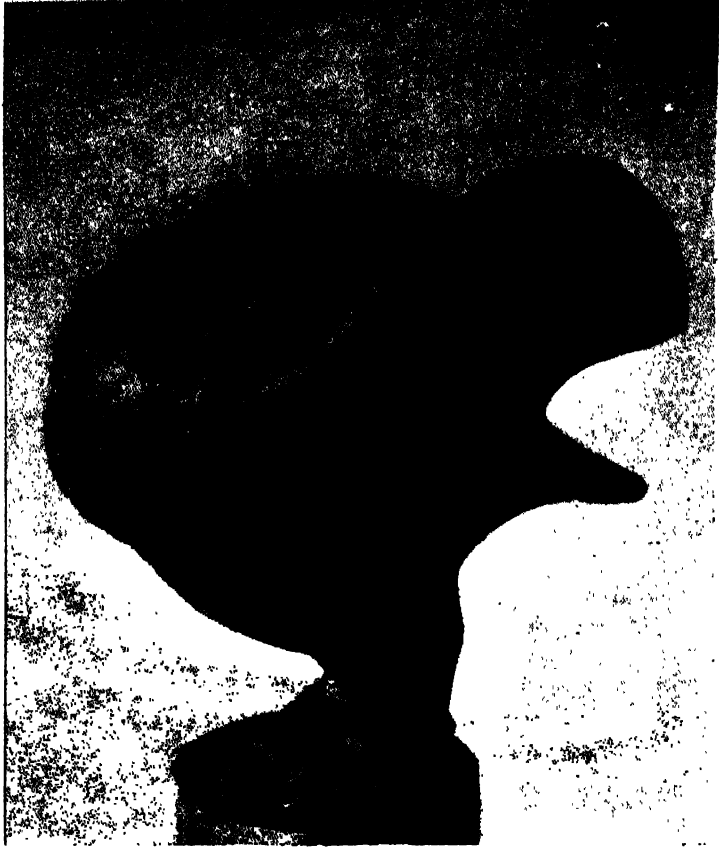
১৫৪· শর্বরী রায়চৌধুরী। কম্পোজিশন-১। ব্রোঞ্জ। ১৯৬২।

রূপভাবনার সন্ধান সে দিতে পেরেছে যার মধ্যে তার নিজের ঐতিহ্যের পরিচয় যেমন আছে তেমনি আছে বিশ্বের কাছে উপস্থাপিত করবার মতো কিছু অভিনবত্বও।

ভাস্কর্যে সেই সমস্যার যে সম্পূর্ণ সমাধান হয়েছে এরকম বলা যায় না। আমাদের ঐতিহ্যগত ভাস্কর্যের যে সমৃদ্ধ অতীত সময় ও সংযোগের ব্যবধানে তা থেকে আজ আমরা এতই দূরবর্তী যে তার উজ্জীবনের কোনো প্রশ্ন আজ আর আসে না। সে চেষ্টা করতে গেলে যে অন্য এক সংকীর্ণতায় আটকে পড়তে হয় তার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। নন্দগোপাল যে সমস্যার কথা তুলেছেন তিনি নিজেই চেষ্টা করেছেন তাঁর নিজের ভাস্কর্যে এর সমাধান খুঁজতে।

র-২১

এস নন্দগোপালের জন্ম ১৯৪৬-এ ব্যাঙ্গালোরে। ১৯৬৬-তে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক হন। ১৯৭১-এ মাদ্রাজের সরকারি আর্ট কলেজ থেকে ভাস্কর্যের প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমা নেন। পরে ১৯৮০ ও ৮১-তে ইওরোপ ও আমেরিকায় বিস্তৃত ভ্রমণের মধ্য দিয়ে ওখানকার জীবন ও শিল্পের বিশেষত ভাস্কর্যের আধুনিকতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেন এই সত্য, যা তাঁর নিজের ভাষায় এরকম:

"আমি ব্রাঁকুসি, গনজালেজ, ম্যুর, ডেভিড স্মিথ ও অ্যান্টনি কারো-র কাজ দেখেছি এবং দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু শুরু থেকেই একইরকম দৃঢ়তার সঙ্গে আমি এও অনুভব করেছি যে এই সব ভাস্করদের সন্ধান ও সফলতা তাঁদের সংস্কৃতির গভীর থেকে উঠে আসে যে ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে আমি কখনোই মেলাতে পারি না। এটাই আমার সমস্যা।" (ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার টুডে ১৯৮৩, জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারি পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮। ইংরেজি থেকে অনূদিত)।

এই সমস্যার সমাধানে নন্দগোপাল দেশীয় ঐতিহ্যের ভিতর সন্ধান করেছেন। অতীতের সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করেছেন সমকালীন রূপভাবনাকে। দক্ষিণ ভারতে লৌকিক স্তরে ছিল যে সমস্ত ধাতব অলঙ্করণময় কারুকাজ, সেই প্রকরণকে ব্যবহার করে তিনি গড়ে তুললেন নিজের ভাস্কর্য। ইওরোপীয় আধুনিকতা থেকে যা একেবারেই স্বতন্ত্র চরিত্র
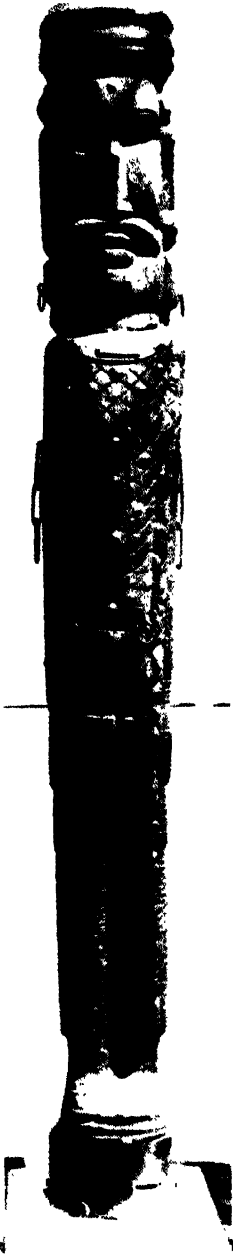
১৫৫· রঘুনাথ সিংহ। অর্জুন। কাঠ। ১৯৮৬।

১৫৬· নাগজিভাই প্যাটেল। টরসো। মার্বল। ষাটের দশক।

পেল। প্রকরণে ও রূপারোপে তার মধ্যে নিজেদের ঐতিহ্যগত রূপচেতনার স্পন্দনকে ধরার চেষ্টা করলেন নন্দগোপাল।

ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে স্বদেশ সন্ধানের প্রয়াসে নন্দগোপালই যে প্রথম বা একক তা অবশ্য নয়। তাঁর আগে পি ভি জানকিরামের কাজেও এর পরিচয় আমরা পেয়েছি। জানকিরাম নন্দগোপালের আগের প্রজন্মের শিল্পী। তাঁর জন্ম ১৯৩০ সালে তামিলনাড়ুতে। মাদ্রাজের সরকারি আর্ট কলেজ থেকেই তিনি চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও বাণিজ্যিক শিল্পে ডিপ্লোমা নেন যথাক্রমে ১৯৫৩, ১৯৬২ ও ১৯৬৪-তে। তারপর হাঙ্গেরি গিয়ে সেখানেও ভাস্কর্যের প্রশিক্ষণ নেন ১৭০

১৫৭· অজিত চক্রবর্তী। হিরো উইথ স্পিয়ার। কাঠ। ১৯৮০।

১৯৭৩-এ। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আই অ্যাম মডার্নিস্ট অ্যামঙ্গ মডার্নিস্টস অ্যান্ড ট্র্যালিশনালিস্ট অ্যামঙ্গ ট্র্যাডিশনালিস্টস"। (ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার টুডে ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৩৯) তাঁর কাজে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় সম্পর্কে তিনি সচেতন। তিনিও ধাতব পাতকে পিটিয়ে লৌকিক প্রকরণে ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত প্রতিমাকল্প রূপায়িত করেন।

দক্ষিণ ভারতে এভাবে ধাতব পাতের কাজের ধারাবাহিকতা গড়ে উঠেছে। পি এস নন্দন (১৯৪০) বা কে এম গোপাল যেমন এ ধরণের কাজে নিজস্ব রূপভঙ্গি গড়ে তুলেছেন, তেমনি কিছুদিন আগে কলকাতায় প্রদর্শনী করে গেলেন এম সেনাথিপথি, ধাতব পাতের উপর নতোন্নত (রিলিফ) পদ্ধতির কাজে ঐতিহ্যগত রূপারোপে যথেষ্ট সফলতা দেখিয়েছেন তিনিও।

অনেক ভাস্করই আধুনিকতার ইওরোপীয় মডেলের বাইরে এরকম একটা ঐতিহ্য সম্পৃক্ত পথের সন্ধান করেছেন। যেটা খুবই প্রয়োজনীয় ও আত্ম-আবিষ্কারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আধুনিকতার ও আত্ম-আবিষ্কারের সামগ্রিক কোনো সমাধান কি উঠে আসে এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে? ভাস্কর্যের দায় তো কেবল সনাতন রূপবোধে তন্নিষ্ঠ থাকাই নয়, বিশ্বব্যাপী আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জীবনধারায় নিরন্তর যে নানা জটিলতা আনছে, তারও প্রতিফলন থাকবে ভাস্কর্যের ফর্ম বা রূপাবয়বের মধ্যে। তা যদি না থাকে তাহলে সে তো সময়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। আধুনিকতারও সম্পূর্ণ স্ফুরণ ঘটে না সেখানে। ইওরোপে রদাঁ পরবর্তী ভাস্কর্যে রূপের ভাঙনের মধ্য দিয়ে আবিশ্ব উত্তরাধিকারকে আত্মস্থ করে নেওয়ার যে সফল প্রয়াস সময়ের জটিলতাই ছিল সেখানে প্রধান চালকশক্তি।

আমাদের ভাস্কর্য সময়ের জটিলতাকে ধরতে চেয়ে আধুনিক ইওরোপের দিকে হাত বাড়িয়েছে। অথবা নিজস্ব ভাষা খুঁজতে গিয়ে অতীত ঐতিহ্যের দিকে চোখ ফিরিয়েছে। এই দুটি প্রয়াস স্বতন্ত্রভাবে চলেছে বলে কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ের একটা সমস্যা থেকেই গেছে।

এই ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলির মধ্য দিয়েই আমাদের সমকালীন ভাস্কর্য অর্জন করেছে কিছু গৌরব, যেখানে ইওরোপীয় ভাষার পুনরাবৃত্তি করে নয়, তার সারাৎসারকে আত্মস্থ করে দেশের ধমনী থেকে তাপ সংগ্রহ করে সৃষ্ট হয়েছে ত্রিমাত্রিক রূপকল্প যার মধ্যে সাম্প্রতিকের জটিলতা ও ঐতিহ্যের স্পন্দন এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটেছে। রামকিঙ্কর (১৯০৬-৮০), প্রদোষ দাশগুপ্ত

(১৯১২-১৯৯১), সোমনাথ হোর (১৯২১) ও মীরা মুখার্জির (১৯২৩) ভাস্কর্যে রূপের অভিনবত্বের মধ্য দিয়ে সময় ও বাস্তবতার যে তীব্র সঞ্চার তাতে ইওরোপ-নিরপেক্ষভাবেই গড়ে উঠতে পেরেছে আমাদের সমকালীন ভাস্কর্যের স্বতন্ত্র এক ভাষা। এখানে 'ইওরোপ নিরপেক্ষ'ভাবে বলতে ইওরোপীয় আধুনিকতাকে অস্বীকারের কথা বোঝাতে চাইছি না আমরা। সেই আলোতে নিজের দেশকাল সম্পৃক্ত অভিজ্ঞতাকে স্বচ্ছ করে রূপ দেওয়ার কথা বলতে চাইছি যাতে তা কেবলই রূপমূলক অর্থাৎ কেবলই ফর্ম, বা কেবলই ইওরোপমূলক হয়ে না ওঠে।

কেবলই ফর্মের, যাকে বলে ফর্মের জন্য ফর্ম, তার একটা মোহ আছে আমাদের সমকালীন অনেক ভাস্করেরই। ফলে আমরা যখন সফলতার একটা ক্ষেত্র হিশেবে সোমনাথ হোর বা মীরা মুখার্জির নাম করি, তখন তাঁদের কেউ কেউ হয়তো আপত্তি করবেন যে অনেক সময় বর্ণনাত্মক ও বক্তব্য প্রধান তাঁদের কাজে ফর্মের বিশুদ্ধতা বা অভিনবত্ব বজায় থাকে না। কখনো তা হয়ে ওঠে এক লৌকিক রূপের প্রসারণ, কখনো-বা তাকে আয়তনময় ভাস্কর্যগুণে অম্বিত বলে মনে হয় না। এই আপত্তির মধ্যেই বিধৃত থাকে সমকালীন ভাস্কর্যের এক সমস্যা, যে দেশকালের বাস্তবতা থেকে অনেকেই তুলে আনতে চান না বা পারেন না এর রূপ। ফলে কতকগুলো নির্দিষ্ট ভঙ্গির আবর্তে আবর্তিত হয়ে চলেন অধিকাংশ ভাস্কর। পূর্বোক্ত দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্করদের অলঙ্করণ-সর্বস্বতার সমস্যা এক দিকে, অন্য দিকে বিশুদ্ধ রূপের সন্ধানে গতানুগতিক ফর্ম-সর্বস্বতার সমস্যা, এই দুই সংকীর্ণতায় আমাদের ভাস্কর্যের সফলতার ক্ষেত্রটি বারেবারেই সংকুচিত হয়।

১৫৮ বি বিঠল। মডার্ন ফিলসফার। সিমেন্ট কংক্রিট।

সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশের একজন ভাস্করের কাছে ফর্মের অনন্যপূর্ব অভিনবত্ব আনা খুব সহজ কাজ নয়। কথা প্রসঙ্গে এই সময়ের প্রথিতযশা ভাস্কর উমা সিদ্ধান্ত বলছিলেন একদিন—প্রাচীন যুগ থেকে ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভাস্কর্যের যে বিপুল কাজ হয়েছে, তারপর আধুনিক ইওরোপে ভাঙনের মধ্য দিয়ে হয়েছে যে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাতে আদিম ও প্রাচ্য উত্তরাধিকার আধুনিকতায় বিশ্লেষিত হয়েছে, তারপর অভূতপূর্ব কোনো রূপের আবিষ্কার খুবই দুরূহ কোনো শিল্পীর পক্ষে। কোনো শিল্পী যা করতে পারেন তা হল, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভবের আলোতে বিস্তীর্ণ ঐতিহ্য থেকে কোনো বিশেষ রূপকে তুলে এনে রূপান্তরিত করে নেওয়া। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত অনুভব ও অভিজ্ঞতা যেহেতু অনন্য তাই রূপের সম্ভাবনাও অশেষ। সুতরাং আমাদের ভাস্কর্যে রূপের অনন্যতার অভাবের যে সমস্যা তার মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত অনুভূতির ও দৃষ্টির অনন্যতার সমস্যা। এর একটা কারণ হতে পারে জীবনানন্দীয় সেই প্রাজ্ঞ উক্তি—'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।'

এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য ভাস্কর্যের দ্বিতীয় প্রজন্ম। প্রথম প্রজন্মের ভাস্করদের সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি

১৫৯· শর্বরী রায়চৌধুরী। গেট অব হেভেন। ব্রোঞ্জ। আশির দশক।

পূর্ববর্তী কয়েকটি প্রবন্ধে। মোটামুটি ১৯০০ থেকে ১৯৩০-এর আগে পর্যন্ত যাঁদের জন্ম তাঁদেরই আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম প্রথম প্রজন্মের মধ্যে। রামকিঙ্কর থেকে শুরু করে তাঁদেরই কয়েকজনের প্রয়াসে আমাদের দেশে আধুনিক ভাস্কর্যের সূচনা হয়েছিল। তাঁরা যেমন নিজেরা কাজ করেছেন, তেমনি কিছু ছাত্রছাত্রীও তাঁরা তৈরি করে গেছেন, যাঁদের মধ্য দিয়ে ভাস্কর্যের আধুনিকতা সাম্প্রতিক পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। এদেরই আমরা বলছি দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্কর। আলোচনার সুবিধার জন্য এক্ষেত্রেও সময়ের একটা নির্দিষ্টতাকে আমরা মেনে নিতে চাই। মোটামুটি ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ অর্থাৎ স্বাধীনতার আগে যাঁদের জন্ম এই পর্যায়ে তাঁরাই হবেন আমাদের আলোচ্য।

প্রথম প্রজন্মের ভাস্কররা শুরু করেছিলেন একেবারে শূন্যতা থেকে। ১৯৩৫-এ শান্তিনিকেতনে ইউকেলিপটাস গাছে ছাওয়া এক প্রাঙ্গণে রামকিঙ্কর যখন সিমেন্ট কংক্রিটে গড়লেন গাছের আদলে বেড়ে ওঠা এক তরুণীর মূর্তি, নন্দলাল যার নামকরণ করেছিলেন 'সুজাতা', তখন এই 'সুজাতা'-র মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষে সূচনা হল ভাস্কর্যের এক নতুন অধ্যায়ের। আধুনিকতার শুরু তখন থেকেই। তার আগে যে সব কাজ হয়েছে, তা ছিল মূলত প্রতিমূর্তিমূলক, বা ইওরোপীয় অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতারই প্রাধান্য ছিল সেখানে। আমাদের দেশের জল হাওয়ায় সঞ্জীবিত, আমাদের ঐতিহ্যের আলো ও চলমান জীবন প্রবাহের তাপে উদ্ভাসিত ত্রিমাত্রিক শিল্পরূপের প্রথম পদপাত ঘটল 'সুজাতা'-য়। ১৯৩৫-এর সেই শুরু প্রথম প্রজন্মের ভাস্করদের হাতে নানাভাবে পল্লবিত হয়েছে ১৯৮০ পর্যন্ত বিশেষভাবে, এবং তারপরেও বিবর্তিত হয়ে চলেছে এখন পর্যন্ত। দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্কর, যাঁরা প্রথম প্রজন্মের ভাস্করদের কাছেই পেয়েছেন শিক্ষা, তাদের কাজের সূচনা মোটামুটি ১৯৬০ থেকে। ষাটের দশকের ভাস্কর হিশেবেই তাঁদের আমরা চিনে নিতে পারি। পরে সত্তরের দশকেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন আরো কিছু ভাস্কর।

১৯৩৫ থেকে শুরু করে চল্লিশের দশকেই প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন প্রথম প্রজন্মের ভাস্কররা। চল্লিশ দশকের যে বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণ সেটাই গড়ে তুলেছিল তাঁদের চেতনাকে। ফলে স্বদেশ চেতনা ছিল তাঁদের শিল্পের অন্যতম প্রেরণা। শান্তিনিকেতনের জল হাওয়ায় গড়ে উঠেছিলেন রামকিঙ্কর। রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের প্রেরণা তাঁর কাছে খুলে দিয়েছিল একদিকে স্বদেশের, অন্যদিকে বিশ্বের সমস্ত দরজা। বাংলার যে গ্রামীণ জীবন-প্রবাহ তার সঙ্গে আশৈশব ছিল তাঁর রক্তের সংযোগ। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও ছেলেবেলা থেকেই ছিল তাঁর প্রচ্ছন্ন যোগ। ফলে বেড়ে ওঠার স্বাভাবিক নিয়মেই স্বদেশ-চেতনা তাঁর বোধকে সমৃদ্ধ করেছিল। আর রবীন্দ্রনাথ খুলে দিয়েছিলেন
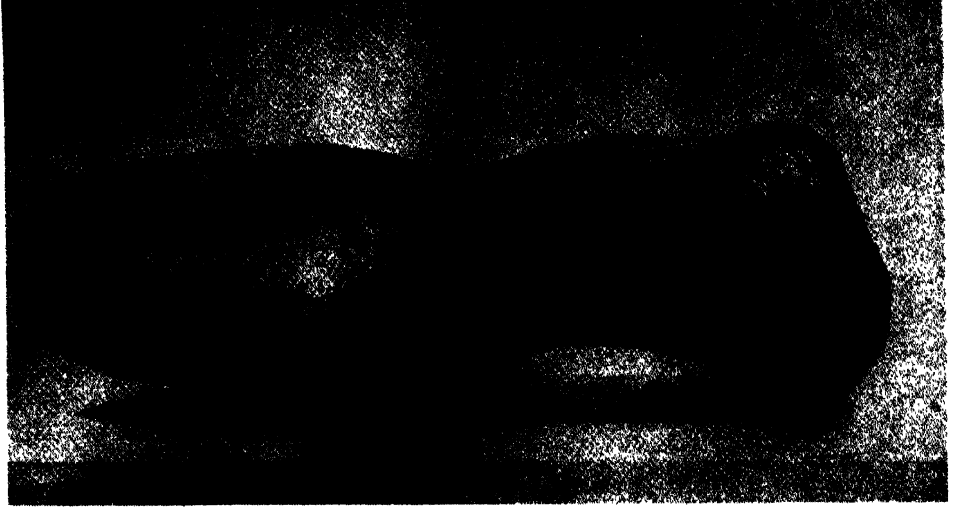
১৬০· হারাণচন্দ্র ঘোষ। ইনক্লাইনড টরসো। কাঠ।

যে বিশ্বের দরজা সেখান থেকে ইওরোপীয় আধুনিকতার সম্পূর্ণ সারাৎসার তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। ফলে রামকিঙ্কর যখন বিস্তীর্ণ শূন্যতার মধ্যে শুরু করলেন নিজের ভাস্কর্যের চর্চা, তখন স্বদেশ ও বিশ্বের এক সম্মিলন ঘটল তাঁর কাজে। কিন্তু নিজের ঐতিহ্যের প্রতি একটা আবেগই তাঁর শিল্প-নন্দনের কেন্দ্রীয় শক্তি।

সেই সঙ্গে একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক আবেগও তাঁর ছিল। এই আবেগকে বুঝতে আমরা আবার স্মরণ করতে পারি তাঁর 'হারভেস্টার' নামে ভাস্কর্যটির কথা। সেই যে ধান ঝাড়াই করছে এক গ্রামীণ নারী। আলম্ব দণ্ডায়মান তাঁর শরীরে মাথাটি দেখা যাচ্ছে না। ধানের মুঠিসহ উত্তোলিত হাতদুটি পেছন দিকে, যেন পরমুহূর্তেই আছড়ে পড়বে ধানের গুচ্ছ সামনের কোনো কঠিন পাদপীঠে। এই ভাস্কর্যটি পাঠিয়েছিলেন ১৯৫২-তে 'আননোন পলিটিক্যাল প্রিজনার' এই বিষয়ের উপর এক আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য প্রতিযোগিতায়। কেন 'হারভেস্টার'-কে এই বিষয়ের অন্তর্গত করে ভাবলেন তিনি, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন আমরা আরো একবার শুনে নিতে পারি তা। "যখন ওদিকে লড়াই চলছে বিয়াল্লিশের উত্তেজনায় গুলি চলছে। দুর্ভিক্ষ হল, তখন আসলে ভুক্তভোগী কারা? পোলিটিশিয়ানরা তো জেলে গিয়ে

২৪১

১৬১· মাধব ভট্টাচার্য। সিম্ফনি। ব্রোঞ্জ
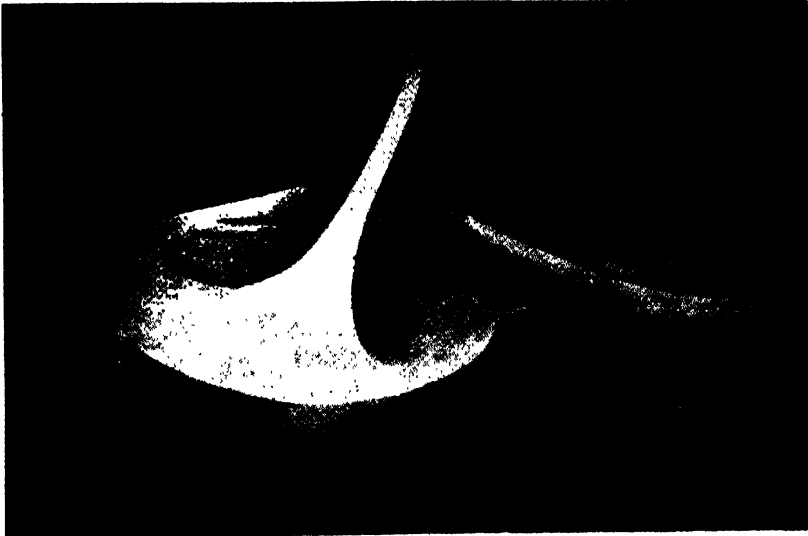
বসে আছেন। এই মাঠে কাজ করা কুলি-মজুররাই তো আসল প্রিজনার।" (সূত্র: শঙ্খ চৌধুরী, 'কিঙ্করদাকে যেমন দেখেছি'। 'রামকিঙ্কর' প্রকাশ দাস সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৮৪) এই দায়বদ্ধতাই রামকিঙ্করের শিল্পেরও উজ্জীবনের মন্ত্র, এটা বললে হয়তো ভুল হবে না।

প্রদোষ দাশগুপ্ত চেষ্টা করেছেন তাঁর ভাস্কর্যে ইওরোপকে স্বীকার করে এবং তাকে ছাড়িয়েও ভারতীয় চেতনাকে সঞ্জীবিত করতে। সেই নান্দনিকতা সমকালীন ভাস্কর্যে তাঁর বিশিষ্ট অবদান। তাঁর আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন আনছিলেন এক ধরণের স্বদেশ চেতনা, তেমনি বিষয়েও আসছিল চল্লিশ দশকের এক প্রতিবাদী আবহ। ১৯৪৩-এর 'ইন বন্ডেজ' বা ১৯৪৮-এর 'জয় হিন্দ' নামের ভাস্কর্য দুটি তাঁর দেশাত্মবোধদীপ্ত প্রতিবাদী চেতনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

৮৭
৯১

চিন্তামণি কর (১৯১৫) ও শঙ্খ চৌধুরী (১৯১৬) তাঁদের ভাস্কর্যে পাশ্চাত্য আধুনিকতার সঙ্গে কেমন করে ভারতীয় ভাস্কর্যের বোধকে মেলাতে প্রয়াসী হয়েছেন, সে কথাও আমরা তাঁদের উপর পূর্ববর্তী আলোচনায় বুঝতে চেষ্টা করেছি। ধনরাজ ভগত (১৯১৭) যেমন লৌকিক ভারতীয়তার কাছে দায়বদ্ধ থেকে ভাস্কর্যে আনতে চেয়েছেন সারল্যের চেতনা, তেমনি অমরনাথ সেহগাল-এর (১৯২২) ভাস্কর্যে রয়েছে দেশভাগ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিপন্নতার স্মৃতি।

সামাজিক ও নান্দনিক দায়বোধের প্রকাশে সমকালীন ভাস্কর্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণ ঘটিয়েছেন সোমনাথ হোর ও মীরা মুখার্জি। তাঁদের প্রকাশের স্বরূপও আমরা আগে আলোচনা করেছি।

এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে চল্লিশ দশকের সামগ্রিক দায়বোধ সাহিত্য ও শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে এক নতুন চেতনা এনেছিল, ভাস্কর্যেও তাই। এই দায়বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্রথম প্রজন্মের ভাস্কররা অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ভাস্কর্যের একটা বিশিষ্ট পাদপীঠ তৈরি করে দিতে পেরেছেন, যাকে আরো প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছেন দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্কররা।

কিন্তু এই দায়বোধের বাতাবরণটা প্রথম পর্বে অনুপস্থিত ছিল দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্করদের কাছে। প্রথম পর্বে জাতীয়তার থেকে আন্তর্জাতিকতাই তাঁদের আকর্ষণ করেছিল বেশি। কেননা আধুনিক ভাস্কর্যের ভাষা আয়ত্ত করতে পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে অনিবার্যভাবেই বুঝে নিতে হচ্ছিল তাঁদের। ভাস্কর্যের এই অন্তর্নিহিত ছন্দেই এত নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন অনেকে, ফর্মের স্বরাটত্ব থেকে তাঁরা আর বেরোতে চান নি বা পারেন নি। এটা দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্কর্যের একটা সমস্যা। সময় যে রূপাবয়ব গড়ে তোলে ঐতিহ্য ও দেশকাল চেতনাকে আত্মস্থ করে, রূপের সেই অনন্য অভিনবত্ব জেগে উঠেছে খুব কম ক্ষেত্রেই। তবু দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্কররা পূর্বসূরিদের অর্জিত রূপচেতনাকেই প্রসারিত করে যেভাবে বৈচিত্র্য ও গভীরতা এনেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন সংবিৎও যে অর্জন করেছেন, সেটাও কম অভিনিবেশের যোগ্য নয়।

তবু ভাস্কর্যের অগ্রগতি যে খুবই মন্থর তার কারণ আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতি। যে দেশে কিছু কিছু সীমিত ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতির সুউচ্চ শিখরের পাশাপাশি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জমে থাকে মধ্যযুগের অন্ধকার, যেখানে জীবনধারণের প্রাথমিক সমস্যাগুলো প্রকট হয়ে আছে এখনো, সেখানে শিল্পকলা এক বিলাসিতা মাত্র। দেশের সরকার বা সমাজ সংস্থার তাতে বিশেষ উৎসাহ নেই বা যেটুকু আছে তা খুবই সীমিত। ধনিকশ্রেণী ইদানীং যদিও একটু ছবির দিকে ঝুঁকেছে, কিন্তু ভাস্কর্যের প্রতি তাঁদের বিশেষ আগ্রহ নেই। ভাস্কর্য অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ, ব্যয়সাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ মাধ্যম। পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া তার বিকাশ কোনো যুগে কোনো দেশেই হয় নি।

এ সমস্ত সত্ত্বেও এখনো যে অনেক ভাস্কর ঝুঁকি নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাচ্ছেন, এটাই আমাদের অনুপ্রাণিত করে তাঁদের কাজকে একটু নিবিষ্টভাবে দেখতে।

সম্পূর্ণভাবে ভাস্কর্যই জীবন ও জীবিকা এরকম শিল্পী থাকলেও, তাঁদের সংখ্যা খুবই সীমিত। অধিকাংশ ভাস্করই অন্য কোনো পেশায় নিযুক্ত, কেবল অবসর সময়ে তাঁদের শিল্পে নিমগ্ন হতে পারেন। তাঁরা যে কাজ করেন তার খুব কমই ঠিক সময়ে বিক্রি হয়। ফলে একটি কাজের পর দ্বিতীয়টির জন্য তাঁদের অপেক্ষা করতে হয় আবার অর্থসংগ্রহ পর্যন্ত। এভাবে কাজ জমে জমে স্টুডিওতে ধুলিমলিন হয়ে পড়ে থাকে। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের ভাস্কররা কাজ করেন। তাঁরা অন্তত তাঁদের শিল্পের কাছে গভীর দায়বদ্ধ বলে তাঁদের স্টুডিওর মধ্যে এখনো আমরা খুঁজে পেতে পারি অসামান্য কিছু শিল্প-সম্ভার।

দুই

সূচনা

১৯৫১ সালে প্রদোষ দাশগুপ্ত কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভাস্কর্য বিভাগের অধ্যাপক হিশেবে যোগ দেন। এই ঘটনাটি দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বের খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে প্রদোষবাবুর নিজের কথা থেকেই। জীবনের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে তিনি লিখেছেন:

"১৯৫১ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত কলকাতা কলেজে আমার অধ্যাপনার সময় আমি ভাস্কর্য বিভাগকে একেবারে গোড়া থেকে সংগঠিত করেছিলাম এবং ছাত্রদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতে আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখিনি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি দেখলাম, আমার ছাত্রদের অনেকের মধ্যেই রয়েছে ভাস্কর্যের গুণাবলী বোঝার এবং নান্দনিক বোধ অনুযায়ী তাঁদের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া প্রকাশের বিরল ক্ষমতা। ১৯৫৫-র মধ্যে এই ভাস্কর্য বিভাগ সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করল এবং প্রায়ই অনেক ছাত্রের কাজ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। একই বছর কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনী সমালোচনা করতে গিয়ে স্টেটসম্যানের শিল্প-সমালোচক ভাস্কর্য বিভাগ সম্পর্কে উজ্জ্বল ভাষায় লিখলেন। তাঁর মতে—'প্রদোষ দাশগুপ্তের ছাত্রদের ভাস্কর্যের অসামান্য সম্ভারই প্রদর্শনীটিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ করেছে। এই সম্ভার আমার দেখা কলকাতার ভাস্কর্যের মধ্যে খুবই উল্লেখনীয় এবং বর্তমান সন্ধিক্ষণে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক দাশগুপ্ত তাঁর ছাত্রদের মধ্যে, মনে হয়, একটা নীরব বিপ্লব আনতে পেরেছেন।... ভবিষ্যতের জন্য আমরা বাস্তবিকই একটা ভাস্কর্যের নবজাগরণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।'" (বিড়লা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত 'তিন প্রজন্মের ভাস্কর্য' প্রদর্শনীর স্মারকপত্রের ভূমিকা। ইংরেজি থেকে অনূদিত।)

যে ভাস্কর্যের নবজাগরণ বা স্কাল্পচারাল রেনেসাঁসের কথা বলেছিলেন স্টেটসম্যানের সমালোচক কলকাতায় অনেকাংশে সেটা সফল হয়েছে, এটা আমরা এখন কিছুটা অনুভব করতে পারি। প্রদোষ দাশগুপ্তের শিক্ষকতার ছ-বছরে কলকাতার আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়েছেন বেশ কয়েকজন ভাস্কর যাঁরা ষাটের দশকে পরিণতিতে পৌঁছে সম্প্রতি পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছেন বাইরের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও।

১৬২. শঙ্কর ঘোষ। টরসো। ব্রোঞ্জ।
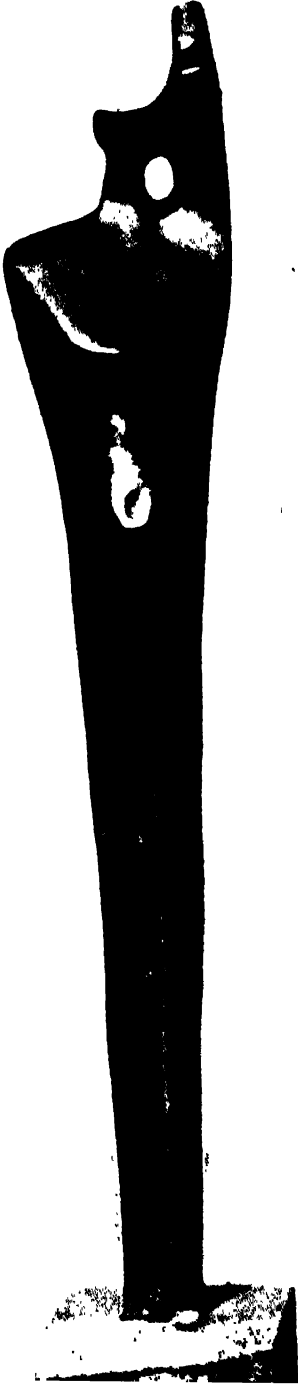
১৬৩· গিরিশ ভাট। ফাদার অ্যান্ড সান। ব্রোঞ্জ। ১৯৬৪।

১৬৪· রজনীকান্ত পাঞ্চাল। ফ্রিডম। ব্রোঞ্জের জন্য প্লাস্টার।

১৬৫. গোটকুমার / বিশ্ব গণপতি / ব্রাস

সৌভাগ্যক্রমে প্রদোষ দাশগুপ্তের মৃত্যুর কয়েক মাস আগে কলকাতার বিড়লা অ্যাকাডেমি 'তিন প্রজন্মের ভাস্কর্য' নামে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১-এর ৬ থেকে ২১ এপ্রিল। এতে প্রদোষ দাশগুপ্তের নিজের, তাঁর ছাত্রদের এবং সেই ছাত্রদের কাছে শিখেছেন যাঁরা সেই সব তরুণদের ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়। প্রদোষ দাশগুপ্তের ছাত্রদের অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রজন্মের যে সব ভাস্করের কাজ ছিল সেই প্রদর্শনীতে তাঁদের অনেকের কাজই সচরাচর আমাদের দেখার সুযোগ হয় না। এই প্রদর্শনীর ফলে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্কর্যের একটা অংশ সম্পর্কে সামগ্রিক একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল দর্শকের মনে। আমরা এখানে এই প্রদর্শনীর অন্তর্গত দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্করদের কাজ সম্পর্কে প্রথমে একটু আলোচনা করে নেব। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের কাজ পরে আবার আমরা বিস্তৃতভাবে দেখব। এই প্রদর্শনী থেকে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্কর্যের একটা রূপরেখা উঠে আসে।

এই প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্করদের মধ্যে প্রবীণতম ছিলেন হারাণচন্দ্র ঘোষ। তাঁর জন্ম ১৯২৭। দুটি কাজ ছিল তাঁর। একটি কাঠের। নাম 'ইনক্লাইনড টোরসো'। আয়তন ৯০ X ৩০ সেমি। সিলিন্ড্রিক্যাল বা বেলনাকার একটি কাঠের বা বৃক্ষের দীর্ঘায়ত গোলাকার চরিত্র সম্পূর্ণ বজায় রেখে তার থেকে খুব সামান্য অংশ কেটে আনা হয়েছে আনুভূমিক শায়িতা এক নারীর দেহমূলের আদল। বৃক্ষের বৃক্ষত্ব বজায় রেখেও তাকে যে মানবীর চরিত্রে অভিষিক্ত করা এবং একটা ধ্রুপদী সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ ঘটানো তার শরীরে, এই সফলতা এই কাজটির বৈশিষ্ট্য। এর পাশাপাশি ওই প্রদর্শনীতেই দেখা প্রদোষ দাশগুপ্তের একটি কাজের যদি তুলনা করি তাহলে দুই প্রজন্মের ব্যবধানের খানিকটা আভাস হয়তো আমরা পেতে পারব। ১৬০

প্রদোষ দাশগুপ্তের 'আনফোল্ডিং অব স্প্রিং' শীর্ষক ব্রোঞ্জের কাজটি ১৯৭৯-তে করা। ৩০ সেমি দৈর্ঘ্যের এই কাজটিতে এক শায়িতা নারীমূর্তির আদল। এখানে আয়তনময় বিন্যাসে অনেকটা অতিশায়িত করা বা কোথাও অনেকটা সংক্ষিপ্তকরণের মধ্যেও শরীরের স্বাভাবিক রূপটি ধরা থাকে। শরীরের ছন্দিত বিন্যাসের মধ্য দিয়েই এখানে একটা ভাব বা আইডিয়ায় পৌঁছানো। হারাণচন্দ্র ঘোষের কাজটিতে আমরা দেখি বিমূর্তায়নের প্রাধান্য। শরীরের সৌন্দর্যের বিমূর্ততাকে এখানে কাঠের চরিত্রে আরোপ করা হচ্ছে। মাধ্যমের পার্থক্যের জন্য প্রকাশের খানিকটা পার্থক্য আসা স্বাভাবিক। এ সত্ত্বেও বিমূর্ততার দিকে একটা ঝোঁক যে ষাটের দশকের শিল্পীদের মধ্যে আসছিল, সেটাই বোঝা যায় এই দুটি কাজ পাশাপাশি দেখলে। ১০১

হারাণচন্দ্র ঘোষের দ্বিতীয় কাজটির নাম ছিল 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড'। সিমেন্টে করা আয়তনময় এই কাজটিতে মূর্ততা ও বিমূর্ততার সহাবস্থান ঘটেছে।

গোটকুমার (১৯৩২) 'বিশ্ব গণপতি' ও 'গোপাল গণপতি' নামে ব্রাস বা পেতলের কাজ দুটিতে গণেশের অবয়বকে যেভাবে সুষম জ্যামিতিকতায় বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তাঁর ঈশ্বর-বোধ বা আস্তিকতার পরিচয় যেমন রয়েছে তেমনি ১৬৫

ভারতীয় ভাস্কর্যের সংহতি ও আধুনিকতার ফর্ম-চেতনা এই দুইয়ের সমন্বয় অনুভব করা যায়। ভাস্কর্যে গণেশই তাঁর প্রধান বিষয় এবং এই বিষয়ের উপর তিনি নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন।

সুবলচন্দ্র সাহার (১৯৩৩) 'ভিকটিম-১' শীর্ষক টেরাকোটার কাজটিতে ছিল অভিব্যক্তিময় এক নারী মুখের রূপায়ণ, এবং সিমেন্টের 'ভিকটিম-২' একটি পাখির উপস্থাপনা। দুটি প্রতিমাকল্পেই ধরা পড়েছে সময়-সঞ্জাত অস্তিত্বের বিপন্নতা।

রণেন দত্তের (১৯৩৩) 'দ্য অ্যাপেল' নামের ব্রোঞ্জের কাজটিতে একটি অঙ্কুরিত ফলের রূপকল্প। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত জীবন্ময়তাকে ধরার চেষ্টা করেছেন শিল্পী।

শঙ্কর ঘোষ (১৯৩৪) 'রিক্লাইনিং' ও 'টোরসো' নামের দুটি কাজে নারী অবয়বের অন্তর্নিহিত ছন্দকে তীক্ষ্ণ জ্যামিতিক কৌণিকতায় বিশ্লেষণ করে এক বিপন্ন সংক্ষুব্ধতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন পরিশীলিত নান্দনিক বৈভবে।

'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড' নামে একটি টেরাকোটা ও একটি কাঠের কাজে সমরেশ চৌধুরী (১৯৩৪) রূপের সরলতায় মাতৃত্বের শাশ্বত সুষমাকে ধরেছেন।

সুভাষ রায় (১৯৩৫) 'মাদার ১ ও ২' নামে কাঠের দুটি কাজের একটিতে ইলিপস্ বা উপবৃত্তাকার রূপাবয়বকে আয়তন ও শূন্যতায় বিভাজিত করে যেভাবে দণ্ডায়মান এক নারীর আদলের আভাস রেখে তাকে সারল্যময় বিমূর্ততার দিকে নিয়ে গেছেন, তা শিল্পশুদ্ধির নিবিড়তায় সমৃদ্ধ।

উপরোক্ত শিল্পীরা ছাড়াও এই প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্করদের মধ্যে ছিলেন অজিত চক্রবর্তী (১৯৩০), উমা সিদ্ধান্ত (১৯৩৩), মাধব ভট্টাচার্য (১৯৩৩), রঘুনাথ সিংহ (১৯৩৩), শর্বরী রায়চৌধুরী (১৯৩৩), বিপিন গোস্বামী (১৯৩৪), মানিক তালুকদার (১৯৪৪) ও বিশ্বভারতী ও বরোদার ছাত্র অন্ধ্র প্রদেশ নিবাসী উমাশঙ্কর (১৯৪৫)। শেষোক্ত দুজন অবশ্য প্রদোষ দাশগুপ্তের ছাত্র নন। তাঁরই ছাত্রদের কেউ তাঁদের শিক্ষক। তবু তাঁদের উল্লেখ করা হল কেননা এখানে আমরা ১৯৪৭-এর আগে জন্ম এরকম ভাস্করদের প্রসঙ্গই আলোচনা করব। এই শিল্পীদের সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তৃতভাবে আলোকপাতের চেষ্টা করব। 'তিন প্রজন্মের ভাস্কর্য' প্রদর্শনীটি কলকাতায় দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্কর্যের উপর ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছে। এজন্য এর উল্লেখ হয়তো অযৌক্তিক হয় নি।

১৯৫৬-তে ইওরোপ থেকে কলকাতায় ফিরে এসে চিন্তামণি কর কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হিশেবে যোগ দেন। ১৯৭৩ পর্যন্ত তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময় তাঁর কাছে শিখে পরবর্তীকালে খ্যাতিমান হয়েছেন অনেক ভাস্কর। কলকাতায় তাঁরই নেতৃত্বে তাঁর ছাত্রদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল শুধুই ভাস্করদের যৌথ সংগঠন 'স্কাল্পটর্স গিল্ড, ক্যালকাটা'। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যে সব ভাস্কর, তাদের মধ্যে রয়েছেন—চিন্তামণি কর নিজে ছাড়া দেবব্রত চক্রবর্তী, অনিট ঘোষ, মধুসূদন চক্রবর্তী, যুগলচন্দ্র পাল, নিরঞ্জন প্রধান, বিমান দাস, দিলীপ সাহা, সঞ্জয় দাস, মধুসূদন চ্যাটার্জি, অশেষ মিত্র, সুরজিৎ দাস, বিকাশ দেবনাথ ও করবী ঘোষ। আমরা জানি তাঁদের প্রায় সকলেই ষাট ও সত্তর দশকে ভাস্কর হিশেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এই গিল্ড সম্পর্কে আমরা আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি চিন্তামণি করের উপর পূর্ববর্তী আলোচনায়।

শান্তিনিকেতনে কলাভবন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে রামকিঙ্করের অধীনে শিখে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছেন অজস্র ভাস্কর। রামকিঙ্করের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বে সমকালীন ভাস্কর্যে প্রভাব বিস্তার করেছেন শঙ্খ চৌধুরী (১৯১৬) ও প্রভাস সেন (১৯১৯)। শঙ্খ চৌধুরী পরে বরোদায় শিক্ষকতার সূত্রে অনেক ভাস্করকে অনুপ্রাণিত করেছেন। দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্করদের মধ্যে রামকিঙ্করের কাছে বা কলাভবনে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন আসামের শোভা ব্রহ্ম (১৯৩০), দিল্লির মেথারাম ধর্মানি (১৯৩১) গোয়ালিয়রের মদন ভাটনগর (১৯৩১), দিল্লির বলবীর সিং কাট (১৯৪১)—ইনি পরে বরোদায়ও শিখেছেন, ত্রিপুরার বিপুলকান্তি সাহা (১৯৪৪)—ইনিও পরে বরোদায় শঙ্খ চৌধুরীর অধীনে শিখেছেন, অন্ধ্র প্রদেশের উমাশঙ্কর (১৯৪৫), কলকাতার তারক গড়াই (১৯৪৬)-এর মতো আরো অনেক ভাস্কর।

পশ্চিম ভারতে বম্বের জে জে স্কুল অব আর্টস-এ ভাস্কর্য শিক্ষার একটা ধারা ছিল। প্রথম দিকে অ্যাকাডেমিক রীতি ও পরে আধুনিকতাকে আত্মস্থ করে তা সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম ভারতে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্কর্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে বরোদার শিক্ষাধারা। বরোদার এম এস ইউনিভার্সিটির অধীনে ফাইন আর্টস কলেজ
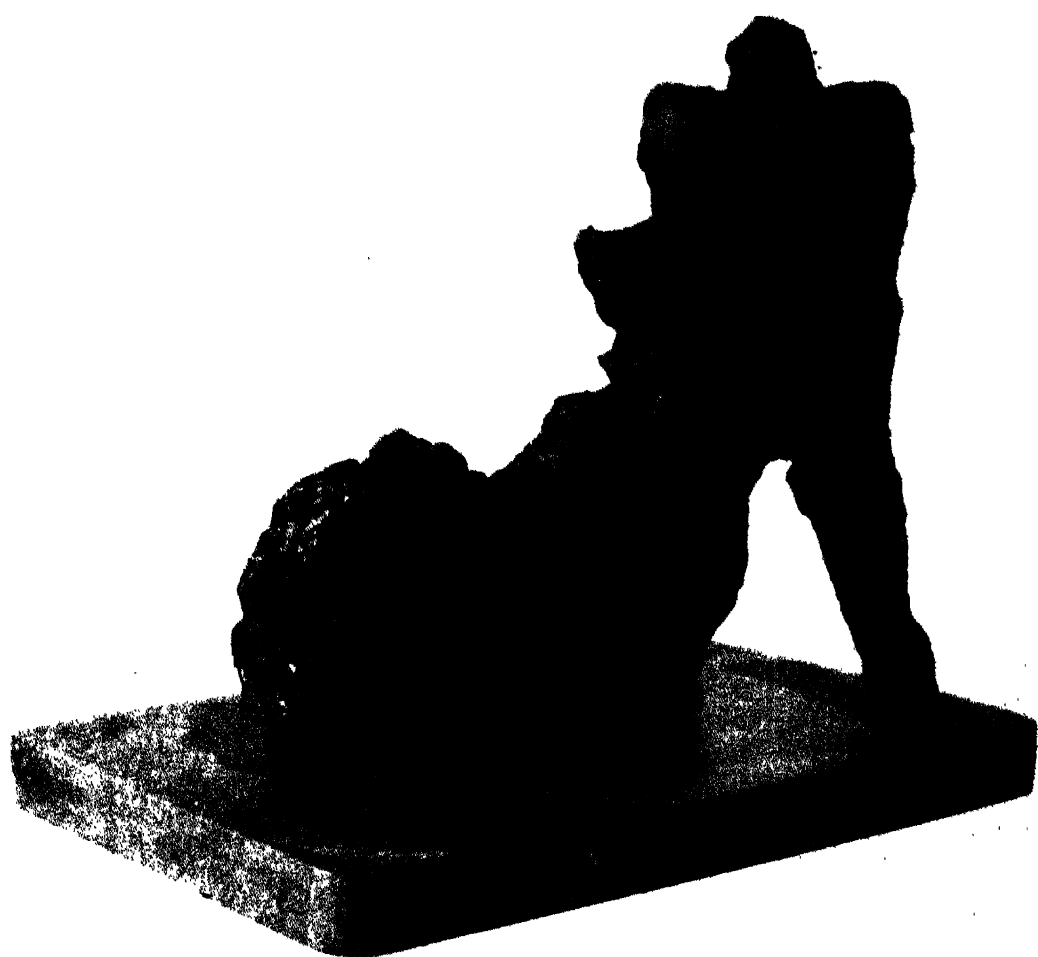
রঙিন ছবি ১৮· রাঘব কানেরিয়া। টরসো। ব্রোঞ্জ।

রঙিন ছবি ১৯· বিমান দাস। নায়িকা। ব্রোঞ্জ।

প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫০-এ। এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে রতন পরিমু লিখেছেন, এই প্রতিষ্ঠান শুরুর আগে আমাদের আর্ট স্কুলগুলোতে দু-ধরণের শিল্প শিক্ষা ছিল, একটি ছিল ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক রীতির অনুসরণ, অন্যটি তথাকথিত ট্র্যাডিশনাল। বরোদাই প্রথম এই দুই রীতির বাইরে গিয়ে আধুনিকতার প্রয়োজন অনুযায়ী রূপরীতির চর্চা শুরু করল। (রতন পরিমু: বরোদা পেইন্টার্স অ্যান্ড স্কাল্পটর্স। ললিতকলা কন্টেম্পোরারি-৪, পৃষ্ঠা ১৩) এরকম উক্তিতে বিতর্কের সূত্র থাকলেও একথা ঠিকই যে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বরোদায় নতুন হাওয়া বইয়েছিলেন শঙ্খ চৌধুরী। ১৯৫০-এ তিনি বরোদায় ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান হিশেবে যোগ দেন। তাঁর নিষ্ঠা ও উৎসাহে অনেক ছাত্র সেখানে কাজে উদ্বুদ্ধ হন। রামকিঙ্কর ও শান্তিনিকেতনের প্রেরণা ছিল তাঁর মধ্যে। সেই প্রেরণাকেই তিনি উৎসারিত করলেন বরোদায়।

পাথর কাটা ও ধাতু ভাস্কর্য দুটোতেই সেখানে নতুন গতি সঞ্চার করেছেন শঙ্খ চৌধুরী। রাজস্থানের মাকরানার মার্বল পাথরের কেন্দ্রে গিয়ে পরম্পরাগত প্রস্তর খোদাই রীতি তিনি শিখিয়েছেন। রূপের অতিরেকহীন নির্ভারতার দিকে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তাঁর ছাত্ররা। বরোদার ছাত্রদের মধ্যে এখন বিখ্যাত—গিরিশ ভাট (১৯৩১), নাগজি প্যাটেল (১৯৩৭), রমেশ পাটেরিয়া (১৯৩৮), বিদ্যারত্তম খাজুরিয়া (১৯৩৪), বলবীর সিং কাট (১৯৪১), রাঘব কানেরিয়া, রজনীকান্ত পাঞ্চাল (১৯৩৭), একটু পূর্ববর্তী প্রজন্মের রমেশ পাণ্ড্য (১৯২৬), আবার তরুণতর প্রজন্মের জনক ঝনক নারজারি, ললিত গুপ্ত, লতিকা কাট, দীপক কান্নাল, গোফরান কিদওয়াই, রামনিক কানেরিয়া, ধ্রুব মিস্ত্রী প্রমুখ ভাস্কর।

উত্তর ভারতে দিল্লি, লখনৌ, বেনারস, ইত্যাদি অনেকগুলি কেন্দ্রেই ভাস্কর্য শিক্ষার সুযোগ ছিল। উত্তর ভারতে ষাট ও সত্তর দশকে প্রতিষ্ঠিত ভাস্করদের মধ্যে রয়েছেন বেনারসের কে ভি জেনা (১৯৩০), দিল্লির মেথারাম ধর্মানি (১৯৩১), আনন্দ দেব (১৯৩৩), এস এস ভোরা (১৯৩৩), বেদ নায়ার (১৯৩৩), লখনৌর এস জি শ্রীখণ্ডে (১৯৩৪), অমৃতসরের অবতার সিং (১৯৩৪), বেনারসের প্রতাপ সিং দীনেশ (১৯৩৭), চণ্ডিগড়ের শিব সিং (১৯৩৮), দিল্লির এস আর ভূষণ (১৯০৮), বর্তমানে পশ্চিম জার্মানি নিবাসী ইউনগো (১৯৩৮), দিল্লির বিমান দাস (১৯৪৩)—তিনি অবশ্য কলকাতায় চিন্তামণি করের ছাত্র ছিলেন, রমেশ বিস্ত (১৯৪৫), অমিতাভ ভৌমিক (১৯৪৭) ও লখনৌর প্রতাপকুমার স্যাক্সেনা (১৯৪৭) প্রমুখ।

দক্ষিণ ভারতে ভাস্কর্য শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল মাদ্রাজের গভর্নমেন্ট স্কুল বা কলেজ অব আর্টস। এখানে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর অধীনে যে ভাস্কর্য-শিক্ষার সূচনা হয়, তাতে প্রথম প্রজন্মের প্রদোষ দাশগুপ্ত যেমন তৈরি হয়েছেন তেমনি দ্বিতীয় প্রজন্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাস্করও তৈরি হয়েছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় পি ভি জানকিরাম (১৯৩০) ও ফুলচাঁদ পাইনের (১৯৩৩) নাম। দেবীপ্রসাদ ছাড়াও তাঁদের সময় ছিলেন পানিক্কর উপাধ্যক্ষ হিশেবে। পানিক্কর মূলত চিত্রকর কিন্তু ভাস্কর্যের ছাত্রদেরও তিনি আধুনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেন। ফুলচাঁদ পাইন তাঁর কাছ থেকে অনেক উপকৃত হয়েছেন।

১৯৬৫-তে মাদ্রাজের কাছে চোলমণ্ডলে কিছু শিল্পীর নিজেদের চেষ্টায় চোলমণ্ডল আর্টিস্টস ভিলেজ গড়ে ওঠে। সেখানকার সদস্য শিল্পীদের মধ্যে ধাতব পাতের ভাস্কর্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন—পি এস নন্দন (১৯৪০), অনিলা জ্যাকব (১৯৪১), এস পরমশিবম (১৯৪২) ও এস নন্দগোপাল (১৯৪৬)।

উপরোক্ত ভাস্কররা ছাড়া দক্ষিণ ভারতে ষাট ও সত্তর দশকের প্রতিষ্ঠিত ভাস্করদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এম রেডাপ্পা নাইডু (১৯৩২), এস মুরুগেসান (১৯৩৩), কানাই কুনহিরামন (১৯৩৭), বালান নামবিয়ার (১৯৩৭), সি দক্ষিণমূর্তি (১৯৪৩), বালসান কোল্লোরি, টি বিজয়ভেলু, এম ভি কৃষ্ণাণ প্রমুখ।

ভারতবর্ষে ভাস্কর্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিল প্রথম প্রজন্মের ভাস্করদের কাজের মধ্য দিয়ে। তাঁরাই তাঁদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে সেই আধুনিকতা সঞ্চারিত করেছিলেন দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্করদের মধ্যে। সূচনার মূল উৎসটা ছিল কলকাতা ও শান্তিনিকেতন। সেখান থেকেই সেটা বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রথম প্রজন্ম থেকে দ্বিতীয় প্রজন্মে বিস্তারটা কি করে হল তারই একটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা গেল এই অংশে।

পরবর্তী অংশে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ভাস্করের কাজের স্বরূপ ও বিবর্তন বোঝার চেষ্টা করব যাতে এই সময়ের ভাস্কর্যের মূল প্রবণতাগুলি ধরা যায়। দুটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে এই আলোচনা। প্রথম অংশে ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠা যাঁদের অর্থাৎ ১৯৩০ থেকে ৪০-এর মধ্যে জন্ম। দ্বিতীয় অংশে সত্তর দশকে প্রতিষ্ঠা যাঁদের অর্থাৎ ১৯৪০ থেকে ৪৭-এর মধ্যে জন্ম।

তিন

ষাটের দশক

উভয়েই দৃশ্যতার শিল্পরূপ হলেও ছবি ও ভাস্কর্যের মধ্যে নান্দনিক ব্যবধান এতই সুদূর যে দুইয়ের কোনো তুলনা চলে না। তবু যে চিত্র-ভাস্কর্য কথাটি সমস্বরে পাশাপাশি উচ্চারিত হয়, তা হয়তো তাদের কালগত না হয়ে শুধু দেশগত (Spatial) বিন্যাসের ঐক্যসূত্রে। ছবি দ্বিমাত্রিক, কিন্তু তাতে ত্রিমাত্রার বিভ্রম আনা যায়। আবার রেখা ও বর্ণক্রমের বিস্তারে তাতে প্রকাশ করা যায় বোধের অনেকগুলি তল বা মাত্রা। ফলে প্রকাশের বহুমুখিনতা আসতে পারে তাতে। ধরা যেতে পারে জীবনের নানা দিক, নানা ব্যঞ্জনা। ভাস্কর্য ত্রিমাত্রিক বলে তাতে কোনো বিভ্রমের সুযোগ নেই। সেখানে সবটাই স্পষ্ট, স্পর্শনীয়। অমোঘ এক রূপাবয়বী ঐক্যবোধের মধ্য দিয়ে ভাস্করকে পৌঁছে দিতে হয় বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায়। অতিকথনের সুযোগ নেই। ফর্মের অনন্য অভিনবত্ব না আনতে পারলে কোনো ভাবই সঞ্চারিত হয় না তার মধ্যে। তাই ভাস্কর্য বড় কঠিন মাধ্যম। কিন্তু খুবই বিশুদ্ধ। রূপের শুদ্ধতাকে ভাবের ব্যঞ্জনায় নিয়ে যাওয়া সেখানে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্যই সব ভাস্করকে প্রথমে শুদ্ধ রূপের সাধনা করতে হয়।

কেউ কেউ তাই শুধুই ফর্মের গহনে আটকে যান। তাকে উত্তীর্ণ হয়ে নিজের অন্তঃস্বরূপকে ধরতে পারেন না। ভাস্কর্যের এই এক সমস্যা। ষাটের দশকের ভাস্কররা নানাভাবে চেষ্টা করেছেন এই সমস্যাকে উত্তীর্ণ হতে। ছবির প্রবাহকে যেমন আমরা বাস্তবতা ও নান্দনিকতার নিরিখে ভাগ করে নিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে পারি, ভাস্কর্যে সেরকম

১৬৬· দেবব্রত চক্রবর্তী। স্প্রিং। ব্রোঞ্জ। ১৯৮৮।

১৬৭· কে কুনহিরামন। স্ট্যান্ডিং ফিগার। কংক্রিট।
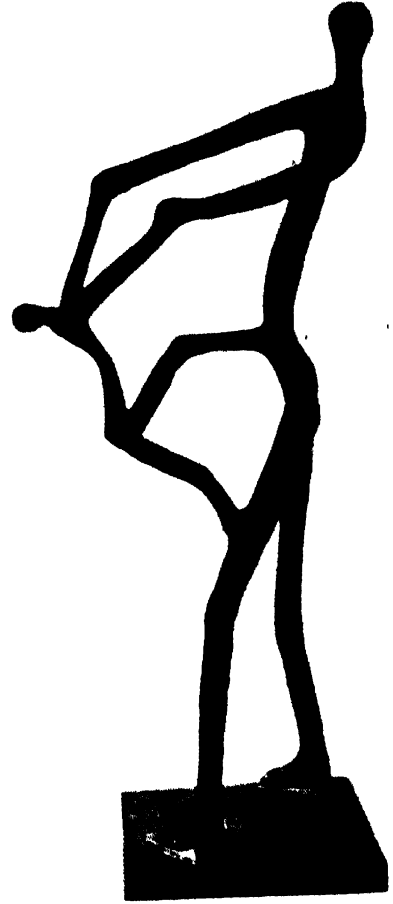
১৬৮· উমা সিদ্ধান্ত। মাদার অ্যান্ড চাইল্ড। ব্রোঞ্জ। ১৯৫৫।

বিভাগ সম্ভব নয়। ষাটের দশকের ছবিতে যেমন জোর পড়ছিল সমাজ চেতনা ও বাস্তব চেতনার উপর আর সেটাই নিয়ন্ত্রিত করছিল ছবির রূপাবয়বকে, ভাস্কর্যে সেরকম নয়। সেখানে যাত্রাটা শুরু হয়েছিল আন্তর্জাতিকতা থেকে, ধীরে ধীরে পৌঁছনোর চেষ্টা চলছিল জাতীয়তায়, আত্মস্বরূপের কাছে। বড় কঠিন সে যাত্রা।

এই যে আন্তর্জাতিক আধুনিকতার ভাষা তা তো সময়েরই সারাৎসার মথিত করে উঠে আসা। কিন্তু সেই সময় তো সর্বাংশে আমাদের সময় নয়। তাকে ভাঙতে ভাঙতে আমাদের সময়ের দিকে নিয়ে আসা এই ছিল ভাস্করদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। ভাস্কর্যে আমাদের সফলতার নিরিখ হতে পারে সেটাই। কতকগুলি সাধারণ প্রবণতা লক্ষ করা যায় এর মধ্যে, যেমন শাশ্বত এক ধ্রুপদী চেতনার সন্ধান, ফর্মের আধুনিকতাকে ভারতীয়তায় সঞ্জীবিত করার প্রয়াস, সমাজ চেতনার দিকে আসার চেষ্টা ও শুধুই বিমূর্ত ফর্মের সাধনা। কয়েকজন শিল্পীর কাজের মধ্যে এই প্রবণতাগুলোই বোঝার চেষ্টা করব আমরা।

অজিত চক্রবর্তী (১৯৩০) একাধারে চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। চিত্রকলায় তিনি অনেক সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত। সাবলীল আবেগকে স্নিগ্ধতায় রূপ দেন। কিন্তু তাঁর ভাস্কর্যে আবেগের থেকে বেশি প্রাধান্য পায় বুদ্ধিদীপ্ত বা মেধাপ্রসূত মননশীলতা। তাঁর নিজের কথায় "ইন স্কাল্পচার, আই ফিল ইনক্লাইনড টু দ্য আনএনডিং কোয়েস্ট অব থ্রি ডাইমেনশনাল ট্যাকটিলিটি ইন অর্ডার টু এনসিওর দ্য ইমপ্যাক্ট অব ফর্মস।" (আলবাম—সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস ১৯৬০-১৯৯১) রূপাবয়বকে গুরুত্ব দিয়ে ত্রিমাত্রিক স্পর্শগ্রাহ্যতার অভিনবত্বে পৌঁছতে চান তিনি।

প্রদোষ দাশগুপ্ত তাঁর ভাস্কর্যের শিক্ষক। কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বের হন ১৯৫৪-তে। ১৯৫৮-তে চেকোস্লোভাকিয়ায় যান। প্রাগে অধ্যাপক ইয়ান কাভান-এর কাছে তিন বছর শেখেন। কাভান ইয়ান স্তুরা-র ছাত্র। ইয়ান স্তুরা কাজ করেছেন রদাঁ ও মাইঅল-এর অধীনে। শিক্ষাসূত্রে অজিত চক্রবর্তী অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকারের সঙ্গে যুক্ত। অ্যাকাডেমিক রিয়ালিজমে তাঁর ভিত খুব শক্ত। ফলে ফর্ম ভেঙে অভিব্যক্তির প্রখরতার দিকে যেতে পারেন সহজেই। ন্যাশনাল গ্যালারিতে রয়েছে তাঁর যে কাজটি ব্রোঞ্জের 'পোর্ট্রেট অব অ্যান আর্টিস্ট' ১৯৬২-তে করা, তাতে অনুভব করা যায় এই শক্তির পরিচয়।

১৬৯· উমা সিদ্ধান্ত। মর্টালিটি অ্যান্ড ইটারনিটি। টেরাকোটা। ১৯৮৬।

এর পাশাপাশি তাঁর নিজস্বতা গড়ে উঠেছে প্রকৃতি বা কখনো কখনো পুরাণকল্প থেকে বিমূর্তায়িত রচনায়, যেখানে বিষয়ের অন্তস্থ কেন্দ্র থেকে শক্তি স্ফুরিত হয়ে অবয়বকে সংহত করে তোলে। তিনি নিজে বলেছেন আমাদের মন্দির ভাস্কর্য এবং আদিম ও উপজাতীয় মানুষের শিল্পের সারল্য ও সংহতির অভিঘাত থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন। (জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারি প্রকাশিত ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার টুডে ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৪৩)। ১৯৮৩-তে বম্বের জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়েছিল 'হিরো উইথ স্পিয়ার' নামে কাঠের একটি কাজ। দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকের রূপায়ণে এখানে যে বিশদবর্জিত সারল্য, তা তাঁর ছবির সাবলীলতাকে মনে পড়ায়। বাইরে স্ফুরিত অন্তস্থ শক্তির সংহতিতে উজ্জ্বল ভাস্কর্যের দৃষ্টান্ত—ব্রোঞ্জের 'হোলি অ্যাভিয়েশন অব গড়ুর', এবনি কাঠের 'বনসাই', ১৯৬৯-এর কাঠের 'সেলেইমোলেটো', ১৯৭১-এর কাঠের 'টোরসো', ১৯৭৩-এর টেরাকোটার 'চার্ন-হুইল' ১৯৭৪-এর ব্রোঞ্জে 'ম্যান দ্য টেবিবল'।

১৫৭

১৭০· পি ভি জানকিরাম। ঈগল। তামার পাতা। ১৯৬৮-৬৯।

আসামের শোভা ব্রহ্ম (১৯৩০) আদিম ও উপজাতীয় শিল্পের শক্তিকে নিজের কাঠের ভাস্কর্যে রূপায়িত করে ভারতীয় চেতনার উৎসারণ ঘটাতে চেষ্টা করেছেন। সেদিক থেকে শোভা ব্রহ্ম সমকালীন ভাস্কর্যের এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী।

মাদ্রাজের পি ভি জানকিরাম (১৯৩০) সম্পর্কে আমরা গোড়ায় একটু আলোচনা করেছি। একটা পর্যায়ে তাঁর কাজ ছিল পাশ্চাত্য আধুনিকতার রূপানুসারী। তারপর তিনি দক্ষিণ-ভারতীয় লৌকিক শিল্পের অনুসরণে ঐতিহ্যাশ্রিত রূপবন্ধের সন্ধানে ব্যাপৃত হন। অলঙ্করণবাহুল্যের জন্য তাঁর কোনো কোনো কাজে আধুনিকতার সংঘাত অনুভূত না ১৭০ হলেও অনেক কাজেই অ-ইওরোপীয় উৎসের কারণে ভারতীয় রূপবোধের কেন্দ্রটির সন্ধান খুবই তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। প্যাঁচাকে বিষয় করে তাঁর কতকগুলো ধাতব কাজ শিল্পশুদ্ধির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছাত্র ছিলেন ফুলচাঁদ পাইন (১৯৩৩)। মাদ্রাজ যাওয়ার আগে তিনি কলকাতায় ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিখেছিলেন। তখন অল্প কিছুদিনের জন্য অজিত চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর শিক্ষক। দেবীপ্রসাদের কাছে তিনি যেমন অ্যাকাডেমিক রিয়ালিজম শিখেছেন, তেমনি মাদ্রাজ আর্ট কলেজে পানিক্কর তাঁকে আধুনিকতার দিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রথম দিকে রিয়ালিজমের চূড়ান্ত সফল কাজ তিনি করেছেন। কিন্তু এই রিয়ালিজমকে অতিক্রম করে কেমন করে তিনি অভিব্যক্তির আধুনিকতায় পৌঁছলেন তার পরিচয় রয়েছে ১৯৬০-৬১-র 'দ্য ফেস' নামে একটি ব্রোঞ্জে। সেখানে একটি পুরুষের মুখের প্রফাইলকে যেভাবে তিনি রেখা ও আয়তনের কৌণিক তীক্ষ্ণতা ও শূন্যতার সমন্বয়ে ধরেছিলেন তা খুবই আকর্ষণীয়।

এই কাজটি দেখানো হয়েছিল ১৯৮৬-তে লন্ডনের কমনওয়েলথ ইনস্টিট্যুটে 'ট্রেন্ডস ইন বেঙ্গল আর্ট' শীর্ষক এক প্রদর্শনীতে। সেই প্রদর্শনীর স্মারক পুস্তিকায় তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছিল "অ্যাকর্ডিং টু হিম, থট ইজ ইররিলেভেন্ট ইন স্কাল্পচার। ইট ইজ ওনলি অ্যাকিউরেসি অব টেকনিক দ্যাট ইজ প্রাইমারিলি ইমপর্টেন্ট।" ফুলচাঁদ পাইনের কাজে কিন্তু চিন্তা বা মননশীলতার অভাব আছে বলে মনে হয় না। বরং তাঁর কাজে ক্রমান্বয়ে এক দর্শন চেতনার উন্মীলন ঘটেছে। সিমেন্টের কাজে যেভাবে তিনি স্ফুরিত আয়তনকে প্রাধান্য দেন, বা কাঠের কাজে যেভাবে আনেন তলের সংযোগে রেখার বিন্যাস তাতে আধুনিক রূপাবয়বেও ভারতীয় ভাস্কর্যের নান্দনিক কেন্দ্রটির সন্ধান আছে।

প্যাঁচা তাঁর একটি প্রিয় বিষয়। নানাভাবে নানা বিন্যাসে তিনি প্যাঁচাকে রূপ দিয়েছেন ভাস্কর্যে। সেই আয়তনময়তায় ৫২ যেমন অন্ধকারের এক সংহত প্রতীক তিনি খোঁজেন তেমনি সন্ধান চলে ধ্রুপদী ভারতীয়তার। সম্প্রতি শারীরিক ৫৩ প্রতিবন্ধকতার জন্য তিনি করছেন শুধু তার দিয়ে ভাস্কর্য। সেখানেও পাখি বা বাউল ইত্যাদি যে কোনো বিষয় রূপায়ণে প্রাধান্য পায় আয়তনের পূর্ণতা। সরু তারের সংযোগের মধ্যবর্তী শূন্যতা যেন আয়তনে স্পন্দিত হয়ে ওঠে।

কে জি সুব্রামনিয়ন লিখেছিলেন ১৯৮৩-তে শর্বরী রায়চৌধুরীর (১৯৩৩) ভাস্কর্য সম্পর্কে যে তাঁর কাজ আছে দুরকম। খুব উন্নত প্রকাশক্ষম মুখাবয়ব যেখানে তিনি ধরেন সংগীত-নিমগ্ন তানে ঝংকৃত বড়ে গোলাম আলি, আলি আকবর খাঁ বা কেশরবাঈ-এর মতো ব্যক্তিত্বকে; আর একরকম যেগুলো শুরু হয় 'নন-অবজেকটিভ অবজেক্ট' হিশেবে, তারপর ধীরে ধীরে কোনো একটা রূপাবয়বের দিকে যেতে থাকে। (জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারি প্রকাশিত ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার টুডে ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৪৯)। শর্বরী রায়চৌধুরী নিজে বলেছেন, 'স্কাল্পচার, পেইনটিং সব জায়গাতেই মিউজিক আছে। ১৫৪ ইলোরাতে নটরাজ দেখে পাগল হয়ে গেছিলাম। নিজে নাচতে শুরু করেছিলাম ওখানে।' (প্রতিক্ষণ, সংস্কৃতি সংখ্যা ১৫৯ ১৩৯৩, পৃষ্ঠা ৫৮) শর্বরী রায়চৌধুরীর মধ্যে একটা সাংগীতিক তন্ময়তা আছে, সেটাই তাঁর ভাস্কর্যের অন্তর্নিহিত প্রেরণা। ফলে দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারিতে রাখা 'কম্পোজিশন ২' শিরোনামে ১৯৬২-র পাখির রূপায়ণের ব্রোঞ্জটিতেই হোক, বা ১৯৮৩-তে বম্বের জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শিত 'গেট অব হেভেন-১' নামের ব্রোঞ্জেই হোক, সব ধরণের কাজেই সংগীত সম্পৃক্ত ধ্রুপদী চেতনা প্রস্ফুটিত হয়।

১৯৫১-তে কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেই প্রদোষ দাশগুপ্তের কাছে তিনি শিখেছেন। ১৯৫৬-তে পাশ করে বেরিয়ে ১৯৫৭ থেকে ৬০ পর্যন্ত বরোদায় শঙ্খ চৌধুরীর অধীনে কাজ করেছেন। ১৯৬২-তে ফ্লোরেন্স গেছেন শিক্ষার্থী হিশেবে। ইওরোপে জ্যাকোমিত্তি, হেনরি ম্যুর, মারিনো মারিনির সংস্পর্শে এসেছেন আর দেশে কাছ থেকে রামকিঙ্করকে কাজ করতে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ভিতরের মগ্নতায় গেঁথে রূপ দেন তাঁর ভাস্কর্যে। দেশের ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিক আধুনিকতার সমন্বয়ে ভাস্কর্যে অনন্য শুদ্ধতা ও সংবেদনকে খোঁজেন

রঙিন ছবি ২০· সুরজিৎ দাস। মেডিটেশন। ব্রোঞ্জ। আশির দশক।

রঙিন ছবি ২১· এস· নন্দগোপাল। মাস্কিজ। তামার পাত। পিতল ঢালাই।

তিনি।

রঘুনাথ সিংহ (১৯৩৩) ভাস্কর্যকে দেখেন জীবনেরই প্রসারণ হিশেবে। শিল্পীর আন্তর অনুভূতিকে কোনো একটি রূপাবয়বে এনে সীমিত জীবনকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর বিশ্বজাগতিক সত্যের দিকে প্রতিফলিত করা, ভাস্কর্যের লক্ষ্য তাঁর কাছে অনেকটা এরকম। ১৯৫৫-তে প্রদোষ দাশগুপ্তের অধীনে কলকাতায় আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেন। ১৯৫৮ থেকে ৬০ বরোদায় প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৬৩-৬৪-তে ইটালির নেপলসে এমিলিও গ্রেকোর অধীনে কাজ করেন। কিন্তু তিনি বলেন বিদেশে গিয়ে বিশেষ কিছুই শেখেন নি তিনি। দেশের মধ্যে তিনি বিস্তীর্ণ ঘুরেছেন। যেন দেশের হৃদয় মথিত করে উঠে আসে তাঁর রূপ। বৃক্ষের আদলকে বজায় রেখে দীর্ঘায়ত বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদের কাঠ থেকে সামান্যই বিযুক্ত করে তার সঙ্গে লোহার নানা অংশ যোগ করে আদিম অভিব্যক্তির উৎসারণ ঘটিয়ে তিনি যখন গড়েন 'অর্জুন' বা 'ভীম' অথবা একটি গাছের ডালপালা সংলগ্ন কাণ্ডের সামান্যই পরিবর্তন ঘটিয়ে, তার দুই প্রান্তকে তার দিয়ে যোগ করে যখন নাম দেন টিউন বা সুর, তখন বোঝা যায় প্রকৃতির ভিতর থেকেই কেমন করে তিনি নিষ্কাশিত করেন শিল্প। অ্যাকাডেমিক রিয়ালিজমে তিনি অত্যন্ত দক্ষ, কিন্তু যেভাবে তিনি ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সংযোগে দর্শন-চেতনায় অন্বিত ভাস্কর্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনের চেষ্টা করছেন, তাতেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। ৫০ ১৫৫

বিখ্যাত ব্যক্তির প্রতিকৃতির বাইরে কলকাতায় প্রথম সৃজনশীল উদ্যান ভাস্কর্যের স্রষ্টা উমা সিদ্ধান্ত (১৯৩৩)। হাজরা পার্কে (যতীনদাস পার্ক) 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড' নামে তাঁর ভাস্কর্যটি বসে ১৯৫৮ সালে। ১৯৭৬ নাগাদই সম্ভবত একবার কলকাতার একটি দৈনিক থেকে রামকিঙ্করকে যখন কলকাতার মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যগুলো দেখানো হয়েছিল, তিনি প্রশংসা করেছিলেন এই কাজটির। সেটা উমা সিদ্ধান্তের একটি বড় স্বীকৃতি। ১৬৮

তাঁর কাজে বহুমুখিনতা আছে। নানা মাধ্যমে নানা ভঙ্গিতে কাজ করেন। অভিব্যক্তিবাদী প্রত্নপ্রতিমা সঞ্জাত রূপবিন্যাসের দিকে একটু ঝোঁক আছে। এই দুঃখময় মানবিক অস্তিত্ব যে বিপন্নতা সঞ্চার করে, তারই অন্তরালে চলতে থাকে আলোর বা উজ্জীবনের প্রস্তুতি। তাঁর ভাস্কর্যে আহত, ছিন্ন কোনো শরীরের একটি অংশ রূপান্তরিত হতে হতে পাখি হয়ে যেতে পারে। ভারতীয় চৈতন্যের এই সদর্থক দার্শনিক প্রত্যয় তাঁর আঙ্গিককেও কিছুটা প্রভাবিত করে। এই প্রত্যয়ই তাঁর শিল্পীসত্তাকে ব্যবহারিক জীবনের দিকেও প্রসারিত করতে পারে। আমাদের প্রতিদিনের চেনা প্রকৃতির মধ্যেই যে রয়েছে শিক্ষার নানা উপকরণ, নিরক্ষর মানুষ বর্ণমালার পাঠও যে নিতে পারে প্রকৃতি পাঠ থেকে, শিক্ষা ক্ষেত্রে এই মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য তিনি পর পর দুবছর রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান। ১৬৯

মাধব ভট্টাচার্যের (১৯৩৩) কাজে ষাটের দশকের সমাজচেতনার আবহ ধরা পড়ে প্রকৃষ্টভাবে। প্রথম দিকে নারীর দেহমূল, তার শরীরের উত্তলতা, অবতলতা ইত্যাদিকে মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী রূপ দেওয়া থেকে শুরু করে তিনি চলে আসেন শহরজীবনে মানুষের সমবেত আনন্দ বিষাদ ও জটিলতার রূপায়ণের দিকে। ফলে মাধ্যম ও আঙ্গিকেও পরিবর্তন আসতে লাগল। অ্যাক্রিলিক শিট, পার্সপেক্স ইত্যাদি মাধ্যমে বিশদহীন জ্যামিতিক বিন্যাসে অত্যন্ত পরিশীলিত এক আঙ্গিক তিনি সৃষ্টি করেছেন। ১৬১

এখানে তাঁর এক স্মৃতিচারণা থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৫৯-৬০-এ তিনি যখন বরোদায় ছাত্র ছিলেন তখন ওখানকার শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করতে পারা যাবে, যেটা সমকালীন ভাস্কর্য প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ

"বরোদার Faculty of Fine Arts বিরাট জায়গা নিয়ে। চারদিকে গাছপালার মধ্যে স্টুডিও। সেখানে ব্রোঞ্জ ঢালাই-এর Foundry, পাথর কাটার বড় হলঘর, মডেলিং-এর জন্য আলোযুক্ত বিরাট ঘর।.... আর শিক্ষকরাও সবাই খুব নামী।.... আমার শিক্ষক তো শঙ্খ চৌধুরী, পেন্টিং-এর এন এস বেন্দ্রে ও মানি সুব্রহ্মনিয়াম আর সবে ছাত্রজীবন শেষ করে কলেজে ঢুকেছে জ্যোতি ভাট, রতন পারিমু, ফিরোজ কাপেটিয়া, মহেন্দ্র পাণ্ডিয়া ও গিরিশ ভাট, আর যাদের সঙ্গে আলাপ হল, প্রাক্তন ছাত্র শান্তি দাভে, আর তখন ছাত্র যারা হাকুলাল শাহ, গোলাম মহম্মদ শেখ, রাঘব কানেরিয়া, কৃষ্ণ ছোটপাড়, রজনীকান্ত পাঞ্চাল ও নাগজিভাই প্যাটেল, সকলে তো বন্ধু হয়ে গেলাম। আমরা তিন বন্ধু সেখানে খুব জমে গেলাম। আমি, শবরী ও রঘুনাথ সিংহ।" (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৯, পৃষ্ঠা ৯০)

দিল্লির বেদ নায়ার (১৯৩৩) এক সময় ছোট ছোট ম্যাকেট আকারের মানুষের শরীর নিয়ে ভাস্কর্য করতেন। সম্প্রতি
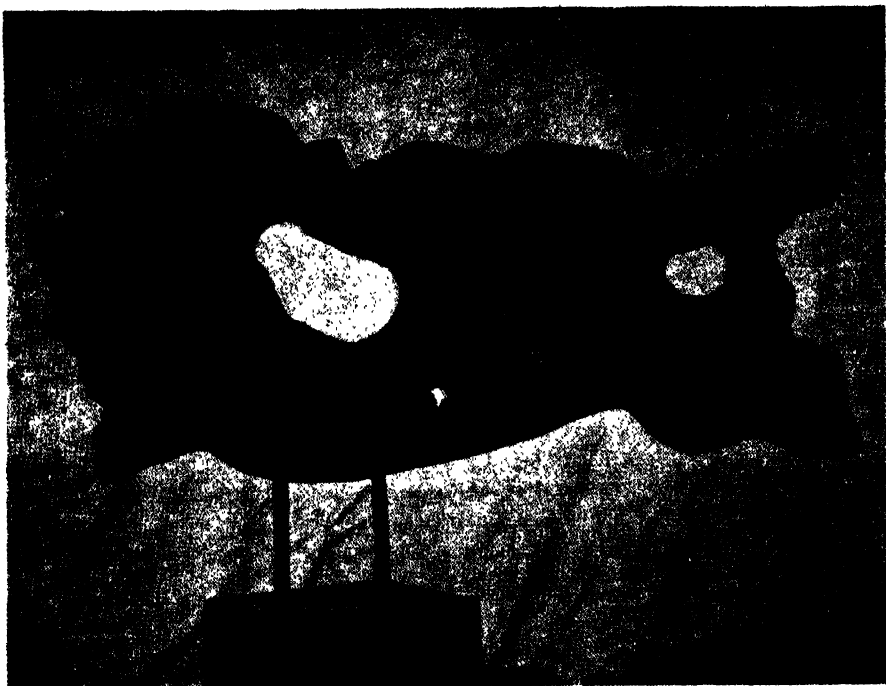
১৭১· রমেশকুমার পাটেরিয়া। ফিশেস। কাঠ।

১৭২· নিরঞ্জন প্রধান। প্রমিস। ব্রোঞ্জ। ১৯৯৩।
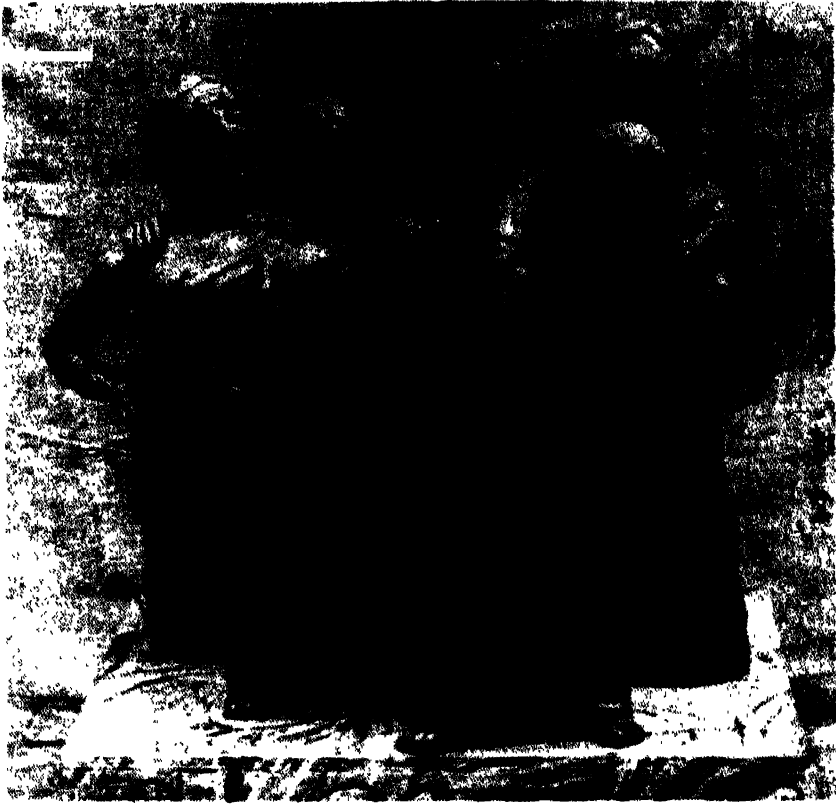
১৭৩ সি দক্ষিণমূর্তি। উওম্যান-১। টেরাকোটা। ১৯৮৬।

চিত্র ও ভাস্কর্য মিলিয়ে তাঁর ইনস্টলেশনগুলি বিপন্ন পরিবেশে মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে প্রকট করে তোলে।

বম্বের বি বিঠল (১৯৩৩) স্ফুরিত আয়তনময় ভাস্কর্যে ভারতীয় পূর্ণতার চেতনাকে প্রস্ফুটিত করেন।

নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিপিন গোস্বামী (১৯৩৪) এখন যেখানে এসে পৌঁছেছেন সেখানে সরলভাবে রূপায়িত মানুষই তাঁর ভাস্কর্যের প্রধান বিষয়। কলকাতার বাবু-সংস্কৃতি কালীঘাটের পটে যেভাবে রূপায়িত সেই স্থূল আয়তনময়তার কৌতুকে তিনি জীবনের প্রশান্তি ও বিক্ষোভকে রূপ দেন। সমকালীন ভাস্কর্যে বিপিন গোস্বামী একজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী।

জম্মুর ভি আর খাজুরিয়া (১৯৩৪) বরোদা ঘরানার ভাস্কর। জম্মু অঞ্চলে প্রাপ্ত মার্বল তাঁর প্রধান মাধ্যম। মাধ্যমের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই তাঁর ভাস্কর্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে প্রায়-বিমূর্ত রূপাবয়বে তিনি প্রকৃতির সমান্তরাল বিশালতা সম্পৃক্ত গাঠনিক গুণান্বিত ভাস্কর্য রচনা করেন।

আর্ট কলেজে প্রদোষ দাশগুপ্ত ও চিন্তামণি কর দুজনকেই শিক্ষক হিশেবে পান দেবব্রত চক্রবর্তী (১৯৩৫)। ১৯৫৯-এ তিনি পাশ করে বেরোন। ভাস্কর্যে রদাঁই তাঁর আদর্শ। মানুষ ও মানবতাবাদই তাঁর শিল্পের প্রেরণা। জীবনকে বাদ দিয়ে তিনি ফর্মের বিশুদ্ধতা খোঁজেন না। ফাইবার গ্লাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি একজন অগ্রবর্তী শিল্পী।

১৯৭০-এর ফাইবার গ্লাশের 'ম্যান অন দ্য মুন', ১৯৭১-এর 'ফোক অব ম্যান', ১৯৭৭-এ ব্রোঞ্জে 'আওয়ার লিডার অ্যান্ড উই', ১৯৭৯-এর 'কোবলার', 'টুওয়ার্ডস আউটার স্পেস', ১৯৮৩-র 'প্রবলেম উইথ দ্য কুইন', 'সিনেমা কিউ', ১৯৮৮-র 'স্প্রিং' তাঁর অজস্র গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্যের মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি করেছেন ২০ ফুট উচ্চতা ও ১৪ ফুট বিস্তারের ফাইবার গ্লাশের বিশাল কাজ। বিষয় 'ছাত্র'।

চারপাশের সময়বিধৃত যে জীবনপ্রবাহ, সেখান থেকেই আসে তাঁর বিষয়। বিষয় অনুযায়ী নির্বাচন করেন আঙ্গিক। কখনো আধুনিকতার বিশদ বর্জিত সারল্য, কখনো ধ্রুপদী ভারতীয়তা, কখনো-বা লৌকিক সারল্য। সব মিলে সরস এক পূর্ণতার বোধ, ঐতিহ্যের আলোয় দীপ্তিময় জীবনের হয়ে ওঠার সহজ ছন্দ, সেটাই বারবার ফিরে আসে তাঁর কাজে।

আর্ট কলেজ থেকে ১৯৫৯-এ পাশ করা চিন্তামণি করের ছাত্র সুরজিৎ দাস-ও (১৯৩৫) সময় ও বাস্তব চেতনাকেই তাঁর শিল্পের প্রধান প্রেরণা হিশেবে গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনের পরবর্তী সময়ের কিছু কাজে আসত চিন্তামণি কর অনুপ্রাণিত আলো-ছায়ার খেলা। কিন্তু বিমূর্ত গুণের থেকে অভিব্যক্তিমূলক বাস্তবতাই পরবর্তীকালে তাঁকে টেনেছে বেশি। অতিরিক্ত বিশদ পরিহার করে আয়তনময়তায় তিনি জীবনের অন্তর্লীন কৌতুক ও করুণাকে তুলে ধরেন। মুখাবয়বের ভাস্কর্যেও অভিব্যক্তির প্রখরতাই তাঁর অন্বিষ্ট। আশির দশকে করা তাঁর ব্রোঞ্জের 'স্ট্রে ডগ', 'মর্নিং ওয়াক', 'মডার্ন লেডি', 'স্ট্রিট আরচিন' সিরিজের অনেকগুলো কাজ, নানা কৌতুকপূর্ণ ভঙ্গিতে গণেশ, 'মেডিটেশন', টেরাকোটার 'পদিপিসি', ফাইবার গ্লাশের 'মিডলক্লাস কাপল', ১৯৯২-তে জলপাইগুড়িতে করা মার্বল-এর 'রবীন্দ্রনাথ', ১৯৯৩-এর মার্বল-এর 'রামকৃষ্ণ' তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজগুলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

র-২০

বরোদায় প্রশিক্ষিত ভাস্করদের মধ্যে রাঘব কানেরিয়া (১৯৩৬), রমেশ পাটেরিয়া (১৯৩৭) ও রজনীকান্ত পাঞ্চাল (১৯৩৭) ষাটের দশকে বিশেষ অভিঘাত সৃষ্টি করে পরবর্তী কালেও তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। রাঘব কানেরিয়া পরিত্যক্ত লোহার টুকরো ও যন্ত্রাংশকে ওয়েলডিং-এর সাহায্যে জুড়ে কল্পনাসমৃদ্ধ রূপাবয়ব গড়েন, অনেক সময় তাতে আসে সুররিয়ালিজমের আবহ। রমেশ পাটেরিয়া মার্বল পাথরে কাজ করেন। প্রকৃতির স্বাভাবিকতাকে প্রাধান্য না দিয়ে পাথরের চরিত্র অনুযায়ী তিনি বিচিত্র রূপ সৃষ্টি করেন। রজনীকান্ত পাঞ্চাল-এর ভাস্কর্যে চিত্রকলার গুণও আরোপিত হয় কিছু পরিমাণে। ছবিতে তাঁর উৎসাহ ছিল কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকে ভাস্কর্য শিখতে হয়। ফলে এই দুটি মাধ্যম তাঁর কাজে মিলে মিশে যায়। তিনি ঢালাই বা ওয়েলডিংয়ের পদ্ধতিতে ধাতু দিয়েই কাজ করেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কাজে দ্বিমাত্রিক জ্যামিতিকতার প্রাধান্য। নিজস্ব রীতিতে বিমূর্ত ভাস্কর্যে তিনি অভিনবত্ব এনেছেন। কেরালার বালান নাম্বিয়ারও (১৯৩৭) ধাতুর টুকরো ওয়েলডিং-এর সাহায্যে জুড়ে কাজ করেন। তাঁর বিমূর্ততার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ভারতের পরম্পরাগত লৌকিক আবহের প্রতীকী অনুষঙ্গের প্রতিফলন ঘটে।

র-১৮

১৭১

১৭৪· অনিট ঘোষ। রাইডার। প্লাস্টার। ১৯৭৬।

১৭৫· মানিক তালুকদার। আউল ফ্যামিলি। টেরাকোটা। ১৯৮০।

ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এরকম কয়েকজন ভাস্করের কাজের আলোচনার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্কর্যের একটা অংশের গতি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করলাম আমরা। ইওরোপীয় আধুনিকতাকে আত্মস্থ করে ভারতীয় ঐতিহ্য ও বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার প্রবণতাই অধিকাংশ শিল্পীর লক্ষ্য। পরবর্তী অংশে আমরা দেখব- সেইসব ভাস্করের কাজ ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে যাঁদের জন্ম এবং সত্তর দশকে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

চার

সত্তর দশক

উপরের অংশ থেকে একটা বিষয় লক্ষ করা যায় যে পঞ্চাশের দশকের শেষ বা ষাটের দশকের শুরুতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন এবং পরেও কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে গেছেন এরকম ভাস্কর অনেক রয়েছেন। দেখা যায় ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে জন্ম তাঁদের অধিকাংশের। বিশেষত ১৯৩৩ সালটি এদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ এই একই বছর কলকাতার অনেক স্বনামধন্য ভাস্করের জন্ম। এর একটি কারণ হতে পারে যে ১৯৫১ থেকে ৫৭ পর্যন্ত কলকাতা আর্ট কলেজে প্রদোষ দাশগুপ্ত শিক্ষক ছিলেন আর তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন অনেকে। ১৯৫১ থেকে বরোদায় শঙ্খ চৌধুরীর শিক্ষকতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ষাটের দশকে চিত্রকলাতে যে নতুন ঢেউ এসেছিল, ভাস্কর্যকেও তা স্পর্শ করেছে, এটা ঘটনা।

ষাট দশকের শেষার্ধে যেসব তরুণ ভাস্কর আর্ট কলেজ থেকে বেরোচ্ছিলেন তাঁদের ঝোঁকটা দেখা যাচ্ছিল বিমূর্ততার দিকেই বেশি। সত্তর দশকে প্রতিষ্ঠা পেলেন যখন তাঁরা তখনো শুদ্ধ রূপের অন্বেষণই তাঁদের লক্ষ্য রইল। কেউ কেউ পরবর্তীকালে অবয়বের দিকে ফিরলেন। কেউ-বা অবয়ব-নিরবয়বের মাঝখানে রয়ে গেলেন। কিন্তু ষাটের দশকের অনেক ভাস্কর যতটা সমাজ ও বাস্তব সচেতন হতে পেরেছেন, সত্তরের শিল্পীরা তা পারেন নি।

কলকাতায় চিন্তামণি করের নেতৃত্বে 'স্কাল্পটর্স গিল্ড'-এর কথা আমরা আগে বলেছি। গিল্ডের ১৯৬৭ ও ১৯৭০-এর মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যে অংশগ্রহণ করছেন যেসব তরুণ শিল্পী, সত্তর দশকে যাঁরা পৌঁছেছেন নিজস্বতায়, তাঁদের অনেকের কাজেই বিমূর্ততার প্রাধান্য। প্রকৃতি কখনো কখনো তাঁদের কাছে প্রকৃষ্ট প্রস্থান বিন্দুমাত্র। তখনকার এরকম তরুণ শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় নিরঞ্জন প্রধান (১৯৪০), বিমান দাস (১৯৪৩), অনিট ঘোষ (১৯৪৪), দিলীপ সাহা (১৯৪৪), মধুসূদন চ্যাটার্জি, মধুসূদন চৌধুরী, সঞ্জয় দাস, করবী ঘোষ, যুগল পাল প্রমুখ তরুণ ভাস্করের নাম।

নিরঞ্জন প্রধান (১৯৪০) পূর্ববর্তী অংশে ষাটের দশকের শিল্পীদের সঙ্গেও আলোচিত হতে পারতেন। কিন্তু শিল্পীর জন্মবর্ষের ভিত্তিতে বিভাজনটা করা হয়েছে বলে তাঁকে এই অংশে আনা হল। ১৯৬৭-তে তিনি কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজ থেকে ভাস্কর্যে প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমা পেয়েছেন। তার আগে ১৯৬৪-তে চিত্রকলা নিয়েও পাশ করেছেন। সত্তরের দশক জুড়ে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে তিনি ভাস্কর হিশেবে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর মতো নিয়মিত কাজ করেন ও প্রদর্শনী করেন এরকম শিল্পীর সংখ্যা বেশি নয়।

তাঁর একেবারে প্রথম ভাস্কর্য ১৯৬৬-র কাঠে তৈরি 'সিটেড উওম্যান'। এক নারীর বসে থাকার ছন্দটিকে ধরা হয়েছে এখানে। এর মধ্যে রয়েছে কিছুটা গ্রামীণ সারল্যের অনুভব। কিছুটা ব্রাকুসি, কিছুটা চিন্তামণি করের প্রভাব। ১৯৬৯-এর কাঠের 'ফ্লাইট ইনটু স্পেস'-এ তিনি আরো বিমূর্ততার দিকে এলেন। একটি পাখির উড়ে যাওয়ার ছন্দকে ধরেছেন এখানে আলম্ব দণ্ডায়মান কাঠটিতে জঙ্গমতার অনুভব এনে। ১৯৫৭-এর আগে পর্যন্ত এই বিমূর্ততার মধ্য দিয়েই তিনি ক্রমে ভাস্কর্যের নান্দনিক শুদ্ধির দিকে এগিয়েছেন। ১৯৭৫ থেকে তিনি ক্রমান্বয়ে অবয়বের দিকে আসতে থাকেন। তখন প্রকৃতি ও জীবনের নানা সৌন্দর্য ও সুষমা, নানা অসংগতি ও করুণা রূপ পেতে থাকে তাঁর ভাস্কর্যে। প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বৃদ্ধি বা প্রসার, যাকে বলে অরগানিক গ্রোথ, সেটা যেমন প্রতিফলিত হয় তাঁর রূপাবয়বে তেমনি

১৭৬· *দিলীপ সাহা। কম্পোজিশন। পাথর। ১৯৯৩-৯৪।*

১৭৭· তারক গড়াই। ট্রাইবাল মাদার। ব্রোঞ্জ। ১৯৯১।

তলবিন্যাসের কৌণিকতায় ঘনকবাদী রীতির অনুষঙ্গে তিনি সময়ের তীর্যক জটিলতাকে রূপ দেন। ১৯৮৬-র 'বাথিং ইন দ্য পন্ড' (টেরাকোটা), 'ডন জুয়ান' (ব্রোঞ্জ), ১৯৮৮-র 'ডিফাইং মেল' (ব্রোঞ্জ), 'সিয়েস্তা' (ব্রোঞ্জ), ১৯৯১-এর 'মিউজিক অব দ্য সোল' (ব্রোঞ্জ), ১৯৯৩-এর 'প্রমিস' (ব্রোঞ্জ), 'টিল ডেথ ডু আস অ্যাপার্ট' (ব্রোঞ্জ), তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর্যের দৃষ্টান্ত। ৫-৫ ১৭২

দিল্লির বলবীর সিং কাট (১৯৪১) শান্তিনিকেতন কলাভবন থেকে পাশ করেন ১৯৬৪-তে। পরে স্নাতকোত্তর শিক্ষা নেন বরোদায় শঙ্খ চৌধুরীর অধীনে ১৯৬৫-৬৬-তে। বরোদায় পাথরের কাজের যে একটা পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল তাতে বলবীর সিং-এরও অবদান আছে। প্রথমে অবয়ব থেকে শুরু করে তারপর অবয়ব ভেঙে ভাস্কর্যের বিশালতা গুণ বা মনুমেন্টালিটিকে আয়ত্ত করতে থাকেন তিনি। প্রথমে একটি পাথর পরে একাধিক পাথরকে একসঙ্গে সন্নিবেশিত করে তিনি বিশুদ্ধ ত্রিমাত্রিক সংহতি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। ১৯৬৭-র 'ইনটিগ্রালস অব আ টোরসো' বা ১৯৭৪-এর 'চক্র', যেটা তিনটি পাথর সন্নিবেশিত করে করা, তাঁর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুটি দৃষ্টান্ত। ১৮১

বিহারের ঈশ্বরচন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত (১৯৪১) একেবারেই বিপরীত রীতির ভাস্কর। তিনি পাটনা আর্ট স্কুল থেকে পাশ করেছেন ১৯৫৭-তে। তারপর ১৯৬৩-তে লখনৌ আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে শান্তিনিকেতনে দিনকর কৌশিকের অধীনে লৌকিক ভাস্কর্য নিয়ে গবেষণা করেন। টেরাকোটায় লৌকিক রীতির ভাস্কর্যে তিনি অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন। লৌকিক রূপবন্ধকে আধুনিকতায় উন্নীত করতে তাঁর অবদান অসামান্য।

বিমান দাস (১৯৪৩) কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেন ১৯৬৬-তে। ১৯৬৯ থেকে তিনি দিল্লি আর্ট কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন। ষাটের শেষ ও সত্তর দশকের গোড়ার দিকে তাঁর কাজে ছিল অনেকটা

৭ ১৯

১৭৮· মধুসূদন চ্যাটার্জি। শ্যাডো। ব্রোঞ্জ। ১৯৯২-৯৩।

শিক্ষার্থীসুলভ বিমূর্ততার চর্চা। ক্রমান্বয়ে তিনি আধ্যাত্মিকতা অনুপ্রাণিত পুরাণকল্প-আশ্রিত এক রূপরীতির উদ্ভাবন করেন যার মধ্যে পাশ্চাত্য আধুনিকতার বিমূর্ত রূপচেতনা ও ভারতীয় মরমী দর্শনচেতনার সমন্বয় ঘটে। 'নায়িকা' নামে তাঁর একটি সাম্প্রতিক ব্রোঞ্জে যেমন দেখি উপবৃত্তাকার একটি বিমূর্ত রূপকল্পের অন্তস্থ শূন্যতায় মিশে থেকে অংশত প্রকাশমান হয় এক নারীর অবয়ব। এই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বিমান দাস লৌকিক অনুভবকেও মিশিয়েছেন। তাঁর কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কে· এল· কাউল সম্প্রতি লিখেছিলেন,

> "ডিসেন্ডিং ফর ডিপার বিমান হ্যাজ মার্জড হিমসেল্ফ ইনটু দ্য অরডিনারি ফোক অব ইন্ডিয়া টু টেক আ পিপ ইনটু দেয়ার উইল অ্যান্ড ও, দেয়ার হোমস্পান কাইন্ড অব লাইফ, দেয়ার অরডিনারি বাট আনফোর্সড স্টেটস অব জয়, দেয়ার ফ্র্যাঙ্ক স্টেটস অব ওরি, উইদাউট এনি অ্যাটেম্পট অর নিড টু মেক অ্যান অ্যাটেম্পট টু ক্যামোফ্লেজ অর হাইড দেয়ার স্যাডনেস।" (বম্বের এক প্রদর্শনীর স্মারকপত্র)

১৯৯৪-তে বিমান দাস কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজেরে অধ্যক্ষ পদে যোগ দিয়েছেন।

মাদ্রাজের সি দক্ষিণমূর্তি (১৯৪৩) মূলত পাথর ও টেরাকোটায় কাজ করেন। পাথরে তিনি দক্ষিণ-ভারতীয় আদিমতার ঐতিহ্যকে আধুনিক অভিব্যক্তিময়তায় সঞ্জীবিত করে উপস্থাপিত করেন। টেরাকোটায় তিনি অনেকটা লৌকিক সারল্যে সাধারণ জীবনের দৃশ্যকে তুলে ধরেন। বিমূর্ততার দিকে না গিয়ে তিনি দেশীয় সংবিতের সন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

অনিট ঘোষ ১৯৬৫-তে কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেন। আর্ট কলেজে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত সুনীল পালের কাছে শিক্ষা তাঁকে যে প্রকৃতির স্বাভাবিকতার রূপায়ণের দিকে পরিচালিত করছিল, পঞ্চম বর্ষে চিন্তামণি করের অধীনে এসে সেটা পরিহার করে ভাস্কর্যের অন্তর্নিহিত বিমূর্ত গুণকে প্রস্ফুটিত করার দিকে অনুপ্রাণিত হলেন। পরবর্তীকালে সেটাই তাঁর ভাস্কর্যের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। প্রকৃতিকে বর্ণনাত্মকভাবে রূপায়িত না করে তার নিহিত সারাৎসারকে ফুটিয়ে তোলা অনেকটা সংগীতময়তায়, এটাই তাঁর কাজের প্রধান ধারা। ধাতব পাতে এক ধরণের কাজ করেন তিনি। দ্বিমাত্রিক পাতের তলের সঞ্চরণ সেখানে ভর ও আয়তনের দ্যোতনা আনে। শূন্যতার মধ্যে রেখার চলনের একটা ছন্দ ও

জ্যামিতি তৈরি হয়। ব্রোঞ্জ বা প্লাস্টারের সেই রেখা বা তলই যেন আয়তনিক হয়ে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। মেঘের চলার কোনো একটি মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে যেন তাঁর হাতে রূপ পায় 'দ্য ক্লাউড' নামের ভাস্কর্যে। বাতাসের উতরোল গতিচ্ছন্দ শরীর পেয়ে যায় 'দ্য উইন্ড'-নামে ভাস্কর্যে। বৃষ্টির

১৭৪ এক একটি ফোঁটার ঝরে পড়া থেকে গড়ে ওঠে 'দ্য রেইন'। এসমস্ত কাজের নিহিত কবিতাকে তিনি সঞ্চারিত করতে পারেন অবয়বী ভাস্কর্যেও হলদিয়ার 'রাইডার' নামে ৯'×৭' মাপের ছুটন্ত ঘোড়ায় ঘোড়সওয়ার কাজটি (প্লাস্টার) যার দৃষ্টান্ত।

বিমূর্ততাই যে ছিল ষাটের শেষ ও সত্তর দশকে নবীন ভাস্করদের প্রধান প্রকাশভঙ্গি এর পরিচয় রয়েছে দিলীপ সাহার (১৯৪৪) কাজেও। চিন্তামণি করের ছাত্র দিলীপ সাহা ১৯৬৭-তে আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেন। মানুষের অবয়বকে বিমূর্তায়িত করে রচনাবদ্ধ তৈরি করাই ছিল তাঁর প্রথম দিকের কাঠের কাজের বৈশিষ্ট্য। ১৯৬৮-৬৯-এর 'বার্ডেন সুইট' নামে কাঠের আলম্ব ও আনুভূমিক দুটি অংশের সমন্বয়ে গড়া কাজটি সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই আকর্ষণীয়। দিল্লির আইফাকস-এ (IFACS) পুরস্কৃত হয়েছিল কাজটি। পূর্বাঞ্চলে অল্প যে কজন ভাস্কর নিয়মিত পাথরে কাজ করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯৬৫-তে তাঁর প্রথম পাথরটিতে ছিল ব্রাঁকুসির প্রভাব। ১৯৮০ থেকে কয়েক বছর অরুণাচলে থাকার সময় ওখানকার নির্জন প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে তাঁর কাজে পরিবর্তন আসে। আশির দশকের শেষ দিক থেকে তাঁর নিজস্ব একক প্রতিমাকল্পের প্রায়-বিমূর্ত রচনার পাশাপাশি তিনি একাধিক প্রতিমাকল্প নিয়ে একটু বর্ণনাধর্মী কাজও করতে থাকেন। ১৯৮৯-এর টেরাকোটায় করা 'সানরাইজ' ও 'সানসেট' শীর্ষক নিসর্গ-রূপায়ণের ভাস্কর্যগুলিতে ঐতিহ্য-আশ্রিত রূপারোপে চলমান জীবনপ্রবাহের দৈনন্দিনতার প্রতি তাঁর যে কবিত্বপূর্ণ বিনতি সেখানেই রয়েছে তাঁর শিল্পীসত্তার পরিচয়।

চিন্তামণি করের ছাত্র মধুসূদন চ্যাটার্জিও ১৯৬৬-তে পাশ করেন। 'স্কাল্পটার্স গিল্ড'-এর প্রদর্শনীতে তাঁর কাজও

১৭৮ ছিল বিমূর্ত। দীর্ঘদিন পরে সম্প্রতি (১৯৯৩) এক প্রদর্শনীতে তিনি যেভাবে ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্যের আদলকে আধুনিকতায় অন্বিত করে কাজ করেছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনিবেশযোগ্য।

১৭৯· রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। টেরাকোটা। ১৯৯১-৯২।
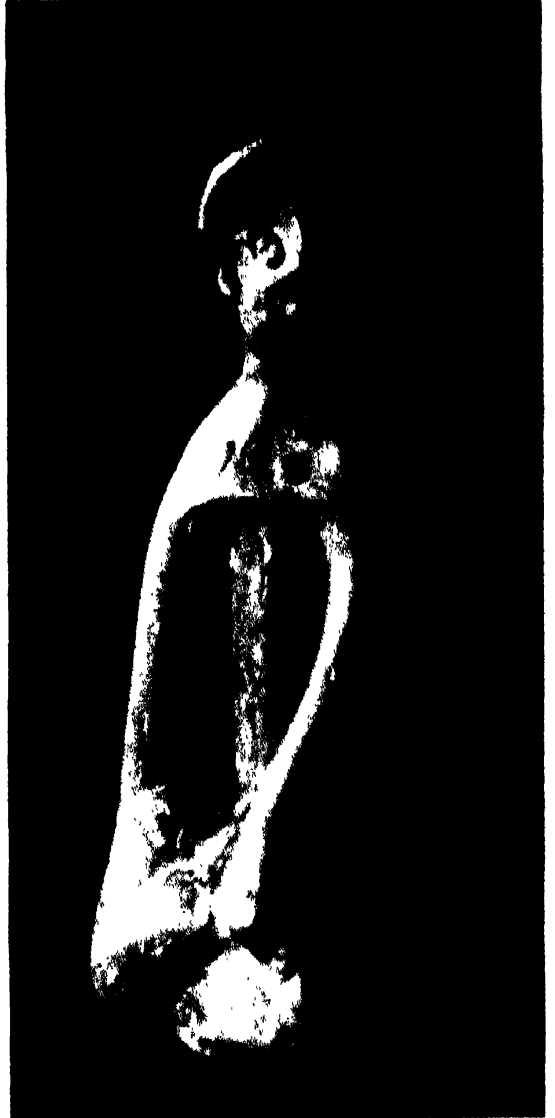
১৮০· দেবব্রত চক্রবর্তী। ছাত্র। ফাইবার গ্লাস। ২০ ফুট × ১৪ ফুট। ১৯৯৩-৯৪।

কারুকৃতিকে নান্দনিকতায় অভিষিক্ত করে তোলাই, এক কথায় বলতে গেলে, মানিক তালুকদারের (১৯৪৪) ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য। ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে বিপিন গোস্বামীর কাছে তাঁর প্রথম শিক্ষানবিশি। পরে ১৯৭১ থেকে দুবছর কলাভবনে শর্বরী রায়চৌধুরীর অধীনে গবষেণা করেন। এই শিক্ষা ও গবেষণা তাঁর ভাবনায় ও সন্ধানে বৈচিত্র্য দিয়েছে, যে বৈচিত্র্যের জন্য তিনি আত্মস্থ করতে চেষ্টা করেছেন কখনো আদিম ভাস্কর্যের সারাৎসার, কখনো লোকায়তিক অমলিন সরলতা, কখনো-বা ধ্রুপদী ভাস্কর্যের মূলগত গঠন ভঙ্গিমা, যাকে সুরজিৎ সিংহ তাঁর সম্বন্ধে এক লেখায় বলেছেন, "ফান্ডামেন্টাল ভাইটাল ফর্মস—দ্য ফর্মস দ্যাট ইউনাইট দ্য ফিস অ্যান্ড দ্য হিউম্যান টোরসো।" তবু এক এক সময় মনে হয় লৌকিক সারল্যেই তিনি যেন সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ, ১৯৮৩-র 'রূপসী বাংলা', 'বনলতা সেন' বা 'চার্লি চ্যাপলিন'-এর মতো টেরাকোটায় রয়েছে যার পরিচয়।

নানা মাধ্যমেই তিনি কাজ করেন নানা ভঙ্গিতে। এর মধ্যে ফাইবার গ্লাশের কাজগুলি আমাদের বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। এই আপাত-চপল মাধ্যমটিকে কেমন করে গভীরতার দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, দুটি যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিমার সহাবস্থানকে মিলিয়ে কেমন করে ভেঙে দেওয়া যায় যুক্তির আপাতশৃঙ্খলা, আর সেই সুররিয়ালিস্টধর্মী অনুষঙ্গে কেমন করে মেলে ধরা যায় বিশেষ এক তত্ত্ববিশ্ব, কারুকৃতিকে উত্তীর্ণ করা যায় বিশিষ্ট এক নান্দনিক অভিব্যক্তিতে, এটাই মানিক তালুকদারের ভাস্কর্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৭৫

ত্রিপুরার শিল্পী বিপুলকান্তি সাহা (১৯৪৪) শান্তিনিকেতন কলাভবন থেকে ১৯৬৭-তে পাশ করেন। সেখানে তিনি রামকিঙ্করের সান্নিধ্যে আসেন। পরে বরোদায় শঙ্খ চৌধুরীর অধীনে কাজ করেন। আদিম শিল্পের বলিষ্ঠতা ও প্রখরতা তাঁর ভাস্কর্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তামিলনাড়ুর এস নন্দগোপাল (১৯৪৬) সম্পর্কে আমরা শুরুতেই আলোচনা করেছি। সত্তর দশকের একজন গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর হিশেবে তাঁর অবদান অবশ্যই বিবেচ্য।

১৮১· বলবীর সিং কাট। সিটি স্কোয়ার। গ্রানাইট। ১৯৭১।
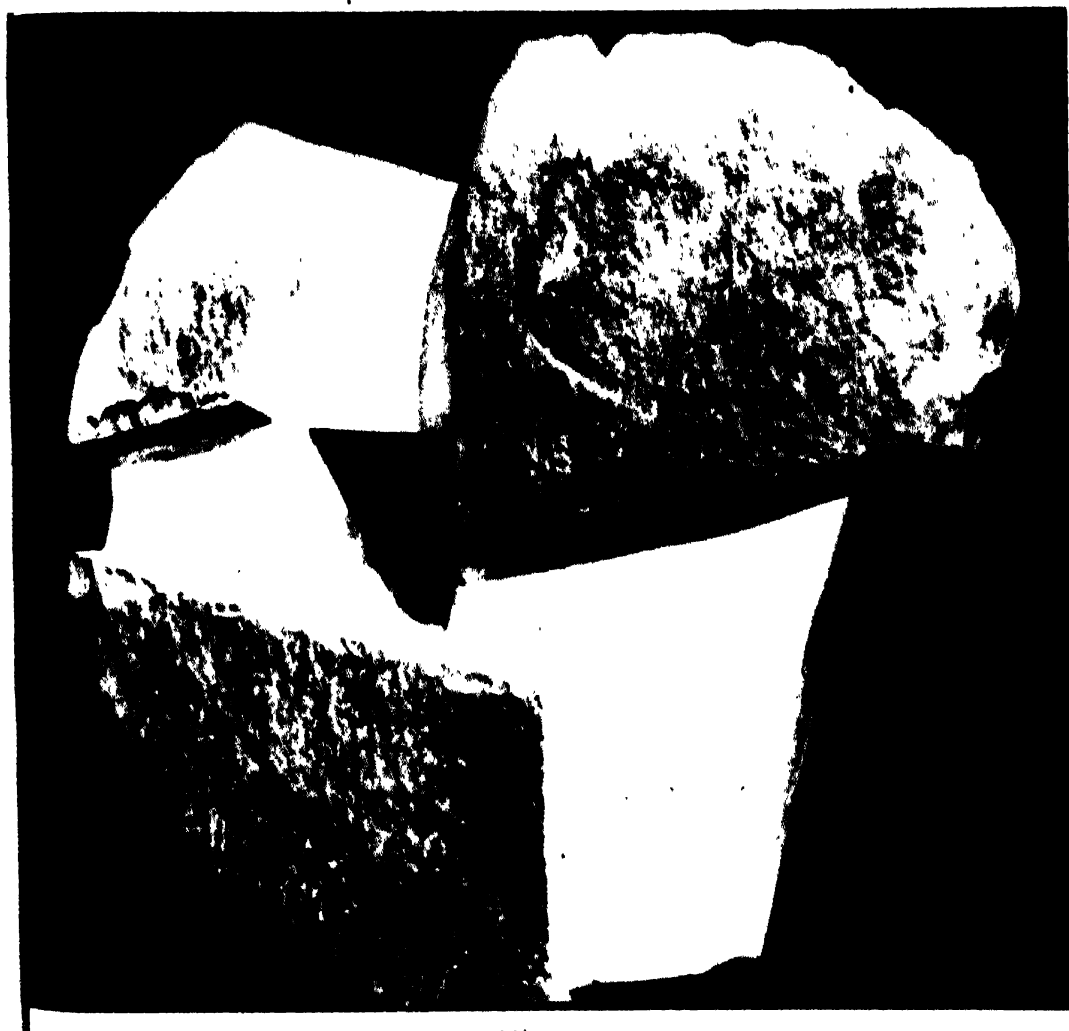
আদিমতার অভিব্যক্তির মধ্যে একই সঙ্গে রয়েছে যে সারল্য ও সংস্কৃতা, ঐতিহ্য-অন্বিত হয়ে তা আধুনিক চেতনাকেও আলোড়িত করতে পারে। তারক গড়াইয়ের (১৯৪৬) ভাস্কর্যে শক্তি ও সুষমার মূল উৎস এই জীবনপ্রবাহের সঙ্গে গভীর সংযোগ। বীরভূমের লৌকিক জীবনের মধ্যে এক সময়ে তাঁর অবস্থান এবং কলাভবনে শিক্ষাসূত্রে রামকিঙ্করের সান্নিধ্য তাঁর শিল্পী চেতনাকে সব সময়ই এই সভ্যতার তৃণমূলের সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। সত্তর ১৭৭ দশকের ভাস্করদের মধ্যে যে বিমূর্ততার দিকে ঝোঁকের প্রাধান্য, তারক গড়াই তার ব্যতিক্রম। অবয়বের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের দেশ ও জনজীবনের গভীর স্রোতটিকে ধরতে চেষ্টা করেন। শহরজীবনের ক্ষণস্থায়ী চাপল্য নয়, অনাদিকাল থেকে প্রবাহিত জীবনের শাশ্বত কেন্দ্রটি তাঁর সন্ধানের বিষয়। প্রত্ন-প্রতিমা সঞ্জাত বলিষ্ঠতা ও প্রখরতার মধ্য দিয়ে তিনি ভাস্কর্যে স্বদেশের প্রাণকেন্দ্রটি সন্ধান করেন। কাঠ, পাথর, ব্রোঞ্জ, টেরাকোটা নানা মাধ্যমেই তাঁর প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত। মুখাবয়বের ভাস্কর্যে তাঁর দক্ষতা ও রচনাধর্মী ভাস্কর্যে রূপাবয়ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর কাজে স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য আনে।

ষাট ও সত্তর দশকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এরকম ভাস্করদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করলাম। তাঁদের কাজের বৈশিষ্ট্য ও গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টাই ছিল উদ্দেশ্য। আপাতভাবে মনে হতে পারে, যেমন কেউ কেউ বলেন অনেক সময়, যে আমাদের সমকালীন ভাস্কর্যে তেমন কোনো গভীর কাজ হচ্ছে না। কিন্তু একটু নিবিষ্টভাবে দেখলে অনুভব করা যায় ষাটের দশক থেকে সম্প্রতি পর্যন্ত অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নিরন্তর একটা কাজের প্রবাহ চলেছে। আধুনিকতার সূচনা থেকেই প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান চলছিল, ষাট ও সত্তর দশকের ভাস্কররাও সেই সন্ধানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

ষাটের দশকে বা তার কিছু আগে ভাস্কর্যের চর্চা ও শিক্ষায় প্রাধান্য ছিল কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের। এখান থেকে এটা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে যায়। বিভিন্ন কেন্দ্রে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে থাকে। ষাটের দশকের শিল্পীদের কাজে প্রাধান্য ছিল সমাজচেতনা ও ঐতিহ্য চেতনার। সত্তর দশকে জোর পড়ে ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর। বিমূর্ততার দিকে ঝোঁকেন অনেক শিল্পী। এর মধ্যেও জীবনের প্রতিফলন যে ঘটে নি তা নয়।

এ পর্যন্ত ভাস্কর্যের সংজ্ঞা ও প্রত্যয় সম্পর্কে এরকম একটা ঐক্যবোধ ছিল যে ভাস্কর্য ত্রিমাত্রিক আয়তনের শিল্প। একক কোনো আয়তনিক বিন্যাসের মধ্য দিয়েই সঞ্চারিত হয় নন্দনবোধের নানা মাত্রা। পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীরা ভাস্কর্যের এই সংজ্ঞাকে আরো প্রসারিত করলেন। আরো বৈচিত্র্য এল মাধ্যম ও রূপভঙ্গিতে। পরবর্তী আলোচনায় সেটাই হবে আমাদের অনুধাবনের লক্ষ্য।

ভাস্কর্যের তৃতীয় ও নবীন প্রজন্ম

এক

আশির দশক

আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বছর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সংগীতভবন প্রাঙ্গণে ইউক্যালিপটাস গাছের সমারোহের মধ্যে রামকিঙ্কর গড়ে তোলেন তাঁর 'সুজাতা' নামে ভাস্কর্যটি। ৪৮ বৃক্ষের আদলে বেড়েওঠা দীর্ঘায়ত সিমেন্ট কংক্রিটে তৈরি এই নারী মূর্তিটিকে ভারতীয় আধুনিকতার প্রথম সূচনা বলে মনে করেন অনেকে। রামকিঙ্কর তাঁর নিজস্ব রীতির ভাস্কর্য শুরু করেন অবশ্য ১৯২৮ থেকেই। কিন্তু প্রস্তুতির পর্যায় পেরিয়ে দেশ-কাল অন্বিত রূপের স্বাতন্ত্র্যে অভিনব তাঁর প্রথম সৃষ্টির দৃষ্টান্ত এই 'সুজাতা'। এর মধ্য দিয়েই ভারতীয় ভাস্কর্যে আধুনিকতার এক নতুন দিগদর্শন সূচিত হল। ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে শুরু হল সমকালের উপযোগী ভাস্কর্যের বিশিষ্ট এক ভাষার সন্ধান।

বিংশ শতকের শুরু থেকে বা তার কিছু আগে থেকেই অবশ্য ভারতীয় ভাস্কররা প্রতিকৃতি ভাস্কর্যের বাইরে বা পাশাপাশি রচনাধর্মী ভাস্কর্যও করছিলেন। আমাদের মনে পড়বে মহারাষ্ট্রের গণপৎ কাশীনাথ ম্হাত্রে (১৮৭৬-১৯৪৭) কথা। ১৮৯৬ সালে তিনি তৈরি করেছিলেন 'টু দ্য টেম্পল' নামে প্রদীপ হাতে মন্দিরাভিমুখী এক মহারাষ্ট্রীয় নারীর ৫৭ প্রতিমাকল্প। রচনাধর্মী ভাস্কর্যের সূচনা বলে চিহ্নিত করা হয় একে। এরকম ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে আরো অনেক। কিন্তু সেখানে রূপাবয়ব নির্মাণে ইওরোপীয় স্বাভাবিকতা-আশ্রিত অ্যাকাডেমিক রীতিই প্রাধান্য পেয়েছে। রূপের মধ্যে সেখানে আমাদের ঐতিহ্য বা জীবনধারার কোনো স্পন্দন ছিল না। সেই স্পন্দনটি প্রথম এনেছিলেন রামকিঙ্কর তাঁর 'সুজাতা' নামে ভাস্কর্যে।

রামকিঙ্করের প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করেছিল অনেককে। এই শতকের প্রথম তিন বা চারটি দশকে আমাদের সরকারি আর্ট স্কুলগুলিতে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক রীতির যে ভাস্কর্য শিক্ষা প্রচলিত ছিল, সেই শিক্ষাধারাকে আত্মস্থ করে কয়েকজন প্রতিভাবান ভাস্কর ইওরোপীয় আধুনিকতার আঙ্গিক ও ভারতীয় নন্দনচেতনার সারাৎসারকে মিলিয়ে ভাস্কর্যে এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সচেষ্ট হন। পূর্ব ভারতে প্রদোষ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯১), চিন্তামণি কর (১৯১৫) ও শঙ্খ চৌধুরীর (১৯১৬) হাতে যে প্রচেষ্টার শুরু সেটাই নানাভাবে পল্লবিত হতে থাকে পূর্ব ভারতে সুধীররঞ্জন খাস্তগীর (১৯০৭-১৯৭৪), প্রভাস সেন (১৯১৯), সুনীলকুমার পাল (১৯২০), সোমনাথ হোর (১৯২১), মীরা মুখার্জি (১৯২৩), পশ্চিম ভারতে এন জি পানসারে (১৯১২-১৯৬৮), এ দাবিয়েরওয়ালা (১৯২২), পিলু পোচখনওয়ালা (১৯২৩), উত্তর ভারতে ভবেশচন্দ্র সান্যাল (১৯০৪), ধনরাজ ভগৎ (১৯১৭), অমরনাথ সেহগাল (১৯২২) ও দক্ষিণ ভারতে ধনপাল (১৯১৯) প্রমুখ ভাস্করের কাজের মধ্য দিয়ে। ভাস্কর্যের প্রথম প্রজন্মের এই শিল্পীরা ইওরোপীয় মডেলের বাইরে আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের যে রূপচেতনা সন্ধানের চেষ্টা করেন সেটাই পূর্ণতা পায় দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্করদের হাতে।

১৮২· মৃণালিনী মুখার্জি। দেবী। শণের দড়ি। ১৯৮১।

১৯৩৫ থেকে শুরু করে চল্লিশ দশক জুড়ে চলতে থাকে সমন্বয়ের সাধনা। চল্লিশ দশক আমাদের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট হিশেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বাস্তবতার যে ক্লিন্নতা, ঔপনিবেশিক শোষণের যে নিরাবরণ উগ্র রূপ, যুদ্ধ ও মৃত্যুর যে ভয়ঙ্করতা, সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা প্রতিবাদীচেতনায় অন্বিত আত্মআবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করে শিল্পীদের। চিত্রকলায় যেমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রূপরীতির সমন্বয়-প্রয়াস শুরু হয়, ভাস্কর্যেও চলতে থাকে সেই সন্ধান। 'ক্যালকাটা গ্রুপ' (১৯৪৩-১৯৫৩)-এর অন্যতম রূপকার প্রদোষ দাশগুপ্ত তাঁর ভাস্কর্যে এই সামাজিক আলোড়নের পাশাপাশি, ভারতীয় রূপচেতনার কেন্দ্রটিকেও খুঁজতে থাকেন। রামকিঙ্করের সঙ্গে লৌকিক জীবনপ্রবাহের যে গভীর সংযোগ ছিল তা দিয়ে পাশ্চাত্য আধুনিকতার অভিব্যক্তিবাদীরীতির সারাৎসারকে খুব সহজেই তিনি দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলেন। আদিমতার সংক্ষুব্ধতার মধ্য দিয়ে ভারতীয় জীবনপ্রবাহের চিরন্তন মূল স্পন্দনটিকে তুলে আনতে পারলেন তিনি তাঁর ভাস্কর্যে।

চল্লিশ দশকের যে স্বদেশ সন্ধান, ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজচেতনায় বিশের দশক থেকে যার সূত্রপাত, ভাস্কর্যে সেটা একটা বলিষ্ঠ আদল পেল রামকিঙ্করের কাজে। প্রদোষ দাশগুপ্ত, চিন্তামণি কর ও শঙ্খ চৌধুরী চল্লিশ দশকের এই চেতনাকে পঞ্চাশ ও ষাটের দশক পর্যন্ত প্রসারিত করে পাশ্চাত্য আধুনিকতা ও ধ্রুপদী ভারতীয়তার মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। অন্যদিকে লৌকিক রূপরীতির সারল্য ও সুষমাকে একই সঙ্গে ধ্রুপদী প্রশান্তি ও আধুনিকের জটিলতার রূপায়ণে সফলভাবে ব্যবহার করেন মীরা মুখার্জি।

প্রথম প্রজন্মের এই অর্জনকে আরো পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যান দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্কররা ষাট ও সত্তর দশক জুড়ে। ষাটের দশক চিত্রকলার ক্ষেত্রে যতটা বৈচিত্র্যের সন্ধান দিতে পেরেছিল, যতটা আত্ম-আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ততটা পারে নি। ভাস্কর্যের শিল্পীদের তখন ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল রূপাবয়বের কিছু মূলগত সমস্যা নিয়ে। ফলে বিমূর্ততার উপর জোর পড়েছিল। বস্তুর অবয়বকে কি করে শিল্পের অনির্বচনীয়তায় উদ্ভাসিত করা যায়, যাতে তা প্রতিষ্ঠিত রূপভঙ্গিগুলির পুনরাবৃত্তি না হয়ে এই সময়ের সংবিৎকে আত্মস্থ করতে পারে, সেই চেষ্টার মধ্য দিয়ে ষাট ও সত্তর দশকের ভাস্কররা নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

করছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঝোঁক ছিল বিশুদ্ধ রূপ বা বিমূর্ততার দিকে। কেউবা চলমান জীবনপ্রবাহ থেকে তুলে আনছিলেন রূপের ইঙ্গিত। বা জীবনেরই বিশ্লেষণ খুঁজছিলেন ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে। আর এই সন্ধানের মধ্য দিয়ে সীমিত ক্ষেত্রে হলেও ভারতীয় স্বাতন্ত্র্যের একটা ইঙ্গিত উঠে আসছিল। চিত্রকলার মতো এত ব্যাপকভাবে না হলেও আত্ম-আবিষ্কারের একটা প্রক্রিয়া চলতে থেকেছে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও।

ষাটের দশকে একটা প্রতিবাদী চেতনার আবহ ছিল, আদর্শের ভিত্তিও ছিল অনেক দৃঢ়। সেই প্রেরণা ভাস্করদেরও উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মূলগত কিছু সমস্যা গোড়া থেকেই ছিল। যেমন পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। আমাদের এই দরিদ্রের দেশে ভাস্কর্যের মতো ব্যয়সাপেক্ষ শিল্পের চর্চা বিলাসিতা বলেই গণ্য হয়। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ষাট ও সত্তর দশকের শিল্পীরা কাজ করে গেছেন। আদর্শের ভিত্তি দৃঢ় ছিল বলে, একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হলেও, ভাস্কর্যের চর্চা ব্যাপ্তি পেয়েছিল দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্করদের হাতে। নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যে ও স্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পেরেছিল।

তৃতীয় প্রজন্মের ভাস্কররা মোটামুটি একটা প্রস্তুত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। তাতে তাঁদের সুবিধেও যেমন হয়েছিল, তেমনি সমস্যাও দেখা দিয়েছিল। সুবিধে এই যে তাঁদের সামনে এগোনোর পথটা কিছুটা স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল। আর সমস্যা এই যে পরিচিত পথে স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান দুরূহ। এই বাস্তবতার মধ্যেই তৃতীয় প্রজন্মের ভাস্করদের কাজ করতে হয়েছে। তাঁদের তৃতীয় প্রজন্ম বলছি এজন্য যে সত্তর ও আশির দশকে বিভিন্ন শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রে তাঁরা শিখেছেন দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্করদের কাছে, অর্থাৎ ষাটের দশকে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। চল্লিশ দশকে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রথম প্রজন্মের ভাস্কররা তৈরি করেছেন দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্করদের, ষাট ও সত্তর দশকে যাঁরা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন। তাঁদের কাছেই আবার শিক্ষা পেয়েছেন পরবর্তী প্রজন্ম, অর্থাৎ তৃতীয় প্রজন্ম, সত্তরের শেষ ও আশির দশকে যাঁদের প্রতিষ্ঠা। আমরা এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়সীমাকে মেনে নেব। তাঁদেরই বলব তৃতীয় প্রজন্মের ভাস্কর যাঁদের জন্ম মোটামুটি স্বাধীন ভারতে অর্থাৎ ১৯৪৭-এর পরে।

১৮৩· ধ্রুব মিস্ত্রী। চলন্ত মানুষ। ১৯৮১।

প্রথম প্রজন্মের ভাস্কর হিশেবে, পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা গণ্য করেছি তাঁদের, যাঁদের জন্ম ১৯০০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭-এর আগে যাঁদের জন্ম তাঁদের ধরেছি দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্কর হিশেবে। সেই সূত্র ধরেই ১৯৪৭-এর পরে ১৯৬০ বা ৬৫ পর্যন্ত যাঁদের জন্ম তাঁরাই আলোচ্য হবেন তৃতীয় ও নবীন প্রজন্মের ভাস্করের

ক্ষেত্রে।

আশির দশকে সারা ভারতেই চিত্রকলার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। এর আগে শিল্পকলার সঙ্গে অর্থনীতির প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। বিক্রি করার জন্য ছবি আঁকার কথা ভাবতে পারতেন তখন খুব কম শিল্পীই। ছবি আঁকা জীবিকা হতে পারে নি তখন। আশির দশকের শুরু থেকে ধীরে ধীরে ছবির একটা বাজার তৈরি হল। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও ধনিক শ্রেণী ছবি কিনতে উৎসাহী হলেন, ফলে শহরে শহরে শিল্প-বিপণন কেন্দ্র বা আর্ট গ্যালারি গড়ে উঠল। এর ফলে কিছু শিল্পী উপকৃত হলেন ঠিকই, কিন্তু সেই বাজার এতটা প্রসারিত হল না যাতে সকলের কাছে পৌঁছয় সে সুযোগ। অনেকে সেই একই তিমিরে রইলেন, কিন্তু বাজারের অগ্রগতি শিল্পীর আদর্শের ভিতটিকে শিথিল করল। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী তরল ছবির দিকে ঝোঁক গেল অনেকের।

এই তরলতা ভাস্কর্যকে তেমন স্পর্শ করে নি। কেননা, ছবির পাশাপাশি ভাস্কর্যের কোনো বাজার তৈরি হয় নি। আগের তুলনায় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার পরিমাণ বেড়েছে সামান্য। তাতে কিছু ভাস্কর হয়তো উপকৃত হয়েছেন, কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশেষ পালটায় নি। ফলে এখনো যাঁরা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে আসেন, তাঁরা বস্তুগত সফলতার আশা বিশেষ রাখেন না। শিল্পের টানেই তাঁরা আসেন। সেজন্য কিছুটা তন্নিষ্ঠ চর্চা ভাস্কর্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে এখনো সজীব রেখেছে। আশির দশক ও তার পরবর্তী সময়ে ছবির তুলনায় চর্চার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, ভাস্কর্যের খানিকটা বিকাশই আমরা দেখতে পাই।

এই বিকাশের তিনটি দিক লক্ষ করা যায়। প্রথমত, মাধ্যম ও প্রকরণের বৈচিত্র্য। তৃতীয় প্রজন্মের শিল্পীরা ভাস্কর্যের প্রথাগত কয়েকটি মাধ্যমের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকলেন না। অনেক অপ্রচলিত বস্তুকে তাঁরা আনলেন ভাস্কর্যের মাধ্যম হিশেবে। তেমনি প্রকরণেও এল বিবর্তন। আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও প্রসারিত হল অনেক। দ্বিতীয়ত, ভাস্কর্যের

১৮৪· সোমন, কে এস। টেরাকোটা। ১৯৮৫।

সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবন ও বাস্তবতার সংযোগ ঘটল অনেক বেশি। জীবনের ছোট ছোট সুখ, দুঃখ আশা ও হতাশা হয়ে উঠতে পারল ভাস্কর্যের বিষয়। শিল্পীর প্রতিবাদী চেতনা বা সামাজিক দায়বোধ গুরুত্ব পেল বেশি। এই দায়বোধকে প্রকাশ করার জন্য আঙ্গিকেও ঘটল বিবর্তন। তৃতীয়ত, আঙ্গিকের ভিতর দিয়ে আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টা আরো প্রগাঢ় হল। পাশ্চাত্য আধুনিকতার অনুসরণের বাইরে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রসারণের যে চেষ্টা প্রথম প্রজন্ম থেকেই ছিল সেই নান্দনিক ও দার্শনিক প্রত্যয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন তৃতীয় প্রজন্মের ভাস্কররাও।

এই তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে তৃতীয় বা নবীন প্রজন্মের ভাস্কর্যকে বোঝার চেষ্টা করব আমরা।

দুই

বৈচিত্র্য

কাঠ, পাথর, মাটি বা ব্রোঞ্জ এরকম কয়েকটি প্রথাগত পদার্থই ভাস্কর্যের একমাত্র মাধ্যম নয় যে কোনো জিনিশ দিয়েই ভাস্কর্য করা সম্ভব এটা ইওরোপের আধুনিকতাতে অনেক আগেই আমরা দেখেছি। আমাদের দেশে ষাটের দশক পর্যন্ত কোনো কোনো ভাস্কর রীতি-বহির্ভূত মাধ্যম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও, সত্তর দশক থেকেই এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক প্রসারিত হতে থাকে। বরোদার নবীন প্রজন্মের ভাস্কররা এরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মনোযোগী হয়ে এই প্রথা বিরোধী রীতিতে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জনক ঝনক নারজারি, ললিত গুপ্ত, লতিকা কাট (১৯৪৮), দীপক কান্নাল, গুফ্রান কিদওয়াই, রামনিক কানেরিয়া, ধ্রুব মিস্ত্রী (১৯৫৭) প্রমুখ। রতন পরিমু 'নিউ স্কাল্পচার ফ্রম বরোদা' নামে এই ভাস্করদের উপর এক প্রবন্ধে (ললিতকলা কন্টেম্পোরারি, ২৮ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯) বলেছেন এদের কাজ ততটা বৌদ্ধিক বা মস্তিষ্ক-প্রসূত নয় যতটা মানবিক ও মননধর্মী। মাধ্যম ও রূপাবয়ব নিয়ে খেলার ভঙ্গিতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে করতেই এরা গড়ে তোলেন এক একটি ভাস্কর্য।

এদের কয়েকটি কাজ একটু নিবিষ্টভাবে দেখলেই এদের বৈশিষ্ট্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি। রামনিক কানেরিয়া ক্যানভাসের উপর প্লাস্টারে 'বুল' নামে একটি ষাঁড়ের মূর্তি গড়েন। প্রথাগত ভাস্কর্য থেকে এটা একেবারেই আলাদা। মনে হয়, যেন কতগুলো ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো বিস্রস্তভাবে সন্নিবেশিত হয়ে অনেকটা দ্বিমাত্রিকভাবেই ষাঁড়ের আদল এনেছে। মহেঞ্জোদারোর প্রত্ন-প্রতিমা সঞ্জাত যে বলিষ্ঠ ষাঁড় যুগ যুগ ধরে ভারতীয় ভাস্করদের কাছে নিরুচ্ছ্বাস সংহত শক্তির প্রতীক হয়েছে, সেই প্রত্ন-প্রতিমাই যেন যুগোপযোগী বিবর্তনে নতুন রূপ পেল। সমস্ত অন্ধকারকে আত্মস্থ করে হয়ে উঠল প্রতিবাদী চেতনার প্রতীক স্বরূপ।

লতিকা কাট (১৯৪৮) বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭১-এ ভাস্কর্যে স্নাতক শিক্ষাক্রম শেষ করেন। ১৯৭৫-এ বরোদা থেকে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম শেষ করে ১৯৭৫ থেকে ৭৮ সেখানেই অধ্যাপক ও প্রখ্যাত ভাস্কর মহেন্দ্র পাণ্ড্যর অধীনে গবেষণা করেন। সত্তর দশকে তাঁর কাজে মুখোশের প্রাধান্য ছিল। মানুষের মুখের স্বাভাবিক কাঠামোটি যেন দ্রবীভূত হয়ে যেতে যেতে এক বিপন্ন করুণায় পর্যবসিত হত। ব্যক্তিত্বের যেন কোনো স্পষ্ট আদল নেই। সময়ের তাপ তাকে পুড়িয়ে গলিয়ে নিঃসীম শূন্যতার দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। কোনো কিছুই তার স্পষ্ট আদলে থাকছে না, দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে এই বোধ তাঁর পরবর্তী ভাস্কর্যেও কাজ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৮১-র 'গ্রোথ-১' নামের অ্যালুমিনিয়াম ও কালো মার্বল-এর কাজটির উল্লেখ করা যায়। কালো মার্বলটি দেয়াল বা স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তারও শরীর থেকে স্ফীতির মতো বিভিন্ন অংশ নির্গত হচ্ছে। সেই স্তম্ভের তলায় অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি একটি শরীর অর্ধশায়িত পড়ে আছে। তাঁর শরীরের গ্রোথ বা বিস্ফার যেন কর্কটরোগাক্রান্ত এই সময়ের প্রতীক হয়ে উঠতে চায়।

বরোদা-র প্রসঙ্গ দিয়েই যখন শুরু করা হল তখন ধ্রুব মিস্ত্রীর (১৯৫৭) কাজের কথাও এখানে বলে নেওয়া যায়, যদিও লতিকা কাটের তুলনায় বয়সে তিনি অনেক নবীন। তাঁর ১৯৭৮-এর একটি প্লাস্টারের কাজে দেখি একটি মানুষের শরীর ও ঘনকাকার একটি ব্লক মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সেই ব্লকটির ভিতর থেকেই নির্গত হচ্ছে শরীরের বিভিন্ন অংশ। সুররিয়ালিস্টধর্মী এই কাজটিতে রূপাবয়বের নিঃসীম ভাঙন বা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যে করুণায় ১৮৩ পৌঁছুতে চেয়েছেন, অনেকটা সেই একই রকম করুণার সঞ্চার ঘটে ১৯৮১-র 'ওয়াকিং ম্যান' শীর্ষক ফাইবার গ্লাসের

পূর্ণাবয়ব এক নগ্ন পুরুষের মূর্তিতে। এই কাজটিতে মানুষের মূর্তিকে কোনোভাবেই আদর্শায়িত করা হয় নি, কোনোরকম ভাঙন বা বিকৃতিকরণও ঘটে নি। উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে মানুষের নগ্ন সত্তার যে প্রকাশ ঘটেছে সেটাই এক প্রগাঢ় শূন্যতাকে মেলে ধরছে। ফাইবার গ্লাস এই প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে বহুল-ব্যবহৃত মাধ্যম হয়ে উঠতে থাকে। প্রকরণ ও আঙ্গিকের বিশেষ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই প্রতিবাদী চেতনার স্ফূরণ ঘটেছে এখানে। তৃতীয় প্রজন্মের ভাস্কর্যের এটা একটা বৈশিষ্ট্য।

ভাস্কর্য ত্রিমাত্রিক বলে তার একটা সলিডিটি বা কাঠিন্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এরকম প্রচলিত ধারণাকে নস্যাৎ করে দেন মৃণালিনী মুখার্জি (১৯৪৯) তাঁর সুতো, দড়ি বা তন্তু দিয়ে তৈরি ভাস্কর্যে। মৃণালিনীও বরোদার ছাত্রী। ১৯৭০-এ সেখানকার স্নাতক। পরে কে· জি· সুব্রামনিয়ন-এর কাছে ম্যুরাল ডিজাইন শেখেন। দড়ি বা সুতো দিয়ে বুনে বুনে তিনি দেয়ালে ঝোলানোর জন্য করেন যখন 'দেবী', 'শিমুল ফুল', বা 'কলা গাছ'-এর মতো ভাস্কর্য, তখন তা এক স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের বিন্যাস ঘটায়। লৌকিক রীতিতে এরকম কাজের প্রচলন যদিও আছে, কিন্তু একে আধুনিক সৃজনশীল ভাস্কর্যের স্তরে তুলে আনার কৃতিত্ব মৃণালিনী মুখার্জির।

১৮২

১৮৫· গোপালপ্রসাদ মণ্ডল। কালো পদ্ম। অ্যালুমিনিয়াম। ১৯৮৫।

১৮৬· অমিতাভ ভৌমিক। প্রিস্ট হেড। মার্বল।
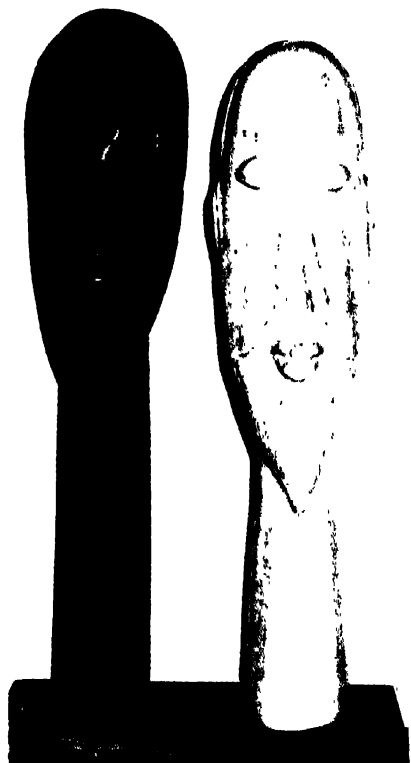
১৮৭· গোপালপ্রসাদ মণ্ডল। দা লেডি উইথ আইসক্রিম। টেরাকোটা। ১৯৯১।

ভাস্কর্য একটি ত্রিমাত্রিক ও দীর্ঘস্থায়ী আয়তনিক ঘনবস্তু না হতেও পারে, তা হতে পারে নৃত্য ও অভিনয়ের মতো ক্ষণস্থায়ী। পাশ্চাত্যে অনেক আগেই তা ঘটেছে। আমাদের দেশে রত্নাবলী কান্ত সম্প্রতি নৃত্য ও ভাস্কর্যের সম্মিলন ঘটিয়ে এক অভিনব রূপ সৃষ্টি করছেন। ভাস্কর্য ও নৃত্য দুটি মাধ্যম নিয়েই রত্নাবলী দীর্ঘদিন তন্নিষ্ঠ চর্চা ও গবেষণায় নিমগ্ন। ভাস্কর্যে শান্তিনিকেতন কলাভবন থেকে স্নাতক ও বরোদা থেকে ১৯৭৯-তে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম শেষ করে তিনি ইওরোপ ও আফ্রিকায় বিস্তীর্ণ ভ্রমণ ও ভাস্কর্যের গবেষণামূলক উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি চলে আশৈশব নৃত্যের চর্চা। নৃত্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয় যে অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য ও ছন্দের বৈভব, তাকেই দুটি স্বতন্ত্র মাত্রা হিশেবে ভাস্কর্যের মধ্যে তিনি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভাস্কর্যকে নিছক বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত রূপবন্ধের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হিশেবে তিনি দেখেন নি। সমকালীন জীবনধারার সংক্ষুব্ধ সংঘাতে তাকে স্পন্দিত করতে চেষ্টা করেছেন। মঞ্চের উপর ভাস্কর্যধর্মী নৃত্যনাট্যের উপস্থাপনাও করে থাকেন তিনি যেখানে নৃত্য ও ভাস্কর্য একাকার হয়ে দুটি শিল্পরূপের সম্ভাবনাকেই অনেক প্রসারিত করে।

একই ভাস্কর্যে একাধিক মাধ্যম ব্যবহার করেন আজকাল অনেকেই। সুনীলকুমার দাস (১৯৫২) যখন থেকে ফাইবার গ্লাশের সঙ্গে কাঠ বা পাথর মিলিয়ে রচনাবদ্ধ পরিকল্পনা শুরু করেন তখন এটা খুব বেশি প্রচলিত ছিল না। দুটি

মাধ্যমকে মিলিয়ে সুন্দর এক কৌতুক রস সৃষ্টি করেন তিনি। একটি ঘোড়া পা উপরে তুলে শুয়ে আছে বা একটি ছাগল বসে আছে— তাদের শরীর ফাইবার গ্লাশে তৈরি কিন্তু মাথাটি কাঠ বা পাথর কেটে গড়া। এই সমন্বয় কৌতুকের সঙ্গে করুণাও জাগায়। আর এই করুণার মধ্য দিয়ে শিল্পী তাঁর প্রতিবাদী চেতনাকে প্রকাশ করেন। সমাজচেতনা তাঁর কাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। চারপাশের জীবন থেকেই উঠে আসে তাঁর ভাস্কর্যের বিষয়; এজন্য তাঁর কাজ হয়তো একটু বর্ণনাত্মক হয় কিন্তু তা হয়ে ওঠে অসামান্য রসদীপ্ত ও ব্যঞ্জনাময়। কলকাতার সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস-এর সদস্য এই শিল্পীর কাজ নিয়মিত প্রদর্শিত হয় সোসাইটির প্রদর্শনীতে। আঙ্গিকের বিশিষ্টতা ও দায়বোধে সুনীল একজন বিশিষ্ট ভাস্কর হিশেবে গণ্য।

১৯৭৫-এ কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেরোনোর পর থেকে তাপস সরকার (১৯৫৩) শৈল্পিক ও সাংগঠনিক নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রতিনিয়ত নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। শিল্পীসত্তা ও কর্মীসত্তার সফল সমন্বয় ঘটেছে তাঁর মধ্যে। ১৯৮৩ ও ৮৪-তে কলকাতায় ব্রিটিশ কাউন্সিল ও মিউজিয়ামের আশুতোষ হলে তিনি দুটি প্রদর্শনী করেন স্ক্র্যাপ মেটাল বা ভাঙা পরিত্যক্ত লোহার টুকরো ও যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি ভাস্কর্যের। স্ক্র্যাপ মেটালের ভাস্কর্য অবশ্য ইওরোপে বহু আগেই প্রচলিত, তবু তাপস এদের মধ্যে যে লিরিসিজম বা কাব্যিক ব্যঞ্জনা এনেছিলেন মাধ্যমের কর্কশতাকে অতিক্রম করে তা খুবই আকর্ষণীয়। মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে তিনি অনেক কাজ করেছেন। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে সিলভার জুবিলি মনুমেন্ট হিশেবে ৪২ ফুট উচ্চতার 'অর্জুন' নামে একটি ভাস্কর্য করেন তিনি ১৯৮৫-তে। ইস্পাতের পাত ওয়েলডিং-এর সাহায্যে জুড়ে জুড়ে এটি তৈরি। ১৯৯২-তে কলকাতার পার্ক

১৮৮· সুনীলকুমার দাস। মংরু-১। ফাইবার গ্লাস ও পাথর। ১৯৯৩।

১৮৯· তাপস সরকার। ব্রোঞ্জ। ১৯৮৮-৮৯।

স্ট্রিট ও ক্যামাক স্ট্রিট-এর সংযোগস্থলে 'ফ্যামিলি উইথ আ ড্রিম ডল' নামে ১৭ফুট × ৯ফুট উচ্চতার ফাইবার গ্লাশের ভাস্কর্যটি ছাড়াও দার্জিলিং, রায়গঞ্জ, রাঁচি, দিল্লি, ফারাক্কা ইত্যাদি নানা জায়গায় তিনি করেছেন বা এখনো করছেন নানা ধরণের মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্য।

এখানে উল্লেখ করা যায়, কলকাতায় ১৯৯৪-তে দশ জন ভাস্করকে নিয়ে গড়ে ওঠে 'ক্যালকাটা স্কালপটরস' নামে যে সংঘ তার অন্যতম উদ্যোক্তা ও সম্পাদক তাপস সরকার। ষাট ও সত্তরের দশকে চিন্তামণি করের নেতৃত্বে কলকাতায় ক্রিয়াশীল ছিল 'স্কালপটর্স গিল্ড' নামে ভাস্করদের সংঘ। তারপরে 'ক্যালকাটা স্কালপটর্স'-ই কলকাতায় শুধুমাত্র ভাস্করদের যৌথ সংগঠন। এর সদস্যদের মধ্যে আছেন উমা সিদ্ধান্ত (সভাপতি) (১৯৩৩), দেবব্রত চক্রবর্তী (১৯৩৫), সুরজিৎ দাস (১৯৩৫), দিলীপ সাহা (১৯৪৪), অনিল সেন (১৯৫১), তাপস সরকার (১৯৫৩), সন্দীপ চক্রবর্তী (১৯৬১), সুদর্শন পাল (১৯৫৮), প্রবীরকুমার দাস (১৯৬৩) ও কৌশিক পাল (১৯৬৫)।

আঙ্গিক ও প্রকরণের বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখেন আকু (১৯৫৩)। তাঁর জন্ম বেনারসে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা নেন যথাক্রমে ১৯৭৭ ও ১৯৭৯-তে। আকুর রচনা মূর্ততা ও বিমূর্ততার মধ্যবর্তী স্তরের। নরম মাটিতে আঙুলের সংবেদনময় স্পর্শে তিনি গড়ে তোলেন ছোট আয়তনের স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ। কেবলমাত্র চামড়া দিয়ে বা চামড়ার সঙ্গে অন্য মাধ্যম মিলিয়ে তিনি তৈরি করেন গতানুগতিকতার বাইরের অসামান্য সব রূপ যার মধ্যে আদিমতা ও প্রত্ন-প্রতিমার সংহতি মিশে অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ ঘটে। ৫৫ ১৯৯

তাঁর স্ত্রী সোমা-র (১৯৬০) কাজও একটু স্বতন্ত্র ধরণের। সোমা ১৯৮৫-তে শান্তিনিকেতন কলাভবন থেকে এম ফাইন শিক্ষাক্রম শেষ করেছেন। ১৯৮৩-তে কলকাতায় মুখাবয়ব নিয়ে একটি ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর পর ১৯৮৮-র প্রদর্শনীতে তিনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে কাজ করেন। টেরাকোটার কাজগুলোতে যৌবনের স্ফুরিত শক্তিকে তিনি রূপ দেন। পুরুষ ও নারীর যৌবনের সমন্বয় নতুন সৃষ্টির উৎস। চিরসত্য এই বহুব্যবহৃত সূত্রটিকে উদ্ভাসিত করে সোমা বুঝতে চেষ্টা করেছেন আধুনিক জীবনের গহন জটিলতাকে। ২০২

জম্মুর রাজেন্দর কুমার টিকু (১৯৫৩) কাঠ ও পাথর দিয়ে অভিনব এক ধরণের ভাস্কর্য করেন যা বিমূর্ত হলেও ভারতীয় লৌকিক জীবনকে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করে তোলে। ১৯৪

পাথরের সঙ্গে ধাতুকে মিলিয়ে মানুষের মুখাবয়ব অবলম্বন করে ধ্রুপদী রূপবিন্যাসের দিকে যান গোপীনাথ রায় (১৯৫৩)। নানারকম অপ্রচলিত সিনথেটিক পদার্থও তিনি ভাস্কর্যের মাধ্যম হিশেবে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেন। ২০৪

দিল্লির সি জগদীশ (১৯৫৬) শুধুমাত্র খবরের কাগজ বা অন্য কাগজ দিয়ে অদ্ভুত কৌতুকদীপ্ত এক ধরণের ভাস্কর্য করেন। জগদীশ-এর জন্ম হায়দ্রাবাদে। ১৯৭৮-এ তিনি চিত্রকলায় ডিপ্লোমা নেন। তারপর ম্যুরাল শেখেন। কিন্তু এই নতুন রীতির ভাস্কর্যে তিনি অসামান্য স্বকীয়তার পরিচয় দিচ্ছেন। ১৯৯০-এর জাতীয় প্রদর্শনীতে ও ১৯৯১-এর ত্রিয়েনাল-এ তাঁর একটি কাজ ছিল 'লং ডে জার্নি ইনটু নাইট'। একটি ঘোড়া, তার পিঠে চেপেছে তিনজন নারী-পুরুষ। সামনে ঘোড়ার গলার দড়ি ধরে লাঠি হাতে ধুতি ও কোট পরিহিত মুণ্ডিত-মস্তক এক পুরুষ। পাশে হেঁটে চলেছে একটি কুকুর। পুরো কাজটিতে সারল্য ও কৌতুকের মধ্যে গ্রামীণ ভারতীয় জীবনের পরিমণ্ডল এত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যে মুগ্ধ হতে হয়। শুধু কাগজ দিয়ে এত সহজ অথচ এত অভিনব ভাস্কর্য আর হয়েছে কিনা সন্দেহ। ১৯৬

কেরালার এন· এন· রিমজন (১৯৫৭) আঙ্গিক ও অভিব্যক্তি দুদিক থেকেই খুব অভিনব কাজ করেন। ১৯৮২-তে তিনি ত্রিবান্দ্রাম থেকে ভাস্কর্যের স্নাতক। ১৯৮৯-তে লন্ডনের রয়াল কলেজ অব আর্ট থেকে স্নাতকোত্তর শিক্ষা নেন। তাঁর কাজে একটা মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি আছে। কেবল এক বা একাধিক মূর্তির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকে না। তাঁর 'ব্লু মুন ইন অক্টোবর' নামের ১৯৮৯-এর ভাস্কর্যটি প্লাস্টার, লোহা, কাঠ ও চারকোল দিয়ে তৈরি। নীচে একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের মধ্যে সংবেদনময় স্ফুরিত-যৌবনা এক নগ্নিকা নারী উপবিষ্ট, তার পেছনে বসে আছে এক পুরুষ। তাদের মাথার উপরে কাঠ ও লোহার অনেক বড় ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তাংশ। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেয়ালে চারকোলে এঁকে বৃত্তটি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। অবয়বের তুলনায় অনেক বড় এই বৃত্তের উপস্থাপনা জীবনকে যেন আকাশের ব্যাপ্তি দিয়েছে। এভাবেই ১৯৯৩-এর 'দ্য টুলস' নামে কাজটিতে মেঝের উপর বৃত্তাকারে ছড়িয়ে রাখা আছে অজস্র হাতে কাজ করার যন্ত্র। আর তার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে ফাইবার গ্লাশে তৈরি এক নগ্ন পুরুষ। তার হাতদুটি মাথার উপর একত্রে রাখা প্রণামের ভঙ্গিতে। সমগ্র উপস্থাপনার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতার অনুষঙ্গ অনুভব করা যায়। র-২২

এই আধ্যাত্মিক ব্যাপ্তি, ভাস্কর্যকে গভীর ভাব ও ব্যঞ্জনার বাহক ও দ্যোতক করে তোলার প্রয়াস তৃতীয় ও নবীন প্রজন্মের ভাস্কর্যের একটি বৈশিষ্ট্য। আসামের এক তরুণ শিল্পী প্রদীপ মহন্ত কাঠ ও তার সঙ্গে নানা ব্যবহার্য বা অব্যবহার্য পরিত্যক্ত জিনিশ জুড়ে টোটেম পোলের মতো যে ভাস্কর্য করেন তাতে দেশীয় সংবিতের গভীর স্পর্শ থাকে।

১৯৮

এইভাবে মাধ্যম ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তরুণ শিল্পীরা ভাস্কর্যে এক নতুন মাত্রা আনার চেষ্টা করছেন।

তিন

জীবন

ফর্ম বা রূপাবয়বের বিশুদ্ধতা, ফর্মের ভিতর দিয়ে দেশের নান্দনিক ঐতিহ্য ও দর্শনচেতনার সারাৎসারকে তুলে ধরা ভাস্কর্যের এটা একটা অনিবার্য মাত্রা। এর পাশাপাশি সময়ের প্রতিফলনকেও আত্মস্থ করে নেয় ভাস্কর্য রূপাবয়বেরই অনুষঙ্গে। আমাদের সমকালীন ভাস্কর্যে এই দুটি কাজ পাশাপাশি চলেছে। ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠত্বের একটা লক্ষণ হয়তো এই দুটি দিককে মিলিয়ে নিতে পারা। রামকিঙ্করের ভাস্কর্যে যেমন এই দুই মাত্রা অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গেছে।

চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের ভাস্কররা জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানের জন্যই হয়তো রূপের শুদ্ধতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশি। ভাস্কর্যকে বর্ণনাত্মক করে সেই শুদ্ধতাকে তাঁরা ব্যাহত করতে চান নি। আবার এও সত্যি ফর্মের অনির্বচনীয়তার মধ্যেও কেউ কেউ খুবই সফলভাবে আনতে পেরেছেন চলমান জীবনের আলোড়ন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তাঁদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে। অমরনাথ সেহগাল, সোমনাথ হোর বা মীরা মুখার্জি যার অনন্য দৃষ্টান্ত।

সত্তর দশক পর্যন্ত পৌঁছাতে আমাদের ভাস্কর্য আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনেকটাই আয়ত্ত করতে পেরেছে। ফলে আশির দশকের তরুণ শিল্পীরা প্রসারিত করতে পেরেছেন তাঁদের সন্ধানের সীমা। রূপের শুদ্ধতার পা সময়ের বাস্তবতাকেও তাঁরা করে তুলেছেন ভাস্কর্যের অন্যতম বিষয়। দায়বোধ ও প্রতিবাদী চেতনার উপর অ...াই জোর পড়েছে তৃতীয় প্রজন্মের ভাস্কর্যে। এই প্রতিবাদীচেতনা তৃতীয় প্রজন্মের ভাস্কর্যের একটি বিশেষ দিক। তৃতীয় প্রজন্মের ভাস্করদের অনেকেই এখনো রয়েছেন প্রস্তুতি-পর্বে। চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময় হয়তো এখনো আসে নি। তবু একথা বলা যায় জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ তাঁদের কাজে গভীরতার মাত্রা আনে।

দিল্লির অমিতাভ ভৌমিক (১৯৪৭) যখন কালো ও শাদা মার্বলে গড়েন 'প্রিস্ট হেড' (১৯৯০) নামে দুটি মুখ তখন মদিগলিয়ানি অনুপ্রাণিত ডিম্বাকৃতির সারল্যের মধ্যেও অভিব্যক্তিতে অনুপ্রবেশ করে যে জটিলতা তা খুব তির্যকভাবে ধর্মীয় মৌলবাদের প্রতি কটাক্ষ করে। রূপাবয়বের আন্তর্জাতিকতা দিয়ে শিল্পী এখানে এমন এক সামাজিক সত্যকে প্রতিফলিত করেন যা একই সঙ্গে স্বদেশ ও বিশ্বকে মিলিয়ে দিতে পারে।

গোপাল প্রসাদ মণ্ডলের (১৯৪৯) পাথর ও ব্রোঞ্জের কাজের ধারায় ধ্রুপদী রূপচেতনারই যদিও প্রাধান্য, যেখানে প্রকৃতি থেকে জীবনের যে প্রস্ফুটন সেই বিমূর্ত প্রত্যয়কেই আয়তনিক দৃশ্যতার ভাষায় তিনি খোঁজেন, যে সম্পর্কে একটু বিস্তৃতভাবে পরবর্তী অংশে আমরা আলোচনা করব, কিন্তু তাঁর টেরাকোটায় তিনি অনেক প্রত্যক্ষভাবে চলমান জীবন ও সমাজবাস্তবতার কাছাকাছি আসতে পারেন। তির্যক শ্লেষ ফুটে ওঠে সেখানে। 'আউলস অব ক্যালকাটা' নামে টেরাকোটায় যেমন প্যাঁচার শরীরে মানুষের মুখের সমাহার ঘটে। 'এগ সেলার'-এ বিক্রেতা নারী যে ডিমের পসরা সাজিয়ে বসে তার গায়ে আঁকা থাকে রাজনৈতিক দলের প্রতীক। 'হোলি মিশন'-এ কলকাতার পথের ভিক্ষুক হয়ে ওঠে যিশুর উপমান।

গোয়ালিয়রের চন্দ্রসেন যাদব (১৯৫২) মার্বলে করেছিলেন 'দ্য ইভ' নামে ভাস্কর্যটি (১৯৯০)। সপ্তম ত্রিয়েনালেতে প্রদর্শিত হয়েছিল। একটি কালো আয়তক্ষেত্রাকার বড় ব্লকের উপর রাখা আছে তিনটি পুরুষের মুখমণ্ডল শাদা মার্বলে তৈরি, আর রয়েছে একটি শায়িত নারীর দেহকাণ্ড (টরসো) কাচ দিয়ে ঢাকা। এই চারটি প্রতিমাকল্পের সমন্বয়ে শিল্পী আভাসিত করেন এক সামাজিক বিপন্নতা।

১৮৭

সুনীলকুমার দাস (১৯৫২) সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি মাধ্যমের বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে।
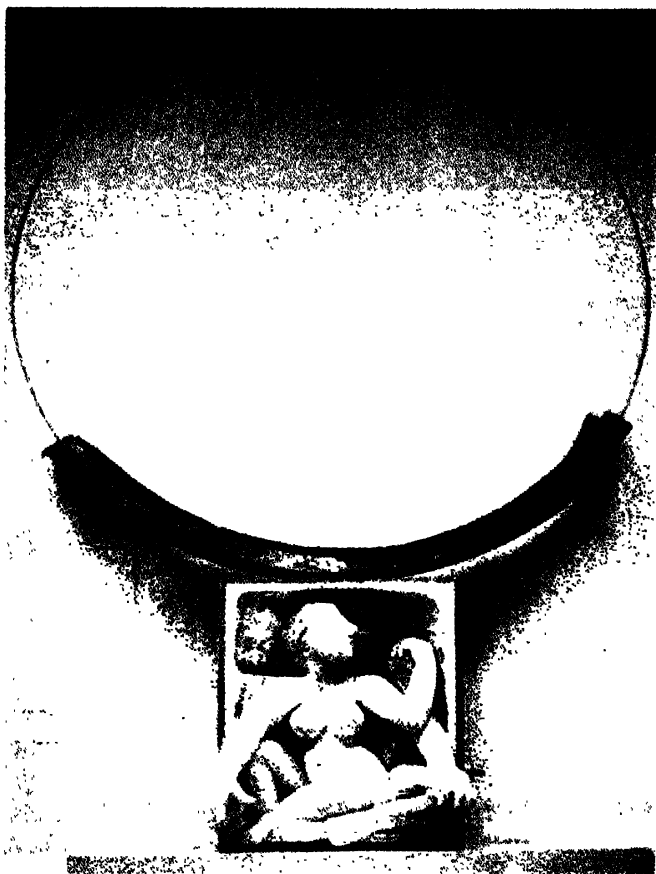
রঙিন ছবি ২২· এন· এন· রিমজন। ব্লু মুন ইন অক্টোবর। প্লাস্টার, লোহা, কাঠ, চারকোল। ১৯৮৯।

রঙিন ছবি ২৩· সুনীলকুমার দাস। গোট। ফাইবার গ্লাশ ও মার্বল। ১৯৮৪।

রঙিন ছবি ২৪· বিমল কুণ্ডু। কম্পোজিশন। ব্রোঞ্জ।

রঙিন ছবি ২৫· শ্যামল রায়। টেরাকোটা।

মাধ্যমের বৈচিত্র্য দিয়ে বা একাধিক মাধ্যমের সমন্বয়ে তিনি যেভাবে এই ক্ষয়িষ্ণু জীবনকে তুলে ধরেন তাতেই তাঁর কাজ বিশিষ্টতার মর্যাদা পায়। গ্রাম ও শহর উভয় জীবনের সঙ্গেই তাঁর সংযোগ নিবিড়। গ্রামের পথে যেতে যেতে কোনো বৃদ্ধাকে হয়তো তিনি দেখেন একটি গর্ভবতী ছাগল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। তিনি অনুভব করেন কেমন করে এই ছাগলটিই বৃদ্ধার জীবনের অর্থনীতি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এটাই হয়ে ওঠে তাঁর কাছে একটি ভাস্কর্যের বিষয়। ভাস্কর্যে রূপের অভিনবত্বের সঙ্গে লৌকিক জীবন, সামাজিক সমস্যাকে একাত্ম করে নিয়ে সুনীল ইতিমধ্যেই সমকালীন ভাস্কর্যের এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হয়ে উঠেছেন।

৭ ১৫

১৮৮

কলকাতার সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস-এর সদস্য বিমল কুণ্ডু (১৯৫৪) নিজের ভাস্কর্য সম্পর্কে বলেছেন,

"আমি ভাস্কর্যকে উপস্থাপিত করতে চাই তার সম্পূর্ণতায়। বিষয়ের থেকে সামগ্রিক আবেদনের দিকেই আমি মনোযোগ দিই বেশি। বিভিন্ন তল, বাঁক, আলো-ছায়ার বিন্যাসে উপস্থাপনার সমগ্রতাই আমার মূল বিষয়।"

অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভাস্কর্যগুণেরই সন্ধান করেন তিনি। বিশুদ্ধতার এই ধ্রুপদী চেতনাতে তাঁর রূপাবয়ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তলবিন্যাসের যে জ্যামিতিক কৌণিকতায় বিশ্লেষিত হয় তাতে কিউবিজমেরই প্রতিফলনের প্রাধান্য থাকে। যেমন কাঠ কেটে কেটে তিনি যখন নির্মাণ করছেন কোনো মানুষের মাথা, তখন তাতে মানুষের মুখাবয়বের গোল বা বর্তুল আকারের বদলে এসে যাচ্ছে বৃক্ষের চরিত্রসুলভ এক ধরণের আলম্ব বিন্যাস। বিভিন্ন তলগুলি উপর থেকে নীচে ঋজুভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। একটি তল আর একটি তলের সঙ্গে মিশে তীক্ষ্ণ সরলরেখা তৈরি করছে। এই জ্যামিতিক শুদ্ধতাই তাঁর কাজের মূলগত রস।

একটা প্রশান্তির দিকে তাঁর ঝোঁক সবসময়। 'ডিসকর্ড' নামে (১৯৮৩) প্লাস্টারে তৈরি করেন যখন তিনি পাশাপাশি বসে থাকা দুই নর-নারীর মূর্তি তখন তাদের অন্তর্লীন সংঘাতের মধ্যে মূর্ত থাকে এক বিপন্ন শূন্যতা। আবার 'খানসাহেব' (১৯৮৮) নামে সরোদ-বাদনরত শিল্পীর রূপায়ণে যে ধ্রুপদী আবেদন বা 'স্টিল-লাইফ' নামে (১৮৮৯) কাঠের স্তম্ভের উপরে উড়ন্ত একটি পাখির উপস্থাপনায় যে সুরের স্মিত অনুরণন সব কিছুই অতিরেকহীন প্রশান্তি ও নৈঃশব্দ্যের দ্যোতনা আনে।

কিন্তু এই নৈঃশব্দ্যের ভিতর দিয়েই তিনি চলমান জীবনপ্রবাহের মূল সুরটিকে ধরার চেষ্টা করেন। কলকাতায় সল্টলেকের নিকো পার্কে রয়েছে তাঁর 'বীরপুরুষ' নামে সিমেন্ট-কংক্রিটের বড় কাজ। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে বীরের বেশে এক শিশু। বা কাঁকুড়গাছির মোড়ে একটি ট্রাফিক আইল্যান্ডে তিনি করেছেন 'কলকাতা' নামে সিমেন্ট কংক্রিটের একটি বড় কাজ। কিছু যুবক-যুবতীর প্রতিমাকল্প নিয়ে নীচ থেকে উপর দিকে উঠে যাওয়া একটি রচনা। প্রশান্তি সর্বত্রই তাঁর মূল উপজীব্য। কিন্তু এই প্রশান্তির মধ্য দিয়ে চলমান জীবনপ্রবাহের আলোড়নই প্রতিধ্বনিত হয়। 'উইন্ডো' নামে (১৯৯১) ব্রোঞ্জ ও কাঠের একটি কাজে শিল্পী খুব সরলভাবে রূপ দেন পাশাপাশি কিছুটা ব্যবধানে রাখা আলম্ব দুটি কাঠের দণ্ডের উপরে আনুভূমিকভাবে একটি কাঠ লাগিয়ে যে কাঠামো তৈরি হয় সেই কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা নারী প্রতিমা। বিপন্নতার মধ্যে বন্দিনী নারীর রূপক হয়ে ওঠে কাজটি। এভাবেই বিমল কুণ্ডুর কাজে সমাজ-সত্যের ছায়া আসে কিন্তু তা নির্মাণের শুদ্ধতার মধ্য দিয়ে পরিশীলিত হয়ে ভাস্কর্যের মৌলিক আবেদনকেই উজ্জ্বল করে তোলে।

১৯০

১৯১

পাটনার রজতকুমার ঘোষ (১৯৫৬) মূলত টেরাকোটায় কাজ করেন। প্রথাগত লৌকিক রূপকে যেমন তিনি উপস্থাপিত করেন, তেমনি জীবনের দৈনন্দিনতার দৃশ্য-রূপও ফুটে ওঠে তাঁর কাজে। অজস্র অবয়ব নিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর রচনাবিন্যাস। সাধারণ জীবন-প্রবাহের সুখ-দুঃখ, আশা ও নিরাশাকে ফুটিয়ে তোলেন তিনি। তাঁর উপস্থাপনা একটু বর্ণনাধর্মী হলেও জীবনের উত্তাপে সমৃদ্ধ। এবং তাঁর কাজে রসবোধ এত স্বতঃস্ফূর্ত যে একটি প্রথাগত মাধ্যমের আবেদনকে তিনি অনেক বিস্তৃত করে নিতে পেরেছেন।

এই টেরাকোটা দিয়েই আলোড়িত সময়ের মহাকাব্য-প্রতিম ভাস্কর্য রচনা করেন কেরালার শিল্পী কে এস সোমন (১৯৫৬)। সোমন বরোদা থেকে ভাস্কর্যের স্নাতক শিক্ষাক্রম শেষ করেছেন ১৯৮২-তে। তারপর কিছুদিন তিনি কলকাতার ললিতকলা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতের বিস্তীর্ণ মন্দির ভাস্কর্য তাঁর প্রেরণার উৎস। সেই প্রেরণা নিয়ে তিনি চলে আসেন সমকালের সংক্ষুব্ধ জটিলতাকে রূপ দিতে। সময়ের প্রবাহের মতো তাঁর ভাস্কর্যও প্রবাহিত হয় ঘটনার পর ঘটনা-পরম্পরায় কিন্তু তাতে বাস্তবতার যুক্তিগ্রাহ্য বিন্যাস থাকে না। বরং সুররিয়ালিজমের আদলে

১৮৮

১৯১· *বিমল কুণ্ডু। মিউজিসিয়ান। প্লাস্টার। ১৯৯২।*

১৯০· *বিমল কুণ্ডু। বীরপুরুষ। সিমেন্ট। (নিকো পার্ক)।*

রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন একটি উড়ন্ত নারীর মুখ, তার শরীর নিয়ে নিয়েছে অট্টালিকার আদল। সেই ভিত্তি হয়ে উঠেছে একটি হাত যা ধরে রেখেছে স্তম্ভের উপর খেলনা ঘোড়ায় চড়া এক শিশু। সেই হাতটিই অন্যপ্রান্তে কনুইয়ের কাছে স্ফীত হয়ে একটি মুখে রূপান্তরিত হয়েছে। এরকম আপাতযুক্তির শৃঙ্খলাহীন বিন্যাসের মধ্য দিয়ে শিল্পী এই সংক্ষুব্ধ সময়ের আলোড়নকে রূপ দেন যার সঙ্গে অনেকটা সাযুজ্য অনুভব করা যায় ডস্টয়েভস্কীয় জগতের। সোমন ভাস্কর্যের প্রাথমিক সংজ্ঞাগুলোকেই যেন পালটানোর চেষ্টা করলেন। একক রূপকল্পে আবদ্ধ রইল না তাঁর ভাস্কর্য। ছবির বড় ক্যানভাসে যেভাবে আলোড়িত ও বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব রূপকল্প ও ঘটনাপুঞ্জকে, সেটা তিনি করেন ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে। বিক্ষোভ ও তীব্র সংঘাত তাঁর ভাস্কর্যকে এক মহাকাব্যিক মাত্রা দেয়, যার তুলনা সমকালীন ভাস্কর্যের এই প্রজন্মে বিরল।

সোমনের সমসাময়িক বর্তমানে দিল্লি নিবাসী কেরলের শিল্পী কে এস রাধাকৃষ্ণণের (১৯৫৬) ব্রোঞ্জেও অভিব্যক্তিময় প্রতিবাদী চেতনা প্রতিফলিত হয়। রাধাকৃষ্ণণ শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্র। সেখানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা শেষ করেছেন ১৯৮১-তে।

আরো একজন কেরালার শিল্পী এস রাধাকৃষ্ণণও (১৯৫৯) সোমনের মতো টেরাকোটাতে কাজ করেন। বাস্তবতার করুণাকে সুররিয়ালিজম-এর দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসে সোমনের সঙ্গে তাঁর কাজের কিছুটা সাযুজ্যও অনুভব করা যায়। ত্রিবান্দ্রাম আর্ট কলেজে তাঁর ভাস্কর্যের শিক্ষা। পরে কানহাই কুনহিরামনের কাছেও শিখেছেন। ভারতীয়

১৯২· রত্নাবলী কান্ত। নৃত্য ও ভাস্কর্যের সমন্বয়।

ঐতিহ্য-আশ্রিত মাধ্যম টেরাকোটাতে সমকালীন বাস্তবতার প্রতিবাদী ভাষ্য গড়ে তুলতে তাঁরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ১৯৮৬-র ষষ্ঠ ত্রিয়েনালে তাঁর একটি টেরাকোটা ছিল 'ফ্লুট অ্যান্ড সাইলেন্স' নামে। গাছের তলায় বেঞ্চে বসে ছোট একটি বাঁশি বাজাচ্ছে দীর্ঘায়ত এক নারী। নারীর অবয়ব ও সমগ্র পরিমণ্ডল ঘিরে এক করুণার বাতাবরণ। নৈঃশব্দ্য ও করুণায় আলোড়িত হতে থাকে সময়। এভাবেই বাস্তব ও বাস্তবোত্তীর্ণের মধ্যে, রিয়ালিজম ও সুররিয়ালিজমের মধ্যে এক সংযোগ রচিত হয়। সম্প্রতিকালে টেরাকোটা মাধ্যমটি অনেক প্রসারিত হয়েছে তৃতীয় প্রজন্মের অনেক শিল্পীর চর্চায়, সোমন ও রাধাকৃষ্ণণ তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমকালীন ভাস্কর্যে জীবনবোধ ও প্রতিবাদীচেতনা এভাবেই তরুণ শিল্পীদের কাজের একটি বিশেষ লক্ষণ হয়ে উঠছে। আগের তুলনায় সারা ভারতে ভাস্কর্যে এখন নিয়মিত কাজ করছেন এরকম শিল্পীর সংখ্যা অনেক বেশি। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে হলেও তাঁদের এই প্রয়াস একটি শুভলক্ষণ। সকলেই যে স্বকীয়তা ও নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি অর্জন করেছেন তা নয়। তবু নিয়মিত কাজ করছেন এরকম কয়েকজন সম্ভাবনাময় শিল্পীর নাম উল্লেখ করা যায়—যেমন, সুশান্ত রায় (১৯৫২), দিল্লির ওমপ্রকাশ খারে (১৯৫২) ও এম জি কিদওয়াই (১৯৫২), মাদ্রাজের বালসান কোল্লেরি (১৯৫৩), টি বিজয়ভেলু (১৯৫৪), বম্বের জে কে চিল্লার (১৯৫৪), আগরতলার মিলন বণিক, বম্বের উত্তম পাচারণে

১৯৩ স্বপন রায়। টেরাকোটা। ফ্লোইং অ্যাফেকশন। টেরাকোটা। ১৯৯২।

১৯৪ রাজেন্দ্রকুমার টিকু। দা রেলিক। কাঠ। ১৯৯১।

৯৫· অসিত দাস। দা কারাভান। ব্রোঞ্জ।

১৯৬· জগদীশ সিং। লং ডে জার্নি ইনটু নাইট। কাগজ। ১৯৯০।

১৯৭· *রামকুমার মান্না। ভাদু। টেরাকোটা। ১৯৯৩।*

১৯৮· *প্রদীপ মহান্ত। কাঠ ও মিশ্র মাধ্যম। ১৯৯৩।*

(১৯৫৫), মাদ্রাজের এন করুণমূর্তি (১৯৫৫), পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণকলি দত্ত (১৯৫৫), দিলীপ সরকার (১৯৫৫), ঋষি বরুয়া (১৯৫৮), সুকুমার ঘোষ (১৯৬১), সঞ্জীব নারায়ণ দত্ত (১৯৬১), নূপুর চ্যাটার্জি (১৯৬১), কৃষ্ণ গোস্বামী (১৯৬২), সুনন্দা দাস (১৯৬২), প্রবাল পট্টনায়ক (১৯৬২), দীপঙ্কর দত্ত (১৯৬৩), জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী (১৯৬৩), কিশোর চক্রবর্তী (১৯৬৩) প্রমুখ।

এই প্রতিবাদী চেতনার পেছনে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাস্করদের প্রভাব অনিবার্যভাবেই রয়েছে। সোমনাথ হোর বা মীরা মুখার্জি যেভাবে চলমান ঘটনাপ্রবাহের সারাৎসারকে ভাস্কর্যের বিষয় করে তোলেন এবং রূপের শুদ্ধতার মধ্য দিয়ে তাকে এক এক আধ্যাত্মিক অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে রূপারোপের অনির্বচনীয়তায় উদ্ভাসিত করে তোলেন, তার একটা গভীর প্রভাব নবীন প্রজন্মের মধ্যে কাজ করেছে। কাজেই প্রতিবাদী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপের শুদ্ধতার সন্ধানটাও রয়ে গেছে। ভাস্কর্যের মধ্যে সময়ের প্রতিফলন যেমন থাকবে, তেমনি আলোকিত হবে ঐতিহ্য-বিধৃত আমাদের আত্মপরিচয়। এই আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াসও প্রতিবাদী চেতনারই একটা অঙ্গ।

চার

স্বদেশ

বিংশ শতকে আমাদের দেশে ভাস্কর্যের চর্চা শুরু হয়েছিল ইওরোপীয় অ্যাকাডেমিক রীতির অনুসরণের মধ্য দিয়ে। মহারাষ্ট্রের গণপৎ কাশীনাথ ম্হাত্রে (১৮৭৬-১৯৪৭) থেকে শুরু করে আমাদের দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী পর্যন্ত ভাস্করদের প্রতিকৃতি ও রচনাধর্মী কাজে প্রকৃতি-অনুসারী যথাযথতার রূপারোপে দক্ষতার কোনো অভাব ছিল না। শৈল্পিক বোধও ছিল তাঁদের যথেষ্টই। তবু আধুনিকতায় পৌঁছতে আমাদের ভাস্কর্যকে রামকিঙ্কর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তার কারণ এই নয় যে এতদিন ইওরোপে আধুনিকতার যে বিকাশ ঘটেছে সেটা আয়ত্ত হয় নি এখানে, বা রামকিঙ্করের সৃষ্টির ভিতর সেই রূপভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটল। এর চেয়ে বড় কারণ রামকিঙ্করই প্রথম আধুনিক আঙ্গিকের মধ্যে ভারতীয় নন্দনচেতনা ও জীবনবোধের উজ্জীবন ঘটাতে পারলেন।

১৯৯· আকু। অনামা। চামড়া। ১৯৮৫-৮৬।

২০০· সোমা। অনামা। ব্রোঞ্জ। ১৯৯৩।

২০১· শ্যামল রায়। লেডি। টেরাকোটা। ১৯৮৭।

২০২· অনিলকুমার। ক্রিয়েশন। শাদা মার্বল। ১৯৯০।

তাই শুরু থেকেই আমাদের ভাস্কর্যকে ঐতিহ্যের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করার একটা প্রয়াস চলেছে। এই প্রয়াস কতটা সফল হয়েছে, ইওরোপ-নিরপেক্ষভাবে আমাদের ভাস্কর্য কতটা স্বতন্ত্র পাদপীঠ পেয়েছে, বিশ্বের ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতায় কোনো নতুন মাত্রা যোগ করতে পেরেছে কিনা এ নিয়ে বিতর্ক আছে। সমকালীন কোনো কোনো প্রতিষ্ঠিত ভাস্করও মনে করেন সেরকম কোনো স্বাতন্ত্র্য অর্জিত হয় নি এখনো, অদূর ভবিষ্যতেও হবে কিনা সন্দেহ। তবু পর্বে পর্বে ভাস্কর্যের বিবর্তন অনুধাবন করতে গিয়ে এটুকু হয়তো আমরা লক্ষ করেছি আত্ম-আবিষ্কারের একটা প্রক্রিয়া এব মধ্যে চলতেই থেকেছে। সমকালীন ভাস্কর্য নিয়ে যেটুকু সামান্য চিন্তা-ভাবনা করার চেষ্টা করেছি আমরা এই প্রক্রিয়াটিকে বুঝে নেওয়ার প্রয়াসই হয়তো তার অন্যতম যুক্তি।

তৃতীয় প্রজন্মের ভাস্কর্যেও আঙ্গিক ও মাধ্যমের বৈচিত্র্য এবং প্রতিবাদী চেতনার পাশাপাশি রূপকল্পের মৌলিকতার সন্ধান চলেছে। আর সেই সন্ধানের মধ্য দিয়েই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করেছেন শিল্পীরা। সেই প্রয়াসে বিধৃত থাকে আত্ম-আবিষ্কারের একটা মাত্রা।

১৮৬ অমিতাভ ভৌমিকের (১৯৪৭) 'প্রিস্ট হেডস' শীর্ষক মার্বল ভাস্কর্যটির কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এখানে ওভাল ও সিলিন্ড্রিক্যাল, ডিম্বাকৃতি ও বেলনাকৃতি সরল রূপাবয়বের যে সমন্বয়, সেই সারল্য সৌন্দর্যের মূলগত কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে দর্শককে। এই সারল্য যদিও ব্রাকুসিরই মৌলিক আবিষ্কার তবু এর মধ্যে প্রাচ্য-চেতনার যে প্রতিফলন থাকে তাকে সমকালীন মাত্রায় কেমন করে বুঝে নিচ্ছেন একজন ভাস্কর, এই কাজটিতে তারই পরিচয় অনুভব করা যায়। দিল্লির কাকু প্রদীপ কুমার স্যাক্সেনার (১৯৪৭) ১৯৯০-এর জাতীয় প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত 'গ্রে

২০৩· সন্দীপকুমার চক্রবর্তী। আননোন ফেস। টেরাকোটা। ১৯৯২।

২০৪· গোপীনাথ রায়। বাড (কুঁড়ি) ফাইবার গ্লাস।

হেয়াব কুইন' নামের মার্বলটিতেও সারল্যের ভিন্নধর্মী রূপ অনুভব করি আমরা। দুটি স্ফুরিত গোলক সমন্বিত হয়েছে, তারপর দুপাশ থেকে কেটে দিয়ে আনা হয়েছে তমসালীন একটি মুখের আদল। আয়তনের স্ফুরিত পূর্ণতা, তার প্রবাহকে কেটে ও রঙের ব্যবহারে এর ধ্রুপদী বিন্যাসকে ব্যাহত করে এর মধ্যে যে আদিম রহস্যাবৃত অন্ধকারের দ্যোতনা আনা হয়েছে সেটা যেন ঐতিহ্যেরই এক সমকালীন বিশ্লেষণ।

গোপালপ্রসাদ মণ্ডল (১৯৪৯) ভাস্কর্যে তাঁর রূপাবয়ব সন্ধানের নাম দিয়েছেন 'অরগানিক ক্রিস্টালিজম' এবং একে তিনি এক আবিষ্কারই বলেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়

> "আই ট্রাইড টু ইনভেন্ট নিউ ফর্ম অব স্কাল্পচার বাই কনটিনিউয়াস ক্রিস্টালাইজেশন অব অরগানিক ফর্মস ইনটু অ্যাবস্ট্রাক্ট ফিচারস।"

জৈব রূপকে বিমূর্ততার দিকে নিয়ে যেতে গিয়ে একটা জায়গায় এসে থেমেছেন গোপালপ্রসাদ যাতে প্রকৃতির সাযুজ্যটুকু সম্পূর্ণ অবলুপ্ত না হয়। রূপের মধ্যে এই যে প্রাণময়তা এটা ভারতীয় ভাস্কর্যের এক অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। কেননা ভারতীয় ভাস্কর সবসময়ই প্রেরণা নিয়েছেন প্রকৃতি থেকে। পাশ্চাত্য আধুনিকতা একদিকে যেমন এই প্রাণময়তার অন্তর্লীন ছন্দকে আরোপ করে জড় পদার্থকে নান্দনিক প্রাণে উদ্ভাসিত করেছে, তেমনি আবার প্রকৃতি নিরপেক্ষ যান্ত্রিক গাঠনিকতা দিয়েও গড়ে তুলেছে ভাস্কর্য। এর একটিকে বলা যায় অরগানিক ভাইটালিজম, অন্যটিকে কনস্ট্রাকটিভিজম। গোপালপ্রসাদের কাজ এই ভাইটালিজম ধারার অন্তর্গত। তিনি অবশ্য এর মধ্যে প্রাকৃতিক নানা রূপ ও গঠনের মূলগত সত্য ও জ্যামিতিকে নানাভাবে প্রয়োগ করে যুগোপযোগী রূপের সন্ধান করেছেন।

'ফ্লাড' নামে তাঁর একটি পাথরের কাজ আছে ১৯৭৮ সালের। একদিক থেকে এটি একটি চোখের রূপারোপ।

উন্মীলিত দুটি আঁখি-পল্লবের মাঝখানে চোখের মণিটি দেখা যাচ্ছে। আর একপ্রান্তে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে গিয়ে স্থির হয়ে আছে। আবার অন্য দিক থেকে এই উন্মীলিত চোখ অনেকটা বীজের অবয়বের সঙ্গেও সাযুজ্য রচনা করে। যেন অঙ্কুরিত হওয়ার আগে খুলে গেছে দুটি পাপড়ি। ১৯৭৮-এর বন্যা মানুষের মধ্যে যে দুর্দশা ও শোকের ছায়া এনেছিল, অশ্রুবিন্দুটি হয়ে উঠেছে যেন তারই প্রতীক। এখানে এই পরিশুদ্ধ জৈব রূপের নির্যাস দিয়ে শিল্পী এক সামাজিক বাস্তবতাকেও ধরতে চেষ্টা করেছেন। আবার ১৯৮২-র 'লিফ-বাড' নামে পাথরের কাজটিতে একটি পাতার রূপের সঙ্গে মিলে গেছে একটি মানুষের মুখ। সরল জ্যামিতিকে মুখ ও পাতাকে মিলিয়ে দিয়ে সারল্যে বিধৃত রূপের মূলগত ভিত্তিটি সন্ধান করেছেন। ঐতিহ্য ও আধুনিতাকে মেলানোর এই প্রচেষ্টাতেই গোপালপ্রসাদ মণ্ডল তাঁর ভাস্কর্যে স্বকীয়তার সন্ধান করেছেন।

আয়তনের পূর্ণতার মধ্য দিয়ে ক্লাসিসিজম বা ধ্রুপদী বোধের দিকে যাওয়া, ভারতীয় ভাস্কর্যের এই মূলগত দর্শনকে গ্রহণ করেন অনেক ভাস্কর। প্রকৃতিকে বা জীবনের অনুষঙ্গকে একেবারেই বিমূর্ততায় পর্যবসিত করে নেন কেউ। যেমন বেনারসের রাম শঙ্কর (১৯৫০) ১৯৯০-এর জাতীয় প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত 'ওভাম' নামে মার্বলটিতে ঈষৎ স্ফুরিত একটি ডিম্বাকৃতি রূপাবয়বের মধ্যে জীবনের স্পন্দন জাগিয়ে তুলতে পারেন। বা দিল্লি নিবাসী গোয়ালিয়রের ওম-প্রকাশ খারে (১৯৫২) ১৯৯১-এর সপ্তম ত্রিয়েনালে প্রদর্শিত কালো ও শাদা মার্বল-এর দুটি কাজে মানুষের মুখের অনুষঙ্গে সেই পূর্ণতাকেই প্রস্ফুটিত করেন।

তাপস সরকার (১৯৫৩) তাঁর স্ক্র্যাপ মেটালের কাজেই হোক, ব্রোঞ্জ বা ফাইবার গ্লাশের গাঠনিকতাধর্মী কাজেই হোক এক ধরণের লিরিসিজম বা প্রশান্ত সুষমা আনেন যাতে এক বিশ্বাসের জগতের প্রতিফলন থাকে। এখানে যেমন রোমান্টিকতার মধ্য দিয়ে ধ্রুপদী বোধের দিকে যাওয়া, তেমনি আবার অনেকটা একই রকম ধ্রুপদী প্রশান্তির দিকে যান বিমল কুণ্ডু (১৯৫৪) একেবারে ভিন্ন পথ ধরে। তাঁর তলবিন্যাসের যে কৌণিক তীক্ষ্ণতা কিউবিজম-আশ্রিত সেই বিশ্লেষণকেও তিনি যখন ধ্রুপদী বোধের দিকে নিয়ে যেতে পারেন, তখন বোঝা যায় ভিন্ন পথে চললেও ঐতিহ্যের

২০৫· সতীশচন্দ্র। মাদার অ্যান্ড চাইল্ড। স্টোন ওয়্যার। ১৯৯২।
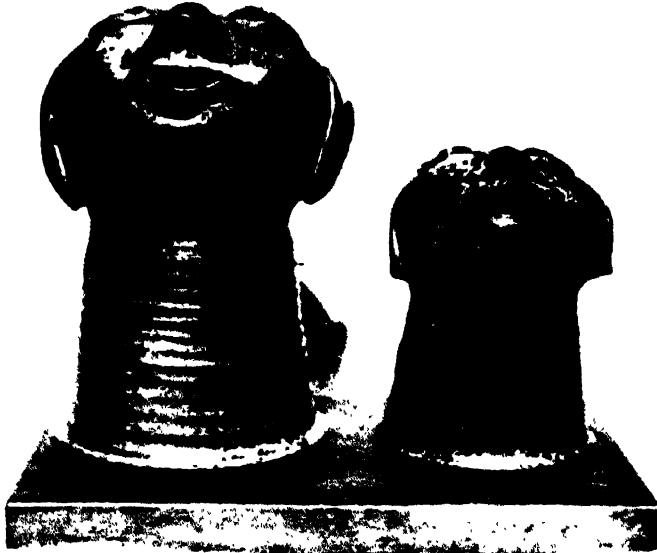
কেন্দ্রটির সন্ধান করেন সমকালীন অনেক ভাস্করই।

বরোদায় প্রশিক্ষিত এন পুষ্পমালা (১৯৫৬) টেরাকোটায় কাজ করেন। লৌকিক জীবনের অনুষঙ্গ মাখা পূর্ণাবয়ব নরনারী তাঁর ভাস্কর্যের বিষয়। তার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের সাধারণ জীবনপ্রবাহ নন্দিত হয়। আর এভাবেই তিনি দেশের স্পন্দনকে ধরে রাখেন তাঁর কাজে। রজতকুমার ঘোষের (১৯৫৬) টেরাকোটা প্রসঙ্গে আমরা আগে বলেছি। দুজনেই অনেক অবয়ব নিয়ে গল্প বলার ধরণে কাজ করে লৌকিক জীবন ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন।

টেরাকোটা প্রসঙ্গে কলকাতার দুজন শিল্পী ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ: তাঁদের একজন শ্যামল রায় (১৯৫৭), অন্যজন রামকুমার মান্না।
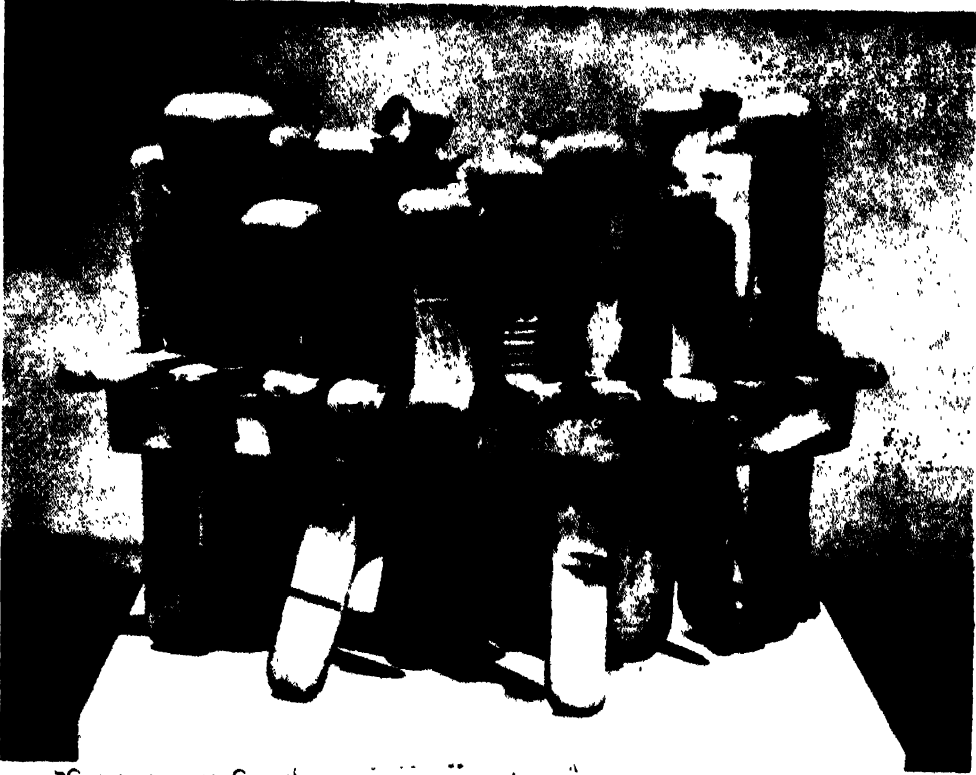
২০৬· ইন্দিরা পুরকায়স্থ। গ্যাদারিং। কাঠ। ১৯৯২।

শ্যামল রায় চিত্রকলার ছাত্র ছিলেন। ১৯৮০-তে কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে চিত্রকলা নিয়েই পাশ করেন। কিন্তু তারপরে টেরাকোটার কাজে তাঁর উৎসাহ জাগে। প্রায় নিজের চেষ্টাতেই আয়ত্ত করেন টেরাকোটার প্রকরণ এবং ক্রমে এটিকেই তাঁর নিজের মাধ্যম করে নেন। লোকায়তিক সারল্য ও স্নিগ্ধতা এবং আধুনিকতার জ্যামিতি মিলে গড়ে ওঠে তাঁর টেরাকোটার মানব বা মানবী। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মান-পরিমাণকে তিনি স্বাভাবিকতা থেকে সরিয়ে নেন। এ ব্যাপারে এক সময় তাঁর কাছে প্রেরণা হিশেবে কাজ করেছে দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত শিল্পী পানিক্করের ছবি। পানিক্করের ছবিতে যেমন মানুষের হাত-পাগুলি শরীরের তুলনায় কৌতুককরভাবে ছোট হয় আর অনুপাতের এই বৈষম্য যেমন কল্পরূপাত্মক রসের সঞ্চার করে, শ্যামলের মূর্তিগুলোও অনেকটা সেরকম। সাধারণত স্ফেরিক্যাল ও সিলিন্ড্রিক্যাল, গোলক ও বেলনাকার জ্যামিতির প্রাধান্য তাঁর কাজে। শরীর উত্তলতায় স্ফুরিত হয়। একটি অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সংযোগের সন্ধিগুলিতে যে সামান্য অবতলতা থাকে, বাকি অংশের উত্তলতাকেই তা আরো স্পষ্ট ও ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। বাংলার পরম্পরাগত ও লৌকিক ভাস্কর্যে যে অনাবিল সুষমা ও আনন্দের আবহমণ্ডল, সেই

ধারাটিকে আধুনিকতায় সঞ্জীবিত করেছেন শ্যামল রায়।

রামকুমার মান্না তাঁর শৈশবে মাটিকে শিল্পিত করে তোলার যে খেলা শুরু করেছিলেন, তাই তাঁকে ক্রমান্বয়ে একজন সংবেদনময় ভাস্করে পরিণত করেছে। মাটির সঙ্গে তাঁর যোগ বাস্তব জীবনে যেমন, তেমনি শিল্পের নন্দনেও। টেরাকোটাই তাঁর একমাত্র মাধ্যম। কোনো আর্ট কলেজের প্রথাগত শিক্ষা তাঁর নেই। কিন্তু রয়েছে এক স্বচ্ছ শিল্পদৃষ্টি ও রসবোধ। সেই মূলধন নিয়ে খেলাচ্ছলে মূর্তি গড়তে গড়তে নজরে পড়ে যান কিছু শিল্পানুরাগী মানুষের। তাঁদেরই প্রেরণায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করতে করতে ভাস্কর্যকেই তাঁর পেশা করে নেন। প্রথম দিকে গণেশের রূপকার হিশেবে তাঁর দক্ষতা মানুষের নজর কাড়ে। পরে আরো প্রসারিত হয় তাঁর কাজ।

১৯৯১-এর সেপ্টেম্বরে রামকুমার অভিনব এক ভাস্কর্যমালা নিয়ে প্রদর্শনী করেন। এই প্রদর্শনীতেই প্রমাণিত হয় যে একজন দক্ষ কারুবিদই নন, তিনি প্রতিভাদীপ্ত একজন শিল্পীও। ভাস্কর্যের বিষয় হিশেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন কমলকুমার মজুমদার সংগৃহীত ও চিত্রিত 'আইকম বাইকম' নামে ছড়ার বইটি। এর এক একটি ছড়ার ভাস্কর্যরূপ রচনা করেছেন। আয়তঘনকাকার মাটির ব্লক থেকে কেটে কেটে নতোন্নত (রিলিফ) পদ্ধতিতে বের করে এনেছেন রূপাবয়ব, বাংলার লৌকিক জীবনপ্রবাহের নর-নারী শিশু। রেখার আঁচড়ে রূপ পেয়েছে নদ-নদী, গাছগাছালি, লতায় ও ফুলে বাংলার প্রকৃতি। চিত্র ও ভাস্কর্যের যুগলে নতুন প্রাণে জেগে উঠেছে রূপকথার জগৎ। কমলকুমারের রেখা বিন্যাসের মেজাজটিকে বজায় রেখেছেন। সেই ভিত্তির উপর নিজস্ব চেতনাকে প্রসারিত করেছেন।

'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো/ বর্গী এল দেশে'—এই ছড়ায় যে বর্গীর কল্পনা ও বুলবুলিতে ধান খাওয়ার কল্পনা, তার দৃশ্যরূপ যেমন রচিত হয়, তেমনি 'বর দেখে যাও বর দেখে যাও/রান্না ঘরের ঝুল/ কনে দেখে যাও কনে দেখে যাও/ কনক চাঁপার ফুল'—এরকম কবিতার সারল্যে ভরা কৌতুক রহস্য মেশানো বিমুগ্ধ বিস্ময়কেও ধরবার চেষ্টা করেছেন শিল্পী। টেরাকোটা বাংলার এক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ শিল্প প্রকরণ। আর এইসব ছড়ার মধ্যে ধরা আছে অনাদি কালের বাংলার রূপসৌন্দর্য ও প্রাণ। এই দুইয়ের সম্মিলনে রামকুমার সৃষ্টি করেছেন যে শিল্পরূপ, তা শুধু ছড়ার ইলাস্ট্রেশন নয়, এর মধ্য দিয়ে তিনি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন আধুনিকতার উপযোগী ভাস্কর্যের স্বতন্ত্র এক ভাষা, যাতে এই দেশের চিরকালের জলমাটির গন্ধকে প্রসারিত করা যায়—সম-সময় পর্যন্ত। এর পর ১৯৯৪-তে বাংলার লৌকিক দেব-দেবী নিয়ে তিনি একটি ভাস্কর্যমালা করেন। সেখানে বেলনাকার (সিলিন্ড্রিক্যাল) জ্যামিতির আলম্ব উপস্থাপনায় বৃক্ষের সবল বিন্যাসে গড়ে তুলেছেন মূর্তিগুলো। বাংলার লৌকিক ভাস্কর্যকে আধুনিকতায় সঞ্জীবিত করতে রামকুমারের অবদান অনস্বীকার্য।

শ্যামল রায় ও রামকুমার মান্না টেরাকোটা ভাস্কর্যে বাংলার প্রাণকেন্দ্রটিকে স্পর্শ করেছেন। শ্যামলের কাজে সুষমার সঙ্গে মেধা বা বৌদ্ধিক দিকের সংযোগ একটু বেশি, রামকুমার সেদিক থেকে অনেকটাই স্বভাব-শিল্পী। আমরা এই দুজনের কাজের সঙ্গে যদি সোমনের টেরাকোটার তুলনা করি তাহলে দেখব একই ভারতীয় ভাস্কর্য কেমন করে দুটি বা তিনটি বিপরীত অভিব্যক্তির সৃষ্টি করল। তিন জনের কাজেই কিন্তু আধুনিকতার অর্জন আত্মীকৃত হয়েছে। তবু নিজস্ব চেতনা অনুযায়ী তাঁদের প্রকাশ হয়েছে বিভিন্ন। সমকালীন ভাস্কর্যে আত্ম-আবিষ্কার বা স্বদেশ চেতনাকে এমনিভাবে নানামুখী মাত্রায় আমাদের বুঝে নিতে হবে।

সিরামিকসে বেনারসের সতীশ চন্দ্রও (১৯৫৭) লৌকিক রূপবন্ধকে ব্যবহার করেন সুন্দরভাবে। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিরামিকস ভাস্কর্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা শেষ করেছেন তিনি ১৯৮২ ও ১৯৮৬-তে। এখন কলকাতায় ললিতকলা অ্যাকাডেমির পূর্বাঞ্চলীয় কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

ভারতীয় ধ্রুপদী রীতির আধুনিক বিন্যাসে বিশিষ্ট অভিঘাত রাখছেন সম্প্রতি গোয়ালিয়রের অনিলকুমার (১৯৬১)। ১৯৯০-তে জাতীয় প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত 'টু টরটয়েজ' নামে মার্বলটি দেখলেই আমরা অনুধাবন করতে পারি কেমন করে মূলগত গোলকাকৃতি স্ফীত আয়তনময়তাকে সামান্য রূপান্তরিত করে তিনি তাঁর ভাস্কর্যে ব্যবহার করেছেন। দুটি অর্ধগোলক সমন্বিত হয়ে তৈরি করেছে কচ্ছপের দেহের দুই অংশ। উপরিতলকে কেটে কেটে তাতে অমসৃণ টেক্সচার এনেছেন। আর সামনের দিকে দুটি অর্ধগোলকের সংযোগস্থলে প্রলম্বিত রেখেছেন একটি ছোট গোলক, যা হয়ে উঠেছে কচ্ছপের মাথা। এভাবে মূলগত জ্যামিতিক আয়তনকে সামান্য রূপান্তরিত করে তিনি তাতে প্রকৃতির অনুষঙ্গ আনেন। ১৯৯৪-তে বিড়লা অ্যাকাডেমির 'তরুণ মুখ' প্রদর্শনীতে আমরা তাঁর 'জীব' সিরিজের চারটে মার্বল দেখেছি। এই যে আয়তনের পূর্ণতার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রস্থ শক্তিকে বাইরে বিচ্ছুরিত করে দেওয়ার পদ্ধতি এর মধ্যে

২০৭ জ্যোতির্ময় বায়চৌধুরী। সিম্ফনি। ব্রোঞ্জ। ১৯৯২।

ধ্রুপদী ভারতীয় ভাস্কর্যের গভীর আত্তীকরণ রয়েছে। ইওরোপীয় আধুনিকতায় সমন্বিত হলেও ভারতীয়তার এটা একটা সমকালীন রূপ।

তাঁর সমসাময়িক কলকাতার সন্দীপ চক্রবর্তীর (১৯৬১) কাজেও আয়তনিক পূর্ণতায় বিচ্ছুরিত এই কেন্দ্রীয় শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। সন্দীপ কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে ১৯৮৮-তে পাশ করে ১৯৯০-তে বরোদা থেকে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম শেষ করেন। তাঁর একটি প্রদর্শনীর ক্যাটালগে তাঁর কাজকে বলা হয়েছে 'নউমেনাল স্কাল্পচার' (Noumenal Sculpture)। কারণ হিশেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—"দে আর 'নউমেনাল' ইন দ্য সেন্স অব বিং অবজেক্টস অব ইনটেলেকচুয়াল ইনসটিংকট"। বড় আয়তনের উপর সামান্য কাজ করে কখনো তিনি বের করে আনেন কোনো মানুষ বা পশুর আদল, কখনো-বা বিমূর্ত অনুষঙ্গেই রেখে দেন।

এই ধ্রুপদী বোধকেই স্বপন রায় তাঁর ব্রোঞ্জ বা টেরাকোটায় রূপ দেন অবয়বের বিন্যাসে। ভারতীয় ভাস্কর্যের ধ্যানমগ্ন গভীরতা ও পূর্ণতার বোধটি তিনি আনতে চেষ্টা করেন। মানবীয় প্রতিমাকল্পে রূপ দেন সংগীতের বিমূর্ততাকে। আবার প্রকৃতির লাবণ্যও ফুটে ওঠে তার কাজে। 'ফ্রোয়িং অ্যাফেকশন' নামে একটি টেরাকোটায় যেমন দেখি যূথবদ্ধ কয়েকটি ১৯৫

হাঁস একসঙ্গে বসে আছে। একটিই শরীর থেকে যেন বেরিয়েছে লীলায়িত দীর্ঘ গলার কতকগুলো মুখ। এখানে যে ছন্দিত কাব্যময়তা আছে, ধ্রুপদী প্রশান্তির সঙ্গে সেটাও তার ভাস্কর্যের একটি মাত্রা। এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে মিলিয়েই সম্পূর্ণ হয় তাঁর ধ্রুপদী অন্বেষণ।

অসিত দাসের কাজে চারপাশের পরিবেশ, ঘটনাপ্রবাহ, নিসর্গের খণ্ড খণ্ড রূপ ধরা পড়ে। জাল ফেলে মাছ ধরছে জেলে বা মরুভূমিতে হেঁটে যাচ্ছে উট এরকম নিসর্গধর্মী বিষয় নিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে কাজ করেন। সমাজের ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে আলোড়িত করে। ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে তিনি এর প্রতিবাদী ভাষ্য রচনা করেন। দেশকে তিনি ধরেন তার সমসাময়িকতা ও দৈনন্দিনতায়। কিন্তু খুবই রসসমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন ভাস্কর্য হিশেবে।

টেরাকোটা ভাস্কর্য ও সিরামিকস পটারিতে বিদগ্ধ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন বিশ্বভারতী কলাভবনে প্রশিক্ষিত গৌতম দাস (১৯৬৩)। তাঁর রিলিফধর্মী কাজগুলোতে তিনি বাংলার সারল্য ও সুষমাকে প্রস্ফুটিত করেছেন নিবিড় নিষ্ঠায়।

সারা ভারতে অজস্র ভাস্কর কাজ করছেন এই মুহূর্তে। তাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আলাদা করে আলোচনা করা সম্ভব নয় একটি ছোট নিবন্ধের পরিসরে। আমরা শুধু বুঝতে চেষ্টা করেছি নবীন প্রজন্মের কাজের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং সমকালীন ভাস্কর্যে তাদের অবস্থানের স্বরূপ। অনিল সেন (১৯৫১), সুদর্শন পাল (১৯৫৮), সঞ্জীবনারায়ণ দত্ত (১৯৬১), প্রবীরকুমার দাস (১৯৬৩), সমর ঘোষ, সুকুমার ঘোষ, বেনারসের রুমা জৈন, জয়পুরের অঙ্কিত প্যাটেল, বম্বের দীপক পউনিকর প্রমুখ অনেক শিল্পীরই বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়া গেল না। তাদের সকলের কাজের মধ্য দিয়েই সমকালীন ভাস্কর্য ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে ও পূর্ণতা পাচ্ছে।

বিংশ শতকে আমাদের সমকালীন ভাস্কর্য সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র কোনো পাদপীঠ পাবে কিনা সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় এখনো আসে নি। কিন্তু অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ভাস্কর্যের প্রসার যে থেমে নেই এবং ভাস্কররাও যে স্বদেশ ও ঐতিহ্যের কথা মনে রেখে আত্ম-আবিষ্কারের তাগিদে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন এ কথা যেন আমরা কখনো ভুলে না যাই। সেখানে কিছুটা আলো ফেলাই আমাদের এই বর্তমান প্রয়াসের উদ্দেশ্য।

চিত্রসূচি

উল্লেখ-ক্রম ভাস্কর্যের (বা ছবির) নম্বর, শিল্পী, শিরোনাম, তারিখ, পৃষ্ঠা।
(বইয়ের পৃষ্ঠার মার্জিনে উল্লিখিত নম্বর আলোচিত ভাস্কর্যের সংখ্যা নির্দেশক, রঙিন ছবির ক্ষেত্রে ৫১ নং একরকম উল্লেখ আছে।)

৫৩· ফুলচাঁদ পাইন। আই ওন্ট লিভ ইউ। টেরাকোটা। ১৯৭৪-৭৫। ৭৫
৫৪· বেদ পি সন্দীপ। অনামা। কাঠ ও মিশ্র মাধ্যম। ১৯৯৩। ৭৬
৫৫· আক্কু। অনামা। ব্রোঞ্জ ও চামড়া। ৭৬
৫৬· রামকুমার মান্না। ম্যাজিশিয়ান। টেরাকোটা। ১৯৯৪। ৭৭
৫৭· জি কে ম্হাত্রে। টু দ্য টেম্পল। মার্বল। ১৯০০।৮০
৫৮· বি ভি তালিম। ইন টিউন উইথ আলমাইটি। প্লাস্টার। ১৯২৫। ৮১
৫৯· এন জি পানসারে। আর্কিটেকচারাল রিলিফ। পাথর। ১৯৪৮। ৮৩
৬০· হিরণ্ময় রায়চৌধুরী। বসন্ত। মার্বল। ৮৪
৬১· অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কুটুম কাটাম। বার্ড ইন স্টর্ম। ৮৫
৬২· এন জি পানসারে। স্ট্যান্ডিং উওম্যান। কাঠ। ৮৬
৬৩· দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। মাই ফাদার। মাটি। ১৯২৪। ৯৪
৬৪· দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। হোয়েন উইন্টার কামস। প্লাস্টার। ১৯৫৭। ৯৫
৬৫· দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। মারটার্স মেমোরিয়াল-এর অংশ। ব্রোঞ্জ। ১৯৫৬। ৯৫
৬৬· দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। মহাত্মা গান্ধী। ব্রোঞ্জ। ১৯৫৮। ৯৭
৬৭ প্রভাস সেন। ফ্ল্যাট প্রেয়ার। ৯৯
৬৮· ধনরাজ ভগৎ। ফ্ল্যাট প্রেয়ার। ওয়েলডেড কপার। ১৯৫৮। ১০০
৬৯· ধনরাজ ভগৎ। লাফিং ফেসেজ। সিরামিকস। ১৯৬২। ১০০
৭০· এস ধনপাল। প্রসাধন। ব্রোঞ্জ। ১৯৫৬। ১০২
৭১ অমরনাথ সেহগাল। আপরাইজিং। ব্রোঞ্জ। ১৯৫৭। ১০৪
৭২ এ এম দাভিয়েরওয়ালা। শি অ্যান্ড থ্রি আদারস। ধাতু। ১৯৬৫। ১০৫
৭৩ এম ধরমানি। হতাশা। পাথর। ১৯৬০। ১০৬
৭৪· ভবেশ সান্যাল। উপবিষ্টা নারী। টেরাকোটা। ১৯৪৮। ১০৭
৭৫· রামকিঙ্কর। সাঁওতাল পরিবার। কংক্রিট। ১৯৩৮।১১০
৭৬· রামকিঙ্কর। কচ ও দেবযানী। প্লাস্টার। ১৯২৯। ১১২
৭৭· রামকিঙ্কর। দীপস্তম্ভ। সিমেন্ট। ১৯৪১। ১১৩
৭৮ রামকিঙ্কর। হারভেস্টার (ধানমাড়াই)। ব্রোঞ্জ। ১৯৪৩। ১১৪
৭৯ রামকিঙ্কর। কলের বাঁশি। কংক্রিট। ১৯৫৬। ১১৬
৮০ রামকিঙ্কর। গান্ধী। ডান্ডি মার্চ। সিমেন্ট, প্লাস্টার ১৯৪০। ব্রোঞ্জ ১৯৭২। ১১৭
৮১· রামকিঙ্কর। রবীন্দ্রনাথ। বিমূর্ত। প্লাস্টার। (পরে ব্রোঞ্জ)। ১৯৩৮। ১১৮
৮২· রামকিঙ্কর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রোঞ্জ। ১২৬
৮৩· রামকিঙ্কর। মধুরা সিং। সিমেন্ট ১৯৪০। ব্রোঞ্জ ১৯৪৯। ১২৮
৮৪· রামকিঙ্কর। মিথুন। সিমেন্ট। ১৩০
৮৫· রামকিঙ্কর। গতি। প্লাস্টার। ১৯৫৩। ১৩১
৮৬· প্রদোষ দাশগুপ্ত। টো পয়েন্ট। সিমেন্ট। ১৯৫০। ১৩৪
৮৭· প্রদোষ দাশগুপ্ত। ইন বন্ডেজ। ব্রোঞ্জ। ১৯৪৩। ১৩৫
৮৮· প্রদোষ দাশগুপ্ত। ক্যাকটাস ফ্যামিলি। সিমেন্ট। ১৯৫৩। ১৩৭
৮৯· প্রদোষ দাশগুপ্ত। ব্রোকেন আইডল। প্লাস্টার। ১৯৭০। ১৩৮
৯০· প্রদোষ দাশগুপ্ত। পিকিং লাইস। সিমেন্ট। ১৯৪৮। ১৩৯
৯১· প্রদোষ দাশগুপ্ত। জয় হিন্দ। ব্রোঞ্জ। ১৯৪৮। ১৪০-১৪১
৯২· প্রদোষ দাশগুপ্ত। এ্যাডল। সিমেন্ট। ১৯৫০। ১৪২
৯৩· প্রদোষ দাশগুপ্ত। টয়লেট। সিমেন্ট। ১৯৪৭। ১৪৪
৯৪· প্রদোষ দাশগুপ্ত। এগ ব্রাইড। ১৯৭৩। ১৪৫
৯৫· প্রদোষ দাশগুপ্ত। মাদার অ্যান্ড চাইল্ড। ড্রয়িং। ১৪৭
৯৬· প্রদোষ দাশগুপ্ত। এগ ব্রাইড। মার্বল-এর জন্য প্লাস্টার। ১৯৭২। ১৪৯
৯৭· প্রদোষ দাশগুপ্ত। এগ ফেমিলি। ব্রোঞ্জ। ১৯৭৩। ১৫০
৯৮· প্রদোষ দাশগুপ্ত। এগ মাদার। প্লাস্টার। সত্তর দশক। ১৫২
৯৯· প্রদোষ দাশগুপ্ত। ড্রয়িং। ১৫৩
১০০· প্রদোষ দাশগুপ্ত। সাঁটুল গুপ্ত। ব্রোঞ্জ। ১৯৫০। ১৫৪
১০১· প্রদোষ দাশগুপ্ত। আনফোল্ডিং অব স্প্রিং। ব্রোঞ্জ ১৯৭৯। ১৫৫
১০২· চিন্তামণি কর। সবিতা ও উষা। ব্রোঞ্জ। ১৯৯৩। ১৫৮
১০৩· চিন্তামণি কর। উষা ও সবিতার। ভিট্রিফায়েড টেরাকোটা। ১৯৫২। ১৬১
১০৪· চিন্তামণি কর। গ্রীষ্ম। প্লাস্টার। ১৯৮৫। ১৬২
১০৫· চিন্তামণি কর। বর্ষা। ১৬৩
১০৬· চিন্তামণি কর। ক্লাউড মেসেঞ্জার। ব্রোঞ্জ। ১৯৪৯। ১৬৫
১০৭· চিন্তামণি কর। ভিজিটেশন। কাঠ। ১৯৬৪। ১৬৬
১০৮· চিন্তামণি কর। ক্যারিয়াটিড। কাঠ। ১৯৫৯। ১৬৭
১০৯· চিন্তামণি কর। স্কেটিং দ্য স্ট্যাগ। ব্রোঞ্জ। ১৯৪৮। ১৭২
১১০· চিন্তামণি কর। বুদ্ধ। অ্যালুমিনিয়াম। ১৯৬২। ১৭৩
১১১· চিন্তামণি কর। নায়িকা। ব্রোঞ্জ। ১৯৬০। ১৭৬
১১২· চিন্তামণি কর। এমব্রেস। টেরাকোটা। ১৯৫০। ১৭৭
১১৩· চিন্তামণি কর। ড্রয়িং। ১৭৭
১১৪· চিন্তামণি কর। মিথুন। কাঠ। ১৯৮৩। ১৭৯
১১৫· চিন্তামণি কর। ড্রয়িং। ১৭৯
১১৬· শঙ্খ চৌধুরী। আহ্লাদী। টেরাকোটা। ১৯৫২। ১৮২
১১৭· শঙ্খ চৌধুরী। মাই ফাদার। ১৯৪৫। ১৮৩

রঙিন ছবি

গ্রন্থপঞ্জি

এই গ্রন্থ রচনায় যে সমস্ত বই, পত্র-পত্রিকা বা অন্যান্য লেখা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়ক হয়েছে নীচে তার তালিকা দেওয়া হল, বইতে উল্লেখের ক্রম-অনুসারে।

১ আনন্দ কুমারস্বামী। হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইন্দোনেশিয়ান আর্ট

২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলার ব্রত 'বিশ্বভারতী'। ১৯৫৬।

৩ সুধাংশুকুমার রায়। দা রিচুয়াল আর্ট অব দা ব্রতজ অব বেঙ্গল ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় কলকাতা ১২,১৯৬১।

৪ বেঞ্জামিন রোলান্ড। দা আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া, পেঙ্গুইন ১৯৭০।

৫ হেইনরিক জিমার, দা আর্ট অব ইন্ডিয়ান এশিয়া। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস। ১৯৮৩।

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা পরিচয় বিশ্বভারতী গ্রন্থাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড।

৭ বিদ্যা দেহেজিয়া। দা কালেকটিভ অ্যান্ড পপুলার বেসিস অব আর্লি বুদ্ধিস্ট পেট্রনেজ সেক্রেড মনুমেন্টস, ১০০ বি সি—এ ডি ২৫০। দা পাওয়ার্স অব আর্ট পেট্রনেজ ইন ইন্ডিয়ান কালচার। বারবারা স্টোলার মিলার সম্পাদিত অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৮ এম এস রানধাওয়া ও ডি এস রানধাওয়া। ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার ভাকিলস, ফেফার অ্যান্ড সিমনস লিমিটেড, বম্বে।

৯ আনন্দ কুমারস্বামী। দা অরিজিন অব বুদ্ধ ইমেজ।

১০ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। ভারত শিল্প। চিত্রকথা। অরুণা প্রকাশনী। ১৯৮৮।

১১ হার্বার্ট রিড। দা মিনিং অব আর্ট পেলিকান। ১৯৬৬।

১২ আনন্দ কুমারস্বামী। দা ড্যান্স অব শিব। সাগর পাবলিকেশনস, নিউ দিল্লি। ১৯৮৭।

১৩ স্টেলা ক্রামরিশ। দা আর্ট অব ইন্ডিয়া। ফাইডন প্রেস। ১৯৬৫।

১৪ নীহাররঞ্জন রায়। অ্যান অ্যাপ্রোচ টু ইন্ডিয়ান আর্ট।

১৫ পরোক্ষ কুমারস্বামী সেন্টিনারি সেমিনার পেপারস। ললিতকলা অ্যাকাডেমি। এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধ নীহাররঞ্জন রায়-এর দা লাইফ অব কুমারস্বামী অ্যান ইন্টারপ্রিটেশন।

১৬ পূর্বোক্ত 'পরোক্ষ' গ্রন্থের অন্তর্গত কপিলা বাৎস্যায়ন-এর প্রবন্ধ দা ইন্ডিয়ান আর্টস দেয়ার ইন্ডিয়েশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড প্রিন্সিপলস অব ফর্ম।

১৭ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলার ভাস্কর্য। সুবর্ণরেখা, কলকাতা। ১৯৮৬।

১৮ রোমিলা থাপার। কালচার ইন আর্লি ইন্ডিয়া ট্রাডিশন অ্যান্ড পেট্রনেজ। টেলিগ্রাফ। ৭ থেকে ১৩ এপ্রিল ১৯৮৭।

১৯ বারনার্ড চ্যামপিগনিউল। রদাঁ। টেমস অ্যান্ড হাডসন। ১৯৬৭/১৯৮৮।

২০ হার্বার্ট রিড। মডার্ন স্কাল্পচার। টেমস অ্যান্ড হাডসন। ১৯৬৪/১৯৮৭।

২১ ই এইচ গোমব্রিচ। দ্য স্টোরি অব আর্ট। ফাইডন।

২২ হার্বার্ট রিড। ফিলসফি অব মডার্ন আর্ট। ফেবার অ্যান্ড ফেবার। ১৯৬৪/১৯৮২।

২৩ হার্বার্ট রিড। হেনরি ম্যুর, আ স্টাডি অব হিজ লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক। টেমস অ্যান্ড হাডসন। লন্ডন। ১৯৬৫।

২৪ টিমোথি হিলটন। পিকাসো। টেমস অ্যান্ড হাডসন। লন্ডন। ১৯৭৬/১৯৮৭।

২৫ দেশ, সাহিত্য সংখ্যা। ১৩৯৯।

২৬ পার্থ মিত্র। স্ট্যাটাস অ্যান্ড পেট্রনেজ অব আর্টিস্টস ডিউরিং ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া ১৮৫০-১৯০০, 'দা পাওয়ার্স অব আর্ট' নামে পূর্বোক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত।

২৭ যোগেশচন্দ্র বাগল। হিস্ট্রি অব দ্য গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটস, ক্যালকাটা। শতবার্ষিকী সংকলন।

২৮ কমল সরকার। ভারতের চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। যোগমায়া প্রকাশনী। ১৯৮৪।

২৯ কমল সরকার। কলকাতার স্ট্যাচু। পুস্তক বিপণি। ১৯৯০।

৩০ রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। দ্য ব্রেক ইন ইন্ডিয়ান স্কাল্পচারাল ট্রাডিশন। বিভাব, বিশেষ ভাস্কর্য সংখ্যা, ১৯৮৩। সন্দীপ সরকার ও সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত।

৩১ কমল সরকার। অর্ধশতবর্ষে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস। দেশ। ৪ জুন ১৯৮৩।

৩২ ললিতকলা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। মনোগ্রাফ।

৩৩ প্রশান্ত দাঁ। নানা রঙে দেবীপ্রসাদ। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স। ১৩৯১।

৩৪ সুশীল মুখার্জি। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী দ্য স্কাল্পটর। বিভাব, বিশেষ ভারতীয় ভাস্কর্য সংখ্যা। ডিসেম্বর ১৯৮৩

৩৫· ১৯৮৯-এর ডিসেম্বরে বিড়লা অ্যাকাডেমি আয়োজিত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর পূর্বাপর প্রদর্শনীর স্মারকপত্র।
৩৬· পরিতোষ সেন। যামিনী রায়ের চিত্রকলা। দেশ, ১৮ এপ্রিল ১৯৮৭।
৩৭· মার্গ (শিল্প বিষয়ক পত্রিকা) ডিসেম্বর ১৯৬২। সমকালীন ভারতীয় ভাস্কর্য সংখ্যা।
৩৮· 'ট্রেন্ডস ইন বেঙ্গল আর্ট' শীর্ষক লন্ডনের কমনওয়েলথ ইনস্টিট্যুটে অনুষ্ঠিত (৬ নভেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৬) প্রদর্শনীর স্মারক পুস্তিকা।
৩৯· ললিতকলা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত 'পিলু পোচখনওয়ালা' শীর্ষক অ্যালবামের এস· ভি· বাসুদেব লিখিত ভূমিকা।
৪০· ললিতকলা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত ধনরাজ ভগৎ-এর মনোগ্রাফে চার্লস ফাবরি লিখিত ভূমিকা।
৪১· কেশব মালিক। রিজিওনাল নোটস অন কনটেম্পোরারি স্কাল্পচার, নর্থ ইন্ডিয়া, সেকেন্ড ভিউ। বিভাব, বিশেষ ভারতীয় ভাস্কর্য সংখ্যা। ১৯৮৩।
৪২· ললিতকলা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত অমরনাথ সেহগাল-এর মনোগ্রাফ।
৪৩· মূলকরাজ আনন্দ। নোটস অন দ্য মডার্ন মুভমেন্ট ইন স্কাল্পচার। মার্গ, ডিসেম্বর ১৯৬৭।
৪৪· এস· চন্দ্রশেখর। ট্রুথ অ্যান্ড বিউটি : ইসথেটিকস অ্যান্ড মোটিভেশনস ইন সাইন্স। ভাইকিং। পেঙ্গুইন ১৯৯১।
৪৫ জাঁ পল সার্ত্রে। এসেজ ইন ইসথেটিকস। ওয়াশিংটন স্কোয়ার প্রেস, নিউ ইয়র্ক। ১৯৬৬।
৪৬ রবি পাল। রামকিঙ্কর বিষয়ক রচনা। শারদীয় দেশ, ১৩৯৫।
৪৭· সমরেশ বসু। দেখি নাই ফিরে। 'দেশ' পত্রিকায় ৬৫টি কিস্তিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। পরে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থ হিশেবে প্রকাশিত।
৪৮ প্রকাশ দাস সম্পাদিত রামকিঙ্কর। এ· মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি। ১৯৮৯।
৪৯· পরিচয়, শারদীয় ১৯৭৮। বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুলিখিত রামকিঙ্করের স্মৃতিচারণা।
৫০· বাসুদেব চন্দ্র। শিল্পের মানুষ রামকিঙ্কর। প্রতিক্ষণ, ১৭ আগস্ট ১৯৮৪।
৫১· কে· জি· সুব্রামনিয়ান/মোভিং ফোকাস। ললিতকলা অ্যাকাডেমি। ১৯৭৮।
৫২· শঙ্খ চৌধুরীর রামকিঙ্কর বিষয়ক রচনা। দেশ, ৩ জানুয়ারি ১৯৮৭।
৫৩· প্রণবরঞ্জন রায়। ১৯৭২-এ বিড়লা অ্যাকাডেমি আয়োজিত রামকিঙ্কর প্রদর্শনীর ক্যাটলগে সন্নিবিষ্ট আলোচনা।
৫৪ সিদ্ধার্থ রায়। রদাঁ প্রদর্শনীর আলোচনা। পরিচয়, এপ্রিল ১৯৮৩।
৫৫ উইলিয়াম টাকার। দ্য ল্যাঙ্গোয়েজ অব স্কাল্পচার। টেমস অ্যান্ড হাডসন।
৫৬ প্রদোষ দাশগুপ্ত। স্মৃতিকথা শিল্পকথা। প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস।
৫৭ শর্বরী রায়চৌধুরী। আমি ও আমার সময়। প্রতিক্ষণ, সংস্কৃতি সংখ্যা ১৩৯৩।
৫৮ অনাথনাথ দাস সংকলিত রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ মে ১৯৮৮-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য বিষয়ক দুটি চিঠি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা।
৫৯ রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ জানুয়ারি, ১৯৯০। শিল্পী হুসেনের সাক্ষাৎকার।
৬০ প্রদোষ দাশগুপ্ত। মডেলের সন্ধানে। প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯২।
৬১ প্রদোষ দাশগুপ্ত। রদাঁ সম্পর্কিত আলোচনা। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ মে ১৯৮৩।
৬২ প্রদোষ দাশগুপ্ত। আ স্টাডি অব হেনরি ম্যুরস স্কাল্পচার। স্টেটসম্যান মিসেলানি, ১১ অক্টোবর ১৯৮৭।
৬৩ প্রদোষ দাশগুপ্ত। রোল অব অ্যাবস্ট্রাকশন ইন মডার্ন আর্ট। ইন্ডিয়ান ইসথেটিকস অ্যান্ড আর্ট অ্যাকটিভিটি। ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব অ্যাডভানসড স্টাডিজ, সিমলা। ১৯৬৮।
৬৪· ললিতকলা কন্টেম্পোরারি, ২৬ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। রিচার্ড হার্ন্ট ও মার্ক টোবির সঙ্গে প্রদোষ দাশগুপ্তের কথোপকথন।
৬৫ প্রদোষ দাশগুপ্ত। রামকিঙ্করস উইকনেস। ললিতকলা কন্টেম্পোরারি, ৩০ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮০।
৬৬· ললিতকলা অ্যাকাডেমির মনোগ্রাফ, প্রদোষ দাশগুপ্ত: বিষ্ণু দে লিখিত ভূমিকা।
৬৭ প্রদোষ দাশগুপ্ত। ১৯৭৩-এর মার্চে বম্বের তাজ আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত একক প্রদর্শনীর স্মারকপত্রে তাঁর লেখা ভূমিকা।
৬৮ শঙ্খ ঘোষের সাক্ষাৎকার। 'ক্ষুধার্ত', নভেম্বর ১৯৮১, 'অনুষ্টুপ' পত্রিকার শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সংখ্যায় (১৯৯৪) পুনর্মুদ্রিত।
৬৯ চিন্তামণি কর। ইন্ডিয়ান মেটাল স্কাল্পচার। ১৯৫২।
৭০ চিন্তামণি কর। জীবনের অপরাহ্ণে। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা। ১৩৯৯।
৭১· চিন্তামণি কর। স্মৃতিচিহ্নিত। চিরায়ত প্রকাশন। ১৯৮৩।
৭২· ললিতকলা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত চিন্তামণি করের মনোগ্রাফ। মুলকরাজ আনন্দ লিখিত ভূমিকা।
৭৩· ১৯৮৫-তে ইন্ডিয়ান মিউজিয়মে অনুষ্ঠিত চিন্তামণি করের পূর্বাপর প্রদর্শনীর স্মারক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত অশেষ মিত্রের লেখা।
৭৪ শঙ্খ ঘোষ। জার্নাল। দে'জ পাবলিশিং।
৭৫ শঙ্খ চৌধুরী। কিঙ্করদাকে যেমন দেখেছি। রামকিঙ্কর। প্রকাশ দাস সম্পাদিত। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং।
৭৬ শঙ্খ চৌধুরী। রামকিঙ্করের ভাস্কর্য। দেশ, ৩ জানুয়ারি ১৯৮৭।

৭৭· ললিতকলা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত শঙ্খ চৌধুরীর মনোগ্রাফ। কার্ল খান্ডালাভালা লিখিত ভূমিকা।
৭৮· সোমনাথ হোর। আমার চিত্রভাবনা। সিগাল বুকস।
৭৯· সোমনাথ হোর। তেভাগার ডায়রি। সুবর্ণরেখা।
৮০· প্রণবরঞ্জন রায়। ললিতকলা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত সোমনাথ হোরের মনোগ্রাফের ভূমিকা।
৮১· সোমনাথ হোরের সাক্ষাৎকার। দেশ। ১৯৮৫, ৯ নভেম্বর।
৮২· জয়া আপ্পাসামি। অ্যান ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস্‌ নিউ দিল্লি। ১৯৭০।
৮৩· মীরা মুখার্জি। স্পন্দন। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা। ১৩৯৯ (১৯৯২)।
৮৪ মীরা মুখার্জি। সাক্ষাৎকার, দ্য টেলিগ্রাফ, ১৬ নভেম্বর ১৯৮৫।
৮৫· মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জির আলোচনা, স্কাল্পটিং ফর লিবারেশন। দ্য স্যাটারডে স্টেটসম্যান, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
৮৬ মীরা মুখার্জির সাক্ষাৎকার, সানন্দা, ২৬ জুন ১৯৯১।
৮৭ বিড়লা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত মীরা মুখার্জির প্রদর্শনীর ক্যাটালগ। ১৯৯৩।
৮৮· মীরা মুখার্জি। ভাস্কর্যের নানা প্রকরণ প্রসঙ্গে। পরিচয়, শারদীয় ১৯৮৩। অনুবাদ শুভ বসু।
৮৯· প্রভাস সেন। ঢোকরা শিল্পীদের কাহিনী। দেশ। ১৬ নভেম্বর ১৯৮৫।
৯০· মীরা মুখার্জির সাক্ষাৎকার। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ আগস্ট ১৯৯১।
৯১· বিনয় ঘোষ : বাংলা লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব। সিগনেট। ১৯৮৬।
৯২ মীরা মুখার্জি। টোকিও, হিরোসিমা, কিয়োতো। প্রতিক্ষণ-এ ধারাবাহিক প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনী। ১৯৮৫।
৯৩ এস· নন্দগোপাল। আর্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। ললিতকলা কন্টেম্পোরারি, ৩৫ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৭।
৯৪ ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার টুডে ১৯৮৩। জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারি পাবলিকেশন।
৯৫· বিড়লা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত 'তিন প্রজন্মের ভাস্কর্য' প্রদর্শনীর ক্যাটালগ। প্রদোষ দাশগুপ্ত লিখিত ভূমিকা। ১৯৯১।
৯৬· রতন পরিমু। বরোদা পেইন্টার্স অ্যান্ড স্কাল্পটর্স। ললিতকলা কন্টেম্পোরারি, সংখ্যা ৪।
৯৭· আলবাম—সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস ১৯৬০—১৯৯১। সোসাইটি প্রকাশিত।
৯৮· কে এল· কাউল। ১৯৯৪-এর জানুয়ারিতে বম্বের তাজ আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত বিমান দাসের প্রদর্শনীর স্মারকপত্রে লিখিত ভূমিকা।
৯৯ রতন পরিমু। নিউস্কাল্পচার ফ্রম বরোদা। ললিতকলা কন্টেম্পোরারি, ২৮ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯।
১০০· এস এ কৃষ্ণাণ। পি ভি· জানকিরাম—আ স্কাল্পটর অব গ্রেট প্রমিস। ললিতকলা কন্টেম্পোরারি, সংখ্যা ৯, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮।
১০১ ললিতকলা কন্টেম্পোরারি, সংখ্যা ১০, সেপ্টেম্বর ১৯৬৯। সম্পাদকীয়—কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার।
১০২· জয়া আপ্পাসামি। ট্রেন্ডস ইন রিসেন্ট স্কাল্পচার। ললিতকলা কন্টেম্পোরারি, সংখ্যা ১৬। সেপ্টেম্বর ১৯৭৩।
১০৩ গীতি সেন— ব্রোঞ্জেজ বাই মীরা মুখার্জি। ও যোসেফ জেমস—নন্দগোপাল। ললিতকলা কন্টেম্পোরারি,, সংখ্যা ২৭, এপ্রিল ১৯৭৯।
১০৪ কালী বিশ্বাস—ডি পি রায়চৌধুরী। জয়া আপ্পাসামি—এ এম দাবিয়েরওয়ালা। ললিতকলা কন্টেম্পোরারি, সংখ্যা ২১, এপ্রিল ১৯৭৬।
১০৫ শঙ্খ চৌধুরী। রামকিঙ্কর বেইজ। ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট আয়োজিত রামকিঙ্করের প্রদর্শনীর স্মারকপত্রের ভূমিকা, ১৯৯০।
১০৬ ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট প্রকাশিত আ হ্যান্ডবুক অফ স্কাল্পচার্স। ১৯৭৪।
১০৭· অ্যাওয়ার্ড উইনার্স, ন্যাশনাল এক্সিবিশন অব আর্ট ১৯৫৫—১৯৯০। ললিতকলা অ্যাকাডেমি।
১০৮· সি· শিবরামমূর্তি। সাউথ ইন্ডিয়ান ব্রোঞ্জেজ। ললিতকলা অ্যাকাডেমি। ১৯৮৬।
১০৯ দ্য র‍্যানডম হাউজ লাইব্রেরি অব পেইন্টিং অ্যান্ড স্কাল্পচার। চার খণ্ড। র‍্যানডম হাউজ, নিউ ইয়র্ক। ১৯৮১।

নাম-নির্দেশিকা

সাধারণভাবে বাঙালি নামের ক্ষেত্রে মূল-নাম আগে, অবাঙালি বা অভারতীয় নামের ক্ষেত্রে পদবি আগে এসেছে।